গল্পে আত্মবিদ্যা

প্রথম খণ্ড

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
কলকাতা

প্রকাশক
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি

প্রচ্ছদ
শ্রী বিষ্ণু কর্মকাব

প্রাপ্তিস্থান
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
এ-১৯০ মেট্রোপলিটন সমবায় আবাসন
কলকাতা ৭০০১০৫

মুদ্রক
মানসী প্রেস
৭৩ শিশিব ভাদুড়ী সবণী
কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

গল্পেব মাধ্যমে সৎপ্রসঙ্গ হলে
আনন্দ পায় শুনে আর সকলে।
গল্পের বিষয়বস্তুর ধর্ম অনুসারে
তার অনুভূতি হয় অন্তরে।
আত্মবোধের গল্পে আছে আত্মকথা
শুনে শুনে হয় তার আত্মবোধ সাধা।
গল্পে গল্পে আত্মবিদ্যা সহজে মিলে
উপহাররূপে তা-ই সবাই পেলে।।
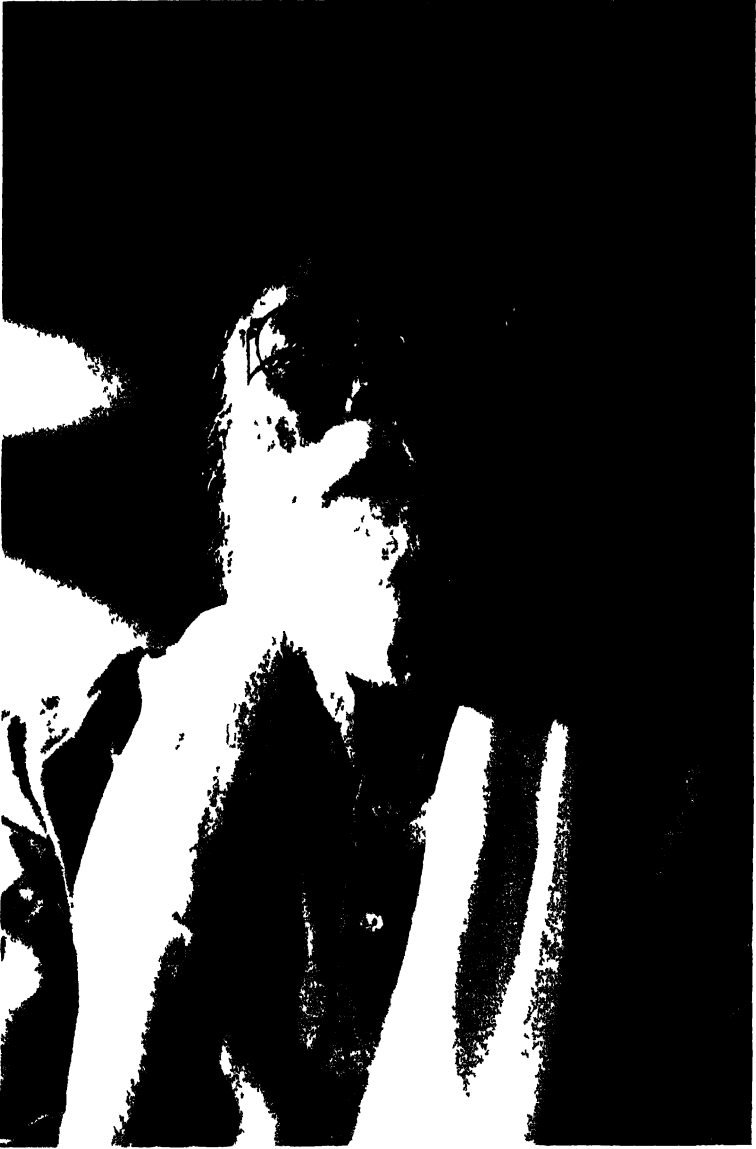
স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

অনেক প্রতীক্ষার পর শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথায় নিবেশিত তত্ত্ববোধিনী গল্পকাহিনীর সংকলন 'গল্পে আত্মবিদ্যা' প্রকাশিত হল। সম্বুদ্ধ প্রজ্ঞানপুরুষ যখন উপলব্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করেন তখন সাধারণ ভক্ত শ্রোতাদের কাছে তার অনেকাংশই বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। ভক্তিবিশ্বাসের প্রাবল্যে (আগ্রহে) শ্রবণেন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ত হয়, কিন্তু হৃদয় ও বুদ্ধির সংস্কারমুক্তি না ঘটলে তা মনকে উর্ধ্বমুখী করতে পারে না বা তাতে মনে কোনও ছাপ পড়ে না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করেন অভিনব এক বৈজ্ঞানিক উপায়ে। ভঙ্গিমাটি অবশ্যই অগতানুগতিক, পাঠকের মনে তাতে তত্ত্বের সুসংহত বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই পরিপূর্ণতার জন্য প্রাঞ্জলতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন যা প্রজ্ঞানপুরুষ নিজেই সবার উপযোগী করে পরিবেশন করেন। এই পরিবেশনায় আসে উপমা, উপাখ্যান, তত্ত্বকল্পকথা যাব অনেকটাই তাঁর বোধে ও উপলব্ধিতে সংপৃক্ত। কিছুটা হয়ত প্রচলিত গল্পগাঁথা, প্রবাদ ও পৌরাণিক কাহিনী।

স্মৃতি-শ্রুতিতে অনেক সময়ই কথোপকথনের মাধ্যমে তত্ত্ব প্রকাশ হযেছে, বিশেষ কবে পুবাণসমূহে অনেক উপাখ্যান সংযোজিত যার মুখ্য উদ্দেশ্য বিভু পরমাত্মাব স্বরূপটি সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা সাধারণের কাছে সহজেই গ্রহণীয হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া গল্পমাধ্যম এই প্রকাশকে সর্বাঙ্গসুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ একটি পরিবেশ তৈরির সহায়তাই করেছে। প্রসঙ্গত দু'একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

মন দিয়েই আমাদের জীবনবোধ। পৌরাণিক চরিত্র ধ্রুবর কঠোর সাধনার কথা আমরা জানি, কিন্তু তার মনোজগতের পরিমাপ করে তাতে তত্ত্বস্বরূপের উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয় বোধটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর দেবর্ষি নারদকে ধ্রুবর কাছে পাঠালেন—এ কাহিনী আমরা অনেকে জানিনা। যারাও বা জানি, তাদেরও তত্ত্ববোধের যে পরিমণ্ডলের প্রয়োজন রয়েছে তার বিশ্লেষণটুকু জানা নেই। তত্ত্ববোধ ছাড়াও সাধনার উপাদান কি কি এবং তা সম্বল করে কি ভাবে মুমুক্ষু সাধক স্যার্থকতা লাভ করে তাও রূপকের মাধ্যমে স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর অনন্যভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। একটি গল্পে, চাষী, তার দুটি বলদ, কুকুর ও বন্য জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে এক চিত্তাকর্ষক গল্পের অবতারণা করে সাধনপথের সবরকম পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেও মনই মূল ভূমি—তাকে পরিষ্কার করে তাতে আধ্যাত্মিকতার ফসল ফলাতে হবে এবং তার উপাদান উপকরণ কি হবে তার বিস্তারও তিনি করেছেন।

প্রসঙ্গত গুরুর ভূমিকাও এসে যায়। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের মাধ্যমে তা সর্ব-সাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে পরিবেশন করেছেন। এক রাজপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষক বা গুরুর নিযুক্তি, ধীরে ধীরে রাজপুত্রের যথার্থ ও সুষ্ঠু শিক্ষালাভের অগ্রগতির পরিচয় দিয়ে আখ্যান শুরু। আবার এরই মধ্যে রাজার ধৈর্যহীন হস্তক্ষেপ শিক্ষাক্রমে এক ছন্দপতন। বিশেষত গুরুর রাজপুত্র-শিষ্যের প্রতি কঠোর আচরণের জন্য রাজা কর্তৃক তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা, গুরুর আত্মগোপন ও ছদ্মবেশে রাজসভায় উপস্থিত থেকে পরবর্তী ঘটনাসমূহেব প্রত্যক্ষ করার ও প্রয়োজনে নিজের পরিচয় প্রদান—একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি শিষ্যের প্রতি গুরুর চিরন্তন সম্পর্কের আবেদনটিও প্রস্ফুটিত। রাজার বিচারে অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুত্রের পিতার কাছে গুরুদেব নির্দেশিত আদর্শ বিচারের বিশ্লেষণ ও অপরাধীর মুক্তি প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অপূর্ব। রাজা তখন নিজের ফাঁদে বন্দী। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই গল্পের জের টেনে এর সার তত্ত্ব আরও প্রাঞ্জল করে বলেছেন—একমাত্র ভগবানই নির্ভুল বিচারক, আবার তিনিই সত্তা হিসাবে সবার মধ্যে বিদ্যমান। অথচ "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। সাধারণ লোকের বিচার করতে যাওয়াই ভুল। দ্বিতীয়ত শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন। কোমলে কঠোরে প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে দৈব অনুভূতির বিকাশ ঘটানোই শিক্ষা দেওয়া। রাজা নিজের হঠকারিতায় সদ্‌গুরুর মহিমা বুঝতে না পেরে যে ভুল করেছিলেন তা সাধারণ মানুষ সহজেই করে থাকে। বস্তুত সদ্‌গুরু অলক্ষ্যে হৃদয়ে বসে সবই প্রত্যক্ষ করেন, ছদ্মবেশী গুরুর অবতারণা করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গুরুর এই মহিমার কথাই তুলে ধরেছেন।

এভাবে অনেক অশ্রুতপূর্ব গল্পের মাধ্যমে তিনি সঠিক সাধনপন্থা এবং উপলব্ধব্য অধ্যাত্মতত্ত্ব পর্যালোচনা করেছেন।

তত্ত্বকথা তত্ত্বাশ্রয়ী করা সহজ, কিন্তু তা পাঠক-শ্রোতাদের কাছে সহজতর করতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাকে গল্পাশ্রয়ী করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ তাই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা এবং তার স্বাদও ভিন্ন। পাঠকদের কাছে এর আবেদনও চিরায়ত।

কাগজের মূল্য ও প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও পাঠকদের কথা বিবেচনা করে এই গ্রন্থের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

স্বানুভবসিদ্ধ প্রজ্ঞানঘন পুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের আলোচনার বিষয়বস্তুই হল পরমতত্ত্ব ও তাঁর স্বানুভূতির বিজ্ঞান। তত্ত্ব বিশ্লেষণই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। পরমসত্যই হল পরমতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দই হল তার স্বরূপ। তা নিত্যাদ্বৈত প্রজ্ঞানঘন। ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম তারই নামান্তর। মাতৃতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব প্রভৃতি পরমতত্ত্বেরই বিজ্ঞানঘন ব্যবহারিক রূপ। তাঁর মুখে সব সময়ই তত্ত্ব প্রসঙ্গেই আমরা শুনেছি। পরমতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্যসিদ্ধি হওয়ার ফলে তাঁর বক্তব্য বিষয় সবই তত্ত্বভিত্তিক। সেই জন্য সর্বশ্রেণীর ও সর্বমতপথের শ্রোতাই তাঁর কথা বা আলোচনার মধ্যে তাদের জিজ্ঞাসার চরম উত্তর পেয়ে প্রীত হন। তত্ত্বপ্রসঙ্গ অতীব দুর্লভ। স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত অপরের পক্ষে তত্ত্ব পরিবেষণ করা সম্ভব নয়। সাধনবিদ্যা হল স্বভাবের সর্বাঙ্গীণ শোধন ও তার বিজ্ঞানসিদ্ধি। জীবনসাধনার বহুবিধ ক্রম আছে। অধ্যাত্মসাধনার মতপথও অনন্ত। স্বভাবের সংস্কার, যোগ্যতা, রুচি, ক্ষমতা, সামর্থ্য অনুসারে মানুষ সাধনার পথ বেছে নেয়। কিন্তু তত্ত্বান্বেষী সাধক অতীব বিরল। সাধনসিদ্ধির বিজ্ঞান অনুসরণ করে সাধক পার্থিব জগতের প্রভাব মুক্ত হয়ে অপার্থিব জগতে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তত্ত্বের অনুভূতি ব্যতীত জীবন মুক্ত ও অমৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তত্ত্বের কোনও সাধন নেই সত্য, কিন্তু তার প্রসঙ্গ শ্রবণের মাধ্যমে যোগ্য অধিকারী সাধকের তত্ত্বস্ফূর্তি হয়।

তাঁর তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাহিনি, গল্প ও উদ্গীত গান। সত্যানুভূতি হল তত্ত্বানুভূতি। ব্রহ্মাত্মবিদ্যা হল তারই বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ। তা বাক্যমনাতীত সত্য, কিন্তু স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের মুখে সেই প্রসঙ্গ শ্রবণের মাধ্যমে দুর্বোধ্য ব্রহ্মাত্মবিদ্যা যে কত সহজসাধ্য হয়, তাঁর মুখ নিঃসৃত তত্ত্বভিত্তিক গল্প, কাহিনি হল তার প্রমাণ। গল্প ও গানের মাধ্যমে মানুষের অসংযত, অসংস্কৃত, চঞ্চল, অস্থির মনকে স্থির ও একাগ্র করা খুব সহজেই সম্ভব হয়। সেই জন্য তিনি গান ও গল্পের মাধ্যমে দুর্বোধ্য ঈশ্বরাত্মব্রহ্মতত্ত্বকে অতীব সহজবোধ্য করে পরিবেষণ করেছেন দিনের পর দিন সৎপ্রসঙ্গ কালে। সংগ্রহ করা সেই সমস্ত গল্পের সংখ্যাও অনেক। তার কিছুটা প্রথম খণ্ডে সদ্য প্রকাশ করা হল। অভিনব এই গল্পগুলি শুনে আমরা যে আনন্দ পেয়েছি, সবাই যাতে সেই আনন্দ লাভ করতে পারে তার জন্যই আমাদের এই *গল্পে আত্মবিদ্যা* গ্রন্থটি প্রকাশের প্রচেষ্টা। আত্মবোধ অতীব দুর্বোধ্য হলেও *গল্পে আত্মবিদ্যা* পাঠে সহৃদয় পাঠক মাত্রেই যে উপকৃত হবেন তা বলাই বাহুল্য। আত্মবোধে সবাই উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হোক—সবার মুক্তিশান্তি লাভের জন্য এই শুভেচ্ছাই সকলকে জানাই।

ওঁ তৎ সৎ

বিনীতা

বাণী চক্রবর্তী

মুখবন্ধ

গল্পে আত্মবিদ্যা গ্রন্থটির মাধ্যমে সর্ব মানুষ এবং জীবজগতের অন্তর্নিহিত পরম সত্য ও দিব্য অমৃতময় তত্ত্বস্বরূপকে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা, কার্যাবলী ও ব্যবহারের মাধ্যমে যে অভিনব ভঙ্গিমায় সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে তা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। সুদূর অতীত কাল হতে বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের লীলাভূমি বহিঃপ্রকৃতিতে যা-কিছু মনোরম, চিত্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য তা জীবরূপী মানুষের কাছে পরম আশ্চর্যের বিষয়, আবার জীবজগতে জীবের জটিল জীবনরহস্যও মানুষের কাছে এক পরম জিজ্ঞাসা। সর্বোপরি মানবসমাজে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ বা পার্থক্য, অন্তরের গুণ-শক্তির ও বিদ্যা-বুদ্ধির যোগ্যতা এবং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অনুভূতির যে পার্থক্য, সে সব সত্ত্বেও মানুষ সমাজবদ্ধ, সংসারবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে। তার রহস্য দুর্বোধ্য হলেও মানুষ তার সত্য পরিচয়টি জানার চেষ্টা করেছে অতীতে, চেষ্টা করছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তা করবে। সত্যকে জানবার ইচ্ছা যে জিজ্ঞাসা, তা একমাত্র মানুষের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় এবং যোগ্য অধিকারী আত্মান্বেষণযোগে আপন হৃদয়ে তার সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

সত্য কী—এটি মানুষের কাছে একটি মৌলিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। মানুষমাত্রেই কল্পনাপ্রবণ, কামনাবাসনার দাস। কামনাপূরণের জন্য তাকে কর্ম করতে হয়। কর্মের জন্য কর্তৃত্ব দরকার। কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব হল মনুষ্য জীবনের এক বিশেষ লক্ষণ। মনুষ্য ইতর জীবের মধ্যে এই তিনটির ব্যবহার স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় দেখা যায়। জীবনধারণের জন্য অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় (বাসস্থান), আহার সংগ্রহ, নিদ্রা বা বিশ্রাম এবং বংশরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদন—এগুলি স্বভাবগত ভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাদের এই স্বভাবগত আচরণকে মানুষ instinct ও impulse রূপে ব্যক্ত করেছে। মানুষের মধ্যে উপরোক্ত এই চতুর্বিধ স্বভাবগত আচরণ common হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যা অধিক বা বিষদ ভাবে দৃষ্ট হয় তা হল বিশেষ ধর্মবোধ, যুক্তি-বিচার, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ। শেষোক্ত শব্দগুলির মর্মার্থ ও তাৎপর্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির মাধ্যমেই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এ সবের প্রকাশবিকাশ সবার মধ্যে সমান ভাবে দৃষ্ট হয় না। কারও মধ্যে কোনওটা স্বল্প মাত্রায়, কারও মধ্যে কোনওটার আধিক্য বেশি না-হলেও কিছুটা প্রকাশ পায়, আবার কারও মধ্যে এগুলির পূর্ণ প্রকাশবিকাশ বা অভিব্যক্তি তাকে সর্বোত্তম ভাববোধ ও অনুভূতির অধিকারী করে দেয়। এই রকম অধিকারী পুরুষই জীবনবিজ্ঞানের পরমসত্যটি অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হয়।

মানুষমাত্রেই গুণভাব, দেশ-কাল, কার্য-কারণের অধীন। এ সবই নিজবোধের সসীম ব্যবহার। গুণভাবযোগে বোধের সসীমতা হল বোধের মল। এই মলিনবোধের অধিকারী হল অধিকাংশ মানুষ। গুণভাবের মাত্রার তারতম্য অনুসারে মানুষের মধ্যে ভাববোধের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গুণভাবের প্রভাব জীবনকে লুব্ধ করে সংসারবদ্ধ করে

রাখে। গুণভাবাদি সবই মানুষের স্বভাবজাত। স্বভাব আবার স্ববোধজাত। স্বভাবের বহিঃপ্রকাশই হল প্রকৃতি।

প্রকৃতির অধীন মানুষ তমোগুণপ্রধান, দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। দেহসর্বস্ব ভোগের জীবনই হল তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। তাদের থেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হল অন্তরের স্বভাবাধীন মানুষ। তাদের যোগ্যতা, ভাববোধ ও অনুভূতি পূর্বদের অপেক্ষা উন্নততর হলেও তাদের বোধ সত্ত্বমিশ্রিত রজোপ্রধান। তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ যাদের বেশি, তাদের ভাববোধ অন্তর্মুখী এবং অধিক মার্জিত ও সংযত। তমোরজোগুণী ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃতির বশে যারা, তারা অবিদ্যাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে। সত্ত্বগুণ ও শুদ্ধসত্ত্বগুণের অধিকারী যাঁরা, তাঁরা বিদ্যাশক্তির অধীনে চলেন। তমোরজোগুণের প্রভাব তাঁদের মধ্যে অতি সামান্য, প্রায় না-থাকার মতোই। তাঁরা অন্তর্ভাববোধের উন্নত অবস্থায় সত্যবোধের অধীনে চলেন। প্রকৃতির অধীন যারা, তাদের অভিমান-অহংকার ও স্বার্থবোধ সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বভাবের অধীনে যারা চলে তাদের অভিমান-অহংকার ও স্বার্থ অপেক্ষাকৃত কম। স্ববোধের অধীনে যাঁরা চলেন, তাঁরা অভিমান-অহংকার ও স্বার্থ শূন্য। স্ববোধের প্রভাবে চলেন বলে তাঁদের কোনও ভাবের বিকার হয় না। তাঁরা দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণ সাপেক্ষ নন, তাঁদের চিত্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

স্ববোধের প্রভাবে যাঁরা চলেন, তাঁরা শুদ্ধবোধের অধিকারী। শুদ্ধবোধই হল সত্যবোধ তত্ত্ববোধ ঈশ্বর-আত্মার পরিচয়। সর্বজীবনেরই সত্য পরিচয় হল ঈশ্বর-আত্মা। আপনবোধে সবার হৃদয়ে এই ঈশ্বর-আত্মার সত্যানুভূতি পূর্ণ ভাবে নিহিত আছে। জীবনের মধ্যে তাঁর পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির অপেক্ষায় তাঁর স্বয়ংপ্রকাশ স্বভাব নিরন্তর সক্রিয় হয়ে অন্তরকে পরিচালনা করে। এই ঈশ্বরাত্মবোধ হল সত্যবোধ ও তত্ত্ববোধ। তত্ত্বজ্ঞান হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞপুরুষ আপনবোধে সমবোধে তত্ত্বজ্ঞানকে স্বানুভূতির ভাষায় ব্যক্ত করে অপরকে তদ্‌বোধে অনুপ্রাণিত ও প্রবুদ্ধ করে আত্মতত্ত্বের অধিকারী বানিয়ে দেন। তত্ত্বজ্ঞানীর ভাষাই হল আত্মজ্ঞানের ভাষা, পাকা আমি-র ভাষা। আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত পাকা আমি জীবের কাঁচা আমিকে তদ্‌বোধে প্রবোধিত করার জন্য আত্মতত্ত্বের কথা তাকে নানা ভাবে শোনান।

আত্মতত্ত্বের কথা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হলেও তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আত্মজ্ঞানী তা সহজবোধ্য করে সুললিত ভাষায় নানাবিধ উপমা, উদাহরণ, ব্যাখ্যা, গল্প, কাহিনি, বিশ্লেষণ প্রভৃতির মাধ্যমে জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের কাছে পরিবেশণ করেন। আলোচ্য গ্রন্থটির নামাকরণ হল *গল্পে আত্মবিদ্যা*। যে বিদ্যা আত্মবোধের স্বরূপকে সম্যক্‌রূপে অনুভবসিদ্ধ করে দেয়, সেই বিদ্যা আলোচ্য গ্রন্থে কেবলমাত্র গল্প, কাহিনি, উপাখ্যান ও উপমা সহযোগে যে কত মনোরম ও সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে তা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। গল্পগুলি দৈনন্দিন ভাষণের মধ্য থেকে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জিজ্ঞাসু ভক্তদের সহজ, জটিল-কুটিল প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারই অংশবিশেষ এই বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বকে অবলম্বন করে এক অভিনব ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ গল্পের আদি-মধ্য-অন্তে তার অন্তর্নিহিত সত্য ও তত্ত্বের প্রকাশবিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

আবার কোনও কোনও জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ গল্পে তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য।

কামাহত সংসাববদ্ধ জীবকে সংসারমুক্ত আত্মবোধে প্রবুদ্ধ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ সংসারী মানুষের জীবন স্বভাবজাত সংস্কারের দ্বারা মলিন ও সীমিত। পুঁথিগত বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা সবই সসীম, বিকৃত, মলিন ও অপূর্ণ বলে তা অবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত। তা চিদাভাস গুণাধীন বলে কল্পনাপ্রধান এবং অভিমান-অহংকারে ভরা। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ভেদই সেখানে সর্বাধিক। সংসারী মানুষের জীবনালেক্ষ্য, জীবনের ঘটনাবলী সবই রূপ-নাম-ভাবের বিকারে গড়া ও ভরা। তা দেশ-কাল, কার্য-কারণ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির অধীন। জীবরূপী কাঁচা আমি তার ভোক্তা। স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত ভোগসর্বস্ব জীবনে মানুষ সুখশান্তি আশা করে বটে, কিন্তু শোক, মোহ, দুঃখ, অশান্তি হল তার পুঁজি। সে জীবনে সুখ, আরাম, শান্তি কামনা কবে। তার জন্য চেষ্টা করে, পরিণামে পায় সে দুঃখ, ব্যথা, মৃত্যুযন্ত্রণা, অশান্তি, ভ্রান্তি, ভীতি প্রভৃতি। সংসারজীবনে মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য পূর্ণমাত্রায় থাকে বলে তার ত্রিবর্গ সাধনই হল ধর্ম, অর্থ, কাম; মোক্ষ সাধন তার হয় না। মোক্ষ সাধন হয় বিদ্যাশক্তির অধীনে।

বিদ্যাশক্তির সাধন হয় স্ববোধে আপনবোধে। স্বভাবের বশে জীবন এবং স্ববোধের প্রভাবে জীবনের মধ্যে পার্থক্য এতবেশি যে তা অনুমান করা যায় না। স্বভাবের জীবনে গুণভাবের আধিক্য বেশি, নাম-রূপ প্রিয় বলে তার প্রভাবে চলতে জীব অভ্যস্ত। সেই জন্য নাম-রূপ-ভাবের বিকার হতে সে মুক্তি পায় না। কিন্তু স্ববোধের দ্বারা পরিচালিত যে জীবন তা হল শুদ্ধবোধের জীবন, ভাব-রূপ-নামবর্জিত আত্মবোধের বা আপনবোধের জীবন। স্ববোধের জীবনে নিজ অতিরিক্ত কোনও কিছুর অস্তিত্ব ও ব্যবহার সিদ্ধ নয়। তাতে কল্পনার কোনও সুযোগ নেই। স্ববোধের দ্বারাই স্ববোধ পরিপূর্ণ বলে তা দ্বৈত ভাববোধ থেকে মুক্ত। জীবনের মধ্যে এই বোধ সবারই হৃদয়ে নিহিত। বুদ্ধিদোষে মানুষ তা ভুলে আছে বলে মানুষ স্বভাবের অধীনে চলে, অর্থাৎ দ্বৈতভাবের গুণভাবের বিকারে চলে। স্বভাবের ঘর ছেড়ে স্ববোধের ঘরে ফিরে আসার জন্য মানুষকে কঠোর তপস্যা করতে হয়। সবার পক্ষে তা সম্ভব নয়, অথচ বিদ্যার শক্তি, স্ববোধের জ্ঞান সবারই দরকার। অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রভাবে যে স্বভাবের বিকার হয় বিদ্যা বা জ্ঞানের সাহায্যেই তা দূরীভূত হয়।

নিজের মধ্যে দু'টি ভাগ—আমি ও আমার। সংসারীদের মধ্যে অবিদ্যার প্রভাবে আমারভাবেরই প্রাধান্য বেশি। তা নাম-রূপের প্রভাবে গড়া বলে বিকারী ও পরিণামী এবং সর্বদুঃখের কারণ। কিন্তু আমি-র ভাগটি নিজবোধের ভাব বলে তা বিকারমুক্ত। আমারপ্রধান আমি হল সংসারী মানুষ। আমিপ্রধান আমার হল ঈশ্বর এবং আমারমুক্ত আমি হল আত্মা-ব্রহ্ম। ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম এক সত্য এক তত্ত্বেরই পরিচয়, কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত হয়েও গুণভাব-শক্তির সঙ্গে যুক্ত এবং ব্রহ্ম-আত্মা নিত্যমুক্ত। আমারবোধ হল অনাত্মবোধ এবং আমিবোধ হল আত্মবোধ। আমারভাব যুক্ত অনাত্মাশ্রয়ী জীবকে অনাত্মা আমারভাব মুক্ত আত্মবোধে প্রতিষ্ঠার জন্য, অর্থাৎ দ্বৈত ভাববোধ, মিশ্র ভাববোধ হতে অদ্বৈত ভাববোধ, অর্থাৎ অবিমিশ্র শুদ্ধ ভাববোধে ফিরে আসার জন্য যে সত্যজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন তা সহজসাধ্য নয়, তবু মানুষের হৃদয়ে সেই বোধ

জাগাবার জন্য বহুবিধ সাধনপদ্ধতি প্রচলিত আছে। গল্প, উপাখ্যান, কাহিনির মাধ্যমে সেই বোধকে সহজে অপরের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষগণ এই বিদ্যার আশ্রয়ে মানুষকে সাহায্য করেন।

দীর্ঘকাল সৎপ্রসঙ্গকালে জিজ্ঞাসু ভক্তদের নানাবিধ জটিল প্রশ্নের উত্তরে অনেক সময় তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার মধ্যে গল্প, উপাখ্যান ও কাহিনির প্রকাশ আলোচ্য প্রসঙ্গকে অধিক সুগম ও মনোগ্রাহী করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। সেই আনন্দধারার যতটা সুরক্ষিত হয়েছে তা-ই হল আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গল্প চিরকালই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কাছেই প্রিয়। গল্প শুনতে সবাই ভালবাসে এবং অস্থির, চঞ্চল চিত্তও একাগ্র মনে গল্প শুনে আনন্দ পায়। তাই আত্মকথা আলোচনাকালে সুকৌশলে গল্পের মাধ্যমে আত্মবিদ্যা পরিবেষণ করা হয়েছে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানুষকে নানাবিধ অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তার জীবনের সমস্যা এতবেশি বেড়ে যায় যে, সে কোনও উপায় খুঁজে পায় না। এ রকম যাদের জীবন তাদের জন্য *গল্পে আত্মবিদ্যা* খুবই ফলপ্রদ হবে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

সাধারণ মানুষের মন বড় চঞ্চল। সংসারীদের কামাহত চিত্ত বড় দুর্বল। কোনও বিদ্যা সঠিক ভাবে চর্চা করা এবং তার অন্তর্নিহিত সারমর্মকে বা অনুভূতিকে গ্রহণ করা ও চিত্তে ধরে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিদ্যা যতই উন্নততর ও সূক্ষ্মতর হয় ততই তা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয়। গতানুগতিক নিয়মে যে বিদ্যাশিক্ষা মানুষ করে ও পায় তাতে শিক্ষার্থীর কিছু প্রচেষ্টা দরকার হয়, তার সঙ্গে পূর্ব অভিজ্ঞতার সংস্কারও থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুঁথিগত সংগ্রহ করা বিদ্যা অপেক্ষা অধিক থাকা দরকার। তা না-হলে শিক্ষকের বা গুরুর অনুশাসন শিক্ষার্থীর কাছে সুখকর, গ্রাহ্য ও সুবোধ্য হয় না। জাগতিক বিদ্যা, যা মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে চর্চা করে লাভ করে তাকে প্রাকৃত বিদ্যা বা অবিদ্যা বলা হয়। তার দ্বারা জীবনের বহিঃপ্রকৃতির অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণের পুষ্টি-তুষ্টি হয়। অন্তর্মনের প্রকাশবিকাশ বা পুষ্টি-তুষ্টির জন্য, অর্থাৎ স্বভাবের সাত্ত্বিক রূপায়ণের জন্য যে বিদ্যাশক্তির অনুশীলন দরকার তা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না এবং সম্ভবও নয়। সেই বিদ্যার অধিকারী পুরুষ অনুভবসিদ্ধ, সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল পরাবিদ্যা অর্থাৎ নিত্য একবোধের বা সমবোধের বিজ্ঞান। তা-ই হল আত্মবোধ আপনবোধ ঈশ্বরবোধ তত্ত্বজ্ঞান অমৃত মুক্তি শান্তি স্বরূপ। তা নিহিত থাকে সবার হৃদয়ের গভীরে। প্রকাশের অপেক্ষায় থাকলেও প্রকাশ সহজে হয় না। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞপুরুষের সংস্পর্শে থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যা অনুশীলন করতে হয়। স্বয়ংপ্রকাশ এই বিদ্যা সাধনসাপেক্ষ নয়, তবে স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের মুখে শ্রবণসাপেক্ষ। শ্রবণের মাধ্যমে এই বিদ্যা শ্রোতার হৃদয়ে অনুভবসিদ্ধ হয় প্রত্যক্ষ ভাবে। সেই জন্য এই বিদ্যার নাম শ্রুতিবিদ্যা।

শ্রুতিবিদ্যা মানে ব্রহ্মাত্মবিদ্যা, পরমতত্ত্ববিদ্যা। এই তত্ত্ববিদ্যা অবলম্বনে প্রসঙ্গক্রমে যে-সব কথা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্রোতাদের সামনে অভিব্যক্ত হয়েছে সেগুলি সবই গল্প, উপাখ্যান ও উপমার রূপ ধারণ করেছে। গল্পগুলির মধ্যে ছোট-বড় নানা রকম গল্প আছে, কোনওটিই তত্ত্বশূন্য নয়। সব গল্পেরই অন্তর্নিহিত সত্য ও তত্ত্বটি হল

আপনবোধের তথা আত্মবোধের পরিপূরক ও সম্পূরক। কোনও কোনও গল্পের মধ্যে তত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পাওয়ার তার তাৎপর্য সহজবোধ্য নয় বলে তার তত্ত্ববিশ্লেষণ গল্পের শেষে দেওয়া হয়েছে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু সবই গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনের, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিজন, প্রিয়জন, আপনজন, জ্ঞাত-অজ্ঞাত অর্থাৎ চেনা-অচেনা লোক, বিষয়বস্তু সবকে নিয়েই গল্পগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল গল্পগুলির মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠককে নিজস্বরূপ সম্বন্ধে অভিহিত বা সচেতন করা এবং তদ্‌বোধে প্রতিষ্ঠিত করা। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাববোধ সহযোগে মানুষের বৈচিত্র্যময় চরিত্রের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তাদের আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে, তেমনই আত্মবিদ্যার সূক্ষ্ম, গভীর অনুভূতির ধারাটিও সযতনে রক্ষিত হয়েছে। সহৃদয় পাঠক একান্ত মনোযোগ সহকারে গল্পগুলি অধ্যয়ন করলে তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন আত্মবোধের পরিচয় অবগত হতে পারবে।

স্বাত্মবোধের সিদ্ধিপ্রদ আত্মবিদ্যার অভিনব এই বিজ্ঞানটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হল স্বাত্মবোধে সবাইকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বর্তমানে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়েছে যখন রাষ্ট্রে, সমাজে ও পরিবারে কোথাও মানুষের সোয়াস্তি, সুখশান্তির কোনও নিশ্চয়তা নেই। সাধনভজন করার সময়সুযোগও নেই এবং সবার পক্ষে তা সম্ভবও নয়। নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অনুকূল যেখানে কিছুই নেই, সেখানে অধ্যাত্মসাধনার উপযোগী পরিবেশ, সঙ্গ, আহার, শিক্ষা, অনুশাসন, স্বাস্থ্য, সংস্কার, যোগ্যতা—এ সবেরই অভাব। সেই জন্য সময়োপযোগী *গল্পে আত্মবিদ্যা* গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল কতগুলি তত্ত্বভিত্তিক গল্প, যা পাঠে ও অনুধ্যানে গল্পের তত্ত্ব পাঠক প্রত্যক্ষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে স্বহৃদয়ে, আপন হৃদয়ে আপনবোধের মাধ্যমে।

এক পরমাত্মদেবতাই সর্বভূতে অর্থাৎ সবার হৃদয়ে সবার আত্মারূপে বিরাজমান। তাঁরই অভিব্যক্তি জীবনে সবার হৃদয়ে স্ববোধ-আত্মারূপে, অহংদেব বা পাকা আমি রূপে, অন্তরে স্বভাব আত্মা, অহংকার বা কাঁচা আমি রূপে এবং বাইরে বহিঃপ্রকৃতিতে সেই পৃথক জীবভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। অন্তরে ও বাইরে সবাই নিজেকে অপর অপেক্ষা এবং অপরকে নিজ অপেক্ষা পৃথক ভাবে দেখে, শোনে, জানে, বোঝে এবং সেই মতো আচরণ বা ব্যবহার করে। তাই একাত্মবোধ সবার হৃদয়ে নিহিত থাকা সত্ত্বেও তার অনুভূতি বা জ্ঞান আবৃত থাকে নিজ বুদ্ধিদোষে। সেই বুদ্ধিদোষকে একাত্মবোধের অনুভূতিতে বা জ্যোতিতে শোধন ও নির্মূল করার জন্য গল্পের মাধ্যমে একাত্মবোধের বিজ্ঞানকে পরিবেষণ করা হয়েছে সবার কাছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে সেই একাত্মবোধের প্রকাশবিকাশ পাঠকের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তখন পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান বা পার্থক্য পূর্বের মতো থাকবে না। একাত্মবোধে যিনি প্রতিষ্ঠিত ও অনুভবসিদ্ধ হয়েছেন তাঁর জীবন সার্থক। তিনিই অমৃত মুক্তি শান্তির দিব্য অধিকারী। তিনি ধন্য ও কৃতকৃত্য। তিনিই যথার্থ ধনী ও ভাগ্যবান পুরুষ। সর্বত্র তাঁরই জয়, জয় তাঁরই, তাঁরই জয়।

প্রথম অধ্যায়

১

ভক্তের ব্যাকুলতা দেখে ভগবানই সদ্‌গুরুর আশ্রয় জোগাড় করে দেন। ভক্তের আকুলতায় ভগবান দর্শন দেবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ না-জানা থাকলে তো ভগবান এলেও ভক্ত তাঁকে চিনে নিতে পারবে না। ভগবানকে চিনিয়ে দেবার জন্যই সদ্‌গুরুর প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুব এই প্রসঙ্গে ভক্ত ধ্রুবর গল্প উল্লেখ করলেন।

সরল বালক ধ্রুব মায়ের কাছ থেকে আত্মার আত্মা জীবনের পরমবন্ধু পরমাত্মীয় ঈশ্বর নারায়ণ শ্রীমধুসূদনের নাম শুনে তাঁকে পাবার জন্য নির্জন বনে গিয়ে একান্ত মনে ডাকতে থাকে। তখন ভক্তবৎসল শ্রীনারায়ণ অভিভূত চিত্তে তাকে দর্শন দেবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তার কাছে উপস্থিত হলে ধ্রুব তাঁকে চিনে নিতে পারবে না বলে তিনি দেবর্ষি নারদকে তার নিকট পাঠান এবং তাকে তাঁর যথার্থ পরিচয়, রূপ, আকৃতি, গুণ, অবস্থা, স্বভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা জানাতে আদেশ করেন।

দেবর্ষি নারদ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সেই গভীর বনে, যেখানে ধ্রুব একমনে শ্রীমধুসূদনের ধ্যানে রত ছিল সেখানে এসে উপস্থিত হন। প্রথমে নারদ তাকে এই কঠোর ব্রত, সংকল্প ও উদ্দেশ্য হতে বিরত হবার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু বালককে তার সংকল্প থেকে কোনও মতেই টলাতে না-পেরে এবং তার শুদ্ধ, সরল ও তীব্র ব্যাকুল অন্তঃকরণের যথার্থ পরিচয় পেয়ে নারদ আস্তে আস্তে ভগবানের মহিমা সহজ সরল ভাবে তার কাছে প্রকাশ করতে থাকেন। ঈশ্বরের প্রতি সরলমতি ধ্রুবর ভক্তি, অনুরাগের ব্যাকুলতা ও তীব্রতা দেখে নারদ বিস্মিত হলেন।

যতবেশি তিনি ঈশ্বরের গুণকীর্তন করেন ততবেশি বালকের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে। তা দেখে নারদ অভিভূত হন। ভগবানের মহিমা শুনে বালকের যেন তৃপ্তি আর হয় না। সে বলে—আরও বল, যত জান। নারদ থামলে বালক ব্যাকুল হয়ে বলে—তুমি বুঝি সেই অনন্ত অসীম হরির মহিমা আর জান না? বাধ্য হয়ে নারদ হরির যথার্থ মহিমা বালককে পূর্ণরূপে শোনান। সেই সঙ্গে দেবর্ষি নারদ ধীরে ধীরে হরির সগুণ ও নির্গুণ মহিমাও বালকের কাছে ব্যক্ত করেন।

সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা প্রসঙ্গে নারদ ধ্রুবকে বললেন—বিশ্বের স্থূল পঞ্চভূত হতে আরম্ভ করে সমস্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, অধিযজ্ঞ, ব্যষ্টি-সমষ্টি, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ও অনন্ত বিশ্বমূর্তি হল হরির বিজ্ঞানময় সগুণ পরিচয়। তার পরে তাঁর

অনন্ত ঐশ্বর্য ও শক্তির, অনন্ত অসীম জ্ঞানময় মূর্তির, আনন্দঘন প্রেমরসময় ভাবের এবং তাঁর অমৃত মধুর নামের অনন্ত মহিমার পূর্ণ পরিচয় দিয়ে সেখান থেকে নারদ বিদায় নেন। যাবার পূর্বে তিনি বালককে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করেন এবং তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে হরির নিকট প্রার্থনা জানিয়ে যান।

এই নারদই হলেন বালকের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু। তাঁর নিকট হতে ভগবানের স্বরূপ মহিমা পূর্ণরূপে অবগত হয়ে ধ্রুব রূপে-নামে-ভাবে-বোধে ইন্দ্রিয়াতীত সেই প্রেমঘন রসময় সচ্চিদানন্দময় ভগবান নারায়ণের উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করে। সে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সর্বগুণাতীত ভগবানকে অনুভব করার জন্য সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুশীলন আরম্ভ করে। তখন তার নিকট, সর্ববস্তুই যে হরি—এই সত্য একে একে প্রতিভাত হয়। সেই বালক ভাবাবেশে বনস্থ বৃক্ষলতা, হিংস্র ব্যাঘ্রাদি পশুদিগকেও শ্রীহরিবোধে আলিঙ্গন করে তাদের সাথে খেলতে থাকে। শ্রীহরি তখন বালকের কাছে তাঁর পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত করেন। ঈশ্বর তাঁর সর্বরূপ, সর্বনাম, সর্বভাব ও সর্ববোধ নিয়ে মহাভক্ত ধ্রুবব আত্মার আত্মারূপে প্রতিভাত হন।

নারদ কৃপা করে ভগবানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় শুনিয়েছিলেন বলেই ধ্রুবর পক্ষে ঈশ্বরকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ঈশ্বরের পরিচয় প্রথমে গুরুমুখে শুনতে হয়। ধ্রুব গুরুরূপী নারদের কৃপাতেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হয়। এই পরিচয়ই হল নাম-রূপের বহিঃপ্রকাশ, তার ব্যবহার এবং নাম-রূপের অন্তরালে তার প্রাণশক্তি ও তার অস্তিত্ব, আশ্রিত-আশ্রয়, সত্তা-শক্তি, তার গুণ, প্রকৃতি ও অভিব্যক্তি। তাব মধ্যেই পূর্ণ আনন্দ ও প্রেম নিহিত আছে।

সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার অখণ্ড মহাভাব, প্রেম ও আনন্দের আতিশয্যে তাঁর বক্ষে লীলায়িত হয়। তাঁর অনন্ত শক্তি স্বভাবপ্রকৃতির সহযোগিতায় নাম-রূপময় বিভিন্ন দেহ ও আকৃতি ধরে প্রকাশিত হয়। দেশ ও কালের মধ্যে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দেন। বহির্বিশ্ব তাঁরই অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্থূল প্রকাশ। এই স্থূল নাম-রূপময় জগতে যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সে সবই তাঁর প্রকাশ।

সগুণব্রহ্ম এবং তাঁর লীলাবিলাস হল শক্তি ও গুণের খেলা। জীবজগৎ তাঁরই প্রকাশ। তিনি সচ্চিদানন্দময় নিত্যপুরুষ, আবার তিনিই লীলাময়। সগুণ সাকার গতিশীল প্রাণের খেলায় জীবজগৎরূপে এবং জড় ও চেতন রূপে যা-কিছু আছে, সবই তাঁর পরিচয়। কাজেই বস্তুজগৎ হতে অর্থাৎ জড়ত্বের স্থূল প্রকাশ হতে আরম্ভ করে তাঁর নিত্যস্বরূপ নির্গুণ দ্বন্দ্বাতীত কেবলজ্ঞানমূর্তি প্রেমানন্দময় অখণ্ড অব্যক্ত তুরীয় অবস্থা পর্যন্ত সবই পরমাত্মার নিজমূর্তি। তিনি এক ও বহু উভয়ই, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই, জড় ও চেতন উভয়ই। জন্ম ও মৃত্যু, অণু ও মহান, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, স্বল্প ও ভূমা, সগুণ ও নির্গুণ, আনন্দ ও নিরানন্দ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, মিথ্যা ও সত্য, ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য, সত্তা ও শক্তি, কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম, পূর্ণ ও অপূর্ণ, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, পুরুষ ও প্রকৃতি প্রভৃতি হল পরমাত্মবোধের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। জীবজগৎরূপে, দেহ-প্রাণ-

মন-বোধরূপে, ব্যষ্টি-সমষ্টি, কারণ-কার্য, নিমিত্ত কারণ-উপাদান কারণ, অন্তর-বাহির, আমি-তুমিবোধে এক পবমাত্মবোধই খেলে। মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবই তিনি। তিনিই দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, শ্রোতা-শ্রুতি-শ্রবণ, কর্তা-কর্ম-করণ, ভোক্তা-ভোজ্য-ভোজন, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, স্রষ্টা-সৃষ্টি-সৃজন। তিনি অণুপ্রাণ, তিনিই বিশ্বপ্রাণ। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বধারী, সর্বজ্ঞ এবং সকলের অধিষ্ঠান। তিনি অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানস্বরূপ। তিনিই ব্যক্তরূপে মহাপ্রাণ, ঈশ্বর ও ভগবান। যত রূপ, তত নাম। যত প্রকার ভাব, তত প্রকার অণুবোধ। যত মত, তত পথ।

তাঁর নির্গুণরূপ (নির্গুণতত্ত্ব) অতীব দুর্বোধ্য। সেই প্রসঙ্গে শোন—তিনি নিত্যরূপে অব্যক্তরূপে অচ্যুতরূপে সত্যশিব বিশুদ্ধ চিদানন্দঘন অলখ নিরঞ্জন নির্গুণ নির্বিশেষ অরূপ অবর্ণ অশব্দ অস্পর্শ অ-মন অখণ্ড অদ্বয় অব্যয় অজর অমর অপাপবিদ্ধ পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতন। এই হল তাঁর অখণ্ড সত্য পরিচয়। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনিই শুধু তাঁকে জানেন, দেখেন ও বোঝেন। তাঁর মধ্যে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। কাজেই তিনি নিজেকে নিজেই ভালবাসেন। কারণ ভালবাসা হল তাঁর স্বভাবের সর্বোত্তম ধর্ম। তিনি একরূপেও সত্য, বহুরূপেও সত্য এবং তুরীয়রূপেও সত্য।

এই সকল ঈশ্বরীয় অনুভূতি ক্রমপর্যায়ে সগুণ থেকে নির্গুণে যায়। প্রতিটি পূর্ব অবস্থা হল কারণ এবং পরবর্তী অবস্থা হল কার্য। এই ভাবে কারণ থেকে কার্য এবং কার্য থেকে কারণ, এই সম্বন্ধ ধরে প্রকাশধারা চলে। বিশ্বজুড়ে তাঁর সগুণ অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে। সগুণের বিকাশ পূর্ণ হলেই নির্গুণ ভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। সগুণ হল নির্গুণের পরিণাম এবং নির্গুণ হল সগুণের পরিণাম। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সম্পূরক ও পরিপূরক সম্বন্ধ। সগুণের বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্য এবং নির্গুণের বৈশিষ্ট্য হল সমতা ও একতা। প্রথমে সগুণের খেলায় নিজেকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে তাদের নির্গুণ নির্বিশেষ সত্তায় মিলিয়ে নেন বা যুক্ত করে নেন। কাজেই বৈচিত্র্যময় নানাত্ব-বহুত্ব তাঁর সবিশেষ বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশ দ্বারা তিনি সকলকে পুষ্ট ও তুষ্ট করে পূর্ণ করে তোলেন এবং শেষে আপনার পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে এক করে নেন। এই হল পরমাত্মার যোগ, তাঁর লীলাবিলাস।

প্রত্যেকে তাঁরই সন্তান। সকলকে নিয়ে তাঁর আনন্দের সংসার। বিশ্বজগৎ হল তাঁর প্রেমের খেলাঘর। সকলে তাঁরই সত্তায় সত্তাবান, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান এবং তাঁরই বোধে বুদ্ধিমান। আবার সবই তিনি স্বয়ং।

৪। ৫। ৬৮

২

সৎপ্রসঙ্গকালে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কখনও তত্ত্বালোচনা, কখনও সাধনার বিজ্ঞান আলোচনা, আবার কখনও বা উপলব্ধিমূলক

উপমা, গল্প, ঘটনা মৌলিক ও স্বকীয় ভঙ্গিমায় স্বানুভূতির ভাষায় ব্যক্ত করেন। আজকে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যমূলক ও উল্লেখযোগ্য একটি কাহিনি আছে। প্রসঙ্গ আলোচনাকালে তিনি বললেন—প্রাণ প্রাণকেই ব্যবহার করে। স্বল্প জ্ঞানই অজ্ঞান। জ্ঞানবক্ষেই অজ্ঞান অবস্থান করে। মৃত্যুর আশ্রয়ও অমৃতের বক্ষে। মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে আরেকটি সুন্দর রূপ আছে। তার মধ্যেই অমৃতত্ব নিহিত। মৃত্যুকে কেউ চায় না তবুও মৃত্যু সবারই সাথি। অমৃতত্ব অতি দুর্জ্ঞেয় বস্তু। আত্মকৃপা ও ঈশ্বরের কৃপাতেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

এক পতিব্রতা নারী তার স্বামীকে দুশ্চরিত্র ও মাতাল জেনেও দেবতাজ্ঞানে প্রাণপাত সেবা করত। তার সেবাকার্যে কখনও কোনও ত্রুটি হত না। কিন্তু মাতাল পতি তার স্বভাব অনুযায়ী পত্নীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দ্বিধা করত না। মাঝে মাঝেই সে চরিত্রদোষবশত পতিতালয়ে রাত কাটাত। পরপর দুই দিন সে ঘরে না-ফেরাতে পত্নী ব্যাকুল হয়ে তার খোঁজ করে এবং পতিতালয়ে তার সন্ধান পায়। বহু কান্নাকাটি ও চেষ্টার পর অস্বাভাবিক অবস্থায় সেখান থেকে সে তার পতিকে নিয়ে আসে। পথে দুর্যোগ আরম্ভ হয় ও রাত হয়ে যায়। অন্ধকারে পতিকে নিয়ে চলতে চলতে সে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। সেই অবস্থায় বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এক সমাধিমগ্ন মুনির উপরে সে পড়ে যায়। তার ফলে মুনির ধ্যানভঙ্গ হয়। অস্বাভাবিক এক মাতালসহ সেই নারীমূর্তিকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি তাকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই পুরুষটির দেহপাত হবে।

মুনির এই মর্মান্তিক অভিশাপের বাণী শুনে পতিব্রতা নারী ব্যাকুল ভাবে তাঁর কাছে তার স্বামীর প্রাণভিক্ষা চায়। কিন্তু ক্রুদ্ধ মুনি, তাঁর অভিশাপ নিশ্চয়ই ফলবে, এ কথা বারবার জানান এবং কোনও মতেই তাঁর অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়—সে কথাও দৃঢ় ভাবে বলেন।

তখন অনন্যোপায় হয়ে পতিব্রতা নারীর সুপ্ত তেজ জেগে ওঠে। বিনা অপরাধে এই কঠোর অভিশাপের প্রতিবাদে সেও মুনিকে সতেজে জানায় যে, স্বামীকে সে সারাজীবন দেবতাজ্ঞানে অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে সেবা করে এসেছে। তার এই সত্যসেবার শুভফলের জোরে সেও ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, তার একনিষ্ঠ সত্যসেবার ফল যেন নিশি অবসানকে প্রতিহত করে অর্থাৎ রজনীর অন্ধকার যেন সত্যের মানরক্ষার্থে তাকে সাহায্য করে, সূর্যোদয় যেন না-হয়।

দুই সত্যসেবী সাধকের সত্যবাক্ বিফল হবার নয়। রজনী আর প্রভাত হয় না, সূর্যও আর ওঠে না। দেবলোকে সাড়া পড়ে গেল। বিশ্বদেব সূর্যকে উদিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সূর্যদেব বললেন—আমি অসহায়। সত্যকে নাশ করার শক্তি আমার নেই। আমি সত্যের অধীন। মৃত্যু এসে তাঁকে বলল—মুনির অভিশাপের সত্যানুসারে পতিব্রতা নারীর স্বামীর প্রাণ নেবার জন্য আমাদের কাজের সহায়ক হও

তুমি। মুনির অভিশাপ বিফল হবার নয়। কিন্তু সূর্যদেব উদিত হতে পারলেন না। তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং এসে সব ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে পতিব্রতা নারীকে তার সত্য ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সেই নারী ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে বলল—তুমি তো সত্যস্বরূপ, সত্যের ধারক, বাহক ও পালক। তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছ সত্যস্বরূপে। তুমি এর বিধান কর। তখন বিষ্ণু মুনিকে তাঁর অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে বললেন। মুনি বললেন—আমি অভিশাপ দিতে পারি, কিন্তু অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে পারি না। এমন অবস্থায় ভগবান বিষ্ণু জগতের কল্যাণার্থে পতিব্রতা নারীর উপর প্রীত হয়ে তাকে বর দিলেন—তোমার স্বামী সুস্থ, সুন্দর ও সবল দেহ নিয়ে দীর্ঘায়ু ও সুখী হোক। সত্যবোধে তোমার পতিসেবার মহিমা জগতে ঘোষিত হোক। তখন সেই নারী বিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে সূর্যদেবকেও বন্দনা করে। সে তাঁকে আহ্বান জানিয়ে নিবেদন করে—হে বিশ্বপ্রাণ, জগতের বন্ধু! তোমার নিত্য কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য আমি যে অপরাধ করেছি তোমার প্রতি, তার জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও এবং তুমি তোমার নিত্য কাজে রত হও।

সূর্যদেব তখন উদিত হলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে বন্দনা করে তাঁর পাশে পতিব্রতা নারীকে দেখে প্রীত অন্তরে বিশেষ ভাবে আশীর্বাদ করে তাকে মঙ্গল ও কল্যাণ রূপ বর দিলেন।

এদিকে মুনি তাঁর সাধনলব্ধ শক্তিকে অবিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করার জন্য বিব্রত ও ব্যথিত চিত্তে অনুশোচনা করতে লাগলেন ও ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইলেন। ভগবান তাঁকে নিজে ক্ষমা না-করে পতিব্রতা নারীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলে অন্তর্হিত হলেন। মুনি তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেয়ে এই গর্হিত কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বারবার সেই নারীর কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন। স্বভাবসুলভ মাতৃস্নেহে সেই নারী মুনিকে প্রণাম করে তাঁকে ক্ষমাপূর্বক বলল—সাধনশক্তি ও সাধনসিদ্ধিকে ভগবানের কাছে অর্পণ করে ভগবৎ বোধে বিশ্বের সকলকে সেবা করাই হল মহাত্মাদের কাজ। সেই ভাবে চলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে স্বামীসহ সে স্বগৃহে গমন করল।

প্রত্যেকের অন্তরে যে আদ্যাশক্তি বিরাজ করে, সত্যসেবা দ্বারা তা জাগ্রত হয়। সত্ত্বগুণের মাধ্যমেই অন্তরের শক্তির দিব্য রূপায়ণ হয়। সত্যই সত্যের ধর্ম। সত্যই সত্যের শক্তি। দেবতাজ্ঞানে সর্বকর্মই সত্যময় হয় এবং সত্যের শক্তিও জাগ্রত হয়। প্রাণের সাধনা সত্যবোধেই পূর্ণ হয়। সত্যবোধে আদ্যাশক্তির প্রকাশ হয়। সাধুসেবার ফলে সাধুগুণ ও সাধুভাব সেবকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

গল্পটি শেষ করে উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—উপরোক্ত গল্পটির মাধ্যমে জীবনে অন্তরশুদ্ধির মানের বিশেষ তারতম্য অভিনব ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অন্তরের অভিমানই যে দিব্য অমৃত ভাববোধের অন্তরায়, তা যেমন মুনির চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, অপরপক্ষে শরণাগতি সর্বসমর্পণ আত্মনিবেদনই যে চিত্তশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা, তা

পতিব্রতা নারীর চরিত্রে সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনে বিশেষ ঘটনা ও অবস্থার মাধ্যমে তা যে-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আত্মজিজ্ঞাসু শরণাগত ভক্তের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব সমাদরে গৃহীত হবে।

গল্প, কাহিনি, উদাহরণ ও উপমার মাধ্যমে কত সহজে মানুষকে সত্যধর্ম ও ব্রহ্মত্ব লাভে সাহায্য করা যায়, তার পরিচয় এই গল্পে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। পরবর্তী যে-সমস্ত কাহিনি ও উদাহরণের উল্লেখ বা বর্ণনা আছে, তার মধ্যে ব্রহ্মাত্মবিদ্যা লাভের চাবিকাঠি কত সহজে পাওয়া যায় তা দেখা যাবে।

১৮। ৫। ৬৮

৩

সব কিছুর সমান মূল্যবোধ জাগলেই জীবনে পূর্ণতা অনুভূত হয়। একবোধে, সমবোধে বা আপনবোধে অন্তঃসত্তার সঙ্গে সব কিছুর নিত্য অভেদ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। অখণ্ড সমবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনবোধে যিনি সব কিছু ব্যবহার করেন তাঁকেই পরমহংস বলা হয়। পরমহংস অবস্থায় জীব ঈশ্বরীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যথার্থ জ্ঞান লাভ হলে ফলবন্ত বৃক্ষের মতো সকলের কাছেই মাথা নত হয়ে যায়। যথার্থ ভক্তি লাভ হলে সকলকেই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ মনে হয়। তখন দোষদৃষ্টি থাকে না।

এই পর্যন্ত বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দু'টি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে পূর্ণ আমিস্বরূপ এবং সত্যস্বরূপের যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত করলেন।

(ক) এক ভক্ত ভগবানের দেখা পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই না কেন? জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী প্রভৃতি তোমাকে কে কী ভাবে পায়? ভগবান বললেন—এখন থেকে যাঁর সঙ্গে দেখা হবে জানবে তার মধ্যেই আমি আছি। আমি-ই সব হয়ে আছি। সব কিছুর মধ্যে আমাকে মানলে, জানলে ও দেখলে আমার পূর্ণস্বরূপের পরিচয় পাবে। বিশেষ কোনও একরূপে আমাকে পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। ভক্তের ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রয়োজন হলে ভক্তের ভাব অনুসারে আমি বিশেষ রূপ ধারণ করি। এই বিশেষরূপে আমাকে পেতে হলে তীব্র ব্যাকুলতা, অনুরাগ ও ভক্তি থাকা চাই। জ্ঞানী আমাকে চায় নির্বিশেষরূপে এবং পায়ও নির্বিশেষরূপে। ভক্ত আমাকে চায় বিশেষরূপে এবং পায়ও বিশেষরূপে। যোগী আমাকে পায় সমবোধের মাধ্যমে। নিষ্কাম কর্মী আমাকে পায় মহান আদর্শ ও সর্বভূতের মঙ্গল ও কল্যাণ মূর্তি রূপে। ভগবান যে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় এই ছোট্ট গল্পটির মাধ্যমে।

(খ) এক পণ্ডিত কোনও এক সভাতে শাস্ত্রপাঠ করছেন। বহু শ্রোতা মনোযোগ সহকারে তা শুনছে। পণ্ডিত শাস্ত্রের মধ্যে থেকে আদর্শ ও নীতি মূলক উপদেশগুলি সুন্দর সুন্দর গল্পের মাধ্যমে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বগুলিকে সকলের বুঝবার সুবিধার জন্য পণ্ডিত দৈনন্দিন ঘটনাবলীর উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা

করছেন। এক শ্রোতা হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি যে-সব কথা বলছ, তা তো আমাদের জীবনের কথা। এগুলি বইয়ে কী ভাবে লেখা হল? আমি শাস্ত্র পড়তে জানি না। তোমার বইয়ের মধ্যে আমাদের কথা ছাড়া ভগবানের কথা যা আছে তা-ই বল। পণ্ডিত ভগবৎ বিষয় যত সহজে তাকে বোঝাতে চায় সে ততই জেদ করে বলে—এগুলি আমাদের কথা। এগুলি ছেড়ে তুমি ভগবানের কথা বল। তখন পণ্ডিত ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে গেলেন। তিনিও শ্রোতাকে বোঝাতে পারেন না এবং শ্রোতাও ভগবানের কথা ছাড়া অন্য কথা শুনতে চায় না।

এমন সময় সেখানে এক পাগল উপস্থিত হল। সে বলল—তোমরা সবাই কী বলাবলি করছ? সব দিক দিয়ে পাঠের আসর মাটি হয়ে যাবে ভেবে সকলে বিরক্ত হয়ে পাগলকে তাড়া করল। পাগল হাসতে হাসতে বলল—তোমাদের ঐ বইয়ের মধ্যে কী আছে আমি জানি। ঐ বইয়ের অক্ষরগুলি কোথা থেকে এসেছে তোমরা তা কি কেউ জান? পূর্বোক্ত শ্রোতা পাগলের কথা শুনে চুপ করে গেল এবং পণ্ডিত কৌতূহলবশত পাগলকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই বল তো কোথা থেকে এই সব অক্ষর এসেছে? তখন পাগল বলতে আরম্ভ করল—মহাশূন্য থেকে এসেছে। সেই মহাশূন্যের উর্ধ্বে পরাকাশ ও চিদাকাশ আছে। মহাশূন্যের মধ্যে একটা শূন্য আছে। সেই শূন্যের মধ্যে সব কিছুব বীজ আছে। সেই বীজের মধ্যে বিশ্বের সব কিছু আছে। সেগুলি শব্দরূপে বেরিয়ে আসে। সেই শব্দই হল বাক্। মূল শব্দের নাম নাদ। এই শব্দগুলির সম্মিলিতরূপই হল প্রণব। প্রণবের প্রকাশই হল জীবজগৎ। এই সবগুলির সম্মিলিত বোধের নামই হল আমি। তাঁকেই তোমরা ভগবান বল। মূলের আমিকে বাদ দিয়ে আমি-তুমি, কোনও বোধ, চিন্তা, কার্য কিছুই সম্ভব নয়। এই 'আমিবোধ' থেকে আমিকে বাদ দেওয়া যায় না। নিত্যবস্তু অপরিণামী অদ্বয় অব্যয় অমৃতস্বরূপ। এই আমি-র এক অংশ স্থির ও নিষ্ক্রিয় এবং অপর অংশ সক্রিয়। সক্রিয় অংশে আমি-র আবার অনেকগুলি ভাগ আছে। প্রতিটি ভাগকে ব্যষ্টি আমি বা জীব বলে। প্রতি জীবের পৃথক পৃথক দেহ বা আধার আছে। সমগ্র ব্যষ্টি দেহ বা আধার 'আমিবোধের' অণু-পরমাণু এবং কতগুলি বৃত্তি দিয়ে তৈরি। সমগ্র ব্যষ্টি দেহ মিলেই হল বিশ্ব দেহ। সবই 'আমারবোধের' ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ ও স্পন্দন মাত্র। এই বোধস্বরূপ আমি-র বিশেষত্ব হল তা অদ্বিতীয় স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। এর মধ্যে যা-কিছু প্রকাশ পায় তাও বোধ এবং তার দ্বারা যা-কিছু প্রকাশ পায় তাও বোধ। বোধ প্রকাশক-প্রকাশ উভয়ই, সত্তা-শক্তি উভয়ই, অস্তি-নাস্তি উভয়ই, ইতি-নেতি উভয়ই, অব্যক্ত-ব্যক্ত উভয়ই এবং তদতিরিক্ত স্বয়ংপ্রকাশ বোধস্বরূপ নিত্য আমি।

বোধের গতিই হল বোধের শক্তি। বোধের শক্তির মূলে বা কেন্দ্রে আছে আনন্দশক্তি বা প্রেমশক্তি। একেই অন্তরঙ্গশক্তি বা পরাশক্তি বলে। মধ্যে বা অন্তরে অন্তঃসত্তা হল তটস্থশক্তি বা চিৎশক্তি। একে মাধ্যমিকশক্তি বলে। বহিঃসত্তায় হল

ক্রিয়াশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি। সমত্বে বা একত্বে স্থিতি হল কেন্দ্রবোধশক্তির ধর্ম। দ্বৈতভাব হল অন্তঃশক্তির ধর্ম। নানাত্ব-বহুত্বভাবই হল বোধের বহিঃশক্তির ধর্ম। এই তিন শক্তিকে যথাক্রমে—কেন্দ্রে যোগমায়া, অন্তরে মহামায়া ও বাইরে মায়াশক্তি বলা হয়। বহিঃশক্তিকে আবার আধারশক্তি বা ধরাশক্তিও বলা হয়ে থাকে। একে জড়শক্তি বা অচিৎ বলা হয়। অন্তঃশক্তিকে জীবশক্তি, চিতিশক্তি বা মনোশক্তিও বলা হয়। জীবমাত্রই এই শক্তির বিশেষরূপ। কেন্দ্রশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন ঈশ্বর স্বয়ং। কেন্দ্রশক্তি থেকে অন্তঃশক্তির এবং অন্তঃশক্তি থেকে বহিঃশক্তির উদ্ভব হয়। অন্তঃশক্তি ও বহিঃশক্তি উভয়ের মূল বা কারণ হল কেন্দ্রশক্তি এবং উভয়ের কার্যেই তা নিরপেক্ষ ভাবে সাক্ষিরূপে বিরাজ করে। অন্তঃশক্তির কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে বহিঃশক্তি যখন সক্রিয় হয়, তখন সে স্বতন্ত্র ভাবেই কাজ করে। বহিঃপ্রকৃতির কাজ আপন ইচ্ছাতেই চলতে থাকে। অন্তঃশক্তির বাইরের দিকে হল বহিঃপ্রকৃতি এবং কেন্দ্রের দিকে হল কেন্দ্রশক্তি। উভয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত থেকে অন্তঃশক্তি দোদুল্যমান ভাবে চলে। কখনও সে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবাধীনে চলে এবং কখনও সে কেন্দ্রশক্তির প্রভাবাধীনে চলে। এই উভয় শক্তির প্রভাবে অন্তঃশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একে সু ও কু, সৎ ও অসৎ এবং দেব ও অসুরের লড়াই বলে। বহিঃশক্তির প্রভাবে জীব বিষয়াসক্ত হয়ে বিষয়বোধে চলে এবং বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে তাকে পুনঃপুনঃ ঘুরতে হয়। কেন্দ্রশক্তির প্রভাবে জীবের বিষয়ভোগে অনাসক্তি, ধর্মে মতি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরানুভূতি হয়।

নাম ছাড়া রূপ হয় না, ভাব ছাড়া নাম হয় না এবং বোধ ছাড়া ভাব হয় না। সত্তা ছাড়া বোধ নেই, আমি ছাড়া সত্তা নেই এবং সত্তা ছাড়াও আমি নেই। উত্তর ছাড়া জিজ্ঞাসা হয় না এবং জিজ্ঞাসা ছাড়া উত্তর হয় না। যার মাধ্যমে আমি প্রকাশ পায় তাকেই জীবন বলে। এই পর্যন্ত বলে পাগল হাসতে লাগল।

তখন পূর্বোক্ত শ্রোতা পাগলের দিকে তাকিয়ে পাগলকে ভগবৎ বোধে স্তব করতে লাগল—তোমার অনন্ত মহিমা তুমি ছাড়া কেউ বোঝাতে পারে না!

পাগল বক্তাকে আলিঙ্গন করে বলল—সকলের শুভ ও কল্যাণ হোক। এই কথা বলে পাগল সেখান থেকে চলে গেল। পাগলের কথা শুনে পণ্ডিতের ভাবান্তর হয় এবং পাগল চলে যাবার পরে তাঁর হুঁশ হয়। পণ্ডিত সেই শ্রোতাকে 'সাধু, সাধু' বলে তার প্রশংসা করলেন এবং তাকে প্রণাম জানিয়ে পাঠ শেষ করলেন। অন্যান্য শ্রোতারাও সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত দেখে-শুনে প্রীত হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

গল্প দু'টি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঈশ্বরের মহিমা অযাচিত ভাবে অনেকের মাধ্যমেই এই ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। স্বয়ংপ্রকাশ ঈশ্বর-আত্মা দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণের অতীত হলেও দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় স্বমহিমায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং কখনও ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য আপেক্ষিক প্রয়োজনে

নিজেকে আংশিক ভাবে অথবা পূর্ণস্বরূপে প্রকাশ করেন স্বভক্তের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য। তাঁর ইচ্ছা ও কার্যাবলী সবই স্বতন্ত্র। তবে সাধারণ মানুষের কাছে যা অসম্ভব তাঁর কাছে তা সহজ ও সম্ভব। পরমাত্মদেবতা পরমেশ্বরের যথার্থ পরিচয় জীবনে স্বানুভবসিদ্ধ হয় হৃদয়ে আপনবোধের মাধ্যমে। প্রত্যেকের হৃদয়ে এই আপনবোধ নিহিত আছে, কিন্তু তার সম্যক্ অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশরূপ ঈশ্বর-আত্মার পূর্ণ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সাপেক্ষ।

তত্ত্বস্বরূপ হল ঈশ্বর-আত্মার যথার্থ পরিচয়। জীবনে তার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা হল হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনলস প্রচেষ্টা। তাঁর অনুগ্রহে সবই সহজসাধ্য ও সিদ্ধ হয়। তপস্যার মাধ্যমে জীবনে অবিদ্যা-অজ্ঞানের মলাবরণ কিছুটা বিদূরিত হয়। তখনই ঈশ্বর-আত্মার অনুগ্রহ, কৃপা ও আশিস্ জীবন অনুভব করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় গল্পটির মাধ্যমে ঈশ্বর-আত্মার অনুগ্রহ ও কৃপা অভিনব ভাবে ব্যক্ত হয়েছে অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

১৮। ৫। ৬৮

৪

জ্ঞান-ভক্তিকে আশ্রয় করে লোভকে বশীভূত করাই সাধনার লক্ষ্য। ইচ্ছা, চেষ্টা, অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধি সম্বল করে ভগবৎ চিন্তায় কর্মক্ষেত্রে কী করে মুমুক্ষু সাধক সার্থকতা লাভ করে, নিম্নোদ্ধৃত গল্পটির মাধ্যমে তা সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গল্পটির বিষয়বস্তু মানুষ, জন্তুজানোয়ার এবং তাদের স্বভাব আচরণকে অবলম্বন করে মানুষের দিব্য আত্মজ্ঞান লাভের এক অভিনব বর্ণনা।

এক বিজ্ঞ চাষি দু'টিমাত্র বলদ সম্বল করে শহর থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়তলি বনজঙ্গলের পাশে কিছু জমি পরিষ্কার করে সামান্য চাষের কাজ শুরু করে। চার দিকে হিংস্র জন্তুজানোয়ারে পূর্ণ গভীর জঙ্গল। প্রথমে সে গাছের ডালপালা দিয়ে একটি খোঁয়াড়ের মতো তৈরি করে নিল। অন্য একটি বড় ঘর গাছের ডাল ও লতাপাতা দিয়ে শক্ত করে বানিয়ে তার একপ্রান্তে বলদ দু'টিকে রেখে আরেকপ্রান্তে সে নিজে থাকতে লাগল। রাতে ঘরের ভিতরে ও বাইরে চার দিকে গাছের শুকনো ডাল, পাতা দিয়ে সে আগুন জ্বেলে রাখত। এই আগুনের ভয়ে হিংস্র প্রাণীরা কাছে আসতে পারত না।

একদিন রাতে কয়েকটি বন্য কুকুর এই খোঁয়াড়ের ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করে এবং আগুন দেখে ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে কয়েকটি আহত হয়, কয়েকটি পুড়ে মরে এবং বাকিগুলি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সকালে উঠে চাষি মৃত কুকুরগুলিকে বাইরে ফেলে দিয়ে আহত কুকুরগুলিকে সেবা করতে গেল, কিন্তু তাদের হিংস্রতার ভয়ে কাছে ঘেঁষতে পারল না। অবশেষে গাছের লতা দিয়ে দড়ি

বানিয়ে বহু কষ্টে তাদের গলায় ফাঁস পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে বলদ নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ল।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। হিংস্র প্রাণীর ভয়ে সে বলদ দু'টিকে খুব সাবধানে রাখে এবং নিজেও খুব সাবধানে থাকে। চাষির খাদ্য হল খিচুড়ি, গাছের ফলমূল ও নিকটবর্তী নদীর জল। বলদ দু'টি খায় ঘাস ও লতাপাতা। চাষি জঙ্গল পরিষ্কার করে ক্রমশ তার জমির পরিধি বাড়িয়ে নেয়। সর্বদাই সে কাজে ব্যস্ত থাকে এবং বলদ দু'টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নিজেও খুব সাবধানে থাকে। আহত কুকুর তিনটির মধ্যে একটি মারা যায় এবং বাকি দু'টি অভুক্ত অবস্থায় কিছুদিন থাকবার পরে দুর্বল ও কাতর হয়ে পড়ে। তখন চাষির দেওয়া সামান্য আহারেই তাদের জীবন রক্ষা পায় এবং ধীরে ধীরে তাদের পোড়া ঘাও শুকিয়ে যায়। অতিশয় দুর্বল বলে লতার দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে তারা পালাতে পাবেনি। চাষির দেওয়া খাদ্য প্রতিদিন খেয়ে ও একই পরিবেশে নিয়ত থেকে ক্রমশ কুকুর দু'টি তাদের হিংস্র স্বভাব ভুলে যায় এবং মানুষ ও বলদ দু'টির নিত্যসঙ্গ পেয়ে তাদের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পরে তারা গৃহপালিত কুকুরের মতো পোষা হয়ে যায়। তাদের বন্য ও হিংস্র স্বভাব চলে যায়। তারা চাষির একান্ত ভক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রভু ও বলদ দু'টির পাহারার কাজ করে। এই ভাবে চাষির সংসারে পাঁচটি প্রাণী হয়।

চাষি ক্রমশ তার আবাসগৃহকে অধিকতর মজবুত ও বড় করে নেয়। আবাদি ফসল রাখবার ব্যবস্থাও তাতে করা হয়। জঙ্গল পরিষ্কার করে ক্রমশ সে তার জমির পরিধি আরও বাড়িয়ে নেয়। এখন অনেকটা নিশ্চিন্তে বলদ দু'টি তাদের বিচরণভূমিতে স্বাধীন ভাবে চরে বেড়ায়। তাদের সকলেরই দেহ-মন-প্রাণেব পুষ্টি, সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। বনের অন্যান্য হিংস্র জন্তুরা তাদের বনের একাংশ হারিয়ে এবং শত্রুনাশের কোনও ব্যবস্থা না-করতে পেরে নিজেরা সমবেত হয়ে সভা করে। এই সভায় সকলে মিলে ঠিক করে, বলদ দু'টিকে ভুলিয়ে কোনও রকমে তাদের মধ্যে নিয়ে এসে বধ করবে এবং তাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করবে। বাঘ, সিংহ, ভালুক, হাতি, গন্ডার, শিয়াল, সাপ প্রভৃতি সকলেরই দৃষ্টি এখন এই চাষি পরিবারের উপর। চাষির আছে বুদ্ধির শক্তি এবং এদের আছে গায়ের শক্তি।

একদিন তাদের মধ্যে একদল সুবিধা মতো বলদ দু'টিকে খোঁয়াড়ের একপ্রান্তে পেয়ে তাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে অনুরোধ করে। বলদ দু'টি তাদের হাবভাব বুঝে আগে থেকেই সাবধান ছিল বলে তাদের কথায় কর্ণপাত না-করে আপন মনে আহার করতে থাকে।

তখন পশুদের দূত শিয়াল এসে বলদ দু'টিকে বলল—এই বনবাসী প্রাণীসকলের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে মিলে তোমরা আজ আহার করবে।

বলদদ্বয় উত্তরে বলল—আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়া নিষেধ। নেমন্তন্ন খেলে আমাদের জাত যাবে।

তখন শিয়ালের পাশে অজগর সাপ উপস্থিত হয়ে বলদ দু'টিকে বলল—তোমরা আমাদের রাজ্যের প্রজা হয়ে আমাদের শত্রু শয়তান হীন মানুষের দাস কেন হয়েছ? মানুষ আমাদের অপকার ছাড়া কখনও কোনও উপকার করে না। আমাদের পেলেই তারা মেরে ফেলে। দেখ না কোথা থেকে এসে আমাদের বিতাড়িত করে একজন মানুষই আমাদের রাজ্যের একাংশ দখল করে নিয়েছে। আমরা ভয়ে ভয়ে চলি কারণ সে সুযোগ পেলেই আমাদের মেরে ফেলবে।

এমন সময় আড়াল থেকে ভালুক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে বলদ দু'টিকে বলল—মানুষকে কখনও বিশ্বাস করো না। ওরা বড় খারাপ। ওদের কাছে আগুন বলে একটি পদার্থ আছে, তা খুবই বিপজ্জনক। এই আগুন দিয়ে তারা আমাদের ভীষণ ক্ষতি করেছে এবং বহু প্রজার প্রাণনাশ করেছে। তোমরা স্বাধীনতা হারিয়ে কেন তাদের দাস হয়ে আছ? ওদের কাছ থেকে আমাদের মধ্যে চলে এস। মানুষ তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে কাজে লাগায়। গলায়, শিং-এ ও পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। তোমাদের দিয়ে ওদের বোঝা ও মালপত্র টানায় এবং হাল চাষ করে ফসল ফলায় নিজেদের স্বার্থে। তোমাদের মেরেকেটে তারা মাংস খায়, চামড়া দিয়ে জুতো বানায়, খুর ও মাথার শিং দিয়ে চিরুনি ও বোতাম বানায়, হাড় গুঁড়ো করে সার তৈরি করে, নাড়িভুঁড়িগুলি শুকিয়ে তন্তু বানিয়ে কাজে লাগায়, মল দিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে আগুন জ্বালায় এবং সাররূপে জমির মধ্যেও ব্যবহার করে। দেখ মানুষ কত স্বার্থপর! তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন্ত অবস্থায় যেমন তোমাদের খাটিয়ে মারে, দেহনাশের পরেও সে রকম তোমাদের দেহের সব কিছু তাদের কাজে লাগায়। প্রতিদানে তারা তোমাদের কী দেয়? শুধু শুকনো খড়, ফেলে দেওয়া তরকারির খোসা, ভাতের ফেন প্রভৃতি। তোমাদের বাচ্চাগুলিকে দুধ খেতে না-দিয়ে তা কেড়ে নেয় নিজেদের জন্য। তাদের এত অত্যাচার সহ্য করে কেন তোমরা তাদের কাছে থাক? আমাদের মধ্যে চলে এস এবং মুক্ত ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন কর। তোমাদের কাছে এত উপকার পেয়েও তারা তোমাদেরই বলে বোকা বলদ। আমাদের মধ্যে থেকে মহিষগুলিকে পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ওদের গোলাম করে রেখেছে এবং তোমাদের মতো কাজ করাচ্ছে। ওরা বাবা সব পারে! ওদের বিশ্বাস করে কেউ কোনও দিন উপকার পায়নি। দেখ না সেদিন আমাদের দলের কয়েকজন বেড়াতে বেরিয়েছিল এবং আমাদের কতখানি জমি মানুষটি কেড়ে নিয়েছে, তা দেখতে গিয়েছিল। তাদের কয়েকজনকে সে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে এবং আর দু'টিকে বেঁধে রেখে খেতে না-দিয়ে দুর্বল বানিয়ে পোষা করে রেখেছে। মানুষ অনেক কিছু খাইয়ে আমাদের জাতভাইদের সম্মোহিত করে পোষা বানিয়ে নেয়। ওরা এত পাজি যে, আমাদের স্বভাব পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। ওদের মতো শত্রু আমাদের

আর কেউ নেই। ওরা আমাদের স্বাধীন রাজ্যের বনজঙ্গল সব কেড়ে নিয়েছে। ওরা আমাদের পরম শত্রু। ওদের সাথে থাকতে নেই, চলে এস আমাদের মাঝে।

এমন সময় সেখানে গন্ডারও এল। সে বলদ দু'টিকে নমস্কার জানিয়ে বলল—বহুদিন আপনাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনারা তো বহুকাল আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আপনাদের মতো সজ্জন বন্ধুর অভাবে আমাদের এখন বড় দুর্গতি। তাই আপনাদের শরণাগত হয়ে এক নিবেদন নিয়ে এসেছি। আপনাদের পূর্বপুরুষ আবহমানকাল এই বনরাজ্যে মন্ত্রিত্ব করে এসেছেন। কেন যে আপনারা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমরা তা জানি না! সেদিন দূর থেকে আপনাদের বর্তমান অবস্থা দেখে বড় মর্মাহত হয়েছি।কোথাকার দ্বিপদ এক মানুষজাতির অধীনে কেন যে চাকরি নিলেন তাও আমাদের বোধগম্য হয় না। সুযোগসুবিধার লোভ দেখিয়ে আপনাদের গোলাম করে রেখেছে তারা। দ্বিপদ মানুষের কত বড় আস্পর্ধা যে, আমাদের রাজ্য থেকে অশ্বমিত্রকে (ঘোড়াকে) সদলবলে জোর করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। এখন তার নাকে দড়ি দিয়ে তার পিঠে চড়ে মানুষগুলি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যায়। তাদেরই (অশ্বমিত্রের) ভাগ্নের বংশ গর্দভদের গোলাম বানিয়েছে। তাদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে মানুষ তাদের আহাম্মক বানিয়ে রেখেছে। তা সত্ত্বেও মানুষ তাদের বোকা, গাধা বলে গালাগালি দেয়। এত বড় অপমান সহ্য করে কেন যে তারা গোলাম হয়ে তাদের মধ্যে থাকে আমরা ভেবে কূল-কিনারা পাই না। আবার দেখুন, মানুষ উটগুলিকেও নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নেয়, তাদের পিঠে ভারী ভারী বোঝা চাপায় এবং তৃণগুল্মশূন্য ও জলশূন্য মরুভূমির মধ্যে তাদের রাখে। তারা ওদের খেতেও দেয় না এবং পালিয়ে যাবে বলে বেঁধে রাখে, আবার কেটে তাদের মাংসও খায়। না-খেয়েদেয়ে ওদের পিঠের হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে। তবুও তাদের পালাবার শক্তি নেই—এমন করে রেখে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে থেকে তারা ছাগল, পাঁঠাদের পর্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাদের মাংস খায়, তাদের বাচ্চাদের দুধ খেতে না-দিয়ে নিজেরা খায়। বাচ্চা অবস্থায় পাঁঠাগুলিকে খাসি বানিয়ে রাখে। পরে সেগুলির মাংস খায় এবং তাদের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করে পায়ে পরে। তা সত্ত্বেও তারা তাদের বলে বোকা পাঁঠা।

সেদিন আমাদের এক বাঘ বন্ধুর কাছে শুনলাম তার জ্যাঠতুতো ভাইবোনেদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের না-খেতে দিয়ে দুর্বল করে মানুষ খাঁচায় বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। মানুষদের মজা দেখাবার জন্য সার্কাসের খেলায় তাদের ব্যবহার করা হয়। প্রতিবাদ করলে ইলেকট্রিক চাবুক দিয়ে তাদের আঘাত করে। আঘাতের ফলে তাদের সর্বশরীর ঝিমঝিম করে। এ ভাবে মানুষ তাদের উপর কত যে অত্যাচার করে তার হিসেব নেই। আমাদের রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের জোর করে মানুষ গোলাম করে রেখেছে এবং তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। তাদের দিয়ে সার্কাসে খেলা

দেখিয়ে তারা পয়সা রোজগার করে। সেখান থেকে কয়েকজন বহু কৌশলে পালিয়ে এসে তাদের দুরবস্থার কথা এবং মানুষের নৃশংস অত্যাচারের কথা আমাদের কাছে বলে সাবধান করে দিয়েছে। মানুষ পশুশালা বানিয়ে তার মধ্যে আমাদের জাতের প্রায় সর্বশ্রেণীর অনেককেই বন্ধ করে রেখেছে। মানুষ সপরিবারে তাদের দেখে মজা পায়। তারা সেই সব খাঁচায় বন্দি আমাদের জাতভাইদের দেখে নানা রকম ভাবে বিদ্রূপ করে। তা খুবই অপমানজনক। এ আর সহ্য করাও যায় না। এই স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায়? পরাধীনতার শৃঙ্খল কেন পরবে পায়ে? আপনাদের সাহায্য পেলে আবার আমরা পূর্ব গৌরব ফিরে পেতে পারি এবং আমাদের জাতভাইদের উদ্ধার করতে পারি। সেই জন্য আমরা সমবেত ভাবে আপনাদের কাছে বিনীত ভাবে নিবেদন জানাচ্ছি। আমাদের সাহায্য করুন।

ইতিমধ্যে বাঘমহাশয় এসেও তাদের দলে যোগ দিয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট বলদ দু'টিকে সামনে দেখে বাঘের জিভে জল এল। কথা বলার পূর্বেই তার মুখ দিয়ে জল গড়াল। সে ভাবল, আহা, এমন ফলার সামনে থাকতে তার সদ্ব্যবহার করতে পারছি না! রাগে ও দুঃখে সে গুমরে মরছে। এতক্ষণ বলদ দু'টি সব ব্যাপার সহ্য করেছে, কিন্তু এখন বাঘকে দেখে তাদের আক্কেল গুড়ুম। এক পা এক পা করে ক্রমশ তারা ঘরেব দিকে রওয়ানা হল। তখন বাঘ কৃত্রিম ভাবে মায়াকান্নার ছল করে বলল—দাদু গো, বহুদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হল! তোমাদের সব খবর মঙ্গল ও শুভ নিশ্চয়ই। আমরা কিন্তু বড় বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আমরা তোমার নাতি হই, চিনতে পারছ না? তোমরা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ এবং জীবন সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ। আমাদের দুর্দিনে আমাদের ফেলে যেও না, দোহাই তোমাদের। আমাদের রাজ্যে মন্ত্রী নেই। রাজা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষশত্রু আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে অনেক অংশ দখল করে নিয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেককেই মেরে ফেলেছে এবং অনেককে আবার বন্দি করে রেখেছে। তোমরা সাহায্য না-করলে আমরা জাতিগোষ্ঠীসহ সবাই বিনষ্ট হব। আমাদের প্রতি সদয় হও। আমাদের দোষত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করে আমাদের রক্ষা কর। ফিরে এস আমাদের মধ্যে। আমাদের মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ কর। আমাদের মন্ত্রণা দিয়ে চালাও। শুনেছি মানুষের খুব বুদ্ধি আছে। আমরা মানুষের শক্তিসামর্থ্যের খবর কিছুই জানি না। বহুদিন মানুষের সঙ্গ করে তোমরা অনেক বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করেছ এবং মানুষের দোষগুণের খবরও অনেক রাখ। তোমাদের সাহায্য পেলে, তোমাদের পরামর্শে আমাদের এই পরমশত্রুকে নাশ করতে আমাদের অসুবিধা হবে না। আমাদের পরমশত্রু মানুষকে নাশ করতে না-পারলে এবং মানুষের হাতে বন্দি আমাদের জাতভাইদের উদ্ধার না-করতে পারলে আমাদেরও শান্তি নেই এবং মানুষের হাতে নিহত আমাদের পূর্বপুরুষরাও শান্তি পাবে না। দাদু গো, এই বিপদেও তোমরা আমাদের সাহায্য করবে না? বড় বিপদে পড়েই তোমাদের কাছে আজ এসেছি। দয়া করে আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

এত কথার মাঝে বাঘের জিভখানি জলে ভরে গিয়েছিল। সুযোগ পেলে সে এরই মধ্যে ফলার লাগিয়ে দিত, কিন্তু সে সুযোগ বলদ দু'টি দেয়নি তাদের।

এমন সময় হাতি ও পশুরাজ সিংহ এসে তাদের মাঝে উপস্থিত হল। হাতি বলদ দু'টিকে নমস্কার জানিয়ে শুঁড় দিয়ে সেলাম ঠুকে বন্দনা করে তাদের স্তবস্তুতি করল। সবাই মিলে বলদ দু'টিকে একবাক্যে মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করে ঘোষণা করল—আজ থেকে আমাদের বনরাজ্যে মন্ত্রিত্বের পদে অভিষিক্ত তোমাদের দু'জনকে আমরা স্বাগত জানাই।

ইতিমধ্যে অন্যান্য সিংহ, বাঘ, হাতি, গন্ডার প্রভৃতি পশ্চাতে এসে সংঘবদ্ধ হল। তখন পশুরাজ বৃদ্ধ সিংহ নবনিযুক্ত মন্ত্রী বলদ দু'টিকে সকলের কল্যাণের জন্য ভাষণ দিতে বলল। সমস্ত পশুই কৃত্রিম উল্লাসে চাপা স্বরে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে লাগল। তখন বলদ দু'টি পরস্পর পাশাপাশি হয়ে গৃহের দিকে অনেকখানি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে। এতগুলি বন্য হিংস্র প্রাণঘাতী শত্রুদের দেখে তারা অত্যন্ত ভীত হয়। তাই দ্রুতপদে গৃহের দিকে যেতে যেতে তারা বলল—যে মানুষের অধীনে আমরা কাজ করছি তাদের পরিচয়, বুদ্ধি ও শক্তির কথা বলে শেষ করা যায় না। তাদের শক্তির সঙ্গে তোমরা কেউ পারবে না। বলদ দু'টি এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছে যে, এতগুলি পশু আক্রমণ করলে আজ আর তাদের প্রাণ থাকবে না। কোনও রকমে আজ প্রাণরক্ষা হলেও ভবিষ্যতে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। আমাদের প্রভুকে যদি এরা মারে তবে আমাদের বাঁচা সম্ভব হবে না। এত শত্রুর মধ্যে নিরাপদে বাস করা কখনওই সম্ভব নয়। ঝট করে বলদ দু'টির মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। তারা ভাবল, কৌশলে আজ এই সব শত্রুগুলিকে নাশ করতে পারলে আমরা বনরাজ্যে নিরাপদে থাকতে পারব। সুতরাং যদি এদের সবাইকে আমাদের বিরাট ঘরের মধ্যে কোনও মতে নিয়ে যাওয়া যায় তবে আমাদের প্রভু কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সেই গৃহে আগুন দিয়ে এদের মারতে পারবে। নতুবা আমরা সদলবলে নিহত হব এবং এদের খাদ্য হব।

এরূপ বিবেচনা করে বলদ দু'টি মুখ ফিরিয়ে হিংস্র পশুদের বিনীত স্বরে বলল—তোমরা যখন বিপদে পড়ে আমাদের সাহায্য চেয়েছ তখন যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব। এই মানুষ শত্রুটিকে তোমাদের মধ্যে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি, যদি তোমরা আমাদের পরামর্শ শোন। পশুরা সবাই মিলে একবাক্যে স্বীকৃত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করল।

তখন বলদ দু'টি বলল—ঐ ঘরে চাষিটি থাকে। চাষির সমস্ত শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র ঐ ঘরের মধ্যে আছে। সে এখন মাঠের একপ্রান্তে একমনে কাজ করছে। এখান থেকে তাকে দেখা যায় না। তোমরা এই সুযোগে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে একে একে ঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাক। বাইরে থেকে যেন টের না-পাওয়া যায়। চাষি যখন আসবে

চাষিকে আমরা ঘরে নিয়ে যাব। তখন তোমরা চাষির ঘাড়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলবে। তাহলে আমাদের একচ্ছত্র রাজত্ব হবে। চাষি অস্ত্র পাবার আগেই তোমরা তাকে আক্রমণ করবে। তা না-হলে চাষি হাতে অস্ত্র পেলে তাকে আর মারতে পারবে না। এই পরামর্শ পশুদের মনঃপূত হল এবং তারা সেই মতো চাষির ঘরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে চাষি কুকুর দু'টিকে নিয়ে মাঠের একপ্রান্তে কাজ করছিল। হঠাৎ কুকুর দু'টি শত্রুর গন্ধ পেয়ে গৃহের দিকে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল। বলদ দু'টিও ঘরের বাইরে ছটফট করছিল। কুকুর দু'টি ঘরের ভিতরে শত্রুদের গন্ধ পেয়ে ভিতরে ঢুকতে না-পেরে ভয়ে বাইরে চিৎকার করতে থাকে। চাষি এই চিৎকার শুনে ছুটে এসে দূর থেকে বহু হিংস্র পশুর পদচিহ্ন দেখে বুঝতে পারল যে, তার গৃহের মধ্যে হিংস্র জানোয়াররা ঢুকেছে। বাইরে বলদ দু'টিকে অস্থির ও চঞ্চল দেখে সে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে আড়াল থেকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে এবং ভিতরে সমবেত হিংস্র জন্তুদের দেখে বিপদ গুণল। খাদ্যের লোভে বনের হিংস্র পশুগুলি ঘরের মধ্যে বসে আছে। সে বলদদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেই তারা তাদের বধ করবে। তার মাথায় তখন এক উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে সে ঘরের দরজাটি বাইরে থেকে খুব সাবধানে ও কৌশলে বন্ধ করে দিল যাতে ভিতর থেকে পশুরা টের না-পায়। তারপর ঘরের চতুর্দিকে শুকনো কাঠ, গাছের পাতা ও অন্যান্য দাহ্য বস্তু জড়ো করে সমস্ত ঘরসুদ্ধ আগুন লাগিয়ে দিল এবং সেই আগুনে পশুরা পুড়ে মারা গেল। একটি পশুও প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পারেনি।

এবার চাষি নিশ্চিন্ত হল। বিরাট বনরাজ্য তাদের হস্তগত হল। অল্পদিনের মধ্যেই চাষি কঠোর পরিশ্রম করে বাসগৃহ নির্মাণ করল এবং মৃত ও পোড়া পশুদের ভস্মাবশেষ জমির সার হিসাবে ব্যবহার করল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। এগুলি বিক্রি করে সে যে অর্থ পেল তার দ্বারা সে আরও কয়েকটি বলদ কিনল এবং বেশ কিছু লোককে চাষের কাজে নিযুক্ত করল। কয়েকবছরের মধ্যেই সেই বিরাট বনপ্রান্তে চাষি আপন বুদ্ধি ও দেহের পরিশ্রমের দ্বারা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ইতিমধ্যে কুকুরেরও চারটি বাচ্চা হয়। চাষি আপন আত্মীয়স্বজন সকলকে নিয়ে আসে। তাদের ঘরবাড়ি তৈরি হয় এবং আরও চাষের বলদ, গরু, বাছুরও আনা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সমবেত প্রচেষ্টায় এক বৃহত্তর জনসমাজ গড়ে ওঠে সেখানে। উত্তরকালে চাষি সেই স্থানকে এক সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত করে।

এক গরিব অশিক্ষিত চাষি জীবনের প্রথমে দু'টিমাত্র বলদ ও একটি হাল সম্বল করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সুদূর এক পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট বনপ্রান্তে সব রকম বাধা, বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও অসীম সাহসের উপর ভরসা করে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল। জীবনব্যাপী অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে সমস্ত বাধা ও প্রতিকূল অবস্থাকে

অতিক্রম কবে জীবনসাধনায় সে সফল হয়। এই ভাবে সে সেখানে এক বিরাট নগরের পত্তন করে। চাষির দেহাবসানের পরে তার এই মহান কীর্তি অমর হয়ে থাকে। তার জীবনব্যাপী সাধনা সর্বকালেব মানুষেব কাছেই এক প্রেরণার বিষয়।

চাষি ও বলদের গল্পের সারতত্ত্বঃ

চাষি—মুমুক্ষু সাধক (জীবাত্মা)।

বলদ—বল দান করে যে। চাষির বলদ দু'টি হল জ্ঞান ও ভক্তি।

কুকুর—লোভের প্রতীক। লোভের বিপরীত ধর্ম হল নির্লোভ বা ভোলা। বন্য কুকুরকে না-খাইয়ে পোষ মানাবার ফলে কামনার বৃত্তিগুলি, যথা—লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রশ্রয় না-পেয়ে নিস্তেজ হয়ে ক্রমশ বশীভূত হয়।

কুকুরের চারটি বাচ্চা—এই হল সাধনার চারটি উপাদানের প্রতীক, যথা—বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল; অর্থাৎ ইচ্ছা, কর্ম বা চেষ্টা, অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান এবং সিদ্ধি বা প্রজ্ঞাস্থিতি (স্বানুভূতি)। লোভের বশেই মানুষের জীবনে বহু রকম দুর্গতি আসে। লোভকে সংযত কবাই হল লোভরূপ কুকুরকে বশ করা। তার ফলে মন নির্লোভ অর্থাৎ অনাসক্ত হয। এই অনাসক্ত মনকেই ভোলা মন বলে। ভোলা মনে প্রভুভক্তি স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পায়।

কর্মক্ষেত্র—কর্মক্ষেত্র হল বিশ্বমন।

মানুষের মন আবর্জনায ভর্তি। মনই হল বনজঙ্গল। এই মনোবনে জ্ঞান ও ভক্তি সহযোগে চাষ করে তার থেকে ফসল তুলতে হয়।

শত্রুর উৎপীড়ন হল চাষের অন্তরায এবং অসুবিধা। এই শত্রু হল বনেব হিংস্র জন্তুজানোয়ার, প্রকৃতিব বিরুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ অস্থিব ও চঞ্চল মনেব বিকাবসমষ্টি অর্থাৎ রিপুদল। মনের নিষ্ঠা, রুচি, একাগ্রতা ব্যতীত শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।

শিয়াল—রজোপ্রধান তমোগুণ। ধূর্ততা, কুটিলতা, চাতুর্য প্রভৃতির প্রতীক।

অজগর সাপ—তমোপ্রধান রজোগুণ। ক্রূরতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতির প্রতীক।

ভালুক—রজোপ্রধান সত্ত্বগুণ। ছলনা, ভনিতা, কৌতুহল প্রভৃতির প্রতীক।

গন্ডার—রজোগুণ। দম্ভ, দর্প, গোঁয়ার্তুমি প্রভৃতিব প্রতীক।

বাঘ—রজোপ্রধান রজোগুণ। অহংকার, তেজ প্রভৃতির প্রতীক।

হাতি—তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ। অভিমানপ্রিয়তা, স্পর্শকাতরতা, মমতা প্রভৃতির প্রতীক।

সিংহ—রজোপ্রধান সত্ত্বগুণ। হিংস্রতা, শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতির প্রতীক।

মহিষ—তমোগুণ। মোহ-আসক্তি ও অলসতার প্রতীক।

অন্যান্য পশু সবই ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ আধার ও শুদ্ধসাত্ত্বিক দিব্যভাবের বিরোধী স্বভাবপ্রকৃতির প্রতীক। মনুষ্য ইতর পশুদের মধ্যে স্ববিরুদ্ধ গুণভাবের লক্ষণাদি যেমন ব্যাপক ভাবে দৃষ্ট হয় মানুষের মধ্যেও তাদের সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে

বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির বিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগতে স্বভাবগুণের যে প্রকাশবিকাশ সাধিত হয় তা শুদ্ধরূপে পূর্ণ পরিণামপ্রাপ্ত হয় মানুষের মধ্যে বিশেষ ভাবে সাধনার বা তপস্যার মাধ্যমে।

বন্য জন্তুজানোয়ার হল কামাদি ষড়রিপু।

খোঁয়াড় হল ভগবৎ নামের বেড়া, রিপুদলের বা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যূহ। জীবনে সাধনরূপ চাষ করতে করতে যে-সব অসুবিধা বা বিঘ্ন উপস্থিত হয় ভগবৎ নামই তা থেকে রক্ষা করে। নামই প্রহরী।

চাষির জমির বেড়া—ভগবৎ নাম ও স্মৃতি দিয়ে মনকে ভরানো। কিন্তু এই বেড়ার উপাদান সংসার থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। মনের বিরুদ্ধ ভাবনাচিন্তা এবং বৃত্তিগুলি হল জঙ্গল। শুদ্ধবোধের ভাবনা করে এগুলি শোধন করতে হয়। শুদ্ধবোধের ভাবনার মাধ্যমে এই বৃত্তিগুলি শুদ্ধবোধে পরিণত হয়।

রামপ্রসাদের গানে আছে—

"মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জীবন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

অগ্নি—অগ্নি হল তপস্যার তাপ। তাপ অন্তর্বোধকে জাগাতে সাহায্য করে। তপস্যার ফলই হল চাষের ফল।

নগর—নয়টা গড় মানে দ্বার। এই দেহের মধ্যে নয়টা দ্বার আছে।

নবদ্বার—নয়টা পথ, যথা—দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, এক মুখ, এক মলদ্বার ও মূত্রদ্বার।

নগরে বাস—জীবনে অন্তর্ভাব ও বহির্ভাবের বৃত্তিগুলির যথার্থ ব্যবহার হলেই দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে সামঞ্জস্য, পুষ্টি ও তুষ্টি হয়। তার ফলে নগরে শান্তিতে বাস করা যায়, অর্থাৎ এই দেহে শান্তিতে বাস করতে হলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করে আপন করে মিলিয়ে নিতে হয়। তবেই জীবন শান্তিময় হয়। আপন আত্মাই হল নিজের কাছে নিকটতম ও প্রিয়তম বস্তু। এই জীবন বা প্রাণ হল অমৃতময়। সকলের দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি হল আত্মারূপ প্রাণের বিস্তার। এই দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির যথার্থ ব্যবহার হয় একাত্মবোধের বা আপনবোধের দ্বারা। আত্মবোধের বা আত্মজ্ঞানের বিস্তারই হল বিশ্বজগৎ। সমস্ত জ্ঞান ও অনুভূতির অধিষ্ঠান হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই বিশ্বের সর্ববস্তুর সঙ্গে তাদাত্ম্য বা ঐক্যানুভূতি হয়।

প্রথমেই বর্জন না-করে সব কিছু গ্রহণ করে পূর্ণ হতে হয়। আবশ্যক হলে কিছু আবর্জনাও গ্রহণ করতে হয়। সংসারী হয়ে সংসারে উদাসীন থাকা হল বিরুদ্ধ ধর্ম। প্রকৃত সংসারী হয়ে সংসারের যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ করে যে ত্যাগী সন্ন্যাসী হয় সে-ই শ্রেষ্ঠ। সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ করার পূর্বে সংসার ত্যাগ করে কেউই যথার্থ সাধুসন্ন্যাসী হতে পারে না।

অন্ধকারের গভীরেই আলো লুকিয়ে থাকে। আলোই অন্ধকার সৃষ্টি করে। এই হল আত্মপ্রকাশের তাৎপর্য। অনাত্মবস্তুর মধ্যে আত্মা নিহিত আছে। আত্মবক্ষে আত্মা থেকে আত্মার দ্বারা আত্মার অনাত্মারূপের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয়। সকলের প্রাণের মধ্যেই অনন্ত শক্তি, অনন্ত বেদ, অনন্ত প্রেম লুকিয়ে আছে। কিন্তু প্রথমেই পূর্ণ শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না।

প্রথমে স্থূলের থেকে সারবস্তু গ্রহণ করতে হয়। তার থেকেই হয় জ্ঞান। জ্ঞানই হল সার। তার পরে আনন্দ। পূর্ণানন্দই হল মুক্তির স্বরূপ। জ্ঞান এক দিকে মুক্তি লাভের উপায় এবং অপর দিকে মুক্তির স্বরূপ। সারবস্তু হল জ্ঞান, জ্ঞানের সার আনন্দ এবং আনন্দের সার হল প্রেম। মুক্তিই আনন্দ। পূর্ণানন্দের পরিণতি হল প্রেম। কেউ কেউ শক্তির খেলাকে প্রেম বলে। তুষ্টি আর আনন্দ এক কথা নয়।

চতুর্বিধ গুরুমূর্তির যথার্থ পরিচয় হল—

(১) পূর্ণ শক্তি—অস্তিত্ববোধে, সত্যবোধে।

(২) পূর্ণ জ্ঞান—আশ্রিত-আশ্রয়বোধে।

(৩) পূর্ণ আনন্দ—আত্মীয়বোধে।

(৪) পূর্ণ প্রেম—শক্তি-জ্ঞান-আনন্দের পূর্ণ বিকাশই হল প্রেমের স্বরূপ। সব কিছুর মধ্যে একতা, সমতা ও পূর্ণতা হল প্রেমের লক্ষণ। তা-ই আত্মবোধ। আত্মীয়বোধ থেকেই আত্মবোধে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার যোগ্যতা বাড়ে। তখন হয় আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মময়।

গল্পটির অন্তর্নিহিত রহস্য খুব তত্ত্বমূলক ও শিক্ষামূলক। আপাতদৃষ্টিতে তত্ত্ব ধরা পড়ে না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তত্ত্বের সন্ধান মেলে।

জ্ঞান ও ভক্তি হল দুই পাশের দুই ডানা। পাখির দুই ডানায় যেমন বহু পালক থাকে, জ্ঞান-ভক্তির অন্তর্গত তেমনই বহু সদ্‌ভাবের স্তর ও বৃত্তি আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল চারটি, যথা—কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি। এই চার ভাবের অন্তর্গতই হল অন্যান্য ভাবসমষ্টি। জ্ঞানের প্রধান চার ভাগের অন্তর্গত হল বৈচিত্র্যময় জ্ঞানাংশ। ভক্তিরও প্রধান চারটি অঙ্গ এবং তার অন্তর্গত বহুভাব। বিষ্ণুর বাহন হল গরুড়। তার দু'টি ডানা। সর্বজীবের হৃদয়েই বিষ্ণু বাস করেন। জীবই হল বিষ্ণুর বাহন, অর্থাৎ বিষ্ণুকে হৃদয়ে বহন করে চলে জীব। জীবরূপ গরুড়ের দু'টি ডানা হল জ্ঞান ও ভক্তি, অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দুই ডানাকে অবলম্বন করেই জীব মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এর যে কোনও একটির অভাবে জীব আপন মুক্তস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অপূর্ণতা ও বদ্ধদশা ভোগ করে। এক বলদ দিয়ে যেমন চাষ করা যায় না, তেমন এক ডানা নিয়েও পাখি উড়তে পারে না। চাষের জন্য দু'টি বলদ লাগে। সেইরূপ আত্মসাধনার জন্যও জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দু'টি বলদ দরকার হয়। উভয়ের বলে মুক্তিরূপ চাষের ফল লাভ হয়।

"সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।"

ভগবান সর্বগুণ ও সর্ব ইন্দ্রিয়শূন্য হয়েও সগুণ ভাবে সর্ব গুণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থান করে সব কিছুকে প্রকাশ করেন এবং অনাসক্ত ভাবে তা আস্বাদন করেন অর্থাৎ সগুণের মধ্যে নিজেই আবার নির্গুণ। এক কথায়, নির্গুণ হয়েও তিনি সগুণ আবার সগুণ হয়েও তিনি নির্গুণ। তাঁর উভয় ভাবের যুগপৎরূপই হল নির্গুণগুণী। সগুণের ব্যবহার লুপ্ত হলে হয় অব্যক্ত নির্গুণ অবস্থা, আবার নির্গুণ থেকে প্রকাশের অভিব্যক্তির ফলে হয় তাঁর ব্যক্ত সগুণ অবস্থা। উভয়ই তাঁর পরিচয়।

কিছু হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। সূর্য অস্তমিত হলে মাথা ঠুকে কেঁদে তাকে ডাকলেও তখন আর তাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যূষে কারও অপেক্ষায় না-থেকে সূর্যের আলো আপনিই জগৎকে আলোকিত করে। সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত এই আলোর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়। জ্ঞান এই প্রতীক্ষার ফলকে নির্দেশ করে দেয়। অজ্ঞান প্রতীক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভক্তি প্রতীক্ষার যোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ কালের ব্যবধানজনিত বিকারকে প্রশমিত করে দেয় বিশ্বাসের মাধ্যমে। জ্ঞান মুক্তি এনে দেয়, ভক্তি মুক্তিতে স্থিতি করে দেয়। অজ্ঞানের জন্য কেউ কেউ সুখ ও প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও শান্তি পায় না। মৃত্যুকে জানলে মানুষ অভী হয়।

চাষি আগে ভযের কারণগুলিকে নাশ করেছে। ভয়ের কারণ হল রিপুসকল, যথা—আলস্য, নিদ্রা, ভয়, জড়তা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ইত্যাদি। এগুলির পবিচয় জ্ঞানের মাধ্যমেই জানা যায়। এগুলিই আবরণ। জ্ঞানের উদয় হলে এগুলি অপসারিত হয়। জ্ঞানের আলোতে অজ্ঞান অন্ধকার বা ছায়া দূরে সরে যায়। তখন মনের বৃত্তিরূপ বিকারগুলি একাকার হয়ে যায় অর্থাৎ রিপুসকল বোধের জ্যোতিতে রূপান্তরিত হয়ে 'পুরি' হয়ে যায়, অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বহির্বিশ্বের সংস্পর্শে এসে তার যথার্থ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা লাভ করাকেই জ্ঞান বলে।

জ্ঞান—বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জানা বা অভিজ্ঞতা।

নগর প্রতিষ্ঠা—নয় গুণের প্রতিষ্ঠা, যথা—আদর্শ, অখণ্ড সুখশান্তি, সুযোগসুবিধা, উন্নতি, নিপুণতা, কীর্তি, তুষ্টি, পূর্ণতা ও স্থিতি।

এই দেশের সকলেই ঋষির বংশধর। তাঁদের স্মরণ করলে সকলের উপকার হয়। পূজা-অর্চনাকে অনেকেই বিশ্বাস করে না, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের, গুণবিশেষের, শক্তিবিশেষের পূজা করে। ব্যক্তির পূজা সকলেই চায়। প্রত্যেকেই পরোক্ষ ভাবে অথবা অপরোক্ষ ভাবে অপরের কাছ থেকে সম্মান, পূজা, প্রশংসা, তোষামোদ ও সেবা চায়। অপরকে না-মানলে মান পাওয়া যায় না। মান পেতে হলে অপরকে আগে মান দিতে হয়। পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে তবেই পূর্ণ হওয়া যায়। নিজে পূর্ণ না-হলে অপরকে পূর্ণ করা যায় না। সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে প্রশ্ন করল—অনেক সময় কর্ম না-চাইলেও কর্ম আসে কেন?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—প্রত্যেকের মনই কর্ম সৃষ্টি করে। মনের মধ্যে পূর্ব থেকেই যে-সমস্ত কামনা, ইচ্ছা জমা থাকে তা-ই হল কর্মের কারণ। এই কারণ থেকে নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি হয়। কামনাবাসনাকে শোধন করতে হলে তদনুরূপ কর্মের সাহায্য নিতে হয়। কর্মই কর্মকে সৃষ্টি করে আবার কর্ম দ্বারাই কর্মের শোধন হয়।

প্রথমোক্ত কর্ম হল সকাম কর্ম এবং দ্বিতীয় কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম নৈষ্কর্মসিদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম হল শাশ্বত দিব্য নিত্য কর্ম। সর্বভাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তা বিকারমুক্ত। কামনাবাসনা প্রথমে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না। কামনাবাসনার কারণের বা মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। সদসৎ সম্বন্ধে অধিক সচেতন হলে কামনাবাসনাকে সহজে শোধন করা যায়।

কর্মকে জোর করে ত্যাগ করলে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে দুশ্চিন্তা বাড়ে, ফলে কর্মও বাড়ে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার ফলে কর্ম আপনা থেকেই কমে যায়, কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়। কর্ম নিজের থেকে ছেড়ে না-গেলে কর্ম কেউ ছাড়তে পারে না। অকর্মবোধে কর্ম করলে কর্মের ফল জমে না। অকর্মবোধ হল কর্মফলে অনাসক্তি ও অকর্তাবোধে কর্ম। তা নিষ্কাম কর্মেরই পরিণতি।

ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে। শুভাশুভ কর্মফলের প্রতি সমত্ববোধ বা উদাসীনভাব নৈষ্কর্মসিদ্ধির সহায়ক। তত্ত্বত কেউই কর্ম করে না। কর্ম করে প্রকৃতি মা। মোহ, অজ্ঞানে জীব আপনাকে কর্তা মনে করে। কর্তৃত্ব জীবাত্মার নয়, কর্তৃত্ব হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির। জীবাত্মার স্বরূপ হল সাক্ষী ও দ্রষ্টা হয়ে থাকা। প্রকৃতির কাজকে নিজের বলে মনে করাই হল কর্মবন্ধন। 'আমারবোধে' কর্মই হল কর্মবন্ধন, আবার অকর্তাবোধে বা 'তোমারবোধে' কর্মই হল বন্ধন মুক্তির লক্ষণ। জীব স্বরূপত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বভাব তার নয়। এগুলি প্রকৃতির বা শক্তির পরিচয় ও লক্ষণ। কর্তৃত্ববোধে মুক্তি আস্বাদন করা যায় না, আবার অকর্তাবোধে কখনওই জীবনের বন্ধন হয় না। ব্যবহারই হল বিজ্ঞান। ব্যবহারদোষে হয় জীবনবন্ধন এবং ব্যবহারের শোধন হলেই হয় জীবন্মুক্তি। 'আমারবোধ' বা অহংকারবোধ হল অভিমান। এই হল সংসারবন্ধনের কারণ অর্থাৎ কর্মবন্ধনের কারণ। 'তোমারবোধ' বা ত্বংকারবোধ হল আত্মজ্ঞানের লক্ষণ। এই হল মুক্তির বিজ্ঞান।

২৪। ৫। ৬৮

৫

পরমাত্মার আমি-ই স্বয়ং মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব, পরাবিদ্যা ও সর্বনিয়ন্তা। সর্বজীবন তাঁর প্রকাশসন্তান বা অংশ এবং তাঁরই (আমি-র) বক্ষে আজীবন বাস করে। মাতৃকোলে মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে তাঁর সন্তান (ছোট শিশু) নিরাপদে কেমন করে অবস্থান করে তা

দেখিয়ে মা নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপের মহিমা কীর্তন কবেন। দিব্যপ্রেমের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্যই হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভিন্ন সম্বন্ধ।

মা স্বয়ং জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই। মা-ই হলেন সকলের আশ্রয়, উপায় ও উপেয় স্বয়ং। মা-ই হলেন পরমাগতি, শরণাগতি, প্রগতি, প্রজ্ঞাস্থিতি, মুক্তি, শান্তি ও স্বানুভূতি। প্রেম, ভালবাসাই হল মাকে পাবার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রেম, ভালবাসা ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না। খিদে পেলেই মায়ের কথা শিশুর মনে পড়ে। মায়ের কোল পেলেই সন্তান নিরাপদ। প্রাণ দিয়েও মা শিশুকে রক্ষা করেন। সেইরূপ জগন্মাতার আশ্রয়ই হল সকলের পক্ষে নিরাপদ ও শান্তিময়। মা ও সন্তানের মধ্যে যে মাধুর্য ভাবের পরিচয় মেলে তা অতুলনীয়। মা না-হলে সন্তানের মর্যাদা নেই আবার সন্তান না-থাকলে মায়েরও মর্যাদা নেই। জাতমাত্রই সকলে সন্তান, নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই কারওর। জন্মমাত্রই সকলে সমর্পিত হয়ে আছে মায়ের কাছে। মায়ের নামই হল মায়ের আশ্রয। ঈশ্বরের নামই হল ঈশ্বরের রূপ এবং ঈশ্বরের রূপই হল ঈশ্বরের নাম। তাঁর নামই হল প্রাণ, প্রাণই তাঁর নাম। প্রাণই হল প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই হল প্রাণ। তাঁর নামই হল ভাব এবং ভাবই হল নাম। তাহলে নামই হল প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই হল নাম, অর্থাৎ ভাবই হল প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই হল ভাব। প্রজ্ঞাই হল বোধ এবং বোধই হল প্রজ্ঞাচৈতন্য। সুতরাং ভাবই হল বোধ এবং বোধই হল ভাব। প্রজ্ঞাই হল আত্মা অর্থাৎ বোধই হল আত্মা। সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ পবমাত্মার রূপ-নাম-ভাব-বোধ সম অর্থবোধক ও অমৃতময়। নিত্যবস্তুই হল অমৃতময। যা অমৃতময় তা-ই পরমসত্য। পবমসত্যের রূপ-নাম-ভাব-বোধও পরমসত্য। এই ভাবে পরমাত্মবক্ষে পরমাত্মার অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশমান।

প্রাণচৈতন্যের বক্ষে প্রাণের ক্রিয়াই হল নাম। এই নামই হল যজ্ঞ। এই যজ্ঞ দুই ভাগে বিভক্ত। অন্তরে হল ভাবময় যজ্ঞ এবং বাইরে হল কর্মময় যজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার এক গ্রামে কোনও এক সাধু আসেন। সেই গ্রামে আরও দু-একজন সাধু-সন্ন্যাসী বাস করতেন। তাঁরা সকলেই নবাগত সাধুর কাছে যাতায়াত করতেন। সেই নবাগত সাধুটি কারও সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা না-বলে আপনভাবেই থাকতেন। প্রত্যহ তিনি স্নান করে একটি খাতা খুলে স্বগত ভাবে কিছু পাঠ করতেন এবং বেশির ভাগ সময়ই নীরবে শান্ত হয়ে বসে থাকতেন। নবাগত সাধুর চালচলন দেখে তাঁকে বুঝতে না-পেরে সেখানকার সাধুরা নানা উপায়ে তাঁর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেন এবং তিনি কী গ্রন্থ পাঠ করেন তা জানতে চেষ্টা করেন। একদিন নবাগত সাধু স্নান করতে গেলে অপর সাধুরা তাঁর খাতা খুলে দেখতে পায় যে, সব পাতায় শুধু লেখা আছে—মা, মা, মা। তাঁরা এর মর্ম বুঝতে না-পেরে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে, কিন্তু কেউই যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে একজন এসে সাধুকে প্রশ্ন করলেন—এই শিক্ষা তুমি কোথায় পেলে? সাধু বললেন—মায়ের কাছে।

তখন গ্রামের এক সাধক বললেন—আমি তো মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসে সাধুর বেশে ঘুবে বেড়াচ্ছি। নবাগত সাধুর আচরণ দেখে সেই সাধক মায়ের মহিমা বুঝতে পারেন এবং ঘরে ফিরে যান।

শুধু সাধুর বেশ ধরলেই প্রকৃত সাধু হওয়া যায় না।

'প্রকৃত সাধু হবে বোধে বোধে শ্বাসে শ্বাসে
শ্বাস-প্রশ্বাসে যুক্ত সাধু অখণ্ড সত্যে আছে মিশে।'

প্রকৃত সাধু, শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্রে যিনি বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকেন। অনুগত সন্তান মাকে অনুসরণ করে। অনুসরণ করা দুই ভাবে হয়—বাইরেও মাকে রাখা এবং অন্তরেও মাকে রাখা। এক অখণ্ড সত্যই রূপে-নামে-ভাবে-বোধে সর্বত্র প্রকাশমান। যার যা প্রয়োজন তা তার সঙ্গেই যুক্ত হয়।

শ্রদ্ধা হল মাতা। শ্রদ্ধারূপ মাতৃসঙ্গ হলে তবেই মায়ের আরেকটি রূপ—জ্ঞান বা বোধ লাভ হয়। জ্ঞান বা বোধ লাভ হলে সত্যলাভ হয় অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথার্থ জ্ঞান হল অখণ্ড মাতৃস্মৃতি, অখণ্ড গুরুস্মৃতি, অখণ্ড আত্মস্মৃতি। একেই অদ্বয়জ্ঞান বলা হয়। অদ্বয়জ্ঞানের অর্থ হল অভেদ অখণ্ড বোধের স্মৃতি।

মাতৃবোধে স্থূল রূপের মধ্যে মাকে মানার অভ্যাস করলে অর্থাৎ অন্তরের বোধ দিয়ে সচেতন ভাবে স্থূলের ব্যবহার করলে অন্তরে-বাইরে প্রাণের ও বোধের সমদৃষ্টি খুলে যায়।

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—উপাখ্যানটি ছোট ও সহজবোধ্য। সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপারের সঙ্গে তার বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু কাহিনির সারমর্মটি অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার্থীর এবং সংসারী মানুষ উভয়ের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ। অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে থেকে জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে আবিষ্কার ও উদ্ধার করা হল ব্রহ্মাত্মবিদ্যার অন্যতম বিশেষত্ব। আলোচ্য গল্পটির মাধ্যমে কত অনায়াসে সহজবোধ্য করে এই বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়৭

৪। ৬। ৬৮

৬

নিত্যবস্তু হল ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম অর্থাৎ অখণ্ড বিশুদ্ধ বোধানন্দস্বরূপ। তা নিত্য অদ্বৈত নিত্যসমান নিত্যবর্তমান। দ্বৈত, নানাত্ব-বহুত্ব প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় প্রতীতি হল অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়ার খেলা। এই অজ্ঞানের খেলাই হল জগৎনাট্য। তার বিশেষত্ব হল নিত্যসত্য বস্তুকে আবৃত করে অনিত্য ও অসত্য বস্তুকে প্রকাশ করা। পরস্পর প্রকাশের মধ্যে তারতম্য ও ভেদ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে শক্তি লাভের প্রাধান্যজনিত প্রতিযোগিতা, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের দ্বন্দ্ব, তুলনামূলক বৈষম্য এবং অবিরাম রূপান্তর সাধন করাই হল অবিদ্যামায়ার স্বভাব। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি হল অবিদ্যার প্রধান অনুচর। এদের প্রভাবে পড়েই জীবাত্মা ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খায়, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু

ও জরা-ব্যাধির আবর্তে পুনঃপুনঃ ঘুরে মরে। একেই ভববন্ধন বলে। এই মহাব্যাধিরূপ ভববন্ধন থেকে সহজে জীব মুক্ত হতে পারে না। আত্মজ্ঞানী দিব্যপুরুষগণ ভবচক্রের রহস্য অবগত হয়ে বিশ্বাতীত অমৃতময় বিশুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে কেবল সাক্ষিদ্রষ্টারূপে অবিদ্যামায়ার জগৎনাট্য দেখে যান। তাঁরা জগতের কোনও সৃষ্টি বা ঘটনা দ্বারাই প্রপীড়িত, বিব্রত ও বিমোহিত হন না। নিত্য সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর চিত্তে অনিত্য মিথ্যা মায়ার প্রভাব থাকে না। অনিত্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত চিত্তই পুনঃপুনঃ মোহ ও ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। শুদ্ধবোধের অভাবে মিথ্যা ও ভ্রান্তিকে সে বুঝতে পারে না। এক ভ্রান্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য সে অপর ভ্রান্তির সাহায্য নেয়। এই ভাবেই ভ্রান্তির চক্রে ভ্রান্তিমূলক জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে তার পুনঃপুনঃ সংযোগ হয়। প্রসঙ্গকে সহজবোধ্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ছোট গল্প বললেন।

একদিন এক বড় হরিণ সরোবরে জল খেতে গিয়ে জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে খুব মুগ্ধ হয়। শাখা-প্রশাখাযুক্ত নিজের সুন্দর দু'টি বড় শিং, টানা টানা চোখ, বড় বড় কান এবং গায়ের রঙ দেখে খুব প্রীত হয়, কিন্তু কৃশ লম্বা পা চারটি দেখে খুব দুঃখ পায়। উর্ধ্বাঙ্গের সৌন্দর্যের তুলনায় নিম্নাঙ্গের কৃশতা লক্ষ্য করে সে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয় এবং পাগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। হঠাৎ একদল শিকারি কুকুরের সাড়া পেয়ে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে। জঙ্গলের পথে দ্রুত পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার শিং লতাপাতায় জড়িয়ে যায়। যে শিং-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইতিপূর্বে সে প্রশংসা করেছিল তা-ই তার প্রাণরক্ষার অন্তরায় হয়, কিন্তু যে চরণগুলিকে সে হেয় মনে করেছিল তা-ই তাকে পালাতে সাহায্য করে। কিন্তু শিংগুলি তার প্রতিবন্ধক হওয়াতে শিকারি কুকুবগুলি এসে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। চরণকে বন্দনা না-করে শিংকে বন্দনা করার ফলেই সে জীবন হারাল। চরণবন্দনা না-করে অন্য কোনও জিনিসের বন্দনা দ্বারা পূর্ণকাম হওয়া যায় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা সুন্দর তা-ই মোহ ও ভ্রান্তিমূলক এবং অজ্ঞানের বা বন্ধনের কারণ। অন্তরের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য হল হৃদয়ের ধর্ম—শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধবোধে তার অভিব্যক্তি হয়।

গল্পটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গল্পটি ছোট হলেও তার সারমর্মটি জীবনলক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। আপাতমনোরম যা-কিছু বুদ্ধিবিচারের ফলরূপে প্রতীয়মান হয়, তার মধ্যে অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত সংস্কারের প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয় যখন, তখন বিপদের সম্মুখীন হলেও অভ্যাসবশত বুদ্ধি যথার্থ সাহায্য করতে পারে না। সাধারণত বুদ্ধির বিচার একদেশদর্শী, আংশিক, সামগ্রিক নয়। সাধারণ বুদ্ধি সব সময়ই অবিদ্যা গুণদোষে দূষিত। বিদ্যার প্রাধান্য ব্যতীত মলিন বুদ্ধির বিচার শুদ্ধ হয় না। সংযমপূর্ণ সাধনার মাধ্যমে অন্তঃকরণ—মন ও বুদ্ধির শোধন হয়, সংস্কার হয়। সেই শুদ্ধ বুদ্ধি বিপদকালে বিমূঢ় হয় না। বুদ্ধিশুদ্ধি মানেই বিবেকসিদ্ধি, প্রজ্ঞাসিদ্ধি। বিবেকসিদ্ধি হলে অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত মোহ, ভ্রান্তি, ভীতি আর জীবনকে অভিভূত করতে পারে না, এমনকী

মৃত্যুকালেও প্রজ্ঞাবুদ্ধি স্থির থাকে। বিবেকী-বুদ্ধিই হল প্রজ্ঞাবান। প্রজ্ঞাবান পুরুষই সমাধির অধিকারী। সমাধিবান পুরুষই পরাজ্ঞান ও পরাবিদ্যার অধিকারী। পরাবিদ্যা ও পরাজ্ঞানই হল অমৃতত্ব, মুক্তিশান্তিস্বরূপ।

১৬। ৬। ৬৮

৭

কর্মের ফল হল অভিজ্ঞতা। বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে এক বিশেষ বোধের রূপ নেয়। এইরূপ বিশেষ বোধ বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে পূর্ণতার টানে পূর্ণতার দিকে সবেগে প্রবাহিত হয় এবং তার সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। এই ভাবেই ব্যষ্টি চৈতন্য সমষ্টি চৈতন্যের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। ব্যষ্টির স্বার্থ ত্যাগ করে সমষ্টির স্বার্থের নিমিত্ত কর্ম করাই হল ধর্মের তাৎপর্য। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হল অধর্ম। শাস্ত্রবিহিত কর্মই হল ঈশ্বরীয় কর্ম বা ধর্ম। এইরূপ ধর্মকর্ম সাধনের মাধ্যমে তপোবল লাভ হয়। সত্যই হল পরম ধর্ম এবং পরম তপ। সুতরাং তপোবলই হল সত্যের বল, আবার সত্যের বলই হল তপোবল। সত্য তপস্যা দ্বারা লব্ধ। বিনা তপস্যায় সত্য লাভ করা যায় না। সত্যের পরিপন্থী হল মিথ্যা। মিথ্যার দোসর হল সকামভাব। নিষ্কামভাবই হল সত্য লাভের উপায়। নিষ্কাম ভাবের সাধনা দ্বারাই তপোবল লাভ হয়। তপোবলের প্রভাবেই মিথ্যার প্রভাব দূরীভূত হয়। সত্যনিষ্ঠ হলে জ্ঞাননিষ্ঠা বাড়ে। সত্যস্বরূপই হল ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর, আবার ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর হল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান সমার্থক। তা নিত্য শাশ্বত অমৃত নির্বিকার অখণ্ড অনন্ত অপরিণামী।

কৌশিকী মুনি তপস্যা দ্বারা যে শক্তি অর্জন করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। একদিন এক বৃক্ষের নিচে বিশ্রামকালে গাছের উপর থেকে এক কাক তাঁর গায়ে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে। ক্রোধভরে তিনি বৃক্ষোপরি কাকের দিকে দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে কাকটি ছটফট করে মাটিতে পড়ে মারা যায়। এই দৃশ্য দেখে মুনির খুব দুঃখ হল বটে, কিন্তু আপনার তপোলব্ধ শক্তির ফল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আনন্দিত হলেন। আপনার তপোবল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তিনি সচেতন ছিলেন না। এই ঘটনার মাধ্যমে সেই সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অনেক সময় সাধকের অজ্ঞাতসারেই তাঁর কাছে পূর্ণতা এসে ধরা দেয়। সবার মধ্যেই যে সত্য আছে এবং সত্যের মধ্যেই যে সকলে আছে, তা সাধনার মাধ্যমে সাধকের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আত্মারূপী মা সকলের হৃদয়েই আছেন, আবার সর্বজীব বিশ্বাত্মার বা বিশ্বমাতার হৃদয়েই বিরাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই এক আত্মা সেই মা। সেই মাকে সম্যক্ ভাবে জানতে না-পারলেও তাঁকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা যায় না। যারা তাঁকে অবহেলা করে তাদের মধ্যেও সেই মা-ই আছেন। সেই মা-ই তাদের দেখেন। যতদিন তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণসিদ্ধ না-হয় অর্থাৎ অন্তঃপ্রাণে তাঁর পূর্ণ অভিব্যক্তি না-হয় ততদিন পর্যন্ত তাঁর সাধনা ও কাজ চলতে থাকে। প্রত্যেকের মন ও বুদ্ধি রূপে মায়েরই শক্তি নিয়ত কাজ করে। মায়ের

কৃপা ব্যতীত তা অবগত হওয়া যায় না। আপনবোধে বা মাতৃবোধে অন্তরে-বাইরে সব কিছুকে না-মানা হলে মায়ের পূর্ণ কৃপা লাভ হয় না। একবোধে, সমবোধে, আপনবোধে, মাতৃবোধে, গুরুবোধে, আত্মবোধে, ঈশ্বরবোধে বা ব্রহ্মবোধে সব কিছু 'মেনে, মানিয়ে চললে' তাঁর কৃপা লাভ হয়। তার ফলে সবই অমৃতময়, আত্মময়, ব্রহ্মময়, সত্যময় বা মাতৃময় অনুভূত হয়। অখণ্ড ভূমাতত্ত্বের এই পরিচয়।

অখণ্ড এক-কে দেখা ও জানা, এক-এ থাকা এবং এক হয়ে যাওয়াই হল পরম পুরুষার্থ বা পরমগতি। অখণ্ডের ধারণা ও অনুভূতি লাভ করার জন্য গুরুকে বা মাকে মেনে, তিনিই সব হয়েছেন এবং তিনিই সব করছেন তাঁর নিজের জন্য—এই বোধ নিয়ে নিয়ত চলতে হয়।

১৭। ৬। ৬৮

৮

আশা হল চিতিমাতা। এই মাতাই হল সকলের একমাত্র ভরসা। এই আশারূপী মায়ের করুণাঘন অনুগ্রহ ও আশিসে কেমন করে মৃতপ্রায় জীবন আবার সবল হয়ে ওঠে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এক সত্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন।

কোনও এক শহরের প্রান্তে রাস্তার ধারে বড় এক বট গাছের নিচে একটি জীর্ণ শীর্ণ ভিখারি থাকত। শহবে গিয়ে ভিক্ষা করে খাবার সংগ্রহ করার মতো শারীরিক অবস্থা তার ছিল না। পথযাত্রীদের মধ্যে কোনও কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করে তাকে কখনও কখনও কিছু দিয়ে যেত। তা দিয়েই তার কোনও প্রকারে দিন চলত।

কিছুদিন পরে একদিন একটি ভিখারিনি মেয়ে তার পোঁটলাপুঁটলি, হাঁড়িপাতিল প্রভৃতি নিয়ে আশ্রয় নিল সেই গাছতলাতেই। এই ভিখারিনি খুবই দুর্বল ও রুগ্ণা ছিল। দূরে গিয়ে ভিক্ষা করার সামর্থ্যও তার ছিল না। এক জায়গায় দু'জন ভিখারি বসাতে প্রথম ভিখারির ভিক্ষার পরিমাণ কমে যায়। ভিখারিনির প্রতি সাধারণ পথিকের সহানুভূতি বেশি থাকার ফলে তাকেই সকলে বেশি সাহায্য করত। তার ফলে ভিখারি অপেক্ষা তার প্রাপ্তিই বেশি হত। কোনও কোনও দিন ভিখারির ভাগে কিছুই জুটত না, কিন্তু ভিখারিনি যৎসামান্য কিছু পেত। সেদিন ভিখারিনি নিজের অংশ রেখে দিয়ে বাকি অংশ ভিখারিকেও দিত। আবার কোনও দিন ভিখারির প্রাপ্তি বেশি হলে সে ভিখারিনিকে সাহায্য করত। এই ভাবে উভয়ের দিন চলতে থাকে।

আস্তে আস্তে ভিখারিনির রোজগার একটু বেড়ে যায়। তার শরীরও একটু পুষ্ট ও সবল হয়। তখন সে দূরে গিয়েও ভিক্ষা করে ভিক্ষার পরিমাণ বাড়াতে লাগল। কিন্তু ভিখারি দূরে যেতে না-পেরে ঐ গাছতলাতেই থাকত। এই ভাবে ভিখারিনির রোজগারে ভিখারিরও চলে যেত। ভিখারিনি দিনান্তে রান্না করে নিজে খেত এবং ভিখারিকেও দিত। এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে ভিখারির শরীর একটু ভাল হয়ে ওঠে। তখন

সেও শহরে ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল। প্রতিদিন তারা যা রোজগার করত তা ভাগাভাগি করে দু'জনে খেত এবং গাছতলায় রাত কাটাত। দিনে দিনে উভয়েরই শরীর ক্রমশ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। তাদের মনে উৎসাহ, শক্তি ও আনন্দ ফিরে আসে। তারা উভয়ে মিলে গাছতলাতেই খড় ও পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে নেয় এবং সেখানেই দু'জনে বাস করে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে একই জায়গায় থাকার ফলে প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে উভয়ের প্রতি উভয়ের সদ্‌ভাব বেড়ে যায়। তারা বিয়ে করে স্বাভাবিক ভাবে সেখানেই ঘরসংসার পাতে। প্রকৃতির ধর্মই এই।

মরা গাঙেও বান ডাকে এবং জোয়ার দেখা যায়। শুকনো ডালেও পাতা গজায় এবং ফুল-ফল হয়। মৃতপ্রায় মুমূর্ষুর মধ্যেও নূতন প্রাণের চেতনা জেগে ওঠে। অন্তরের স্বভাবধর্ম অমোঘ।

গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্ববোধ প্রসঙ্গে স্বানুভূতির ভাষায় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আশা হল কামনার একটি বিশেষ রূপ। কামনা অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত। কামনার অপর নাম কাম। কামপূরণের জন্য কর্মের উদয় হয়। কর্ম নিষ্পন্ন করার জন্য ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন হয়। ইন্দ্রিয়াদি দ্বিবিধ—(১) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং (২) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করার জন্য কর্তৃত্ব ভাবের প্রয়োজন হয়। এই ভাবেই অন্তরে অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রকাশবিজ্ঞান রূপায়িত হয় জীবনে। জীবন চলে অন্তরের স্বভাবপ্রকৃতির দ্বারা। স্বভাবপ্রকৃতি জীবনেব মাধ্যমে লীলায়িত হলেও তার পশ্চাতে থাকে স্ববোধস্বরূপ দিব্য মুক্ত অমৃত আত্মা। স্বভাবপ্রকৃতির সৃষ্টি হল অন্তঃকরণ (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয এবং তাদের আহার ও বিষয়াদি হল যথাক্রমে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং দেহকার্যাদি পরিচালনা করার জন্য হয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার। জীবের তিন দেহ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। অন্তর্বোধের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রৎ-এর সঙ্গে স্থূল দেহের সম্পর্ক, স্বপ্নের সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের এবং সুষুপ্তির (গাঢ় নিদ্রা) সঙ্গে কারণ দেহের সম্পর্ক অভিন্ন। জীবমাত্রই স্থূল দেহের সঙ্গে অধিক পরিচিত। স্থূল দেহের অভাবে সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে হয় তার পরিচয় ও সম্বন্ধ। আবার স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দেহের অভাবে কারণ দেহের সঙ্গে হয় তার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। স্থূল দেহের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হয়। সূক্ষ্ম দেহ সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-ভ্রান্তি-ভীতির কারণ। কারণ দেহ অব্যক্তপ্রকৃতি, সর্ব গুণভাবাদির সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা। জীবকে পর্যায়ক্রমে তিন দেহের মধ্যেই অবস্থান করতে হয়। ঈশ্বর কেবলমাত্র কারণ দেহেই অধিষ্ঠিত থাকেন।

আত্মার জীবত্ব লাভের কারণই হল কল্পিত অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত কামনাবাসনা ও আশা। অবিদ্যার দ্বারা বিদ্যা আবৃত থাকে বলে জীব কামনাবাসনার অধীন হয়। বিদ্যার উদয়ে জীব কামনাবাসনা অতিক্রম করে মুক্তির পথে এগিয়ে চলে। পরাবিদ্যার উদয়ে জীব আপন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আশা হল বদ্ধ জীবের ধর্ম।

নিরাশা ও নিস্পৃহতা হল আত্মার ধর্ম। আশাই বন্ধন, নিরাশা হল মুক্তি। অবিদ্যায় বন্ধন, বিদ্যায় মুক্তি।

২২। ৬। ৬৮

৯

সংসারে একমাত্র ঈশ্বর-আত্মাই আপন, আর কেউ আপন নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একসময় অভাব-অনটন ও নানাবিধ সাংসারিক অশান্তির দরুন একজন গৃহীর মনে সংসারবৈরাগ্য জাগে। সে বাড়িঘর ছেড়ে দিনকয়েক নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়। সাধুকে সে তার সংসারবৈরাগ্যের কথা বলে। সাধু তার সব কথা শুনে ঈশ্বরের একটি বিশেষ নামের সাধন এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম পালনের নির্দেশ দিয়ে তাকে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। যথাসময়ে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে এবং তখন অবস্থা বুঝে নূতন ব্যবস্থা করবেন —এই আশ্বাস দিয়ে সাধু অন্যত্র চলে যান।

গৃহী তখন ঘরে ফিরে এসে সাধুর নির্দেশ মোটামুটি ভাবে পালন করে এবং সামান্য কাজকর্মের চেষ্টাও করে। ধীরে ধীরে তার আয় বাড়ে এবং সংসারের অবস্থাও সচ্ছল হয়। সে বিয়ে করে, কয়েকটি ছেলেমেয়ে হয় এবং সংসারও তার বড় হয়।

কয়েকবছর পরে আবার সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয় এক জায়গায়। সাধুকে সে জানায় যে, তার ঝামেলা এখন বেড়েছে কারণ তার সংসার অনেক বড় হয়েছে। তার পরিবার ও ছেলেমেয়েদের সব কথাই সে সাধুকে জানায়। সব শুনে সাধু তাকে বলেন—এখনও তোমার সময় হয়নি। আবার কিছুদিন পরে দেখা হবে, তখন নূতন নির্দেশ পাবে। এই বলে সাধু চলে যান।

কিছুদিন পরে গৃহীর স্ত্রী ৫/৬টি ছেলেমেয়ে রেখে মারা যায়। ঋণের দায়ে ঋণদাতার কন্যাকে সে আবার বিয়ে করতে বাধ্য হয়। তার গর্ভেও বহু ছেলেমেয়ে হয়। তার বহুজনের সংসারে বিরাট ঝামেলা। আয় কম কিন্তু ব্যয় বেশি। কিছুদিন পর সাধুর সঙ্গে তার আবার দেখা হয়। সাধু তাকে বলেন—এবার তোমার সংসার ছেড়ে আসার সময় হয়েছে। কিন্তু গৃহী নানা অজুহাত দেখিয়ে কিছুদিন সময় চেয়ে নেয় সাধুর কাছে। সাধু তার সব কথা শুনে চলে যান।

কয়েকবছর পরে আবার সাধু এসে উপস্থিত হন এবং গৃহীকে বলেন—এবার সব ছেড়ে আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। তুমি ক্রমশ সংসারে জড়িয়ে পড়ছ। তোমার আসক্তি বাড়ছে, মনের শক্তি কমছে। এর পরে তোমার আর সংসার ছাড়া সম্ভব হবে না। গৃহী এবারেও নানাবিধ অজুহাতের কথা বলাতে সাধু তাকে বললেন—তোমার এ সব অজ্ঞান, মোহ ও আসক্তির কথা। এই মোহের ফাঁদে পড়ে তুমি শেষে মারা যাবে। সংসারে সবাই স্বার্থের জন্য তোমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে। তুমি তাদের হয়ে বহু কর্তব্য করেছ, আর নয়—এবার সব ছেড়ে চলে এস। তোমাকে

ছাড়াও সংসার চলবে। সংসারে কেউ কারও আপন নয়। একমাত্র ঈশ্বর-আত্মাই সত্য এবং আপনজন, আর সব হল মোহবন্ধন। সকলে কেমন স্বার্থপর তা এবার তোমাকে দেখাব। তোমাকে এরা কেউই ভালবাসে না। সকলেই আপনার স্বার্থ দেখে। তা ভাল করে যাতে বুঝতে পার তার জন্যই ব্যবস্থা করছি।

এই বলে সাধু তাকে একটি ফল দিয়ে বললেন—এই ফলটি খেয়ে শুলে তোমার বাহ্যিক অবস্থা মরার মতো হবে, কিন্তু তুমি সবই জানতে পারবে। কৌতূহলবশত গৃহী সেই ফলটি নিয়ে গৃহে ফিরে যায় এবং তা খেয়ে শুয়ে পড়ে। তখন তার অবস্থা মরার মতো হয়, কিন্তু অপরের কথা সবই বুঝতে পারে। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। তার অবস্থা দেখে পরিবারের সকলে খুব কান্নাকাটি করতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী সব এসে জমা হয়। সকলেই নানা কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করে। ঠিক সেই সময় সাধু সেখানে উপস্থিত হন। বিপদকালে সাধুকে দেখে পরিবারের সকলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং মৃতপ্রায় গৃহস্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য করুণস্বরে অনুনয় বিনয় করে।

সাধু কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গম্ভীর ভাবে বললেন—পরিবারের যে কোনও একজন ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে তিনি মৃত ব্যক্তির প্রাণদান করতে পারেন। এই কথা শুনে পরিবারের সকলেই নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রাণ দিতে অস্বীকার করে এবং গৃহস্বামীর জন্য কোনও প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা যে সম্ভব নয় সেই কথাও তারা জানিয়ে দেয়। পরিবারের সকলের কথা শুনে গৃহস্বামী সাধুর কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে তাঁকে বলল—সংসারের মোহ আমার কেটে গিয়েছে। এবার চল তোমার সঙ্গে আমি যাব। এরা কেউ আমার আপন নয়, ঈশ্বরই আমার একমাত্র আপনজন। তাঁর জন্যই জীবনপাত করব। এই বলে সংসার ছেড়ে সাধুর সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে। সে আর ঘরে ফেরেনি। সাধুর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবছর ঘুরে এক জায়গায় বসে সে গভীর সাধনায় রত হয়। তার ফলে, একমাত্র ঈশ্বর-আত্মাই সত্য এবং আপনজন—সাধুর এই কথার তাৎপর্য যথার্থ ভাবে সে আপন হৃদয়ে অনুভব করে।

গল্পটি শেষ করে গল্পের তাৎপর্য ও মর্মার্থ তত্ত্বের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সংক্ষেপে বললেন—সংসারের ধর্ম অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত ও ভ্রান্তিমূলক। এই অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ বহু জন্ম সংসারচক্রে ঘুরে বেড়ায়। তার এই অজ্ঞানজাত মোহ, ভ্রান্তি সে সহজে বুঝতে পারে না, কেউ বোঝালেও সহজে মানতে পারে না। ভ্রান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপরকে সাহায্য করতে পারে না অর্থাৎ সংসারী মানুষ অপর সংসারীকে সংসারমুক্তির উপায় বা পথ দেখাতে পারে না। জীবন্মুক্ত জ্ঞানীপুরুষই যথার্থ সাধু। সব সাধ যাঁর উড়ে যায় বা জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় (বাধিত হয়) তিনিই যথার্থ জ্ঞানী সাধু। তিনিই কামাহত, মোহগ্রস্ত, অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রভাবে পরিচালিত আত্মবিস্মৃত সংসারবদ্ধ জীবকে যথার্থ মুক্তির উপায় ও বিজ্ঞান দিয়ে জীবন্মুক্ত হতে সাহায্য করেন।

২৫। ৬। ৬৮

১০

সংসারের ধর্মই হল সমস্যা সৃষ্টি করা। সমস্যার সমাধান বস্তুর বা ব্যক্তির দ্বারা হয় না। ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্যজ্ঞানের দ্বারাই জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান হয়। তা ছাড়া পূর্ণ সমাধান আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব নয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অনুশীলন দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। দিব্যজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হল ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর উপলব্ধি।

কেবল অন্নবস্ত্রের সমস্যাই সকলের সমস্যা নয়। সংসারে ভোগবাদীর দল অন্নবস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে। ভোগের দ্বারা ভোগের সমাধান হয় না। ত্যাগের দ্বারাই ত্যাগের ও ভোগের উভয়েরই সমাধান হয়। এই ত্যাগের শিক্ষা হয় বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গে মনকে যুক্ত রাখলে। অজ্ঞান-মোহ হল জীবনের দুঃখকষ্টের কারণ। অজ্ঞানের প্রভাবে মন-বুদ্ধি মলিন হয়। তার ফলে অহংকার-অভিমান প্রাধান্য পায়। মোহের প্রভাবে কাম, লোভ, ভোগাসক্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। জাগতিক ঐশ্বর্যই মানুষকে ভোগসুখের মধ্যে যুক্ত রাখে। পার্থিব জীবনের পক্ষে তা-ই হল প্রেয়। এই প্রেয় পথে যথার্থ সুখ, আনন্দ অপেক্ষা অভাব, দুঃখ ও অশান্তির মাত্রাই অধিক। কারণ জাগতিক সব কিছুই বিকারী, পরিণামী, ক্ষয়শীল ও অস্থায়ী। ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যই হল আসল শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ। তা অপরিণামী ও স্থায়ী বলে মানুষকে যথার্থ সুখশান্তির বিধান দেয়। এই পথ হল শ্রেয়র পথ। প্রেয় পথের আদর্শ হল জাগতিক ভোগ এবং শ্রেয় পথের আদর্শ হল জাগতিক ভোগ ত্যাগ এবং ঈশ্বরীয় স্বভাব আস্বাদন ও অদ্বয়বোধে স্থিতি। প্রেয় পথকে প্রবৃত্তি মার্গ বলে এবং শ্রেয় পথকে নিবৃত্তি মার্গ বলে। নিবৃত্তি মার্গের পরিণাম হল সমতা, অমৃত ও শান্তি এবং প্রবৃত্তি মার্গের ফল হল ভোগ, শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কথা বিশদ ভাবে বলতে গিয়ে এক প্রেমিক ভক্তের জীবনী বললেন।

এক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করত। তার ছোট সংসার। সংসারে ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী এই দু'জনমাত্র। ব্রাহ্মণ খুব গরিব, দিন আনে দিন খায়, কিন্তু সে মহাপ্রেমিক ভক্ত। ঘরে ইষ্ট নারায়ণের সেবাতেই সে বেশির ভাগ সময় কাটাত। ইষ্টের সঙ্গে তার গভীর প্রেমের সম্বন্ধ। সর্বক্ষণ নারায়ণের স্তবস্তুতি, পূজাপাঠ ও ধ্যানেই সে মত্ত থাকে। তাঁর কাছে সংসারের জন্য সে কিছুই চায় না। তাঁর সেবাতেই তার আনন্দ ও তৃপ্তি। এদিকে সংসার চলে না। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের এত নিষ্ঠা, ভক্তি পছন্দ করে না। অভাবের তাড়নায় সে জর্জরিত। তার বড় মেজাজি স্বভাব। তার দুঃখের কারণ হল, তার স্বামী রোজগারেও বেরোয় না এবং সংসারের প্রতিও উদাসীন। সে সর্বদাই ইষ্টধ্যানে রত থাকে। পাড়া প্রতিবেশীদের সচ্ছল অবস্থা দেখে তার কষ্ট আরও বেশি হয়। জীবনে কোনও সাধ-আহ্লাদই তার পূরণ হল না ভেবে সে সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করে। সে স্বামীকে লক্ষ্য করে প্রায়ই বলে—তোমার হাতে পড়ে আমার জীবন নষ্ট

হল। ব্রাহ্মণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তোমার জীবন নষ্ট হয়নি। তুমি খুব ভাগ্যবতী। কারণ তোমার ঘরে ভগবান নারায়ণ বাস করেন। যা দরকার নারায়ণের কাছে চেয়ে নিলেই পার। তাঁর কাছে চাইলে তিনি সব দেন। তার কথায় স্ত্রীর বিশ্বাস হয় না বরং ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। নারায়ণ যদি সব দিতেই পারেন তবে তাঁর ভোগের অভাব হয় কেন? আমাদের দু'জনের সংসারে খাওয়া-পরার এত কষ্ট কেন? ঘরে অন্ন নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই। 'নারায়ণ, নারায়ণ' করে ভাবলে সংসার আর চলে না। ব্রাহ্মণী অন্নের অভাবে শাক, লতাপাতা সিদ্ধ করে কোনও কোনও দিন ব্রাহ্মণকে দেয়। ব্রাহ্মণ নারায়ণকে ভোগ নিবেদন করে তা-ই গ্রহণ করে আবার কোনও দিন তাও তার ভাগ্যে জোটে না। একদিন রাতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। অনাহারে ব্রাহ্মণ নারায়ণের আসনের কাছে শুয়ে পড়ে।

এদিকে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে কথা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণকে বলেন—তোমার ভক্ত না-খেয়ে শুয়ে আছে। তাকে অভুক্ত রেখে তুমি কী করে খেলে? তোমাকে ডেকে ডেকেই তোমার ভক্তের এই দুরবস্থা। তার একটা কিছু ব্যবস্থা আজ কর। এই কথা শুনে নারায়ণ হেসে লক্ষ্মীকে বললেন—আমার যে ভক্ত সে তো তোমারও ভক্ত। তার ঘরে আমি যেমন বাস করছি সেই রকম তুমিও তো বাস করছ। তুমিই তাহলে সেই ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করছ না কেন? নারায়ণ আরও বললেন—ভক্ত আমার কাছে কিছু চায়নি, শুধু আমাকেই চেয়েছে। আমাকে পেয়েই সে তৃপ্ত ও আনন্দিত। সে তার ব্রাহ্মণীকে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে বলেছে, কিন্তু আমার প্রতি ব্রাহ্মণীর ভক্তি ও বিশ্বাস নেই বলে সে আমার কাছে কিছু চায়নি। সে তোমার পূজা করে যখন, তখন তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেই তো পারে। লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে ব্রাহ্মণের অভাব দূর করার জন্য নারায়ণ নিজেই বেরিয়ে পড়লেন।

পরের দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ যখন নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় নারায়ণ এক মুটের বেশে মাথায় একটি কুমড়ো নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ি উপস্থিত হন এবং ব্রাহ্মণীকে বলেন যে, ব্রাহ্মণ এটা পাঠিয়েছে। ব্রাহ্মণী পূর্ব রাত্রের রাগ ভুলতে পারেনি। সবেমাত্র মুটেরূপী নারায়ণ কুমড়োটি দাওয়ায় নামিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণী সেই কুমড়োটি মুটের মাথাতেই ছুঁড়ে মারে।

মুটেরূপী নারায়ণ কোনও প্রকারে প্রাণ নিয়ে সরে যান। তখন ব্রাহ্মণী এক লাথি মেরে কুমড়োটি ভেঙে ফেলে। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে কতগুলি সোনার মোহর। ব্রাহ্মণী তখন মোহরগুলি নিয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে। সেই সময় ব্রাহ্মণ স্নান করে ফিরে এসে নারায়ণকে স্নান করাতে যায়। সে নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পায় যে, তাঁর মুখের এক স্থানে আঘাতের চিহ্ন। এই দেখে ব্রাহ্মণ বলল—এ কী হল প্রভু! তোমার এই অবস্থা কে করল? এই বলে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে সে প্রাণত্যাগ করে।

ব্রাহ্মণের পারলৌকিক ক্রিয়া কোনও মতে করার পরে ব্রাহ্মণী একদিন সেই মোহরগুলি নিয়ে শহরে যায় টাকা আনার জন্য। সেখানে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণী তার এই মোহরপ্রাপ্তির কথা সকলের কাছেই গোপন করেছিল। তার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ তার এই মোহরপ্রাপ্তির কথা জেনেছিল। কারও কাছে মোহরপ্রাপ্তির কথা খুলে বলার সাহস ব্রাহ্মণীর ছিল না। বিষয় পেয়েও নানা রকম বিপদের মুখে তাকে পড়তে হয়। পুলিশের হাত থেকে কোনও মতে রেহাই পেয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু, বিষয়প্রাপ্তি, পুলিশের হাতে হয়রানি, পাড়া প্রতিবেশীদের জেরা প্রভৃতি নানা কারণে সে অত্যন্ত দুঃখিত, বিব্রত ও শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ঘরের নারায়ণ বিগ্রহের কথা তার মনে পড়ে। নারায়ণের কাছে সে বিলাপ করতে থাকে এবং সাশ্রুনয়নে নারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই সময় সে দেখতে পায় নারায়ণের মুখের এক অংশে আঘাতের চিহ্ন। কুমড়ো মাথায় মুটের কথা তখন তার মনে পড়ে যায়। নানা রকম চিন্তার ফলে কাঁদতে কাঁদতে সে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে তার এক দিব্যদর্শন হয়। সে দেখতে পায় তার স্বামী নারায়ণের কাছে মহা আনন্দে আছে। কুমড়ো মাথায় মুটের বেশে নারায়ণই তার বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে সে কুমড়ো ছুঁড়ে আঘাত করে। তার ফলে নারায়ণের মুখের বিশেষ এক স্থানে সেই আঘাতের চিহ্ন সে দেখতে পায়। নারায়ণের কৃপায় সবই সে তখন বুঝতে পারে। এই দর্শনের পরে ব্রাহ্মণী জেগে উঠে বিলাপ করতে থাকে।

বিষয়লোভের বশে পড়ে ব্রাহ্মণী ভগবানের কৃপা পেয়েও তা ভোগ করতে পারল না। সংযমের অভাবে সাধনার ফল স্থায়ী হয় না। ব্রাহ্মণের মতো ব্রাহ্মণীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ছিল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ ইষ্টনিষ্ঠার গুণে দুঃখকষ্টকে কখনওই গুরুত্ব দেয়নি ও তার দ্বারা অভিভূত হয়নি। ব্রাহ্মণীর ইষ্টনিষ্ঠা না-থাকার জন্য দুঃখকষ্ট দ্বারা অভিভূত হয়। শেষ দিকে ব্রাহ্মণী পাগলের মতো হয়ে যায়। তার মুখে কখনও ব্রাহ্মণের প্রশংসা, কখনও দুঃখকষ্টের অভিযোগ, কখনও বা নারায়ণের মাহাত্ম্য শুনে লোকেরা তাকে খুব সমীহ করত, কিন্তু ব্রাহ্মণী কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য না-নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। কিছুকাল পরে সে কোথাও চলে যায়, লোকে আর তাকে দেখতে পায়নি।

আলোচ্য ঘটনার নিগূঢ় রহস্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর স্বানুভূতির ভাষায় অতীব মর্মস্পর্শী করে যে-ভাবে ব্যক্ত করেছেন তা হল—উপাখ্যানটি নিছক গল্পমাত্র নয়, জীবনের সত্য ঘটনার বিশেষ এক নিদর্শন। সংসারে মানুষ স্বকল্পিত অজ্ঞান-মোহের বাসনাজালে স্বেচ্ছায় পরিচালিত হয়। তার অন্তরের স্বভাব তাকে পরিচালনা করে। সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিবিধ গুণের দ্বারা সকলের জীবন পরিচালিত হয়। গুণ হল উপাধি। এই উপাধিরূপ গুণ হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির তিনটি ভাব বা শক্তি। তমোগুণের

ধর্ম হল মোহ, আসক্তি, জেদ, স্বার্থ, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিশ্বাস, ঈশ্বরবিমুখতা ও দেহভোগসুখ সর্বস্বতা। রজোগুণের ধর্ম কামনাবাসনা, অহংকার-অভিমান, স্বার্থপরতা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপ্রধান ভাব, দ্বেষদর্শিতা, ক্ষমতা দখল, আধিপত্য বিস্তার, প্রভুত্ব, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা প্রভৃতি। সত্ত্বগুণের ধর্ম শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, বিনয়, নম্রতা, দান, দয়া, স্নেহ, মমতা, সংযম, আপনতা, ঐক্য (একতা), সমতা, নিস্পৃহতা, অমানীতা, অহংকারশূন্যতা, অহিংসা, ক্ষমা প্রভৃতি।

জীবনের সুখশান্তি ব্যাহত হয় তমোরজোগুণের মাধ্যমে। ঈশ্বরচিন্তা, আত্মচিন্তা সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য। শুদ্ধসত্ত্বগুণে হয় তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। জীবনের সত্য পরিচয়, ঈশ্বর-আত্মার প্রতি অনুরাগ, প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, আত্মজ্ঞান, মুক্তিশান্তি শুদ্ধসত্ত্বগুণের উদয়ে সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর-আত্মার অনুভূতি ও উপলব্ধি হৃদয়ে আপনবোধের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়। আপনবোধে দ্বৈতবোধ থাকে না এবং দ্বৈতবোধে আপনবোধ খেলে না। আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত জীবন হল পরম জ্ঞানী, যোগী ও প্রেমিক ভক্তের পরিচয়। আত্মজ্ঞানী ও ঈশ্বরভক্ত আপনবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে ভেদজ্ঞান ও দ্বৈতবোধের একান্ত অভাববশত তাঁরা সংসারী মানুষের মতো স্বকল্পিত ভেদভাবনার বশীভূত হন না। তাঁরা ঈশ্বরাত্মবোধে অর্থাৎ নিত্য অদ্বয়বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে অন্তরে-বাইরে সর্বত্র সর্ববৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্বয় এক আপনবোধকেই অনুভব করেন এবং সেই ভাবেই তাঁরা জীবনযাপন করেন। তাঁদের মধ্যে জাগতিক ভাববোধের কোনও প্রভাব থাকে না। তাঁদের জীবন লৌকিক অভাব, দুঃখকষ্ট, ভাবনাচিন্তা মুক্ত সদা আনন্দময়। তাঁদের কর্তৃত্বাভিমান থাকে না বলে কর্মফলভোগও থাকে না। অদ্বৈতবোধের দৃষ্টিতে তাঁদের ভেদদৃষ্টির নিরসন হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ তাঁদের চিনতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। কাজেই তাঁদের সহজ সরল সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে সাধারণ মানুষ বিশেষ কোনও গুরুত্ব বা তাৎপর্য খুঁজে পায় না। তাঁদের কথা ও আচরণেব মধ্যে মোহনীয় (মুগ্ধকর) এমন কিছু পায় না। প্রেমিক ভক্ত, আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। তাঁদের কাছে অদ্বয়বোধানন্দই হল পরমসত্য। আপনবোধের মাধ্যমেই হয় তা স্বানুভবসিদ্ধ। তাঁদের কাছে অবিদ্যা-অজ্ঞানের কোনও প্রভাবই সিদ্ধ নয়। নিস্পৃহ স্বার্থশূন্য সর্বসমজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জীবনই হল সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁদের মাধ্যমে মানুষ স্বকল্পিত ব্যষ্টি কামাহত অজ্ঞানবদ্ধ জীবনের প্রভাবমুক্ত হয়ে আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিত্য অমৃত দিব্য জীবনের অধিকারী হয়।

আলোচ্য ঘটনাটির মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত উভয় জীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মগত অধিকার, সংস্কার, সাধ্য, যোগ্যতা, রুচি ও স্বার্থ হিসাবে কামনার পথ ধরে মানুষ সংসারে চলে। তারা সকলে আত্মবিস্মৃত, ভ্রান্ত ও অজ্ঞানবদ্ধ। তারা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর-আত্মার সত্য পরিচয় ও তাঁর দিব্য মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। তবে অজ্ঞানমুক্ত দিব্য মহামানবের শরণাগত হলে জীব তার সর্ব প্রতিবন্ধকস্বরূপ অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত হয়ে আপন দিব্য মুক্ত প্রবুদ্ধ

অমৃতস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাহিনিটির মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আপন দিব্য মুক্ত অমৃতস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে নির্দেশ করেছেন বিশেষ ভাবে।

২৫। ৬। ৬৮

১১

সত্য শিব সুন্দরকে দেখতে চাইলে জীবনে একটি আদর্শ ধরে চলতে হয়, জীবনের লক্ষ্যটিকে স্থির রেখে চলতে হয়। সেই জন্য মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাটিকে মিলিয়ে নিতে হয়।

মায়ের ইচ্ছা তাঁর সন্তান যেন ব্যক্তিবিশেষের কাছে অথবা বিশেষ কোনও স্থানে, সসীমের মধ্যে আবদ্ধ না-থাকে, সে যেন সর্বদা সর্বস্থানে এবং সর্ব অবস্থাতেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন বেশে মা সকলের কাছে আসেন। ভূমিকম্প, ঝড়, বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলে তাকেও মাতৃবোধে নিতে হয়। সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধকে অখণ্ডবোধে অভেদে মেনে সাধনা করাই হল সর্বোত্তম সাধনা। এই ভাবে পূর্ণ সত্যের উপলব্ধির জন্য সকলের সাধনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একজন সাধক বিশেষ নাম-রূপ অবলম্বন করে সাধনা করতেন। কিন্তু এই ভাবে বেশ কিছুদিন সাধনা করার পরেও তিনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। অবশেষে একদিন ভিন্ন মতপথের কয়েকজন সাধকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপ অবলম্বন করে সাধনা করতেন, কিন্তু কেউই সিদ্ধিলাভ করেননি।

তাঁরা প্রথম সাধকের কথা শুনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতপথের ও নাম-রূপের সাধনাই যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন এবং প্রথম সাধককে সেই সেই পথ অবলম্বন করে সাধনা করতে নির্দেশ দিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে তর্কের সৃষ্টি হল এবং প্রথম সাধকের মনে দ্বন্দ্ব ও সংশয় জাগল।

এমন সময় ঈশ্বরই এক পাগলের বেশে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বললেন —সব মতপথই সত্য। পরে সকলের কাছে সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধের সাধনার তাৎপর্য ব্যক্ত করলেন। ঈশ্বরকে সূর্যের সঙ্গে উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষ তাকে যে-নামেই ডাকুক, সকলে এক সূর্যের কথাই বলে এবং প্রত্যেকের ঘরের জানালা দিয়ে এক সূর্যের আলোই প্রবেশ করে। সেই রকম মানুষ যে নামেই ডাকুক এক ভগবানই তার মন-রূপ জানালা দিয়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের পরিচয় সম্বন্ধে পাগলের এই সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনে সকলের সংশয় ও দ্বন্দ্বের নিরসন হয় এবং প্রথম সাধক তার আপন সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করে পরিণামে সিদ্ধিলাভ করেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আসল কথা ভক্তের দেহ ও মনের ভাব অনুযায়ী ঈশ্বর তার কাছে প্রকাশিত হন। ভগবান বলতে গেলে শুধু একটিমাত্র রূপকে বোঝায় না, সমগ্রতাকে বোঝায়। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তিনি সর্ববস্তুর মধ্যে সমভাবে আছেন।

ভগবান নির্গুণ এবং সগুণ উভয়ই। দুই নিয়েই তিনি। জড়ও তিনি, চেতনও তিনি। সবকে নিয়ে এক, এই অর্থে অদ্বৈত। কাজেই সমস্ত রূপ-নাম-ভাব-বোধের মধ্যে একজনকেই মানতে হয়।

১০। ৭। ৬৮

১২

অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তি জীবদেহে জড়ীভূত হয়েই থাকে। সেই জন্যই তাকে কুণ্ডলিনীশক্তি বা আধারশক্তি বলা হয়। বিরুদ্ধ অবস্থা, ঘটনা ও সংঘাতে এই অনন্ত শক্তি জাগ্রত হয়। জেগে উঠেও প্রকাশের সুযোগের অভাবে আবার কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়ে। প্রকাশের ব্যাপক সুযোগ পেলে তা আপনাকে সুসংযত ভাবে ব্যক্ত করে। একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সাধনার দ্বারাই এর পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব। অসংযত ভাবে এই শক্তির ব্যবহার বিকৃত হয়ে যায়। তার ফলে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনের বিকার হয়। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরীয় ভাবধারায় এর সুসংযত বিকাশ ও ব্যবহার হয়। তখনই এই শক্তির পূর্ণ পরিচয় ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য জীবনে অনুভূত হয়। মহৎ উদার ভক্ত, সাধুসন্ন্যাসী, মুক্তপুরুষ প্রভৃতি হলেন অনন্ত শক্তির বিশেষ প্রকাশবিভূতি বা অভিব্যক্তি।

শক্তির যথার্থ ব্যবহার হলে তবেই জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি বিদেশি গল্প বলে তাঁর তত্ত্বার্থ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করলেন।

একজন লোক খুবই অলস প্রকৃতির ছিল, কোনও কাজকর্ম করত না। সে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকত। সকলে সেই জন্য তাকে ভর্ৎসনা করত এবং পাগল বলেই ভাবত। একদিন একজন তাকে বলল—তুই কি মাটি কোপাতেও জানিস না?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই জড়প্রকৃতির শান্ত লোকটির জেদ চেপে গেল মাথায়। সে একটি শাবল নিয়ে, যে পাহাড়ের নিচে তাদের বাড়ি, সেই পাহাড় কাটতে গেল। এই ভাবে সে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু পাহাড় কাটে। তৃষ্ণা পেলে ঝরনার জল পান করে এবং দিনান্তে বাড়ি এসে একবার খাওয়াদাওয়া করে।

এই ভাবে প্রতিদিন পাথর কাটার ফলে একদিন এমন হল যে, পাহাড়ের একটি বিরাট অংশ (slab) নিচে গড়িয়ে পড়ল। গ্রামের লোক পাগলের অদ্ভুত কাণ্ড দেখে এবং তার শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত পাহাড় কেটে পাগল শহর তৈরি করার সংকল্প করে এবং তা কার্যেও পরিণত করে।

এই গল্প থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, তার ভিতরে যে শক্তি জমা ছিল তা যথার্থ ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পূর্বে হয়নি। সুযোগ পেয়ে সেই শক্তি যখন আত্মপ্রকাশ করল তখনই তার দ্বারা এই বিরাট কর্ম সাধিত হল।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই হল অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির লীলায়িত রূপ। সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যেই এই শক্তির অস্তিত্ব ও প্রকাশ বর্তমান। প্রকাশের ক্রম ধরে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। শক্তির গতি, অভিব্যক্তি অনন্ত অনন্ত ভঙ্গিমায় নিজেকে ছড়িয়ে দেয়,

ব্যক্ত করে দেয়, আবার কোথাও তাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। বিশেষ বিশেষ আধার, অবয়ব, দেহ, আয়তন ও ক্ষেত্রের মাধ্যমে শক্তির প্রকাশবিকাশ ঘটে। আধারও শক্তি, আধেয়ও শক্তি; কারণও শক্তি, কার্যও শক্তি। এক অখণ্ড পূর্ণ শক্তি তার প্রকাশধারার ক্রমের মধ্যে অনন্ত অনন্ত ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হয় যখন, তখন পরস্পর প্রকাশের মধ্যে মানের তারতম্য অনুসারে ভেদ, পার্থক্য ও বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকাশের অন্তর্নিহিত কেন্দ্রকে বা মূলকে বাইরে থেকে দেখা ও বোঝা যায় না। শক্তির কেন্দ্রে শক্তি পূর্ণমাত্রায় নিহিত থাকে। প্রত্যেক দেহ-আধারে এই শক্তির কেন্দ্র বা মূল আছে। শক্তি স্বরূপত নিরাকার ও অদৃশ্য। শক্তির কার্য ও গতির মান ধরে তাকে ব্যবহার করা হয়।

শক্তির দু'টি দিক। এক দিকে সে অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যসত্তার সঙ্গে যুক্ত, অন্য দিকে বৈচিত্র্যময় গতি ও ক্রিয়া রূপে অভিব্যক্ত। মানুষের দেহে এই শক্তির প্রকাশ দ্বিবিধরূপে পাওয়া যায়— (১) জ্ঞানশক্তি এবং (২) ক্রিয়াশক্তি। জ্ঞানশক্তি মানুষের মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত রূপে প্রকাশ পায়। ক্রিয়াশক্তি দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণের কার্যরূপে প্রকাশ পায়। প্রথমটি মুখ্যপ্রাণ এবং দ্বিতীয়টি গৌণপ্রাণ। সমগ্র শক্তির নামই হল মহাপ্রাণশক্তি। সমগ্র সৃষ্টি তার প্রকাশবিভূতি। জীবদেহে এই শক্তি প্রথমে ক্রিয়া-শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ক্রমপর্যায়ে হতে থাকে।

শক্তির দু'টি কেন্দ্র। প্রথমটি মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে মূলাধার চক্রে অবস্থিত, অপরটি সহস্রার চক্রে অবস্থিত। এই দু'টি কেন্দ্রের মধ্যে আরও পাঁচটি কেন্দ্র আছে। নিম্নদিক থেকে তা যথাক্রমে—মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিমূলে মণিপুর, বক্ষে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধাক্ষ এবং ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞা। এগুলি এত সূক্ষ্ম যে, দেহ বিভাজন করে এদের পরিচয় জানা যায় না। কেবলমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে একাগ্র মনে সাধনার দ্বারা এদের দর্শন ও কার্যাদির সঙ্গে পরিচয় হয়। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে তাঁর নির্দেশে অনলস ভাবে ঐকান্তিক অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যমে সাধক জানতে পারে যে, সহস্রার কেন্দ্রে শক্তির তিন চতুর্থাংশ নিহিত থাকে বোধসত্তাকে আলিঙ্গন করে। আর তার এক চতুর্থাংশের তিন ভাগ থাকে মূলাধারে। আধারসত্তাকে অর্থাৎ চেতনার এক বিশেষ স্থিতিরূপকে জড়িয়ে তা কুণ্ডলীর মতো সর্পাকারে সুপ্ত থাকে। আর তার এক ভাগমাত্র জীবদেহে সক্রিয় থেকে জীবনকে চালায়। সহস্রারে স্থিত শক্তির নাম মহাকুণ্ডলিনী এবং মূলাধারে স্থিত সুপ্ত শক্তির নাম কুণ্ডলিনী। তার এক চতুর্থাংশ জীবসাধারণের মধ্যে সক্রিয় থেকে জীবনকে পরিচালনা করে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে। শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনভজনের মাধ্যমে মূলাধারস্থ সুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয় এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না নাড়িরূপে যে সুপ্ত পথ মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই পথে ঊর্ধ্ব মুখ হয়ে আরোহণ করতে থাকে। চলার পথে সুষুম্নার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কেন্দ্রে বা নাড়িচক্রগুলিতে এক পর্যায়ে আরোহণ করে

তথায় নিজেকে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করে পরিশেষে সহস্রারে উঠে তার তিন চতুর্থাংশ মহাকুণ্ডলিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেখানে পূর্ণ বোধসত্তা সদাশিব ঈশ্বর-ব্রহ্ম-আত্মার সঙ্গে অভেদে রতিসন্ধিযোগে একীভূত হয়ে যায়। অখণ্ড পূর্ণানন্দে সেখানে অবস্থান করে জীবনের যথার্থ সত্য অমৃত পূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপের উপলব্ধি নিয়ে নেমে আসে মূলাধারে। মাঝখানে অন্যান্য চক্রগুলিতে সেই উপলব্ধির জ্যোতিতে তাদের অনুরঞ্জিত করে, তদ্‌বোধে সঞ্চারিত করে মূলাধারে নেমে এসে কিছুকাল থাকে আবার ঊর্ধ্বমুখে সহস্রারে উঠে যায় উপলব্ধির স্মৃতি ধরে। এই ভাবে পুনঃপুনঃ আরোহণ ও অবরোহণ ক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র জীবনকে পরমাত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয়। তার ফলে সাধক গতানুগতিকতার ও অজ্ঞান-অবিদ্যার প্রভাবমুক্ত হয়ে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দিব্য অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাকে আর সাধারণ জীবদশা তথা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে ঘুরতে হয় না।

আলোচ্য গল্পটির মধ্যে নিষ্ক্রিয় মানুষটি সক্রিয় হয়ে কর্ম উন্মাদনায় মেতে উত্তরকালে যে নগরপত্তনে সমর্থ হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে তার সুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ ও তার স্বল্প প্রকাশবিকাশের জন্য, অর্থাৎ মণিপুর চক্র পর্যন্ত উত্থানের ফলশ্রুতিরূপে। মণিপুর চক্রে তার স্থিতি হয়নি বটে তবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা সামান্য উত্থানের ফলেই তার মধ্যে এক অনন্য শক্তির প্রকাশবিকাশ ঘটেছে। সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্রীয়জীবনে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যেই এ রকম কুণ্ডলিনীর জাগরণ, উত্থান ও প্রকাশবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। তার ফলে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাধারণ ধর্মজীবনে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানীগুণী শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। কুণ্ডলিনীর পরিক্রমা যদি পরিপূর্ণ না-হয় তবে জীবনের প্রকাশবিকাশ হলেও পূর্ণতা কখনওই সিদ্ধ হয় না।

কুণ্ডলিনীশক্তির বিজ্ঞানটি যোগ ও তন্ত্র বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এই বিজ্ঞানের মাধ্যমে সাধক জীবন্মুক্ত হন, পূর্ণতা এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। এই হল মানবজীবনের চরম গতি ও লক্ষ্য। কুণ্ডলিনীশক্তির বিজ্ঞান প্রসঙ্গে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ আরেকটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়টি সাধারণ সাধকজীবনের জন্য নয়। সাধারণ সাধক কুণ্ডলিনীর আরোহণ গতির বিজ্ঞান অবলম্বনে গুরু-ইষ্টের অনুগ্রহে ও স্বকীয় পুরুষকারের চেষ্টার মাধ্যমে সিদ্ধ হয়। অপরটি মহাকুণ্ডলিনীর স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত অবতরণ। তা ঘটে ঈশ্বরকোটি, ব্রহ্মকোটি পুরুষের জীবনে। তা সাধনসাপেক্ষ বিজ্ঞান নয়, স্বতঃসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধ পূর্ণসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞান। অতি দুর্লভ এই বিজ্ঞানসিদ্ধপুরুষ। তিনি স্বতন্ত্রপুরুষ, বিলক্ষণপুরুষ। সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ পুরুষদের থেকে এঁদের যে স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য ও বিশেষত্ব তা সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীব দুর্বোধ্য।

জীবনীশক্তির প্রকাশবিকাশের তাৎপর্যকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর স্বানুভূতির দৃষ্টিতে গল্পটি অবলম্বনে সংক্ষেপে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যক্ত করলেন।

১৬। ৭। ৬৮

১৩

ঈশ্বর সর্ব রূপ, নাম, ভাব ও বোধের মধ্যে রয়েছেন। তাঁকে একটি বিশেষ রূপ-নামের মধ্যে ধরলে চলবে না, কারণ তিনি সর্ব রূপময়, নামময়, ভাবময় ও বোধময়। তিনি সর্বত্র সর্বভূতে বিরাজমান। সুতরাং সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধ নিয়ে যে ভগবান তা-ই হল ভগবানের আসল পরিচয়। এই প্রসঙ্গকে যথার্থ ভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিম্নোক্ত গল্পটি বললেন।

এক ভক্ত খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করে কৃষ্ণ লাভের জন্য বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। কৃষ্ণের দর্শন না-পেলে আহার করবেন না এই সংকল্প নিয়েই তার সাধনা।

একদিন সেই ভক্ত স্নান করতে যমুনায় গেলেন। সেই সময় রাখালবেশে কৃষ্ণ যমুনার তীরে এসে ভক্তকে দেখিয়ে উপাদেয় সব খাবার খেতে থাকেন এবং মনের আনন্দে গাইতে থাকেন—

যারে তুমি খোঁজ মিছে অভিমান ও অহংকারে
কে কবে না-খেয়ে পেয়েছেন তাঁরে?

গানটি গেয়ে রাখালবেশী কৃষ্ণ চলে গেলেন। একটু পরে কৃষ্ণের নির্দেশে বালিকার বেশে বাধারানি একঝুড়ি ফল নিয়ে সেখানে এলেন এবং ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি আমার বৃদ্ধ পিতাকে দেখেছ? তার এখানে আসবার কথা ছিল।

ভক্ত বললেন—আমি তোমার বাবাকে দেখিনি।

বালিকা—ফলের ঝুড়িটি তোমার কাছে রাখ। আমি বরং বাবাকে খুঁজে নিয়ে আসি।

ভক্ত একটু রেগে তাকে বললেন—ফলেব ঝুড়িটি আমার কাছে রেখে যে বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছ তাতে আমার কী লাভ?

বালিকা—তোমার উপকার হবে। তুমি যা চাইছ তা-ই পাবে। আমার বাবা বলেছেন, এক ভক্ত কৃষ্ণকে দেখবার জন্য খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করেছে। ফলে তার শরীর দুর্বল হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হয়েছে এবং স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়েছে। এই অবস্থায় কৃষ্ণ এলেও তো সে দেখতে পাবে না এবং চিনতেও পারবে না। তার জন্যই বাবা এই ফলগুলি পাঠিয়েছেন এবং বাবা নিজে এসে তাকে খাওয়াবেন বলেছেন। কিন্তু বাবা তো এখনও এলেন না। আমি বাবাকে খুঁজে নিয়ে আসি। বালিকাবেশী রাধারানির কথা শুনে ভক্ত নিজের ভাববোধের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন কিন্তু ফলগুলি তিনি গ্রহণ করলেন না। ফলের ঝুড়ি রেখে পিতার খোঁজে বালিকাবেশী রাধারানি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধের বেশে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন—আমার মেয়ে যে ফলগুলি রেখে গিয়েছে তা তুমি খাওনি কেন?

ভক্ত—কৃষ্ণের দর্শন না-পেলে আমি খাব না।

বৃদ্ধ—কৃষ্ণকে দেখে তোমার কী লাভ হবে? তাঁকে দিয়ে যদি তোমার কোনও কাজ হয় তো আমাকে বল। আমি তাঁকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলব। কৃষ্ণ তো

নানা বেশেই আসতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণকে বিশেষরূপে দেখতে হলে তাঁকে কোন রূপে দেখতে চাও সেটা ঠিক করে নাও।

ভগবান সর্বদাই যে তোমাকে ধরে রেখেছেন সেই খবরটা জান না। তোমার আশেপাশে চার দিকে রূপে-নামে-ভাবে-বোধে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-মহাকারণে সর্বত্র ভগবান পরমাত্মা কৃষ্ণই রয়েছেন। কৃষ্ণ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

না-খেয়ে ভক্তের দৃষ্টিটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি তখন আবোল-তাবোল অনেক কথাই বৃদ্ধকে বললেন।

বৃদ্ধ তাকে ফলগুলি খেতে বললেন এবং সবল সতেজ হলে কৃষ্ণকে দেখতে পাবে, এই কথা বলে চলে গেলেন। ভক্ত ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে তাঁকে আর দেখতে পেলেন না।

বিষণ্ণ মনে সারাদিন নিজের কথা ভেবে ভেবে রাতে ভক্ত ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে কৃষ্ণঠাকুরের আদেশ পেলেন—কৃষ্ণের অনন্ত বেশ, অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম। সকালে উঠে প্রথমেই যাকে দেখবে তাকেই কৃষ্ণবোধে প্রণাম করবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভক্ত দেখতে পান এক মেথর মাথায় ময়লার বালতি নিয়ে চলেছে। তিনি ছুটে গিয়ে তাকে প্রণাম করতেই মেথরও প্রতিনমস্কার করার জন্য মাথাটা একটু নোয়াতেই ময়লাগুলি সব ভক্তের গায়ে পড়ে গেল।

ভক্ত চটে গিয়ে মেথরকে খুব গালাগালি করতে লাগলেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই মেথরের বেশে এসেছিলেন। ভক্তের মুখ থেকে গালাগালি শুনে ভগবান বললেন—মান থাকলে ভক্ত হওয়া যায় না এবং ঈশ্বরের দর্শনও পাওয়া যায় না। মানটা তাঁকে দিতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—শাস্ত্র পড়লেই হয় না। জীবনের মধ্যে তাঁকে ধরতে পারা চাই। বৃন্দাবনে সব বেশেই কৃষ্ণ ঘুরছেন, কিন্তু মনে একটুখানি সংশয় বা দ্বন্দ্ব থাকলে তাঁর দর্শন মেলে না।

গোপীদের অহংকার হয়েছিল এই ভেবে যে, তারাই শুধু কৃষ্ণকে ভালবেসে ভজনা করে। এই জন্যই কৃষ্ণকে হারাতে হয়েছিল। সকল রূপের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণকে দেখতে চেষ্টা না-করলে পরমাত্মারূপী কৃষ্ণকে দেখা যায় না। সর্ব রূপে-নামে-ভাবে-বোধে কৃষ্ণকে মানা হলে অখণ্ড কৃষ্ণের দর্শন হয়। তখনই সমগ্র বিশ্বভুবন সচেতন বৃন্দাবন হয়।

এই হল পরমাত্মদর্শন। এই পরমাত্মবোধই কৃষ্ণের সত্য পরিচয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা-কিছু সবই পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ। এই বোধ জাগ্রত না-হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণের সত্য দর্শন লাভ হয় না।

কালীয় বিষ হল সর্বগ্রাসী বিষ। এ বিষ না-ঢুকলে ভগবান লাভের ইচ্ছা জাগে না। এটাই হল বিরহ জ্বালা। ভক্ত যখন ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতাই কালীয় বিষ।

বিষের জ্বালায় চিত্ত যখন জর্জরিত হয় তখনই সে বিষমুক্তির উপায় খোঁজে। এ রকম অবস্থায় সদ্‌গুরুর দর্শন ও তাঁর বাণী কার্যকরী হয়। গুরুর মধ্যে ইষ্ট এবং ইষ্টের মধ্যে গুরু অভিন্ন ভাবে বিদ্যমান। কেবলমাত্র গুরুভজনের মাধ্যমেই পরম ইষ্ট তুষ্ট হন ও ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করেন। গোঁড়ামি অজ্ঞানের লক্ষণ। ঈশ্বর-আত্মার স্মরণ ভিন্ন সহজে এই গোঁড়ামি যায় না। ধর্মজগতে সাম্প্রদায়িকতা, মতবিরোধ ও গোঁড়ামি ধর্ম লাভের পরিপন্থী বা অন্তরায়। অসংযত চিত্ত ও মন নিয়ে ইষ্টসাধন হয় না। মলিন চিত্ত জানতে চায়, মানতে পারে না। অখণ্ড পূর্ণকে অর্থাৎ সদ্‌গুরু ও স্বানুভবসিদ্ধপুরুষকে জানতে গেলে কোনও দিনও কেউ জানতে পারবে না। তবে মানার মাধ্যমে উত্তম ফল লাভ করতে পারে। অখণ্ডকে জানা যায় না, মানা যায়। জানার অভ্যাসের মাধ্যমে অহংকার বাড়ে, মানার অভ্যাসের মাধ্যমে অহংকার পালায়। মানুষ জানতে জানতে অভিমানে অপরকে মানতে পারে না। সে বলে, 'জান আরও, জান আবও'। 'জান আরও, জান আরও' করতে করতে অহংকার-অভিমানে জানোয়ার হয়ে যায়, কিন্তু মানতে মানতে মাতোয়ারা হতে পারে না। 'মান তো হবে অমর, না-মান তো কর সমর।' 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই ইষ্ট লাভের সর্বোত্তম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের অধিকারী সবাই হতে পারে। তার জন্য বিশেষ কোনও বিদ্যার প্রয়োজন হয় না।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—তোমরা মানতে শেখ, মানতে শেখ। কী মানবে? রূপে-নামে-ভাবে-বোধে সব কিছুকেই আপনবোধে মান। আপনবোধে সবকে মানলে ভেদজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকে না। কৃষ্ণসাধক মানার বিজ্ঞান অবলম্বন না-করে জানার বিজ্ঞান অবলম্বন করতে গিয়ে বিড়ম্বনা ভোগ করলেন। কৃষ্ণকে কাছে পেয়েও চিনতে পারলেন না, অথচ তিনি কৃষ্ণভক্ত সেজে বসে আছেন। তিনি জানার বিজ্ঞান অবলম্বন না করে যদি মানার বিজ্ঞান অবলম্বন করতেন তবে কৃষ্ণ, রাধা সবাইকে চিনতে পারতেন।

১৬। ৭। ৬৮

১৪

অন্তরে প্রিয়বোধের স্বরূপই হল প্রেম। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে তার মূল্য দেওয়া যায়। যখন সবাইকে ঠিক ঠিক মূল্য দেওয়া হয় তখনই অ প্রেমের রূপ নেয়। নিত্য সমানবোধ বজায় রাখতে পারলেই প্রেমের আস্বাদন হয়। যদি তমোরজোগুণের দোষে কোনও রকম ভাবে তা ব্যাহত হয়, তাহলে প্রেমের বিকাশ হতে পারে না। মানুষকে শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ অনেক বড় করে তোলে, কিন্তু প্রেম পাগল করে দেয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিম্নোক্ত ঘটনাগুলির উল্লেখ করলেন।

(১) একদিন কোনও এক শহরে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হল, বিশেষ দিনে, বিশেষ স্থানে, বিশিষ্ট একজন ম্যাজিসিয়ান সন্ধেবেলায় ম্যাজিক দেখাবে। সেই কথা

শুনে গ্রাম থেকেও লোকজন আসতে লাগল। সেখানে প্রচুর ভিড় হল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল ম্যাজিসিয়ান অনুপস্থিত। উদ্যোক্তাগণ তখন এক ব্যায়ামবীরকে নিয়ে এল খেলা দেখাবার জন্য।

সে নানা রকম ক্রীড়া কৌশল দেখাতে লাগল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ রেগে উঠল ম্যাজিকের বদলে শারীরিক ক্রীড়া কৌশল দেখাবার জন্য। একজন দর্শকের ম্যাজিক সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না। সে ব্যায়ামের কৌশলকেই ম্যাজিক ভেবে খুব উৎফুল্ল হয়ে হলের বাইরে গিয়ে সবাইকে বলতে লাগল—ভিতরে অপূর্ব ম্যাজিক হচ্ছে। ফলে আরও অধিক সংখ্যক লোক সেখানে জমা হতে লাগল। ম্যাজিকের বদলে শরীরের কসরত দেখে কেউ তুষ্ট হয়ে, কেউ বা রুষ্ট হয়ে সেদিন বাড়ি ফিরল।

(২) আরেকবার এক জায়গায় একজন লোকের পিয়ানো বাজাবার কথা ছিল। কাজেই সেখানে বহু লোকজন উপস্থিত হল। কিন্তু রাস্তায় হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটায় সেই পিয়ানোবাদকের একটি হাত ভেঙে যায়, যার ফলে পিয়ানো বাজানো বন্ধ হয়ে যায়।

তখন সেই পিয়ানোবাদক হাত জোড় করে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল যে, হাতটা ঠিক হয়ে গেলে সে এক দিনের জায়গায় তিন দিন পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে।

(৩) কোনও এক বিশিষ্ট গায়কের বাড়িতে কয়েকজন নবাগত শ্রোতা এসে উপস্থিত হল। তারা গায়কের নাম শুনেছে কিন্তু গান শোনেনি। শ্রোতারা এসে দেখে গায়ক তার অনুরাগী ভক্তশিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আপন মনে তার প্রিয় সুরমণ্ডল নামক যন্ত্রটি টুং টাং করে বাজাচ্ছে এবং গুনগুন করে গান গাইছে।

নবাগত শ্রোতাদের মধ্যে একজন অনেকক্ষণ বসে গায়কের টুং টাং বাজনা ও গুনগুন সুর শুনে ভাবল, এটা এক অদ্ভুত সংগীত। সে আপন খেয়ালে, যাবার সময় দুইশত টাকা গায়কের সামনে রেখে তাকে বলল—আপনার গান শুনে বড় প্রীত হয়েছি। অনুগ্রহ করে আমার এই সামান্য প্রীতি উপহার গ্রহণ করুন। এই বলে লোকটি চলে গেল।

ঘটনাগুলি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষ তার স্বভাববশেই চলে। চিদাত্মার চিদাভাসে গড়া জীবজগৎ। চিদাভাস আবার ত্রিগুণাপ্রকৃতি যোগে সক্রিয় ও লীলায়িত হয়। সেই জন্য স্বভাবের মধ্যে ত্রিগুণের প্রভাব নানা ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত হয়। কারও মধ্যে তমোপ্রধান, কারও মধ্যে রজোপ্রধান, কারও মধ্যে সত্ত্বপ্রধান প্রকাশ এবং কারও মধ্যে একাধিক গুণের প্রভাব কার্যকরী হয় বলে পরস্পর মানুষের মধ্যে গুণভাব, শক্তি ও বোধের মিল অপেক্ষা অমিল ও ভেদ বা পার্থক্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। একবোধের বা সমবোধের প্রকাশ বড় দুর্লভ হলেও সম্ভব। গুণ অনুসারে হয় ভাব, তদনুরূপ হয় শক্তির অভিব্যক্তি। গুণভাবের স্বল্পতায় হয় শক্তির সমতা। তার ফলে বোধের অভিব্যক্তিতেও বিকার কমে। গুণভাবযোগেই স্ববোধের প্রকাশ স্বভাবের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়।

ত্রিগুণের ত্রিবিধ মল, যথা—তম-এর মল হল নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞানতা, নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি; রজ-এর মল হল গতিশীলতা, ক্রিয়াশীলতা, বিকার প্রভৃতি এবং সত্ত্বের মল হল চিদাভাসের সীমিত জ্ঞান ও অনুভূতি। এই ত্রিবিধ মলযোগে মানুষ আত্মার স্মৃতি অর্থাৎ সমবোধের বা একবোধের স্মৃতি ভুলে আছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। পরস্পর মানুষের মধ্যে ভাবনা ও ভেদজ্ঞানের কাবণ সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হল তিনটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। স্বভাবের ভেদজ্ঞান স্ববোধের দ্বারা নিরস্ত হয়। সমবোধের বা একবোধের ব্যবহার হয় আপনবোধে। আপনবোধের অভাবেই ভেদজ্ঞান অনুভূত হয়, আবার আপনবোধের সম্যক্ ব্যবহারের ফলে ভেদজ্ঞান থাকে না এবং অভেদজ্ঞান/আত্মজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

২১। ৭। ৬৮

১৫

সর্বজীবনই হল ঈশ্বরের লীলামাধ্যম। এই কথার মর্মার্থ/তত্ত্বার্থ জীবনেব মধ্যে আবৃত থাকে। সত্ত্বগুণ ও শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রাধান্যে অধ্যাত্মসাধনার গভীবে ঈশ্বরাত্মবোধের সম্যক্ উপলব্ধি হলে তা সবিশেষরূপে জানা যায়। জীবনের মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁর মহিমাকে ক্রমধারায় প্রকাশ করেন। যোগ্যতা বাড়ে জীবনে অন্তরাত্মার বিকাশের মাধ্যমে। ঈশ্বব-আত্মার স্বভাবশক্তি জীবের তথা মানুষের মধ্যে দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। একটি হল বুদ্ধিবৃত্তি এবং আরেকটি হল হৃদযবৃত্তি। যোগ্যতার মানের পূর্ণতা সাধিত হলে এই উভয় বৃত্তিব মহামিলন হয়। তখন হৃদয়ে সমবোধ, অখণ্ড একবোধের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হয এবং অন্তরে-বাইবে ভেদ বা পার্থক্য ভাববোধের লক্ষণ থাকে না।

যখন সাধকেব মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিব মহাযোগ সাধিত হয় তখন অভেদ অদ্বয়জ্ঞানের স্ফূর্তি হয়। অভেদ অদ্বযজ্ঞানে সচ্চিদানন্দবোধের স্বরূপ স্বানুভূতিরূপে প্রকাশ পায। স্বানুভবসিদ্ধপুরুষ দিব্য অদ্বয অমৃত জ্ঞানের অধিকারী বলে সমগ্র জীবনের মধ্যে তিনি ঈশ্বরীয় লীলা নানা ভঙ্গিমায় আস্বাদন করেন। তখন স্বানুভূতির আলোকে তিনি বলেন—

বোধসাগরে বোধের লাগিয়া
খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া।
　　জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য সাজে
　　অবিরাম চলে বোধ খেলিয়া।।
বোধের সংসারে বোধের ঘরে
ওঠে ভাসে ডোবে বোধ বোধের তরে।
　　রূপ-নাম-ভাবে বোধ যুক্ত হইয়া
　　করে প্রকাশ বোধের স্বরূপ বোধ দিয়া।।

স্বভাবে মাতিয়া নাচিয়া গাহিয়া
সুখে দুঃখে হাসিয়া কাঁদিয়া।
পরস্পরে মিলিয়া বোধের অভিনয় করিয়া
খেলা শেষে মিলে এসে শান্ত হইয়া।।

খেলার শেষে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরের মধ্যেই সকলে আছে এবং সকলের মধ্যে এক ঈশ্বরই আছেন। তাঁর বাইরে কেউ নেই। তিনি নিজেকে বৈচিত্র্যরূপে সৃষ্টি করেছেন খেলবার জন্য, নিজেকে নিজে আস্বাদন করার জন্য। প্রেমময় সচ্চিদানন্দঘন ভগবান প্রেমের আবেশে আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে নিজের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশই সৃষ্টি।

সৃষ্টি হল তাঁর প্রেম ও ভালবাসার অভিব্যক্তি। কাজেই সৃষ্টির পরিপূর্ণ ধ্বংস কখনও সম্ভব নয়। নিজেকে নিজে আস্বাদন করার জন্য এবং জানবার জন্য নিজের ভিতর থেকেই তিনি বহু সৃষ্টি করেছেন।

এক পাগলের সঙ্গে ভগবানের খুব ভাব। একদিন পাগল ভগবানকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি নিজেকে এ রকম ভাবে বহুরূপে সৃষ্টি করে, বৈচিত্র্যরূপে প্রকাশ করে কেন এত দুঃখকষ্ট পাচ্ছ?

ভগবান বললেন—কী করলে ভাল হত বল দেখি। এই সব সৃষ্টি যদি না-করতাম তবে তুমিও তো আমার সঙ্গে এ রকম ভাবে কথা বলতে পারতে না। আর তা ছাড়া আমি যেমন দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করেছি তেমন সকলের দুঃখকষ্ট দূরও করে থাকি। আবার তোমার মতো পাগলের মধ্যে দিয়ে তাদের কত রকম জ্ঞানের কথা, অখণ্ড এক-এর কথা আমি-ই বলি।

পাগল—তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি কোনটা?

ভগবান—আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল পাগল, যারা শুধু আমাকে নিয়েই থাকে।

পাগল—এবার তবে তোমার মহিমা তুমিই বল, আমি শুনি।

তখন ভগবান একটি একটি করে ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজেই প্রশ্ন করলেন এবং নিজেই তার উত্তর দিলেন। ভগবান বক্তব্যের আদি-মধ্য-অন্তে তাঁর নির্গুণ-সগুণ স্বরূপতত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে পাগলের অন্তর্বোধ ভগবৎ সত্তার সঙ্গে মিশে গেল।

ভগবান তখন সেই পাগলকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন পাহাড়ের উপর দিয়ে। সেই সময় এক যোগী দেখতে পেলেন এক দিব্যমূর্তি হিমালয়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন কাঁধে মৃতদেহ নিয়ে। এই দৃশ্য দেখে সেই যোগী এবং আরও কয়েকজন সাধক তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করতে না-পেরে নিবৃত্ত হল। শুধুমাত্র তিনজন পাগল শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারল।

এই তিনজন পাগল নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল—দেখ, এই দিব্য জ্যোতির্ময়-পুরুষ একজন পাগলকে শুধু নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে কারওকে কেন নিয়ে গেলেন না?

সেই মুহূর্তে সেখানে দৈববাণী হল—তোমাদের যখন সময় হবে তখন তোমাদেরও নিয়ে যাব। তার পরেই এই তিনজন পাগল দেখতে পেল একটি জ্যোতির্ময় দেহের মধ্যে সেই পাগলের দেহ মিশে গেল। তখন তিনজন পাগল স্তব করতে লাগল—

"ত্বং হি কারণং কারণানাং পরাগতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
শরণাগতিঃ পরাভক্তিঃ পরাজ্ঞানং বৈরাগ্যং পরাশান্তিঃ
পূর্ণানন্দঃ পূর্ণামৃতং পূর্ণ প্রেমস্বরূপং ত্বমেকং নিত্য শরণম্।
নমস্তে পরমব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে নমস্তে পরমতত্ত্বায়
গুরোর্গুরুঃ পরমগুরুঃ পরাৎপরং গুরু ইষ্টানাং ইষ্টঃ পরম ইষ্টঃ
আদিরাদেঃ মধ্যস্য মধ্যম্ অন্তস্য অন্তঃ নিত্যস্য নিত্যম্
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সগুণায় নমো নমঃ।
সর্বরূপায় নমো নমঃ সর্বনাম্নে নমো নমঃ
সর্বভাবায় নমো নমঃ সর্ববোধায় নমো নমঃ।।"

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এঁরা সব পাগল, এঁরাই তত্ত্বজ্ঞ। সমস্ত তত্ত্ব দিয়ে গেলেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞ হন তিনি সত্যি সত্যিই পাগল। তত্ত্বজ্ঞ না-হলে কেউ পাগল হয় না। এই সব পাগলের ব্যবহার বড় অদ্ভুত। এ জগতে পাগল ছাড়া কেউ তাঁদের ভালবাসতেও পারে না।

কারও জীবনে যদি এ রকম পাগল হবার সুযোগ আসে তবে সে-ই হয় সত্যিকারের ভাগ্যবান। তা না-হলে পৃথিবীতে আর এমন কোনও বস্তু বা শক্তি নেই যার সাহায্যে মানুষের ব্যথা, দুঃখকষ্ট, অভাব দূর হয় এবং প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় বা প্রাণের অতৃপ্তভাব ও অশান্তভাব তৃপ্ত ও শান্ত হয়। জগৎকে ভালবাসেন বলে ভগবান নিজেই পাগলের বেশে এসে জগৎকে রক্ষা করেন। পাগলদের মাধ্যমেই তাঁর মহৎ দান ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি প্রাণসত্তাকে তিনি নরক থেকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ প্রত্যেককে আপনার ঘরে, স্বরূপের ঘরে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে বা তাঁর রাতুল চরণে অর্থাৎ নিজের মধ্যেই তাকে আপনবোধে মিলিয়ে নেন।

এঁরাই হলেন জগদ্‌গুরু, সমগ্র বিশ্বের নিঃস্বার্থ বন্ধু, কাঙালের ঠাকুর। প্রাণের কী বেদনা, কী অভাব তা এঁরাই ভাল বোঝেন। সেই জন্য এঁরা ওষুধের ব্যবস্থাও এমন ভাবে দেন, যে ওষুধের কখনও মিশ্রণ হয় না। তাঁদের চরণে একটি প্রণাম করলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেই তা পৌঁছায়।

এঁদের কেউ প্রণাম করলে এঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেন—তোমার জিনিস, তোমার প্রণাম তুমি গ্রহণ কর। তাঁরা নিজেরা কখনও প্রণাম নেন না। যাঁর বস্তু তাঁর কাছেই সমর্পণ করে দেন।

এঁদের যা-কিছু প্রয়োজন সব ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। পূর্ণ সমর্পণের পরে ভক্ত যদি পাগল হয় তবে তার ভার আর নিজেকে বহন করতে হয় না, নিজের জন্য কোনও চিন্তাও করতে হয় না। স্বয়ং ভগবানই তখন তার ভার বহন করেন। ভক্ত নিজে শুধু ঈশ্বরের নামে ডুবে থাকে।

এঁদের পাগল বলার কারণ—গোল বস্তু যেমন সর্বত্র গড়িয়ে যেতে পারে, নিজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, নিজের ভার নিজে সামলাতে পারে না, সেই রকম এঁদেরও নিজের দেহরক্ষার জন্য কিছুই করতে হয় না। এঁরা সর্বত্রই সর্বদা সমান অবস্থাতেই থাকেন। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর সর্বত্রই আছেন, সর্বস্থানই মায়ের কোল—এই তত্ত্ব তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। যত রকম আঘাত, ঝড়ঝঞ্ঝা এসে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করুক, তাঁর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ভগবানই আছেন—এই বোধেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গল্পের অন্তর্নিহিত রহস্য গল্পের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যারা মন দিয়ে গল্পটি শুনেছে তারাই সেটা বুঝতে পারবে। তবু সে প্রসঙ্গে যেটুকু বলার দরকার তা হল, এখানে তত্ত্বকথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেষণ করা হয়েছে। গল্পগাথা, উপমার মাধ্যমে তা যখন প্রকাশ করা হয় তখন তা সহজবোধ্য হয়, সহজে লোকে নিতে পারে। পাগলের অথবা ভগবানের প্রসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গকালে যে-ভাবে প্রকাশ হয় তার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংসারে সকলেই কোনও না কোনও ভাবে পাগলের পর্যায়ে পড়ে। ভাবে গড়া মানুষ ভাবের বিকারে চলে। ভাবের বিকারে মানুষের ভিতরে পাগলামি প্রকাশ পায়। কেউ ভাবে পাগল, কেউ অভাবে পাগল, কেউ বা রোগ-শোকে ভুগে পাগল। স্বভাব-পাগল তো সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া কেউ না-পেয়ে পাগল, কেউ পেয়ে পাগল, কেউ চেয়ে পাগল, কেউ না-চেয়ে পাগল, কেউ অর্থের পাগল, কেউ বিদ্যার পাগল, কেউ নাম-যশ-খ্যাতির পাগল, কেউ ভোগে পাগল, কেউ ত্যাগে পাগল, কেউ বিদ্যা-বুদ্ধিলাভে পাগল, কেউ ভক্তির পাগল, কেউ শক্তির পাগল, কেউ জ্ঞানের পাগল, কেউ বিজ্ঞানের পাগল, কেউ ঈশ্বরপ্রেমে পাগল, কেউ বা ঈশ্বর লাভে পাগল। সমগ্র জগৎই একটি পাগলা গারদ। এক পাগল আরেকজনকে পাগল বলে। পাগল কিন্তু নিজেকে পাগল বলে না, অন্যকে বলে। প্রত্যেক পাগলের পাগলামির ধারা আলাদা। কোনও পাগল নাচে-গায়, কোনও পাগল হাসে-কাঁদে, কোনও পাগল হাততালি দিয়ে বেড়ায়, কোনও পাগল বকেই যায়, কোনও পাগল চুপ করে শোনে, আবার কোনও পাগল নিজের মধ্যে নিজে বুঁদ হয়ে থাকে। কোনও পাগল আবার বলে—

'আমার মা পাগল বাবা পাগল
পাগল পাড়ার ভগ্নি ভাই
জগৎ জুড়ে সবাই পাগল
আমি কোন পাগলের মন জোগাই।।'

কোনও পাগল বলে, ঈশ্বর এক মহাপাগল। তাঁর পাগলামির লক্ষণ হল সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি। কোনও পাগল বলে, সবাই এক ঈশ্বর-পাগলের প্রতিমূর্তি। আবার কোনও পাগল বলে, আমিই সেই মহাপাগল। যথার্থ জ্ঞানী-যোগী-ভক্ত তো এক অর্থে পাগল। সবই এক মহা আমি-পাগলের পাগলামি। সুতরাং পাগলই বক্তা, পাগলই শ্রোতা, পাগলই কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা, পাগলই সর্বদেবদেবী, ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম পরম। পরম পাগলের তত্ত্ব পাগল জানে, পাগলই মানে। সেই পাগলের যথার্থ পরিচয় গল্পটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। যে বুঝবে সেও পাগল, যে না-বুঝবে সেও পাগল। ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম পাগলের কথা ফুরাল আপাতত।

২৫। ৭। ৬৮

১৬

অনুরাগের পথে রাধার মতো সকলকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে কখন তিনি আসবেন। বলতে হবে একটা দিনের শেষে—মাগো, আমার বোধহয় ত্রুটি হয়ে গিয়েছে, সেই জন্য তোমার সঙ্গে মিলন আজও হল না। তখন নিজের ত্রুটি সংশোধনের প্রতি সচেতন হওয়া যায়। প্রত্যেকের ত্রুটি হল, নিজের মতো করে চাওয়া। তাঁর মতো নিজেকে তৈরি করা হল প্রেমভক্তির লক্ষ্য। সেই প্রাণের ঠাকুর, যে যেমন ভাবেরই সাধক হোক, সর্বদা তাব কাছেই ইন্দ্রিয়গোচর হন। ভক্ত ভগবানকে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের মধ্যে দেখতে চায়। কেউ যদি নামের মধ্যে থাকে তবে সে প্রার্থনা করে—হে প্রাণময়, তুমি তোমার এই আমি-র কাছে প্রেমের বেশে উপস্থিত হও। ভগবান ভিখারির বেশে, পাগলের বেশে বা বাঘের বেশে অথবা যে কোনও একটি রূপ ধারণ করে ভক্তের কাছে আসতে পারেন। সর্ববেশকে বা সর্বরূপকে ঈশ্বরের নামে গ্রহণ করা সম্ভব হলে ভগবৎ প্রেম পূর্ণ হয়েছে বুঝতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

দুই সাধু ছিলেন। একজন জীবজগতের সর্বরূপের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করতেন। সর্বরূপে, সর্বনামে, সর্বভাবে সত্যের উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল।

একদিন একটি বাঘ এসে তাঁকে ধরল। অন্য সাধুটি দেখলেন যে, সেই সাধুটি নির্বিকার চিত্তে বাঘকে নিজ ইষ্টজ্ঞানে গ্রহণ করে সানন্দে নিজেকে তার কাছে নিবেদন করে বলছেন—প্রভু, তুমি যে আমার এই দেহটি তোমার প্রয়োজনে গ্রহণ করেছ তাতে আমি তৃপ্ত হয়েছি। বাঘ যখন তাঁকে খাচ্ছে তখন সাধু বাঘকে ইষ্টজ্ঞানে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—প্রভু, তুমি আমাকে খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছ তো? তুমি তৃপ্ত হও তাতেই আমি খুশি।

অন্য সাধুটি তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ও উপলব্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এই যে তাঁর সর্ববেশে, সর্বরূপে, সর্বনামে ইষ্টদর্শন অর্থাৎ তাঁর কাছে সবই বিশ্বমূর্তির বা সত্যমূর্তির প্রকাশ—এই তন্ময়তার ফলে সত্যই বাঘের মধ্যে অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপ ভগবান প্রকাশিত হলেন এবং সাধুকে তাঁর করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রকাশ করে তাঁকে পূর্ণ করে স্বস্বরূপে একীভূত করে নিলেন।

অপর সাধুটি এই অভিনব দৃশ্য দেখতে দেখতে সঙ্গী সাধুর মূর্তির মধ্যেই তাঁর ইষ্টের অপরূপ দর্শন পেয়ে নিজেও মহাসিদ্ধি লাভ করলেন এবং প্রেমভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাসের মহিমার সত্য পরিচয় বিশ্বে প্রচার করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গতানুগতিক ধর্মশিক্ষার দ্বারা মানুষ ধর্মজগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। তার ধর্মচর্চার সর্বাংশেই স্বকল্পিত ভাববোধের প্রাধান্য দিয়েই সে তার ধর্মচর্চার বা সাধনার ফল মিলাতে চায়। তাতে কিছু মিল খুঁজে পেলে সে উৎফুল্ল ও খুশি হয় এবং অপরকে সে সেই কথা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু সেই ভাববোধের সঙ্গে তার স্বভাবের দিব্য রূপায়ণ হয় না।

জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফল অনুসারে শাস্ত্রকথার সাহায্যে অনেকে ধর্মলাভের চেষ্টা করে। ধর্মগত সুকৃতি ও সুসংস্কারের প্রভাব না-থাকলে তার ধর্মচর্চা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু সুকৃতি ও সুসংস্কার জাত গোঁড়ামি ও অভিমান সদ্‌গুরুর অনুগ্রহলাভের ফলে শুদ্ধ হলে সাধক যথার্থ ধর্ম লাভের যোগ্য হয়। যথার্থ ধর্ম হল 'সুধর্ম' অর্থাৎ আত্মবোধ। সেই সঙ্গে তার তীব্র ব্যাকুলতা ও উত্তম পুরুষকারের প্রয়োগে স্বল্পকালের মধ্যেই সে দিব্য গুণভাব ও শক্তি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। তার পক্ষে পরমতত্ত্ব লাভের অন্তরায় বিশেষ থাকে না। অধ্যাত্মসাধনার পূর্ণ অবস্থায় উত্তম অধিকারী সাধকের স্বভাবের দিব্য রূপায়ণ হয় এবং তার ফলে দিব্যদর্শন ও দিব্যানুভূতি লাভ হয়। তার দ্বারা অভিষিক্ত সাধক পরমসিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধ সাধকদের মধ্যে দিব্যভাববোধের অনুভূতি প্রকাশ পেলেও পরম তত্ত্বস্ফূর্তি সবার মধ্যে হয় না। তত্ত্বজ্ঞপুরুষের সাধন ও সিদ্ধি স্বতন্ত্র। অন্তরে ইষ্টস্ফূর্তি ও ইষ্টদর্শন অনেক সাধকেরই হয়, কিন্তু তত্ত্বস্ফূর্তি ও তত্ত্বদর্শন অতি দুর্লভ, অতি বিরল। যাঁদের মধ্যে তা হয় তাঁরা স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁদের মধ্যে প্রকৃতিজাত দেশ-কাল ও কার্য-কারণের ভেদ আদৌ থাকে না। দ্বৈতভাবের সাধনা ও সিদ্ধি এবং অদ্বৈতভাবের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে যে পার্থক্য তা তত্ত্বদর্শীর কাছে অবান্তর। তত্ত্বজ্ঞপুরুষের মহাবাণী হল 'All Divine for All Time, as It Is'—অদ্বয় অখণ্ড একবোধে, সমবোধে, আপনবোধে সব 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল তাঁর স্বভাব।

গল্পটির মধ্যে দ্বৈত ভাববোধ ও অদ্বৈত ভাববোধের রহস্য ব্যক্ত হয়েছে এবং পরিশেষে 'নিত্যাদ্বৈত'-এর তত্ত্বটিও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাঠকের কাছে যাতে তা গ্রাহ্য হয় সেই জন্য গল্পের তাৎপর্য সংক্ষেপে প্রকাশ করলেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

১। ৮। ৬৮

১৭

মনই মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও ঐক্যের কারণ। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের মানুষ আপন আপন মনোজাত প্রকৃতির বশে সংসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে রত হয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্মের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার মান আবার প্রত্যেকের স্বভাবপ্রকৃতির ভেদের কারণ।

প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ, রুচিভেদে কর্মের পার্থক্য এবং কর্মভেদে গুণ, শক্তি ও অভিজ্ঞতার মানের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তরের স্বভাব বা মন ধর্ম-অধর্ম, ভাল-মন্দ, পুণ্য-পাপ, সৎ-অসৎ প্রভৃতির কারণ এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জ প্রাণের কর্মের মাধ্যমে মনের ভেদদৃষ্টি বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টির কারণ।

স্বভাবপ্রকৃতি অনুরূপ জীবের আচরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে, বলছি শোন——শ্রান্ত ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এক গরিব সৎ ব্রাহ্মণ পথপ্রান্তে এক বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নেয়। সেই বৃক্ষের অনতিদূরে সে একটি কুয়ো দেখতে পায়। জলতেষ্টায় কাতর সেই ব্রাহ্মণ জলপানের নিমিত্ত কুয়োর কাছে উপস্থিত হয়ে তার মধ্যে গোলমাল ও কলরব শুনতে পায়। কুয়োর মধ্যে একটি বাঘ, একজন মানুষ, একটি বাঁদর ও একটি বিষধর সাপ ব্রাহ্মণের নজরে পড়ে। এদের দেখে সে অবাক হয়ে ভাবে যে, কী করে এরা একসঙ্গে এই কুয়োর মধ্যে পড়েছে! ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবপ্রকৃতির চারটি জীবের মধ্যে শত্রুতা ও খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের অনিষ্ট না-করে বাঁচবার জন্য সকলেই সমান ভাবে চেষ্টা করছে। ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে সকলেই সমবেত ভাবে তাদের উদ্ধারের জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়।

চারটি প্রাণীই দীর্ঘকাল অভুক্ত, জলে সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়ে দুর্বল ও মৃতপ্রায়। সৎ ও উদার প্রকৃতির ব্রাহ্মণ তাদের কাতর প্রার্থনা শুনে ভেবেচিন্তে তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। সে লতাপাতা দিয়ে দড়ি বানিয়ে, নিজের গায়ের চাদর ও বৃক্ষশাখার সাহায্যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে একে একে তাদের কোনও রকমে কুয়ো থেকে তোলে। গায়ত্রীমন্ত্র পুনঃপুনঃ জপ করে ও ইষ্টদেব নারায়ণকে স্মরণ করে প্রথমে ভয়ে ভয়ে সে বাঘকে উদ্ধার করে। ব্রাহ্মণের কৃপায় প্রাণে বেঁচে বাঘ কৃতজ্ঞ চিত্তে ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেবার কালে তার এই উপকারের জন্য তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় যে, বিপদকালে তাকে স্মরণ করলে সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। বাঘের পরে সাপ, তারপর মানুষ ও পরে বাঁদরকে সে উদ্ধার করে।

ব্রাহ্মণের কৃপায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে অপর তিনটি প্রাণীও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বিদায়কালে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বিপদকালে স্মরণমাত্র সকলেই তার সাহায্যার্থে উপস্থিত হবে।

মানুষটি তার পরিচয় দিয়ে বলে যে, সে স্বর্ণকার। সে শহরে বাস করে ও কারবার করে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় যে, প্রয়োজনকালে বিনা পারিশ্রমিকে সে ব্রাহ্মণের অলংকারাদি তৈরি করে দেবে। প্রাণ পেয়ে মানুষটি শহরের দিকে যায় এবং বাঘ, বাঁদর ও সাপ জঙ্গলে যথাস্থানে ফিরে যায়।

অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বহু স্থান ঘুরে নিষ্ফল হয়ে অভাবের তাড়নায় ব্রাহ্মণ খুব কষ্টেই দিনযাপন করতে থাকে। কয়েকদিন পর সে অর্থ উপার্জনের জন্য দূরদেশে যাত্রা করে। যেতে যেতে সে এক গভীর বনে প্রবেশ করে এবং রাতে গাছের উপরে উঠে

রাত কাটায়। অভুক্ত ও ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ পরের দিন সকালে পথ চলতে না-পেরে গাছের নিচে বসে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে থাকে। হঠাৎ বাঁদরের কথাটি তার মনে পড়ে, যাকে সে কিছুদিন আগে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেছিল। বাঁদরের কথা ভাবতে ভাবতে সামনে গাছের ডালের উপরে সে বাঁদরটিকে দেখতে পায়। বাঁদরকে দেখে সে তার ক্ষুধার কথা জানায়। তার কথা শুনে অল্প সময়ের মধ্যেই বাঁদরটি কতগুলি টাটকা ফলমূল এনে দেয় এবং আবার দেখা হবে বলে জানিয়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে চলে যায়। বাঁদরের দেওয়া ফলমূল খেয়ে তখনকার মতো ব্রাহ্মণ সুস্থ হয় এবং অবশিষ্ট ফলমূল সঙ্গে নিয়ে সে বনের পথে চলতে থাকে।

ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। বাঁদরের কথা ভাবতে ভাবতে বাঘের কথা তার মনে পড়ে, কিন্তু গভীর বনে ভয়ে বাঘকে সে স্মরণ করতে সাহস পেল না। বনপ্রান্তে এসে বাঘের কথা বারবার তার মনে হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপরিচিত বাঘটি তার সামনে উপস্থিত হয়। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ তার ইষ্টমন্ত্র ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে থাকে। কৃতজ্ঞ চিত্তে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে বাঘটি ব্রাহ্মণের কাছে এসে পোষা কুকুরের মতো প্রণাম জানায় এবং উপকার করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। তখন ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে তার দুঃখদুর্দশা ও অভাব-অনটনের কথা জানায়। সব কথা শুনে বাঘ ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে বলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। দিনকয়েক আগে এক শিকারিবেশী রাজকুমারকে মেরে বাঘটি যে স্থানে তাকে খেয়েছিল সেখানে রাজকুমারের অঙ্গের অলংকারাদি পড়েছিল। বাঘটি সেই স্থানে গিয়ে রাজকুমারের অলংকারাদি ব্রাহ্মণকে এনে দেয়। বহুমূল্য রত্নখচিত অলংকারাদি পেয়ে ব্রাহ্মণ প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু বাঘের কথায় আশ্বস্ত হয়ে সে সেগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই অলংকারাদি বিক্রি করে সে বহু অর্থের অধিকারী হবে এবং তার দারিদ্র ঘুচে যাবে—এই কথা জানিয়ে বাঘ তাকে প্রণাম করে যথাসময়ে আবার দেখা হবে বলে গভীর জঙ্গলে চলে যায়।

বহুমূল্য অলংকারাদি সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ তখন শহরে এসে পূর্বপরিচিত স্বর্ণকারের সন্ধান করে। এদিকে শিকারিদল রাজকুমারকে হারিয়ে রাজ্যে ফিরে এসে রাজাকে জানায় যে, রাজকুমারকে বাঘে খেয়েছে। রাজকুমারের শোকে রাজা ম্রিয়মাণ হয়ে কোনও মতে রাজকার্য চালান। রাজ্যময় তখন এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

ব্রাহ্মণের কাছে রাজকুমারের নামাঙ্কিত রত্নখচিত বহুমূল্য অলংকারাদি দেখে স্বর্ণকার তাকে চোর মনে করে এবং রাজার কাছে তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে ভাল পুরস্কার পাবে, এই আশায় তাকে রাজার কাছে নিয়ে যায়। ব্রাহ্মণের কাছে রাজকুমারের বহুমূল্য অলংকারাদি পেয়ে ব্রাহ্মণকেই রাজপুত্রের হত্যাকারী ভেবে রাজা তাকে বন্দি করে রাখেন এবং স্বর্ণকারকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে বিদায় করেন। ইতিমধ্যে রাজা ব্রাহ্মণকে শূলবিদ্ধ করার দিন স্থির করে তা ঘোষণা করে দেন। নির্দোষ ব্রাহ্মণ এ কথা জানতে পেরে কারাগারে বসে তার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে ভগবানের কাছে করুণ

ভাবে মিনতি জানায়। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় যে, সৎ ভাবে জীবনযাপন করার ফলে তার এত দুর্গতি, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুদণ্ড পেতে হল। ভগবান যেন এ সবের বিচার করেন। সহৃদয় ভগবান ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনে তার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাকে পূর্বপরিচিত সাপটির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। একান্ত মনে ব্রাহ্মণের সাপটির কথা স্মরণ হওয়ামাত্র পূর্বপরিচিত সাপটি ব্রাহ্মণের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ সবিস্তারে তাকে তার বিপদের কথা জানায়। তা শুনে সে ব্রাহ্মণকে বলল—মানুষ সাপকে সবচেয়ে খল ও কুটিল বলে মনে করে অথচ মানুষের কাছে মানুষই হল সর্বাপেক্ষা অকৃতজ্ঞ এবং বড় শত্রু। উপকারীর উপকার বিস্মৃত হয়ে তার সর্বনাশ করতে মানুষ একটুও দ্বিধা করে না। তার প্রমাণ ব্রাহ্মণের কাছে উপকারপ্রাপ্ত অকৃতজ্ঞ স্বর্ণকার।

পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে সাপটি কী ভাবে ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করবে তা তাকে বলে দেয়। সাপটি রাজার একমাত্র যুবতী কন্যাকে দংশন করবে এবং তার জীবনরক্ষার্থে একটি ওষুধ ব্রাহ্মণকে দিয়ে বলল যে, বিশেষ শর্তে ব্রাহ্মণ রাজকুমারীকে বাঁচাবে। সেই শর্ত হল স্বর্ণকারের যথার্থ বিচার এবং ব্রাহ্মণের দারিদ্র মোচন। সাপের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হয়ে তন্নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে বিষধর সর্পদংশনে রাজকুমারীর মরণাপন্ন অবস্থা। সেই জন্য রাজ্যে হুল-স্থুল পড়ে যায়। চার দিকে রাজা চিকিৎসক, বৈদ্য, ওঝা ডেকে পাঠান, কিন্তু কেউই রাজকুমারীকে বিষমুক্ত করতে পারে না। একমাত্র রাজপুত্রকে হারিয়ে রাজকুমারীর মুখ চেয়ে রাজা কোনও মতে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তাকেও হারাবার ভয়ে ও শোকে রাজা পাগলের মতো হলেন।

রাজা রাজকুমারীর প্রাণরক্ষককে অর্ধেক রাজ্য দান করার শর্ত চার দিকে ঘোষণা করে দেন। এই সংবাদ শুনে কারাগারে বন্দি ব্রাহ্মণ কারাগার রক্ষীকে ডেকে বলে যে, রাজকুমারীর প্রাণ বাঁচাতে পারে এমন ওষুধ তার জানা আছে। রাজা রক্ষীর মাধ্যমে এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠান। ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে জানাল যে, সে রাজকুমারীকে এক বিশেষ শর্তে বাঁচিয়ে দিতে পারে। রাজকুমারীকে বাঁচিয়ে দিলে রাজা তার অর্ধেক রাজত্ব ব্রাহ্মণকে দেবে—এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দৃঢ় ভাবে বলল—মানুষকে আমি আর বিশ্বাস করি না, কারণ মানুষকে বিশ্বাস করার ফলে বিনা অপরাধে আজ আমি কারারুদ্ধ ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। ব্রাহ্মণের মুখে স্বর্ণকারের কথা শুনে রাজা স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠান। ব্রাহ্মণের সামনে স্বর্ণকারকে প্রশ্ন করায় স্বর্ণকার প্রথমে প্রসঙ্গটি বিকৃত ভাবে বলার চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণ রাজাকে বলল—আপনি প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই স্বর্ণকারের বিচার আপনাকে করতে হবে। রাজা স্বর্ণকারের প্রাণদণ্ডের বিধান দেওয়াতে ব্রাহ্মণ তাকে ক্ষমা করে দিতে বলল এই শর্তে যে, সে যদি আবার কখনও মিথ্যা আচরণ করে তখন তার শাস্তি রাজাকে পরিপূর্ণ ভাবে দিতে হবে। স্বর্ণকার প্রাণরক্ষা পেয়ে তার স্বভাবসুলভ স্বার্থবুদ্ধিবশত স্বর্ণালংকার বিক্রি করতে আসা অপর এক গরিব ব্রাহ্মণকে পুরস্কারের লোভে রাজকর্মচারীর হাতে

সঁপে দেয় এবং এর ফলে তার শাস্তি হয়। শাস্তি গ্রহণের পূর্বে রাজার ভাবী জামাতা ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। সেই গরিব ব্রাহ্মণের দুর্গতির কথা শুনে রাজার ভাবী জামাতা (ব্রাহ্মণ) খুবই দুঃখিত হল। রাজাকে তার প্রতিকার করার জন্য পরদিন রাজার সঙ্গে কথা বলার প্রতিশ্রুতি ব্রাহ্মণকে দিল। এদিকে রাতে শোবার আগে সে সাপ ও বাঘের কথা স্মরণ করল এবং তাদের জানিয়ে দিল স্বর্ণকারের অপরাধের কথা। স্বর্ণকার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে সাপের দ্বারা আক্রান্ত হল। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সে বাঘের হাতে প্রাণ হারাল। পরদিন সকালে রাজ্যের লোক রাতের ঘটনা জেনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। এই ভাবে স্বার্থপর বেইমান স্বর্ণকার স্বভাবদোষে নিজের পাপকর্মের শাস্তি নিজেই পেল।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা সর্বসমক্ষে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে শপথ নেন। তখন ব্রাহ্মণ কুয়ো থেকে চারটি প্রাণী উদ্ধারের ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে, শুধু কারাগারে সাপের প্রসঙ্গটি গোপন রাখে। তারপর রাজকন্যাকে ওষুধের সাহায্যে ব্রাহ্মণ বিষমুক্ত করে। রাজ্যের সকলেই তখন খুশি হয়ে ব্রাহ্মণের প্রশংসা করে। তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন এবং অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকুমারীকে তার হাতে সমর্পণ করেন। এই ভাবে ব্রাহ্মণের সুদিন ফিরে আসে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—গল্পটির মাধ্যমে জীবের শুভাশুভ উভয়বিধ স্বভাবপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মিথ্যার প্রভাব সাময়িক ভাবে প্রাধান্য পেলেও পরিণামে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বজীবের মধ্যেই শুভাশুভ স্বভাবপ্রকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। মানুষের মধ্যে হিংস্র, স্বার্থপর, পশুভাবাপন্ন এবং অহিংস, নিঃস্বার্থ, উদার, দেবস্বভাব প্রকৃতির উদাহরণ সর্বকালেই কম-বেশি দেখা যায়। পশুজীবনের ক্রমবিবর্তনের ফল মনুষ্যজীবন। মনুষ্যজীবনের মধ্যে পশুজীবনের অশুভ সংস্কারগুলি সুপ্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। সময় ও সুযোগ মতো সেগুলি প্রকাশ পায়। কেবলমাত্র অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত পাশবিক সংস্কারগুলি পরিশোধিত হয়ে শুভ দিব্য সংস্কারে পরিণত হয় এবং পরিণামে তা ঈশ্বরীয়বোধে বা আত্মবোধে মিশে যায়।

অশুভ, স্বার্থপর, হিংস্র ও অকৃতজ্ঞতাপ্রধান সংস্কারের প্রভাবে স্বর্ণকারের হিংস্রতা ও কুটিলতা পূর্ণ ব্যবহার বাঁদর, সাপ, বাঘ প্রভৃতি জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রমাণিত হল।

৮। ৮। ৬৮

১৮

অশুভ সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য শুভ সংস্কারের সাহায্য অধিক প্রয়োজন হয়। শুভাশুভ মিশ্রিত মনুষ্যজীবনে পশুজীবনের প্রভাবমুক্ত হয়ে দেবজীবন লাভ করার জন্য মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে হয়। মানুষের ধর্মসাধনা হল মনুষ্যত্ব, দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব লাভের ক্রমিক বিজ্ঞান।

উন্নত মনের সাহায্যে নিম্ন মনকে উদ্ধার করতে হয় অর্থাৎ উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়। উন্নত মনের মাধ্যমে কী ভাবে মোহাচ্ছন্ন নিম্ন মনকে উদ্ধার করতে হয় সেই প্রসঙ্গে একটি মজার কাহিনি বলছি, মন দিয়ে শোন।

চরিত্রবান, ধার্মিক, উদার, দয়ালু, প্রজাবৎসল ও মহৎ এক রাজা ছিলেন। তার মন্ত্রী ছিল অত্যন্ত কৃপণ, দুশ্চরিত্র, অধার্মিক, অনুদার ও স্বার্থপর। কিন্তু মন্ত্রীর পত্নী ছিল মন্ত্রীর স্বভাবের ঠিক বিপরীত। সে ছিল বুদ্ধিমতী, ধর্মপ্রাণা, ভক্তিমতী, উদার, দয়ালু এবং সেবাপরায়ণা।

মন্ত্রীর দুর্ব্যবহারে রাজদ্রোহী কুটিল ষড়যন্ত্রের অপরাধে রাজা তাকে এক দুর্গে বন্দি করে রাখেন। বন্দি অবস্থায় মন্ত্রী প্রতিহিংসা, আক্রোশ এবং দুশ্চিন্তার ফলে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তার সুচতুরা পত্নী বুদ্ধিবলে সাত রকম সুতো ও দড়ি এবং এক গুবরে পোকার মাধ্যমে তার উদ্ধারের এক ব্যবস্থা করে। একদিন সে একটি গুবরে পোকার শুমের মুখে ভাল করে মধু মাখিয়ে তার পিছনের পায়ের সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ রেশমি সুতো বেঁধে দেয়। সুতোর নিম্ন ভাগে মোটা সুতো এবং মোটা সুতোর নিম্ন ভাগে অধিকতর মোটা সুতো বেঁধে দেয়। তার সঙ্গে শক্ত মোটা সুতোর নিম্ন ভাগে সরু দড়ি, তার নিম্ন ভাগে মোটা দড়ি এবং তারও নিম্ন ভাগে অধিকতর মোটা শক্ত দড়ি বেঁধে গুবরে পোকাটিকে উর্ধ্বমুখী করে প্রাচীরের গায়ে ছেড়ে দেয়।

পত্নীর এই প্রচেষ্টা দুর্গের উপর থেকে মন্ত্রী লক্ষ্য করেছিল। মধুর গন্ধে গুবরে পোকাটি প্রাচীরের গা বেয়ে বেয়ে দুর্গের উপরে উঠলে মন্ত্রী সুতো ধরে টানতে থাকে এবং তৃতীয় নম্বর সুতোয় বাঁধা পত্রের মাধ্যমে তার উদ্ধারের উপায়টি সবিস্তারে জানতে পারে। তখন সে তদনুসারে পরপর বাকি চারটি দড়িকে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়। সর্বাপেক্ষা মোটা সাত নম্বর দড়ির একপ্রান্ত দুর্গোপরি আংটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তার সাহায্যে সে দুর্গ থেকে পলায়ন করে। পলায়নকালে পত্নীর নির্দেশে দড়িটিকে পুড়িয়ে ফেলে এবং তার ছাইভস্মও সেখান থেকে সরিয়ে ফেলে। দুর্গ থেকে উদ্ধার করে মন্ত্রীকে নিয়ে তার পত্নী ভিন্ন রাজ্যে চলে যায়। সেখানে পত্নীর প্রভাবে মন্ত্রী সৎ ভাবে ও ধর্ম ভাবে জীবনযাপন করে।

মন্ত্রীর পত্নীকে সহৃদয় মহানুভব রাজা ভালবাসতেন এবং তার স্বভাব আচরণে খুবই প্রীত ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় অশুভ স্বভাবপ্রকৃতির মন্ত্রীর ধর্মজীবন লাভের বৃত্তান্ত তিনি জেনেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি সেই মন্ত্রী ও তার পত্নীকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন এবং মন্ত্রীকে পূর্বপদে বহাল করেন। বৃদ্ধ বয়সে অপুত্রক রাজা মন্ত্রীকে রাজত্ব দিয়ে নিজে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

গল্পের তাৎপর্যকে বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গল্পটি রূপক। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল—ঈশ্বরের প্রকাশরূপ হল এই সংসার। রাজা হলেন ঈশ্বর, মন্ত্রী হল বিষয়াসক্ত জীব, দুর্গ হল কর্মবন্ধন এবং মন্ত্রীর পত্নী হল বিদ্যাশক্তি বা গুরুশক্তি। গুবরে পোকাটি হল বীজমন্ত্র এবং সুতো ও দড়ির সাতটি স্তর হল মনের সপ্ত স্তর।

পত্রের বিষয়বস্তু হল শাস্ত্র। গুরুকৃপায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের পুনর্মিলন হয় অর্থাৎ ঈশ্বরীয়বোধে সে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উন্নত মনের সাহায্যে মন্ত্রীপত্নী নিম্ন স্বভাবপ্রকৃতির মন্ত্রীকে যে-ভাবে উদ্ধার করেছে এবং উন্নত স্বভাবপ্রকৃতির দ্বারা সংশোধিত করে নিয়েছে, সেই রকম ধর্মজীবনের মাধ্যমে মানুষ শুভ সংস্কারের দ্বারা অশুভ সংস্কারকে শোধন করে নিতে পারে।

সত্যানুভূতি, সমদর্শন, ইষ্টদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শন অথবা অখণ্ড শান্তিই ধর্মজীবনের লক্ষ্য। এই সর্বোত্তম লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে মনের সাতটি স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। মনের সাতটি স্তরের তিনটি স্তর নিম্নপ্রকৃতির অধীন এবং চারটি স্তর উর্ধ্বপ্রকৃতির অধীন। নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উপনীত হবার জন্য মনের উচ্চ স্তরের সাহায্য অধিক প্রয়োজন হয়। মনের উচ্চ ও উচ্চতর স্তরগুলি হল বোধের উচ্চ ও উচ্চতর শুভ সংস্কার এবং শক্তিবিশেষ। ক্রমপর্যায়ে উচ্চ ও উচ্চতর স্তরগুলির সাহায্যে নিম্ন ও নিম্নতর স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়। মন্ত্রীপত্নীর সুতো এবং দড়ির মধ্যে সাত রকম মনের স্তরের ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

মনের সাতটি স্তর হল—(১) শুভেচ্ছা; (২) বিচারণা; (৩) তনুমনসা; (৪) সত্তাপত্তি; (৫) অসংসক্তি; (৬) পদার্থভাবনা (পরমপদের অর্থ ভাবনা)/পদার্থ অ-ভাবনা (ব্রহ্মাত্মা অতিরিক্ত জগৎ বা অন্য ভাবনার অভাব); (৭) তুরীয় এবং তুরীয়াতীত। অন্য ভাবে সাতটি মানসচক্র, যথা—মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিমূলে মণিপুর, বক্ষে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধাক্ষ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞা এবং শিরোপরি সহস্রার। কুণ্ডলিনীশক্তি মনকে নিয়ে মুক্তি, শান্তি ও আনন্দ আস্বাদন করে ঐ পথেই মনকে নিচে নামিয়ে আনে। পুনঃপুনঃ এই অভ্যাসের দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ হয় এবং সহস্রারে ব্রহ্মাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন্মুক্তি লাভ হয়। পূর্বোক্ত মনের সাতটি স্তরের জ্ঞান বিবেকবিচারপূর্বক উপলব্ধি করে সাধক তুরীয়, তুরীয়াতীতে ব্রহ্মাত্মবোধে অর্থাৎ অখণ্ড প্রজ্ঞানস্বরূপের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। ৮। ৬৮

১৯

সকলে শান্তি চায় ঠিকই, কিন্তু শান্তি লাভের উপায় জানতে হবে মহাপুরুষদের বা সিদ্ধপুরুষদের কাছ থেকেই। অথচ মহাপুরুষদের বা সিদ্ধপুরুষদের কথা প্রথমে কেউই শোনে না এবং মানেও না। তাঁরা চলে গেলে কোথায় কী note রেখে গিয়েছেন সেই সব নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

সন্তান সৃষ্টির মধ্যে যেমন আনন্দ থাকে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেও সেই রকম আনন্দের প্রকাশ রয়েছে। তা অনীশ্বরীয় নয়।

সংসার মিথ্যা নয়, বিবাহ মিথ্যা নয়, দাম্পত্যপ্রেমও মিথ্যা নয়। সব কিছুর মধ্যেই সমান ভগবৎ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোনওটিরই বিষম আধিক্য ভাল নয়। সেই জন্য ভগবান হলেন সমতা অর্থাৎ balanced state, মধ্যম পথে প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণের মাঝখান দিয়ে মনতরী নিয়ে যেতে হবে। প্রাণের দুই তীরে আছে তীর্থ। বুদ্ধি হল হাল, আমি হল মাঝি এবং যাত্রী হল আমিত্ব। আমিত্বকে নিয়ে যেতে হবে। আমি মাঝি, আমার (অহংকার) আর কোনও কাজ নেই শুধু তাঁকে বহন করা ছাড়া। তাঁর আদেশ পুরোপুরি 'মেনে, মানিয়ে চলতে হবে'।

'মেনে, মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের মুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত গল্পটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সকলেই বিশ্বজননীর সন্তান। পঞ্চদেবতাও তাঁরই সন্তান। সূর্যদেবতার একসময় খুব অহংকার হল পৃথিবীকে আলো দিচ্ছে বলে। তার এই অহংকারের জন্য বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি খুব ব্যথিত হলেন। সূর্যকে ডেকে বললেন—তোর দাদা আদ্রা নক্ষত্রকে একটা খবর দিয়ে আসতে হবে তোকে। সে থাকে অনেক দূরে। তার গায়ে ঠিক তোর মতো একটা জ্যোতি আছে। সেই আলো তোর কাছে পৌছতে ষাট লক্ষ বছর লাগে। তার শরীরের মধ্যে তোর মতো দশ হাজার সূর্য লুকিয়ে থাকতে পারে।

সূর্য অভিমানভরে মাকে বলল—মা আমাকে এত ছোট করলে কেন তুমি? আমি তাহলে আর কাজ করব না।

জননী বললেন—তুই যদি এ রকম করে আমাকে বিরক্ত করিস তাহলে তোকে আদ্রার কাছে নিয়ে যাব। তখন তার তেজে তুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবি।

এই কথা শুনে আদ্রার আবার অহংকার হল। তখন মা আদ্রা নক্ষত্রকে বললেন—তোকে তোর দাদা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কাছে পাঠাতে হবে। তার কাছ থেকে তোর কাছে আলো আসতে কয়েকলক্ষ বছর লাগে।

শুনে আদ্রা নক্ষত্রের অবস্থা কাহিল। সে বলল—দাদা কি আমার মতো দেখতে? মা বললেন—তোর চাইতে একটু লালচে। তোর মতো কয়েকলক্ষ আদ্রাকে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। এই কথা শুনে আদ্রা অভিমানে, দুঃখে আর কোনও কাজ করে না।

তখন মা তাকে বললেন—তোর দাদা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের এমন কতগুলি অনুচর আছে যারা তোকে একটা টোকা দিলে তুই ছাই হয়ে যাবি। একদিন সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয়েছিল, তখন তার ছাইটা এখানে এসে পৌঁছতে কয়েকলক্ষ বছর লেগেছিল।

মায়ের এই কথা শুনে সূর্য, আদ্রা, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি নক্ষত্ররা অভিমানে, দুঃখে, ক্ষোভে, ঈর্ষায়, লজ্জায় প্রথমে মায়ের কথার অবাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয়তার বা কর্মবিমুখতার ইচ্ছা ও লক্ষণ প্রকাশ করল। ফলে মায়ের মহামায়াশক্তি এমন একটা ভীষণরূপ ধারণ করল যা দেখে তাঁর সন্তান এই নক্ষত্রমণ্ডলী সমূলে বিনষ্ট হবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে মায়ের স্তব করতে লাগল।

পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকেই সেই আদ্যাশক্তির সত্তায় সত্তাবান ও তাঁর শক্তি দ্বারাই পরিচালিত। তাঁকেই নিরন্তর অনুসরণ করে চলেছে কেউ অজ্ঞানে, কেউ বা সজ্ঞানে। মা কারওকে দিয়ে পালন করাচ্ছেন, কারওকে দিয়ে রক্ষা করাচ্ছেন আবার কারওকে দিয়ে ধ্বংস করাচ্ছেন। কারওকে দিয়ে দান করাচ্ছেন, কারওকে দিয়ে গ্রহণ করাচ্ছেন।

একই ব্যক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের কাজে লিপ্ত আছে, কিন্তু সচেতন নয়। জীবনের মধ্যে জীবনের স্বভাব মহিমা ভিন্ন ভিন্ন কর্মের মাধ্যমে যে-ভাবে অভিব্যক্ত হয় তার উদ্দেশ্য প্রথম অবস্থায় অনুভবগম্য হয় না। সেই জন্য বিরুদ্ধ প্রকাশগুলির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তথাপি মানুষ তার মধ্যে চলেছে এবং তার মধ্যেই থাকবে, কারণ এই হল প্রকৃতির স্বভাবধর্ম। পরিণামে বিরোধ নেই।

গল্পটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ ত্রিগুণাপ্রকৃতির অধীনে চলে। মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ত্রিগুণের প্রভাবে পরিচালিত হয়। ত্রিগুণের তিনটি গুণের বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক হলেও তারা পরস্পর সংযুক্ত হয়েই সক্রিয় হয়। জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, প্রতিবন্ধকতা, আলস্য, নিদ্রা, আবরণ, নাশ প্রভৃতি হল তমোগুণের বিশেষ ভাব ও লক্ষণ। সক্রিয়তা, বৈচিত্র্য সৃষ্টি, প্রকারভেদ, কামনাবাসনা, লোভ, প্রতিহিংসা, অভিমান-অহংকার, দম্ভ, দর্প, মদ, মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, ভোগবিলাসপ্রিয়তা, শক্তি লাভে উন্মত্ততা, ছলচাতুরী, মিথ্যা, ভান প্রভৃতি হল রজোগুণের বিশেষ ভাব ও লক্ষণ। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, সুখাসক্তি, জ্ঞানাসক্তি, সমতা, একতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেমপ্রীতি, মৈত্রী, করুণা, ইষ্টনিষ্ঠা, সত্যানুসন্ধান, আত্মানুভূতি, মুক্তি, শান্তি প্রভৃতি হল সত্ত্বগুণের বিশেষ ভাব ও লক্ষণ।

এই ত্রিগুণের বিস্তারই জগৎসংসার। অচেতন-চেতন সর্বস্তরেই এই তিন গুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিন গুণের কোনওটিই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়। কোনও একটির প্রাধান্যকালে অপর দু'টি অভিভূত থাকে। ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা হল অব্যক্তপ্রকৃতি। তাতে সৃষ্টির অভাব। ত্রিগুণের বৈষম্য দ্বারা গুণের বিকার ও সৃষ্টি সম্ভব হয়। ত্রিগুণের পূর্ণ সাম্য অবস্থা হল সৃষ্টির লয় অবস্থা। গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি হল তার লক্ষণ বা পরিচয়। ঈশ্বরীয় শক্তি পরমাপ্রকৃতির সৃষ্টিবিলাসে ত্রিগুণের খেলাই সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়—কোথাও সৃষ্টিরূপে, কোথাও স্থিতিরূপে, কোথাও ধ্বংসরূপে। সৃষ্টির মধ্যে গুণ ও শক্তির প্রকাশবিকাশ ক্রমপর্যায়ে ঘটে থাকে। তার মধ্যে যখন যেখানে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তা অন্তর্নিহিত স্বভাবশক্তির দ্বারাই আবার সুষ্ঠু ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

জীবজগতে মনুষ্যসমাজে সর্বত্রই এই তিন গুণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও কারও মধ্যে তমোগুণের, কারও মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য যখন ব্যাপক ভাবে হয় তখন সমাজজীবনে আসে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, দম্ভ, দর্প, অভিমান-অহংকারের অভিব্যক্তি। অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে বিড়ম্বনা আসে। তখন সর্ববিধ নিরাপত্তা হারিয়ে চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করে সে মৃত্যুবরণ করে। সত্ত্বগুণী লোকের সংখ্যা বেশি না-হলে এই রজ-তমোগুণীদের বশে আনা মুস্কিল হয়ে পড়ে। সমাজে, দেশে ও রাষ্ট্রে শাসনে তখন শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মাধ্যমে তা কিছুটা নিরসন হয়। শুদ্ধসত্ত্বগুণীর দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনব্যবস্থা তাঁরা দৃঢ় ভাবে সুনিয়ন্ত্রণ করেন।

তামসিক ও রাজসিক অহংকার-অভিমান অপেক্ষা সাত্ত্বিক বা শুদ্ধসাত্ত্বিক অহংকার-অভিমান সর্বতোভাবে শ্রেয়। সাত্ত্বিক অহংকার-অভিমানের দ্বারা মানুষ তার অসংযত স্বভাববৃত্তিকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে দিব্যভাববোধের অধিকারী হয় এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রভাবে গুণাতীত অবস্থা লাভে সক্ষম হয়। গুণাতীত অবস্থায় সে মুক্তিশান্তি লাভ করে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য আখ্যানটির মধ্যে অসংযত শক্তি বা প্রকৃতি কী ভাবে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় তার সম্যক্ বিজ্ঞানটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা লাভের জন্য যে উপদেশ, অনুশাসন ও বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন তা গল্পগুলির তাৎপর্য বর্ণনার মধ্যে অভিনব ভাবে পাওয়া যায়।

৮। ৮। ৬৮

২০

সাধক ভগবানকে লাভ করতে চায়—এ হল একটি শুদ্ধ কামনা (spiritual desire, high ambition or aspiration and intense urge)। সমস্ত সিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের মূলে থাকে শুদ্ধ কামনা। কিন্তু পূর্ণ আত্মসমর্পণ হলে আপনিই কামনারূপ অসার বস্তুটি মল আকারে বেরিয়ে যায়। তা জোর করে বাদ দিলে বিকার হয়। জোর করে বাদ দিতে গিয়ে অনেকে পূর্ণতাকে স্বল্পতা বা আংশিক শূন্যতা দিয়ে পেতে চায়। পূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়েই উপলব্ধি হয়। পূর্ণবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিজেব মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করতে হয় ঈশ্বরের সাহায্যে ও তাঁর ভাববোধের অনুশীলন দ্বারা। তাহলে তাঁর পূর্ণতার প্রভাবে তিনি অন্তরের শূন্যতাকে নিজবক্ষে মিলিয়ে নেন এবং অন্তরে স্বমহিমায় বিরাজ করেন। এই হল আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা।

সৌভরি মুনি যুগের পর যুগ নদীগর্ভে ঈশ্বরের সাধনায় রত ছিলেন। কিন্তু অন্তরের শূন্যতা পূর্ণতার অভাবে তখনও অপূর্ণ। ধ্যান থেকে উঠে হঠাৎ একদিন দেখেন তাঁর চার দিকে সপরিবারে মাছগুলি আনন্দে খেলা করছে। এই দেখে তাঁর মনে ভাবান্তর হল। তিনি ভাবলেন, এদের মতো আনন্দ করার সাথি তো তাঁর নেই। সাথির অভাবে তো এদের মতো আনন্দ আস্বাদন করা যায় না। তার মনে পড়ল তিনি তো সংসার ত্যাগ করে এসেছেন, কিন্তু সংসারের সাধ তো তাঁর মধ্যে ফুটে উঠছে। এই অপূর্ণ সাধপূরণের ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করলে তার সমাধানের জন্য তিনি ধ্যানে বসলেন।

ধ্যানে তিনি অম্বরীষ রাজার পঞ্চাশটি কন্যাকে দর্শন করলেন। তার পরে ধ্যানভঙ্গ হতে তিনি সেই রাজার কাছে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন।

তখনকারদিনে কোনও মুনি যদি কোনও রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতে চাইতেন তবে রাজারা ফিরিয়ে দিতেন না। সেই মুনি মহারাজকে গিয়ে বললেন—আমি তোমার যে কোনও এক কন্যার পাণিগ্রহণ করতে এসেছি।

মুনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে কন্যাদান করা উচিত কি না রাজা তা ভেবেই অস্থির হলেন। কিন্তু এক দিকে কন্যার মঙ্গলচিন্তা আর অপর দিকে মুনির কোপ—এই উভয় সংকটে পড়ে রাজা বুদ্ধি স্থির করে কৌশলে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যাবার জন্য বললেন—আমার কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন?

মুনি বললেন, তিনি যে কোনও কন্যার পাণিগ্রহণ কবতে রাজি আছেন। রাজা ভাবলেন, কোনও কন্যাই বৃদ্ধ মুনিকে পছন্দ কববে না। রাজার মুখে বৃদ্ধ মুনির বিয়ের প্রস্তাব শুনে রাজকন্যারাও হেসেই লুটোপুটি।

রাজা মুনিকে বললেন—আপনি আমার কন্যাদের সঙ্গে দেখা করুন। মুনি তখন এমন এক আকর্ষণীয় চেহারা (রূপ) তৈরি করলেন যে প্রত্যেক রাজকন্যাই তাঁকে বিবাহ করতে চাইল। রাজা মুনিকে বৃদ্ধই দেখেছেন অথচ রাজকন্যারা দেখল সেই মুনির সুঠাম, সুন্দর দেহ।

পরে স্বয়ংবর সভায় রাজাও দেখতে পেলেন মুনির সুন্দর চেহারা। তখন বাধ্য হয়ে রাজা তার পঞ্চাশটি কন্যাকেই মুনির হাতে সমর্পণ কবলেন এবং মুনির মত নিয়ে পঞ্চাশটি উপবন তৈরি করে সেই পঞ্চাশটি কন্যার জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন উপঢৌকন ও উপহার হিসাবে।

বেশ কিছুদিন পরে রাজা একবার কন্যাদের দেখতে গেলেন। প্রথমা কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে প্রথমা কন্যা বলল, তার দুঃখ হল মুনি তার অন্য বোনেদের কাছে না-থেকে সর্বদা কেবল তার কাছেই থাকেন। সেই রকম পঞ্চাশটি কন্যাই রাজাকে একই রকম অভিযোগ করলেন।

তখন রাজা মুনির অলৌকিক মহিমা বুঝতে পারলেন। তিনি দেখলেন অদূরে সরোবরে মুনি একটি পদ্মফুলের উপরে বসে ধ্যানে নিমগ্ন। প্রীত মনে রাজা স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তার পরে বহু বছর আর খোঁজ নিতে পারেননি। ইতিমধ্যে মুনির অনেক নাতিপুতি হল।

মুনি একদিন নাতিপুতিদের সঙ্গে জলের মধ্যে খেলতে খেলতে ডুব দিলেন এবং তার সেই পূর্বের সাধনরত অবস্থা ও জীবনের কথা স্মৃতিতে জেগে উঠল। আশ্চর্য হয়ে সেই পূর্ব অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং সব কিছু ছেড়ে আবার স্বরূপের ধ্যানে রত হবার সংকল্প করলেন।

একটি ছোট ইচ্ছা ও কামনার পরিণাম মুনির জীবনে যে-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই আলেখ্য হল এই কাহিনি। কামনার যেটা ফাঁক (gap) ছিল সেটা পূরণ হয়ে গেল। তখন মুনি তাঁর পত্নীদের ও পুত্রপৌত্রাদির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে আবার ফিরে গেলেন আত্মধ্যানে রত হতে এবং পরে পূর্ণ সমাহিত হয়ে গেলেন। শূন্যতা তাঁর পূর্ণ হয়ে গেল পূর্ণত্বের স্বভাব মহিমায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর স্বানুভূতির ভাষায় সকাম ও নিষ্কাম ভাববোধের যথার্থ তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—কোনও একটি বিষয় নিয়ে আনন্দে মগ্ন হতে গেলে আনন্দের উপকরণ একান্ত প্রয়োজন। যদি এই উপকরণ ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে হয় তবে

আর অভাব বা শূন্যতা থাকে না, কিন্তু বিষয়কে কেন্দ্র করে হলে অন্তরের কামভাব অধিক বেড়ে যায়। কামভাব নিয়ে ভোগমাধ্যমে তা কোনও দিনই পূর্ণ হয় না। সেই জন্য কামনাকে প্রথমেই ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দিলে এবং শুভ বা অশুভ ফলও সমর্পণ করে দিলে তবেই মুক্ত হওয়া যায়। তখন আর কোনও বন্ধন থাকে না।

সকাম ভাববোধের দ্বারা সংসারজীবন এবং নিষ্কাম ভাববোধের দ্বারা অধ্যাত্ম দিব্য মুক্ত জীবনের জ্ঞান ও উপলব্ধি হয়ে থাকে। ইচ্ছা ও কামনার সম্যক্ রূপই হল সংসার। প্রবৃত্তি মার্গই হল সংসারজীবনের লক্ষণ। এই পথে মানুষ তার ভোগেচ্ছা কাম চরিতার্থ করতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। প্রবৃত্তি মার্গই হল ভোগ মার্গ। তার বিপরীত হল নিবৃত্তি মার্গ। তা হল সংসারে বিরক্ত বিবেকী পুরুষের জন্য।

সংসারে মানুষ ইচ্ছার বা কামনার দাস হয়ে বিষয়ভোগে মত্ত থাকে। বিষয় ভোগ ও ইন্দ্রিয়জ সুখের দ্বারা তার জীবনীশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের তেজ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে দুর্বল হয় এবং মৃত্যুর বশে চলে যায়। মৃত্যুভয়ে ভীত জীব দিব্য সুখশান্তির অধিকারী হতে পারে না। অসংযত চিত্তে ভোগে লিপ্ত থেকে সংযমের গুরুত্ব সে হারায়। তার ফলে হয় তার অকাল বার্ধক্য। তার সঙ্গে চিত্তের ভ্রান্তি, ভীতি, অবসাদ, দুশ্চিন্তা বেড়েই চলে। এই ভাবে তার জীবনের অবসান হয়। কিন্তু অপূর্ণ কামনার সংস্কার তাকে আবার দেহধারণ করে ভোগ্য জীবন লাভে বাধ্য করে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এই ভাবেই অসংযত ও কামাহত মানুষকে বহু জন্ম অতিবাহিত করতে হয়। এই চক্র থেকে মুক্তির জন্য তাকে নিবৃত্তি মার্গ অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবসাধনার অনুশীলন করতে হয় সাধুসঙ্গের মাধ্যমে। সাধুসঙ্গের গুণে তার সকাম অসংযত চঞ্চল চিত্ত সংযত ও শান্ত হয়। তার ফলে অন্তর্মুখী ভাব ও চিন্তা তার বেড়ে যায়। সে তখন ঈশ্বরাত্মধ্যানে রত হয়। দীর্ঘকাল সাধনায় রত থেকে ঈশ্বর-আত্মা-গুরুকৃপায় অমৃতময় দিব্যজীবন লাভে সমর্থ হয়। মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়ের অধীনে থেকে দেহাত্মবুদ্ধিযোগে বিষয়ভোগ নয়—সংযমপূর্বক শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সহযোগে ঈশ্বর-আত্মার ধ্যান ও উপলব্ধিই হল জীবনের চরম লক্ষ্য। অমৃতত্ব, মুক্তি, শান্তি হল মানবজীবনের সর্বোত্তম সিদ্ধি ও সত্য পরিচয়।

১১। ৮। ৬৮

২১

জীবনে যার যা আছে তার মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিয়ে দেওয়াই সত্যদর্শন। জীবনের সমস্ত চিন্তা, কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সমবোধে ঈশ্বরকে 'মেনে, মানিয়ে চললে' বিষ্ণুপ্রীতি তথা ঈশ্বরানুভূতি সহজে হয়।

জগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে নিজের একাত্মবোধই হল সত্যবোধ। জগতের সব কিছুকে ঈশ্বরীয় ভাবে সমবোধে গ্রহণ করলে এই সত্যবোধ সহজেই হৃদয়ে জেগে ওঠে।

ঋষিদের অমরত্ববোধ হল সবার মধ্যে সমবোধে মিলে সমত্ব বা পূর্ণতা লাভ। এই বোধে থাকতে হলে সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে আপনবোধে মেনে গ্রহণ করতে হয়।

"ত্যাগাৎ শান্তি", অর্থাৎ ত্যাগই শান্তি—এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিজ জীবনের একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন—একদিন একটি কাক একটি লুচি নিয়ে আসল। এই দেখে অনেকগুলি কাক তাকে তাড়া করল। তখন লুচি ত্যাগ করে সে অন্য কাকদের তাড়না হতে নিষ্কৃতি পেল। অন্য কাকগুলি তাকে ছেড়ে লুচির সন্ধানে চলে গেল।

ঘটনাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে তিনি বললেন—লুচিরূপ বিষয়টির প্রতি কাকের লোভ হয়েছিল। কাকটি তা ভোগ করতে চেয়েছিল কিন্তু অন্য কাকগুলি তার অন্তরায় হয়। তাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে অনন্যোপায়, অসহায়, ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে লুচিটি পরিত্যাগ করার ফলে কাকটি অন্য কাকগুলির উৎপীড়ন হতে নিষ্কৃতি পেল। তখন সে শান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে তখন বোধে জেগে উঠল, "ত্যাগাৎ শান্তি, ত্যাগাৎ শান্তি"।

১১। ৮। ৬৮

২২

নিম্ন অধিকারীর জন্য রূপের প্রয়োজন হয়। হৃদয়ে ঈশ্বর একবার অনুভূত হলে দেখা যায় ঈশ্বর সর্ববস্তুর মধ্যেই রয়েছেন।

ভক্তির চরমতম অবস্থায় ভক্ত একজনকেই পূজা করে। সর্বব্যাপী এক বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা রূপে-নামে-ভাবে-বোধে জ্ঞানী, যোগী, ভক্তের দ্বারা যুগ যুগ ধরে আরাধিত হয়ে আসছে। নির্গুণ-সগুণ উভয়ই তাঁর সত্য পরিচয়।

নানা রকম বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকলেও ঈশ্বরের মধ্যেই সকলে আছে—এই বিশ্বাসই সর্বাবস্থায় সকলকে রক্ষা করে। প্রেমময়ী মা সকলকেই কোলে রেখেছেন।

এক পাগল একবার ভগবানকে বলল—তুমি যে সব জায়গায় আছ কী করে তা জানা যায়?

ভগবান—সর্বরকম বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে সর্বদা সমবোধে গ্রহণ ও ব্যবহার করলে নিত্য ঈশ্বরবোধে যুক্ত থাকা যায় এবং ঈশ্বরের পরিচয় পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়।

পাগল—কোনও জায়গায় বৃষ্টি পড়ছে, কোনও জায়গায় মশা কামড়াচ্ছে—এই রকম বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে সমবোধে সর্বদা থাকা যায় কী ভাবে?

ভগবান—আমি আছি বলেই তুই এ রকম বোধ করেছিস সারাদিন। এক জায়গায় গিয়ে দেখেছিস খুব গরম, আরেক জায়গায় গিয়ে দেখেছিস বরফের মতো ঠান্ডা। উভয় স্থানে অখণ্ড বোধসত্তারূপে আমি-ই বিরাজমান। গরম, ঠান্ডা প্রভৃতি এক বোধেরই প্রকাশভঙ্গিমা মাত্র। আমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছি বলেই তুই আমাকে সেই ভাবে অনুভব করেছিস। তুই আগে ভাল নাম চেয়েছিলি, ভাল পোশাক চেয়েছিলি, সেই জন্য সেই রকমই পেয়েছিলি। এখন চাওয়া অনুরূপ এই ভাবে আছিস। ভগবানের সঙ্গে যখন কেউ বোধে একাত্ম হয়ে যায়, তখন নাম, যশ, অর্থ আর সে চায় না।

১২। ৮। ৬৮

২৩

নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম গুরুভক্তির দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে আশাতিরিক্ত ফল কী ভাবে পাওয়া যায় তারই দৃষ্টান্তমূলক একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক মহাত্মার অনেক শিষ্য ছিল। শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশই ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা প্রায় সব সময়ই সেই মহাত্মার কাছে যাতায়াত করত এবং তাঁকে ঘিরে থাকত। তাদের জন্য গরিব শিষ্যরা গুরুমহারাজের কাছে বেশি যেতে পারত না। ধনী শিষ্যরা অনেক সময় কৃত্রিম ইষ্টনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির এতবেশি বাড়াবাড়ি করত যার জন্য গরিব শিষ্যরা ভয়ে ভয়ে দূরে থাকত।

গুরু মহাত্মা সবই জানতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না। একদিন তিনি তাঁর শিষ্যদের কৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেবার জন্য এক উপায় স্থির করলেন।

অসুস্থতার ভান করে তিনি কয়েকদিন কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না-করে ঘর বন্ধ করে রইলেন। তারপর যেদিন তিনি বেরোলেন দেখা গেল তাঁর এক পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করে জানল, গুরুদেবের মারাত্মক এক ফোড়া হয়েছে যা তাঁর জীবননাশের কারণ হবে। শিষ্যরা মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে বড় বড় ডাক্তার, বৈদ্য আনবার জন্য ব্যস্ততা দেখাল। গুরুদেব সব দেখে-শুনে তাদের নিষেধ করে বললেন—ডাক্তার, বৈদ্য দ্বারা আমার কোনও উপকার হবে না। আমার জীবনরক্ষার একটিমাত্র উপায় আছে। তা হল, যদি কেউ ফোড়াটার বিষাক্ত পুঁজরক্ত চুষে নিতে পারে তাহলে তাঁর জীবনরক্ষা হতে পারে। কিন্তু যে চুষে নেবে তারই তো প্রাণবিয়োগ হবে!

ইষ্টনিষ্ঠা ও একান্ত গুরুপ্রীতির অভাবে শিষ্যদের মধ্যে কেউই গুরুদেবের প্রাণরক্ষার্থে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে রাজি হল না। তারা সকলেই নিজেদের ব্যক্তিগত অসুবিধা ও অক্ষমতার অজুহাত দেখিয়ে গুরুদেবের জন্য অতিমাত্রায় দুঃখের ভান ও অভিনয় করে একে একে স্থান ত্যাগ করল।

সেই সময় এক রাখাল বালক গুরুদেব ও শিষ্যদের কথাবার্তা শুনছিল। ঘটনাটির কথা মনে মনে চিন্তা করে সে মর্মাহত হল। দরিদ্র এই রাখাল বালক প্রায়ই এই মহাত্মাজির কাছে যাতায়াত করত যখন তাঁর কাছে কেউ থাকত না। মহাত্মাজিও তাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি তার সঙ্গে হাসি তামাসা ও গল্পগুজবও কখনও কখনও করতেন এবং ভাল ভাল প্রসাদও তাকে খাওয়াতেন। পার্থিব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, স্নেহ, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত সহজ সরল এই রাখাল বালক মহাত্মাজির কাছে এসে তাঁর সঙ্গ ও ভালবাসা পেয়ে সব সময় তাঁকে মনে মনে চিন্তা করত। মহাত্মাজির পায়ের ফোড়াই তাঁর দেহাবসানের কারণ হবে শুনে মর্মাহত ও শোকার্ত এই রাখাল বালকটি নিজের জীবন দিয়ে মহাত্মাজির জীবন রক্ষা করার সংকল্প করল।

শিষ্যদের প্রস্থানের পরে মহাত্মাজির নিকটে এসে তাঁকে প্রণাম করে সাশ্রুনয়নে সে তার সংকল্প ব্যক্ত করে বলল যে, তার মতো গরিব অখ্যাত এক রাখাল বালকের জীবন

অপেক্ষা মহাত্মাজির জীবন অধিক মূল্যবান। তিনি বেঁচে থাকলে বহু লোকের কল্যাণ হবে, কিন্তু রাখাল বালকের মৃত্যু হলে কারও কোনও ক্ষতি হবে না। এই বলে অতি দ্রুত সে মহাত্মাজির পায়ের ফোড়ার মধ্যে মুখ লাগিয়ে দীর্ঘ একটানে তার পুঁজরক্ত ও মল নিজে চুষে খেয়ে নিল।

এই পুঁজরক্তের স্বাদ সে মিষ্টি আস্বাদন করেছিল। তার এই অভাবনীয় কার্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হল। সকলে ভাবল, এই কার্য দ্বারা রাখাল বালক তাদের হেয় প্রতিপন্ন করল। সেই জন্য তারা বাখাল বালককে প্রীত মনে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেনি। এদিকে রাখালের দুঃসাহসিক কার্যে মহাত্মাজি অতিশয় তুষ্ট ও প্রীত হয়ে তাকে আন্তরিক ভাবে যথার্থ স্নেহ, ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানালেন সকলের সামনে।

সত্ত্বগুণপ্রধান সাত্ত্বিক স্বভাবের অধিকারী সহজ সরল চরিত্রের এই দরিদ্র রাখাল বালকটি নিঃস্বার্থ ভাবে মহাত্মাজির জন্য আত্মদান করে তাঁর কৃপা ও আশিস্ লাভ করার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই দিব্যভাবের অধিকারী হয়ে তার ঈশ্বরোপলব্ধি হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তার দেহাবসান হয়।

প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাজির কোনও ফোড়া হয়নি। তিনি একটি সুপক্ক আম ফোড়ার আকারে তাঁর পায়ে বেঁধে রেখে নিপুণ ভাবে অভিনয়ের ছলে শিষ্যদের পরীক্ষা করেছেন। কৃত্রিম ভক্তশিষ্যের দল সে পরীক্ষায় ধরা পড়ে। কিন্তু অকৃত্রিম ভক্তের স্বরূপ নগণ্য রাখাল বালকের জীবনে প্রমাণিত হয়।

সাধুসন্তদের কাছে কৃত্রিম ভক্তশিষ্যের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। অকৃত্রিম যথার্থ ভক্তের সংখ্যা খুবই কম। যথার্থ ভক্ত না-হলে গুরুকৃপা, ইষ্টকৃপা পাওয়া যায় না। গুরুকৃপা ব্যতীত ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। এই রাখাল বালক গুরুদেবের জন্য যা করেছিল তাঁর নিজের শিষ্যরাও তা পারেনি।

গল্পটির তাৎপর্য তত্ত্বের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সংক্ষেপে ব্যক্ত করলেন—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিত্তের পরিচয় সম্বন্ধে একমাত্র.অনুভবসিদ্ধ পুরুষরাই যথার্থ ভাবে অবহিত। ঈশ্বরাত্মজ্ঞান লাভের সাধনায় দীর্ঘকাল রত থাকতে পারে এমন সংস্কারের অধিকারীপুরুষ সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা জীবনব্যাপী সাধনা ও তপস্যার মাধ্যমে আত্মানুভূতির অন্তরায়গুলি সম্যক্ ভাবে অবগত হয়ে তার বিপরীত ভাব ও বোধের দ্বারা সেগুলিকে নির্বীজ করে নেন।

ত্রিগুণের বিলাসই জগৎসংসার এবং গুণ ও ভাব অভিন্ন বলে ভাবের বিলাসই হল সংসার। অন্তরের মাধ্যমেই ভাবের বিলাস হয়। ভাবের দ্বারাই ভাবের বিস্তার হয় ও তার অনুভূতি প্রকাশ পায়। ভাবসংযমের মাধ্যমে আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুশীলন সাধককে আত্মবোধের অধিকারী করে। আত্মবোধ ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত গুণাতীত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। আপনবোধই হল আত্মবোধের বিশেষ লক্ষণ। আত্মবোধ হল একবোধ, সমবোধ বা আপনবোধ। তার বিপরীত হল

নানাত্ব-বৈচিত্র্যবোধ, বিষমবোধ (ভেদজ্ঞান), অনাত্মবোধ, পৃথকবোধ, অন্যবোধ প্রভৃতি। নিজ অতিরিক্ত ভাববোধই হল কল্পিত কল্পনাবিলাস। আপনবোধ দ্বারাই আপনবোধ পূর্ণ ও সিদ্ধ। অন্য বোধ তাতে থাকে না, থাকতে পারেও না। আবার অন্য বোধে আপনবোধ ও আত্মবোধ আবৃত থাকে, তা প্রকাশ হয় না।

সংসারে অনাত্মভাববোধ বিষয়াবলম্বনে প্রকাশ পায়। তার দ্বারা জীবের আপনবোধ, আত্মবোধ আবৃত থাকে। অনাত্মা বিষয় ও ভাববোধের দ্বারা পরিচালিত সংসারী জীব সৎ অপেক্ষা অসৎ-এর প্রাধান্যই বেশি দেয়। তারা সত্যের মর্যাদা দিতে জানে না, মিথ্যার আশ্রয়ে চলে। তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি সবই কৃত্রিম, মিশ্র ও মিথ্যাপ্রধান। মিথ্যাশ্রয়ী সংসারী মানুষ মিথ্যার দ্বারা পরিচালিত হয়ে গতানুগতিক ধর্মচর্চা করে। তাদের গুরুভজন, ইষ্টভজনের মধ্যে আত্মপ্রীতির বদলে অনাত্মপ্রীতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। অনাত্মপ্রীতির ব্যবহারের মধ্যে মিথ্যাচার সহজেই ধরা পড়ে। তা লুকিয়ে রাখা যায় না। লোকদেখানো ধর্মাচার, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। অপরের চোখে ধুলো দিয়ে সাজা সাধুর এবং মিথ্যাচারী বকধার্মিকের সংখ্যাই বেশি। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে তারা সমাজজীবনে আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে সেই অর্থ ব্যয় করে। তাদের ধর্মজীবন লাভ হয় না। অধর্মের প্রভাবই তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়।

কৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস দ্বারা অধর্ম লাভ হয়, ধর্ম লাভ হয় না। ধর্ম কারও বশে চলে না, ধর্মের বশেই সবাইকে চলতে হয়।

প্রকৃত ধর্ম কোনও মতবাদ, ক্রিয়াকলাপ বা বিশেষ আদর্শও নয়। আত্মবোধ, সত্যবোধ ও অদ্বয়বোধই হল আসল ধর্ম। অন্যান্য আর সবই হল ধর্মের আভাস ও প্রস্তুতি। সত্য অখণ্ড ভূমা এক নিত্য পূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ হল ঈশ্বর-আত্মার পরিচয়। তিনি হলেন সর্বজীবনের অধিষ্ঠান।

১৩। ৮। ৬৮

২৪

সত্যি সত্যি ঈশ্বরের জন্য কম লোকেরই প্রাণ কাঁদে। অনেকেই শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধর্মের ভান করে।

একজন গৃহী সাধক বাইরে পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন এবং ঘরে এসে বেশ গোপনে সাধনভজন করতেন। তার বন্ধুরাও জানত না তার সাধনভজনের কথা। কয়েকবছর পর সবাই দেখতে পেল সেই গৃহীর অনেক আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে।

গৃহীর এক বন্ধু তাকে বলল—শাস্ত্রে অনেক কিছু পড়েছিলাম যার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ তোমার স্বভাবের অভিনবত্ব দেখে শাস্ত্রের সেই সব কথা সত্য মনে হচ্ছে।

সেই গৃহী সাধক অন্তর্বোধে এমন একটা স্থির প্রশান্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, সকলেরই দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করতেন।

সাধারণত লোকে শ্রবণ করে এক রকম, বলে এক রকম, কাজ করে অন্য রকম। কোনওটির সঙ্গে কোনওটির সামঞ্জস্য থাকে না বলে তাদের মনের অশান্তভাব দূর হয় না।

এক মহাপুরুষের কাছে একজন লোক জিজ্ঞাসা কবল—আপনার কাছে এমন কোনও ট্যাবলেট আছে কি যার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়? আপনার কাছে এসে তো অনেকে সৎপ্রসঙ্গ শুনে যায়, তাদের মধ্যে অন্তত একজনকেও আপনি কি শান্তি দিতে পেরেছেন? যারা এখানে আসে তাদের ভবরোগ সেরেছে কি? আপনার কাছে ঈশ্বরানুভূতি বা শান্তি লাভের সহজতম কোনও অব্যর্থ উপায় বা ব্যবস্থা থাকলে আমাকে বলে দিন।

মহাপুরুষ তাকে পরের দিন আসতে বললেন। পরদিন মহাপুরুষের কাছে এসে তাঁর কয়েকটি সহজ সরল সুন্দর উপদেশমূলক সত্যের কথা শুনে সেই লোকটি বলল—এ সব কথা আমার জানা আছে। এ সব কথা দ্বারা তো বিপদ বা অশান্তি দূর হয় না।

উত্তরে মহাপুরুষ বললেন—আমি তো সহজ করেই বলেছি কিন্তু আপনি যখন তা বিশ্বাস করে মেনে গ্রহণ করতে পাবলেন না তখন নিজেব বুদ্ধিতে চলে দেখুন বিপদ বা অশান্তি দূর করতে পারেন কি না। না-পারলে কিছুদিন বিপদের মধ্যেই থাকুন। আপনাদের মতো বিদ্যাভিমানী লোক অহংকারে চলে মনের ভিতরে ভগবানের জন্য সামান্য জায়গাও রাখেন না। উপরন্তু আপনার শরীরে হয়েছে ক্যান্সার।

ভদ্রলোক খুব পেটুক ছিল, কাজেই মহাপুরুষ তাকে পরের দিন উপবাস করতে নির্দেশ দিলেন। পরদিন ছিল তার নেমন্তন্ন। ভদ্রলোক মহাপুরুষের কথা না-শুনে নেমন্তন্ন খেয়ে এল। এর ফলে তার কলেরা হল। মহাত্মাকে সে খবর জানানো হল।

মহাপুরুষ সব কথাই শুনলেন এবং তাকে এমন একটা জিনিস খেতে দিলেন যা ওষুধ বলে কেউ মানবে না। তারপর তিনি তাকে বললেন—যদি বেঁচে ওঠ তবে যে ভদ্রলোকের কাছে তুমি ঋণী তার ঋণটা শোধ করে দিও এবং পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। ভদ্রলোক রাজি হল।

রোগ সারবার পর ভদ্রলোক মহাপুরুষের কাছে এল। অনেক পরিশ্রমের পর মহাপুরুষ তাকে বেশ উন্নত অবস্থায় পৌঁছে দিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—লোকে ভাবে কী করে সংসার চালাবে। 'আমারবোধে' কর্তৃত্বাভিমানে সংসারে সকলে কাজকর্ম করে বলেই কর্তব্যের অজুহাতে তাদের মনে এ সব প্রশ্ন জাগে। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করলে ঈশ্বরই সব প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেন।

১৩। ৮। ৬৮

২৫

সৎপ্রসঙ্গকালে প্রসঙ্গের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক মায়ের তিন ছেলে। বড় ছেলের ভয়ানক জুলুম—এটা খাব না, ওটা খাব না, এটা চাই, ওটা চাই এই রকম। দ্বিতীয় ছেলে খুব শান্ত। সে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব শান্ত ভাবে। তার যখন যা খেতে ইচ্ছা করে মাকে খুব অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে জানায় এবং সেই খাবার তৈরি করার জন্য অনুরোধ করে। আর তৃতীয় ছেলে মাকে নিজের থেকে কিছুই বলে না। মা যদি জিজ্ঞাসা করে—কী রে কোনটা ভাল হয়েছে খেতে? কী খেতে ইচ্ছা করে? তাহলেও সে নিজের থেকে কিছু বলে না। সে মাকে বলে—তোমার যেটা ভাল লাগে সেটাই দিও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে মায়ের ভাললাগা অনুযায়ী মা যা রেঁধে দেন সেটা তার মুখে যদি ভাল লাগে তবে খায়, কিন্তু যেটা ভাল লাগে না সেটা সে ফেলে দেয়, কিছুতেই সে সেটা খায় না। এই ছোট ছেলেকে নিয়েই হয়েছে মায়ের সবচেয়ে যন্ত্রণা। তার কারণ সে তার নিজের রুচি সম্বন্ধে সচেতন হলেও সেটা সে পরিষ্কার ভাবে বলতে পারে না। না-বলার জন্য তার রুচি অনুযায়ী খাবারও তৈরি হয় না। মায়ের রুচি অনুযায়ী মা যে খাবার বানান তার মধ্যে থেকে যেটা তার ভাল লাগে সেটাই সে খায়, অন্যটি খায় না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সংসারে ব্যক্তিগত ভাললাগা নিয়েই যত অশান্তি। তার ফলে পরস্পরের সঙ্গে হয় দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া। ব্যক্তিগত ভাললাগা, ভাল না-লাগা হল মনোধর্ম। মনোধর্ম সবার এক রকম হয় না। গুণভেদে পরস্পরের মধ্যে মনের পার্থক্য হয় এবং মনের ইচ্ছা, ভাব, চিন্তা, ধারণা, কল্পনা, ভাবনা, কর্ম, সাধনা, অনুভূতি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সেই জন্য পরস্পরের মধ্যে চিন্তা, কর্ম ও ভাবের প্রকাশে পার্থক্য হয়। আবার সে সব জ্ঞান ও ভাবের অধিষ্ঠানও আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানে অবিদ্যা-অজ্ঞানের অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান হয়। তখন মনের মোহ, আসক্তি ও অভিমানও থাকে না। আপনবোধে হয় আত্মজ্ঞানের অনুভূতি অর্থাৎ আপনবোধ পূর্ণ হলে হয় আত্মজ্ঞানের অনুভূতি। জীবনে সব কিছুর মধ্যে আপনবোধকে বসিয়ে ব্যবহার করলে আত্মজ্ঞান জেগে ওঠে। আত্মজ্ঞানে হয় সব কিছুর সমাধান। আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানে সমস্যা বাড়ে, সমাধান মেলে না।

আপনবোধের অভাবে অন্য বোধ প্রধান হয়, তার ফলে আত্মজ্ঞানও মেলে না, জীবনে মুক্তিশান্তিও আসে না। সংসারে সবারই কিছু না কিছু অভাব আছে, ফলে অশান্তিও আছে। অভাব কারও কোনও দিন মেটে না কারণ মনের একটি কামনা পূরণ হলে আরও দশটি কামনা বাড়ে। তার ফলে তার অভাব, অশান্তি বেড়েই চলে। এ সবের সমাধানের জন্য সহজ বিধান হল একবোধে বা আপনবোধে সব 'মেনে, মানিয়ে চলা'—এই সহজ সাধনই হল শান্তি লাভের সর্বোত্তম উপায়।

১৫। ৮। ৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৬

জীবনের প্রথম পর্যায়ে যদি পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় তাহলে অবশিষ্ট জীবনের ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করেন। এই বিশ্বাস ঈশ্বরানুভূতির সর্বোত্তম সহায়ক। প্রসঙ্গের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

দক্ষিণ ভারতে এক গৃহীর বাড়িতে এক সাধুবাবা উপস্থিত হলেন। গৃহী ভদ্রলোক হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনি সাধুবাবাকে তার বাড়িতে রেখে তাঁর সেবাযত্নের সব ব্যবস্থা করে কোর্টে গেলেন।

তিনি কর্মস্থল থেকে বাড়িতে এলে সাধুবাবা বললেন—শুনেছি তুমি সংসারের কিছুই দেখ না।

গৃহী—সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেউ আমার নয়, সবই ভগবানের। আমার বলতে শুধু ভগবান এবং আমার চার দিকে যা-কিছু আছে সব তাঁরই।

এই গৃহী ভদ্রলোকের সংসারের সব কিছুই অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হত। ভগবানের স্মরণ নিয়ে তিনি বিচারের রায়ও লিখতেন।

গৃহী ভক্তের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, অকপট নির্ভরতা ও অখণ্ড বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সর্বত্যাগী সাধু মহাত্মা বিস্মিত হলেন। তিনি পরে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—গৃহত্যাগী সাধুদের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অকপট নির্ভরতা ও অখণ্ড বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত বিরল। সংসারের ধর্ম পালন করেও ঈশ্বরবোধে মুক্তজীবনের দৃষ্টান্ত হল এই গৃহী ভক্ত।

পরিপূর্ণ ভাবে কারও ভার একমাত্র ঈশ্বরই গ্রহণ করতে পারেন। আলোচ্য কাহিনিটি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ। সংসারীদের মধ্যে এমনকী সাধুসমাজেও এইরূপ অনন্যসাধারণ জীবন্ত দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। সংসারে মানুষের চার দিকে যা আছে, যা ঘটে তা সে দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তার কাছে সবই অতি সাধারণ বাস্তব বই অন্য কিছু নয়। বাস্তবকেও যথার্থ ভাবে জানা ও বোঝার যোগ্যতা বাস্তববাদীদের মধ্যেও অতি দুর্লভ। বাস্তবের মধ্যেও যে অতিবাস্তব নিহিত আছে তা সাধারণের নজরে পড়ে না। যারা অন্তর্দর্শী অর্থাৎ যাঁদের দিব্যদৃষ্টি খুলেছে তাঁরাই বাস্তবের মধ্যে অতিবাস্তবকে দর্শন করেন।

জীবনে সংস্কার অনুসারে মানুষ তার আদর্শ ও লক্ষ্যকে বেছে নেয় ও তদনুসারে জীবনযাপন করে। অন্তর্ভাববোধের প্রকাশবিকাশ অতীত সংস্কারের ভিত্তিতে যেমন হয় সেইরূপ অন্তরের ভাববোধের ভিত্তিতেও নূতন সংস্কার তৈরি হয়। উভয়ে উভয়ের

সম্পূরক ও পরিপূরক। বিশ্বরূপে যখন এক ঈশ্বরই স্বয়ং বিদ্যমান তখন সর্বজীবনই তাঁর প্রকাশমাধ্যম—তাঁরই প্রতিমূর্তি। তবে অন্তঃপ্রকৃতির গুণভাবের মাত্রা অনুসারে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাববোধের প্রকাশবিকাশ হয়। শুভ সংস্কারের অধিকারী যারা তাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাববোধের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যাদি অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায়। তাদের জীবনে এমন অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ প্রকাশ পায় যা যোগ্য অধিকারীর কাছে সহজেই ধরা পড়ে। যোগ্যতাই হল জীবনের মানদণ্ড যার দ্বারা অন্তরের ভাববোধের ধারণা সিদ্ধ হয়।

অন্তর্ভাববোধের অভিব্যক্তি অধিক মাত্রায় যাদের ভিতরে প্রকাশ পায় তারা সংসারের বাইরে নির্জনেও থাকতে পারে আবার সংসারেও থাকতে পারে। যদিও তা সংস্কারবোধের ভিত্তিতেই জানা যায়, তথাপি এই প্রসঙ্গে অবিবেচনামূলক গোঁড়ামি অযোগ্যতারই লক্ষণ। তা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

প্রতিটি মানুষ যখন ঈশ্বরের বিশেষ রূপ বা প্রতিমা তখন কারওকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা অবিদ্যা-অজ্ঞানপ্রসূত অযোগ্যতার লক্ষণ। আবার বিশেষ কারওকে নিয়ে অধিক মাতামাতি করাটাও সমীচীন নয়।

অন্তরের মূল্যায়ন অন্তর্বোধ দিয়ে হয় ও বাইরের মূল্যায়ন বহির্বোধ দিয়ে হয়। উভয়ের মূল্যায়ন সমবোধে বা আপনবোধে হয়। 'সমানবোধে ভগবান ও অসমানবোধে শয়তান।' এটা একটা প্রবাদবাক্যে পরিণত হবে কালক্রমে। জীবনের সর্বোত্তম মূল্যায়ন সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তা বিশেষ অধিকারী পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। অধিকারীর মান অনুসারে ব্যবহারবিজ্ঞানকে উত্তম, অধম এবং অধমাধম রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। সমগ্র ব্যবহারবিজ্ঞান অন্তর্বিজ্ঞানেরই নামান্তর। অন্তর্বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হল বিশুদ্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর-আত্মা-ভগবান।. তাঁর পরিচয় তিনিই স্বয়ং। তাঁর মধ্যে সব, সবার মধ্যে তিনি। তিনিই সব, সবই তিনি।

২০। ৮। ৬৮

২৭

এক অখণ্ড পূর্ণ বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তার বুকে তার অখণ্ড প্রকাশবিভূতির ঘনীভূতরূপ হল এই বিশ্বজগৎ। ভূমা বোধসত্তাকে কেন্দ্র করে তার এই অনন্ত প্রকাশধারার সৃষ্টি, বৃদ্ধি বা প্রসারতা, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়। বোধময় এই সত্তাই হল সর্বজীবনের উৎস। জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনীয় উপকরণ কেন্দ্রসত্তার থেকেই আসে।

এই সত্তা থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু বৈচিত্র্যময় বহিঃপ্রকাশের দিকে মানুষের মনের দৃষ্টি অধিক থাকার ফলে কেন্দ্রের অখণ্ড বোধময় পূর্ণসত্তার স্মৃতি সাধারণত আবৃত থাকে। মনের বোধে নিজেদের পৃথক ভেবে মানুষ মৃত্যুভয় ও নানাবিধ চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে অস্থির ও চঞ্চল হয়। সেই জন্য মহাপুরুষগণ সকলকেই এই সত্তার পরিচয় ধরিয়ে দিয়ে যান।

রূপ, নাম, ভাব, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি বোধময় অখণ্ড সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। এই সত্যকে উপলব্ধি করাই হল মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই সত্য উপলব্ধিই হল অধ্যাত্মসাধনা বা প্রাণের সাধনা। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের মুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

একবার কোনও এক সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে যোগশিক্ষার তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে এক যুবক এসে উপস্থিত হল। বিনীত ভাবে সে তার মনের সংকল্প মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করে বিশেষ কোনও একটি যোগের পদ্ধতি শিখবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়।

মহাপুরুষ দিব্যদৃষ্টির বলে আগন্তুক যুবকের অতীতের সংস্কার অনুযায়ী তার অন্তরে যোগশিক্ষার জন্য ব্যাকুলতার কারণ অবগত হলেন ও প্রীত মনে তাকে আশীর্বাদ করে তাঁর কাছে থাকতে বললেন এবং যথাসময়ে সব ব্যবস্থা হবে এই আশ্বাসও দিলেন।

প্রতিদিনই যুবকটি যখন মহাপুরুষের সঙ্গ করে তখন তাঁর বালকবৎ আচরণে সে আনন্দ পায়। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পরে যুবকের মনে যোগশিক্ষার ব্যাকুলতা আরও বেড়ে যায়। মহাপুরুষের কাছে যোগের বিশেষ কোনও শিক্ষাপদ্ধতি না-পেয়ে সে তার জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ জানায়।

মহাপুরুষ প্রায়ই তাকে সর্বোত্তম যোগের পদ্ধতি শেখাবেন এই আশ্বাস দেন এবং তার সঙ্গে দিব্য মহাভাবের আবেশে অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করেন। তার ফলে যুবকের মন কখনও কখনও ধ্যানাবেশে আবিষ্ট হয়ে যেত। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পরে সেই মহাপুরুষ দেহরক্ষা করেন। তখন যুবকটি সেই সব স্মৃতি মন্থন করেই উত্তরকালে এক বিরাট যোগীতে পরিণত হয়েছিল।

জীবনসাধনার রহস্য হল অন্তঃশক্তির সাহায্যে বৃহত্তর একটি নূতন গতিশক্তি সৃষ্টি করা, যার দ্বারা পূর্ণতা অনুভব করা যায়। ঈশ্বরের মধ্যে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনও সত্তা নেই। সর্ববিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঈশ্বরই নিত্যবিদ্যমান। মনের দৃষ্টিতে প্রাণের তথা বোধসত্তার প্রকাশধারাতে ভেদ বা পার্থক্য কল্পিত হয়। তার ফলে বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি রূপ ও নাম আপাতদৃষ্টিতে অর্থাৎ মনের ধর্ম অনুযায়ী স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক সত্য বলে মনে হয়। এই হল নিত্যসত্যের বুকে মনের ভ্রান্তিবিলাস। নাম-রূপের কোনও পৃথক অস্তিত্বসত্তা নেই। তা নিত্যবোধসত্তারই প্রকাশস্বরূপ। সর্ববস্তুতে ঈশ্বরীয় নাম যুক্ত করে তদ্‌বোধে ব্যবহার করলে মনের ভ্রান্তি দূর হয় এবং ঈশ্বরীয়বোধের স্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা সাধন প্রণালীর কথা শুনে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, কাজেই মহাপুরুষগণ বোধস্বরূপ মহাপ্রাণকেই ধরিয়ে দেন সহজ করে। এই মহাপ্রাণের সঙ্গে মনকে যুক্ত করতে হয়। মহাপ্রাণের মধ্যে নাম-রূপ সবই সত্য। প্রথমে জড়ত্বের মধ্যে

এই সত্য উপলব্ধি করা খুব কঠিন। মহাপ্রাণই মানুষের সবচেয়ে নিকটে। অনন্ত শক্তি এই প্রাণের।

মানুষের অনন্ত জীবনের কামনাবাসনার সংস্কার কাঁথা সেলাইয়ের মতো এই প্রাণের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। এই সংস্কারগুলির জন্যই মূল প্রাণের তথা বোধসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। সকলে বাইরে এই প্রাণকেই খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু মহাপুরুষদের নির্দেশ মেনে চললে অন্তরে এই প্রাণের পরিচয় সহজেই মেলে। চৈতন্যস্বরূপ প্রাণই ভগবান।

২০। ৮। ৬৮

২৮

ব্যক্তিগত প্রাধান্যই ঈশ্বর লাভের অন্তরায়। প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরীয় ভাব লুকিয়ে আছে। মহাপুরুষদের সঙ্গ করলে প্রাণের মধ্যে থেকেই একে একে ঈশ্বরীয় ভাবসকল প্রকাশিত হয়। অন্তঃপ্রাণের মধ্যে মন দিয়ে মন্থন করে ঈশ্বরীয় ভাবসকল তুলে আনতে হয়। মনের প্রশান্ত অবস্থাই হল গুরুমূর্তি বা ইষ্টমূর্তি। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টা করলে গুরুই পথ দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ অন্তর্বোধই (বিবেক) পথের সর্বোত্তম দিশারি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার এক কৃষ্ণভক্ত সাধক বহু সাধনা করেও প্রাণের ভিতর থেকে কোনও সাড়া না-পেয়ে যমুনাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে গিয়েছিল। গলাজলে নামবার পরে ছোট একটি বালিকার বেশে রাধারানি তাকে এসে বললেন—ওগো অভিমানী, তুমি কী করছ? প্রাণটা কাকে দিচ্ছ? প্রাণকে নাশ করতে নেই। প্রাণের মালিক তুমি নও, তোমার প্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে কি এই ভাবে অবজ্ঞা করতে হয়? তুমি তো তাঁর ভজনা করেছ। তাঁর দর্শন পাওনি বলে মন ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ যে তোমার মধ্যে থেকে তোমার সাধনভজনের সকল জোগান দিয়েছেন সেদিকে মনের যথার্থ ধ্যান রাখনি। তাই তাঁকে দেখতে পাওনি। নিজের কথাই শুধু ভেবেছ, তাঁর দিকে তো একবারও তাকাওনি। এতদিন কী করে সাধনা করেছ এবং সাধনা করে কী পেয়েছ? সাধক বলল—এতদিন তাঁকে ডেকেছি কিন্তু কিছুই পাইনি। তখন বালিকাবেশী রাধিকা বললেন—তুমি এতদিন ব্যক্তিগত প্রাধান্য রেখে সকাম ভাবে কৃষ্ণের ভজনা করেছ। এতদিন তুমি যা করেছ ও যা পেয়েছ তা চোখ বুজে একনিষ্ঠ মনে একটি একটি করে সংযুক্ত করে অন্তরে ভেবে দেখ।

তখন সেই সাধক চোখ বুজে স্থির মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করে নিজের সাধনভজনের কথা ভাবতে লাগল এবং ভাবতে ভাবতে অন্তরের গভীরে ডুবে গেল। কিছুকাল এই ভাবে থাকার পরে বাহ্যজগতের হুঁশ আসতেই চোখ মেলে দেখতে পেল যে, তার সামনে কেউ নেই। বালিকাবেশী রাধারানি অদৃশ্য হয়েছেন। শুধু একটি বাঁশের বাঁশি এবং কিছু টাটকা ফুল ও ফল সামনে পড়ে আছে। এই দেখে সাধক লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তার পরে এই ঘটনার বিষয়বস্তু স্মরণ করতে করতে সে মহাভাবে

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ছয় বছর 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটায়। পরিণামে সর্ববস্তুর মধ্যে সে শুধু কৃষ্ণকেই দেখতে পেত। এই ভাবে কৃষ্ণময় হয়ে কিছুকালের মধ্যেই তার জীবন কৃষ্ণের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

গল্পটি শেষ করে তার তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রেমের ঠাকুরকে অনুরাগ সহকারে ডাকলে তিনি আসবেনই। ভক্তের ডাক কখনও বৃথা যায় না। অনুরাগের তারতম্য অনুসারে সময় মতো ভগবানের দর্শন মেলে। ভগবানেরও একটি কৃত্রিম অভাব আছে—নিজেই ভক্ত সেজে ভক্তের মুখে নিজের নাম শুনতে তিনি ভালবাসেন।

গল্পের বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনের দৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক। সংসারে মানুষ কামনাবাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাস করে এবং সে সব পূরণ করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সব সময় আশানুরূপ ফল সে পায় না। তার ইচ্ছা বা.আকাঙ্ক্ষা যতটা পূরণ হয় ততোধিক আবার বেড়েই চলে। সংসারজীবনের সাধ-আহ্লাদ যথার্থ ভাবে কারওরই পূর্ণ হয় না। সংসারী মানুষ তার জন্য চেষ্টা করেও বিফল হয়। তার চিত্ত সেই জন্য অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়। সংসারীরা এই ভাবকে কোনও মতেই অতিক্রম করতে পারে না। সংসারজীবনে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত ও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে যারা সংসারের বাইরে বেরিয়ে আসে তারা অন্তরের জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখবেদনা, ভয়ভাবনা ও অশান্তি থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে। তারা অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যমে চিত্তের সমাধান খোঁজে। আশানুরূপ সমাধান না-হলে চিত্তের বিক্ষোভ বাড়ে।

আলোচ্য কাহিনির মধ্যে কৃষ্ণসাধকের মনের অবস্থা সেইরূপ হয়েছিল। ইষ্ট-গুরুর যথার্থ নির্দেশ ও সাহায্য ছাড়া কোনও সাধকের পক্ষেই ইষ্টসাধন সিদ্ধ হয় না। জীবের অমার্জিত, অসংযত, মিশ্র ও মলিন ভাববোধ দ্বারা ইষ্টের সন্ধান মেলে না, মিললেও সে বুঝতে পারে না। অন্তঃপ্রকৃতির গুণের মান অনুসারে তার ভাব ও ধ্যানধারণা প্রকাশ পায়। সদ্‌গুরুর কৃপায় ও নির্দেশে তা যথার্থ ভাবে সুসাধিত হলে অন্তরের মলাবরণ, ভেদভাবনা প্রভৃতি অপসারিত হয়। তখন অনায়াসে তার ইষ্টমূর্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। কামাহত জীব স্বকল্পিত অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রভাবে জীবনে চলে চিত্তের মল সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে না। ইচ্ছা মতো কোনও সাধনাই হয় না। অবিদ্যাকে অতিক্রম করার জন্য বিদ্যা সাধনার প্রয়োজন। তা সম্ভব ও সিদ্ধ হয় সদ্‌গুরুর কৃপায় ও সাহায্যে। ইষ্ট ও গুরু অভিন্ন হলেও ইষ্টই গুরু সেজে আশ্রিতের ইচ্ছা পূরণ করেন। জন্ম জন্মান্তরের স্বভাবসুলভ মনোবিলাসের সঞ্চিত মলাদি কেবলমাত্র স্বকল্পিত ক্রিয়াকলাপ ও সাধনভজনের দ্বারা নির্মূল হয় না। ইষ্ট-গুরুর ইচ্ছা ও কৃপাশিসের মাধ্যমেই তা বিদূরিত হয়। তখন সাধক শুদ্ধ চিত্তে ইষ্ট-গুরুর সেবা, স্মরণ, মনন ও ধ্যান যথার্থ ভাবে অভ্যাস করতে পারে। তার ফলে যতই তার চিত্ত সংযত, একাগ্র ও সমাহিত হয় ক্রমপর্যায়ে ততই তার অন্তরে গুরু-ইষ্টের স্বভাব মহিমা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ হতে

থাকে। প্রথমে অন্তর্দর্শনাদি কিছু প্রকাশ পেলেও তারপর উপলব্ধির গভীরে সে প্রবেশ করে। চিত্তের সমাধান হয় অনুভূতির গভীরে আপনবোধের কেন্দ্রে। গুরুর সঙ্গে আপনবোধের সম্যক্ যোগ ও ঐক্য প্রকাশ পায় উপলব্ধির চরমে।

সত্য হল স্বানুভবসিদ্ধ। প্রথমে হয় দ্বৈতবোধে সাধকের ইষ্টদর্শন এবং পরে অনুভূতির পরিপক্ক অবস্থায় তা অদ্বয়বোধে আপনবোধের পরাকাষ্ঠারূপে প্রকাশ পায়।

অন্তরে-বাইরে, সর্বভূতে, সর্ব অবস্থায় ইষ্টের দর্শন ও অনুভূতি অদ্বয়জ্ঞান, সমজ্ঞান ও একরসবোধেরই নামান্তর। সাধনার প্রথমে তা সাধকের কাছে সহজবোধ্য হয় না, দুর্বোধ্যই থাকে। সাধনার ক্রম অনুসারে তার অন্তর্দর্শনাদির প্রকাশবিকাশ ঘটে এবং অন্তরের ব্যাকুলতার মানের তীব্রতা অনুসারে সমগ্র দর্শনাদি স্বানুভূতির গভীরে মিশে বোধে বোধময় হয়ে যায়। এই হল সর্ব অধ্যাত্মসাধনার সর্বোত্তম লক্ষণ। অতি দুর্লভ এই অনুভূতির অধিকারী। সব সাধক এই অবস্থা লাভ করতে পাবে না।

ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ দু'টি ভাব। সগুণ ভাবের ভক্তসাধক ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসে। তার নিজের কোনও ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চাহিদা সে রাখে না। নিজের মতো করে সে কিছু না-চেয়ে ইষ্টের মতো সে হতে চায়। তাতেই তার আনন্দ। অপরপক্ষে ঈশ্বরের নির্গুণ ভাবের সাধক ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে অদ্বয় ভাববোধে ধ্যান ও ভাবনা করতে করতে তদ্‌বোধে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ অদ্বয়বোধস্বরূপই তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তার কাছে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার প্রভৃতি পৃথক ভাববোধের কোনও গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকে না। সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য হলেও উত্তম অধিকারীর কাছে তা-ই হল একমাত্র লক্ষ্য।

ঈশ্বর হলেন ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য হল গুরু-ইষ্টের সঙ্গে যোগসিদ্ধি। যোগী ও জ্ঞানীর লক্ষ্য হল আত্মা-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা।

২০। ৮। ৬৮

২৯

কর্তৃত্ববোধে ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করে কেউ যথার্থ ধার্মিক ও নিষ্কাম কর্মী হতে পারে না। সর্ববিধ কামনাবাসনা ও কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পিত হলে মানুষ দিব্যজীবন লাভ করে। তারপর কর্তৃত্বাভিমানকেও পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে সে ঈশ্বরীয় স্বভাবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সাধনার মাধ্যমে প্রথমে কামনাবাসনার শোধন হয়। দ্বিতীয় স্তরে কর্মফলে অনাসক্তি আসে এবং পরিশেষে কর্তৃত্ববোধের অবসান ঘটে। কর্তৃত্ববোধ থাকা পর্যন্ত সাধক মুক্তির আস্বাদন পায় না। তার ভোগের সংস্কার থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক শক্তিধর যোগী মহাত্মা কোনও এক শহরের প্রান্তে আশ্রম তৈরি করেছিলেন। তাঁর শক্তির মহিমা এবং যোগবিভূতির কথা চার দিকে প্রচারিত হয়েছিল। বহু রোগী

দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে তাঁর কাছে আসত। তিনি তাদের রোগ সারিয়ে দিতেন। রোগমুক্ত হয়ে সকলে তাঁর গুণকীর্তন করে আপন আপন গৃহে চলে যেত। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের স্বভাবপ্রকৃতি শোধনের জন্য তদনুরূপ সাধনভজন করেনি। অশুভ সংস্কার অনুযায়ী জীবনযাপন করে তারা রোগাক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু রোগমুক্ত হয়েও প্রারব্ধ—অশুভ সংস্কারবশেই চলতে থাকে। তাদের কঠিন ব্যাধিগুলি সমবেত হয়ে মহাত্মার ভিতরে প্রবেশ করেছিল। মহাত্মা তা অবগত হয়ে সমূলে তাদের বিনাশের চেষ্টা করাতে ব্যাধিগুলি ক্রুদ্ধ হয়ে বলল যে, তারা কোনও মতেই দেহ ছেড়ে যাবে না, মহাত্মার দেহেই তারা বাস করবে। তখন মহাত্মা তাঁর ডান পায়ের এক আঙুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পায়ের এই আঙুলে ব্যাধিগুলির প্রকোপ প্রকাশ পেয়ে অন্যান্য আঙুলেও ছড়িয়ে পড়ে। চলতে-ফিরতে মহাত্মার খুবই অসুবিধা হত। অনেক সময় রোগের যন্ত্রণায় তাঁকে বিশেষ কষ্টও পেতে হত।

এই অবস্থায় অপর এক মহাত্মার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেই মহাত্মা তাঁকে দেখে তাঁর কাজের সমালোচনা করে তাঁকে বললেন, তিনি সূক্ষ্ম ঈশ্বরীয় নীতি লঙ্ঘন করেছেন। কারণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্কারগত কর্মফলের ভোগ ব্যাধিরূপে তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। সেগুলি তাদেরই কর্মফল। কর্মফল ভোগ না-করে খণ্ডন করা যায় না এবং শোধনও করা যায় না। কর্মফল ভোগের মাধ্যমে তপস্যার কাজ হয়, নিজের কুকর্মের অনুভূতি জাগে এবং তদনুরূপ সচেতন হওয়া যায়। অপরে তার ব্যাধি কেড়ে নিলে রোগী সাময়িক ভাবে ব্যাধিমুক্ত হয় বটে, কিন্তু অশুভ সংস্কার হতে মুক্ত হয় না। সুতরাং এই রোগগুলিকে বহু জন্ম ভোগ করে শেষ করতে হয় এবং কী ভাবে ভোগ করতে হয় তাকে সেই বিধান দিয়ে মহাত্মা চলে গেলেন।

তখন সেই যোগী মহাত্মা যোগবলে বিপরীত ভাবনা দ্বারা সমস্ত ব্যাধির সংস্কাররূপ চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করার চেষ্টা করলেন। তার ফলে ব্যাধি সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে তাঁর চিত্তের গভীরে এক অংশে আত্মগোপন করে সুপ্ত ভাবে থেকে গেল। তাদের বিশেষ প্রকাশের অভাবে যোগী পূর্ববৎ চলতে লাগলেন। রোগগুলির কথা তিনি একেবারে ভুলেই ছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে তার দেহাবসান হয়।

পরবর্তী জীবনে সেই যোগী মহাত্মা পূর্বসংস্কার অনুযায়ী কোনও এক সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থেকে সাধনভজন করতে আরম্ভ করেন। পূর্বজীবনের সংস্কারের সাথে কঠিন রোগের সংস্কারগুলিও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বহু শুভ সংস্কারের সঙ্গে কঠিন ব্যাধিরূপ সংস্কারের প্রকাশের লক্ষণ দেখে তাঁর গুরু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সব অবগত হলেন এবং তাঁকে বললেন যে, পূর্বজন্মের কৃত কর্মের সঞ্চিত ফল সাথে করে নিয়ে আসার জন্য এই জীবনে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। সংস্কারের বীজ চিত্তের গভীরে লুকিয়ে থাকে। তার বহু শাখা-প্রশাখা সূক্ষ্মাকারে চিত্তের গভীরে লুকিয়ে থেকে প্রকাশের অপেক্ষা করে। সুযোগ পেলেই তারা বিকাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুভ সংস্কারের

সঙ্গে যুক্ত হয়ে অশুভ সংস্কারের বৃত্তিগুলিও অনেক সময় অভিব্যক্ত হয়। আবার পৃথক পৃথক ভাবেও তারা আত্মপ্রকাশ করে।

গল্পটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে জানা দরকার। সংক্ষেপে সবার বোধের উপযোগী করে বলছি শোন—বিশুদ্ধ চৈতন্য অখণ্ড। অখণ্ড চৈতন্য আনন্দঘন। তা-ই হল নিত্য সৎ বস্তু। সুতরাং সচ্চিদানন্দঘন অখণ্ডস্বরূপ হল ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মের পরিচয়। জীবজগৎ হল তাঁর বক্ষে স্বভাবের কল্পিত বিলাসরূপ। জীবজগতের মূল উপাদান সচ্চিদানন্দ। কিন্তু তার আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারাদি কল্পিত কল্পনার এক অভিনব রচনা। এই কল্পিত কল্পনাই হল অজ্ঞান, অবিদ্যা ও মায়া। তার কল্পিত কার্যাবলী হল কল্পিত তিন গুণের নিরন্তর মিশ্রণ-জনিত বিলাস।

স্বভাবপ্রকৃতির কল্পনাবিলাসের পরিণামই হল জীবজগতের প্রকাশ। সমগ্র জীবজগতে স্বভাবপ্রকৃতির কল্পিত লীলাবিলাস ঘটেই চলেছে। তার এই লীলাবিলাসের প্রকাশভঙ্গিমা বাস্তবরূপে জীবের কাছে প্রতিভাত হয়।

জীব মূলত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর-আত্মা হলেও স্বভাবকল্পিত কল্পনাবিলাসের দ্বারা স্বভাবলীলায় মেতে তার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অমৃত আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে আছে। জীবরূপী আত্মদেবতা আপন আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে তার অনাত্মাকল্পিত স্বভাব-বিলাসে মেতে আছে বলে তাকে অবিদ্যা-অজ্ঞানের বিকারজনিত ফল দুঃখকষ্টরূপে ভোগ করতে হয়। তবে যাঁরা স্বকল্পিত স্বভাববিলাসের অন্তর্নিহিত রহস্য ও তার মিথ্যাত্ব বিচারপূর্বক অবগত হয়ে তার মিথ্যা মায়াজাল থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন, তাঁরাই হলেন সাধুসন্ত, যোগী প্রভৃতি। তাঁদের জীবনে অশুভ সংস্কারের প্রভাব কম থাকে বলে তাঁরা শুভ সংস্কারের প্রভাবে চলে জীবনের ধর্ম ও সত্য পরিচয় যথার্থ ভাবে অবগত হতে চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কৃতকার্য হন তাঁরাই হলেন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সিদ্ধপুরুষ। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রকার দিব্য ও সৎ ভাববোধের অভিব্যক্তি হয়। তার ফলে তাঁরা অপরের অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত চিন্তা ও কর্মফলের বিকারাদি দেখে করুণাবশত তাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে চান।

বাস্তবদৃষ্টিতে তা অনেকের কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মমূলক ও জনহিতকর সাধুবাদরূপে বিবেচিত হলেও মানুষের জন্মগত কর্মসংস্কার ও ধর্মসংস্কারের বিজ্ঞানভিত্তিক নিগূঢ় রহস্যের জ্ঞান তাদের থাকে না। জীবনের ব্যবহারের মধ্যে জ্ঞান-অজ্ঞানের অবগতি ও অনবগতির পার্থক্য অধিকাংশ লোকেরই অজানা।

মোহ, আসক্তি, ভ্রান্তি, ভীতি যেমন অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রকাশলক্ষণ, সেইরূপ মানুষের দুঃখ ভোগের কারণ অবগত না-হয়ে অহংকারের মাধ্যমে রাজসিক ও তামসিক দয়াপরবশ হয়ে লোকহিতকর কাজ করতে গেলে তার ফল অজ্ঞানেরই পরিপূরক।

সাধারণ মানুষ সংস্কারের বশেই চলে। সংস্কারের প্রভাবেই তার জীবনের সব কিছু গড়ে ওঠে। স্বকৃত কর্মের ফল যখন দুর্বিষহ হয় তখন মানুষ নিজে তা থেকে আর মুক্তি

পায় না। অপরের সাহায্যে সাময়িক ভাবে উপশম হলে সে উপকারীর কৃত্রিম জয়গান গেয়ে স্বভাবসুলভ সংস্কারগত কর্মে মেতে ওঠে। পরিণামে তার দুঃখ দূর হয় না। জন্ম জন্মান্তর তাকে দুঃখের সংস্কার বয়ে চলতে হয় এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। অপরপক্ষে স্বহৃদয় দয়ার্দ্র চিত্ত পরোপকারী যারা, তারা অপরের উপকার করতে গিয়ে অপরের সংস্কারগত দুষ্কর্মের বীজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং ভোগের মাধ্যমেই তাকে তা নির্মূল করতে হয়, অন্য কোনও উপায়ে নয়। লোকে পরস্পর পরস্পরের উপকার করে সহজাত সংস্কার ও অহংকারের মাধ্যমে। পরোপকার অহংকারের দ্বারাই সাধিত হয়।

ঈশ্বরের বিধান জীবের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়েছে অতীব বিজ্ঞানভিত্তিতে। মানুষকে জীবনযাপন করতে হবে ঈশ্বরের নির্দিষ্ট বিধি ও নিষেধ মেনে। বিধি ও নিষেধ শব্দ দু'টির মধ্যে জীবধর্ম সম্পাদন করার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশ পাওয়া যায়। জীবরূপী মানুষকে তার সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য, সর্বতোভাবে নিঃশ্রেয়স্কর জীবনযাপন করার জন্য কী কী করা উচিত বা কর্তব্য এবং কী কী করা অনুচিত বা অকর্তব্য তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বিধিমূলক কাজগুলি একান্ত করা উচিত, অর্থাৎ তা কর্তব্য। তা যথার্থ ভাবে সম্পন্ন হলে মানুষের সর্ববিধ মঙ্গল ও কল্যাণ নিশ্চিত। কিন্তু তা যথার্থ ভাবে সম্পন্ন না-হলে এবং আদৌ তা ব্যবহার না-করলে মানুষকে অমঙ্গল ও অকল্যাণের ফল নানাবিধ বিকাররূপে, দুঃখকষ্টরূপে ভোগ করতেই হবে। অন্য দিকে নিষেধের পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ যা-কিছু নিষিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট তা যথার্থ মানা হলে তা অত্যন্ত মঙ্গল ও কল্যাণকর—নিজের পক্ষে এবং অপরের পক্ষেও। আবার তা যথার্থ মানা না-হলে অথবা আংশিক মানা হলে অথবা আদৌ মানা না-হলে তার ফল দুঃখপ্রদ হবেই।

চিন্তা ও কর্মের আশ্রয়ে জীবন পরিচালিত হয়। উভয়ক্ষেত্রেই বিধি-নিষেধের প্রয়োগ যথার্থ ভাবে নির্দিষ্ট আছে। তার ব্যবহারে কোনও প্রকার অবহেলা বা প্রত্যবায় হলে তদনুরূপ ফল জীবনকে ভোগ করতেই হবে। সাধারণ মানুষের জীবন বেশির ভাগই আদর্শবিহীন। কোনও মহৎ আদর্শ অবলম্বন না-করে এবং তা যথার্থ পূরণের উপযোগী প্রচেষ্টা না-করলে জীবন অজ্ঞানমুক্ত হতে পারে না। অন্তর্ভাববোধের ক্রমবিকাশ সুষ্ঠু ভাবে সাধিত হয় মহৎ আদর্শভিত্তিক জীবনসাধনার মাধ্যমে।

কর্মসাধনা যেমন মহৎ আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া দরকার, ধর্মসাধনাও সেইরূপ মহৎ আদর্শের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। আদর্শ অনুরূপ চিন্তা ও কর্ম, ধর্ম ও কর্ম স্বভাবতই শুভ ফলদায়ক হয়। সাধারণ মানুষের জীবন গতানুগতিক ভাবধারা অনুসরণ করেই এগিয়ে চলে। আত্মিক উন্নতির জন্য মানুষকে নৈতিক আদর্শের সাহায্য নিতে হয়।

ধর্মসাধনার প্রথম স্তর গতানুগতিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয় স্তরে নীতিমূলক ভাবধারা অবলম্বন অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রয়োজনও অধিক। তৃতীয়

স্তর সর্বোত্তম জ্ঞানের তথা সমজ্ঞানের বা অদ্বয়জ্ঞানের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হয়। নানাত্ব-বহুত্ব জ্ঞানের ফল অধিক বিকারী ও পরিণামী, সুতরাং তা সর্বতোভাবে দুঃখপ্রদ। দ্বৈতবোধের জ্ঞান পূর্ববর্তী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও তা বিকারী ও পরিণামী। অদ্বয়বোধের জ্ঞান নিত্যসমান বলে তা বিকারবিহীন ও পরিণামমুক্ত।

সাধুদের জীবনেও এই ত্রিবিধ জ্ঞানের প্রকাশলক্ষণ যার ভিতর যেমন অভিব্যক্ত হয় সেই মতো তার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আলোচ্য কাহিনিটি খুবই শিক্ষাপ্রদ বলে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ তত্ত্বের দৃষ্টিতেই বলা হল।

২৮। ৮। ৬৮

৩০

বিষযাসক্ত মোহগ্রস্ত লোকের সহজে ত্যাগ-বৈরাগ্য আসে না, তারা নিষ্কাম কর্মের মহিমা বুঝতে পারে না। অতিরিক্ত বিষয়চিন্তার ফলে তারা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, ফলে বিষয়-আশয় থাকা সত্ত্বেও ভোগ করে যেতে পারে না। সকাম কর্মের সিদ্ধি ও নিষ্কাম কর্মের সিদ্ধির পরিণাম সহজেই অনুমেয়। সকাম কর্ম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের নিম্নোক্ত গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

কোনও এক গ্রামে একজন লোক ফলের বাগান করার উদ্দেশ্যে অনেক জমি কেনে। সেই জমিতে নানাবিধ ফলের গাছ বুনে রাতদিন তা নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই বাগানের গাছ বড় হয়ে ওঠে ও তাতে ফল হয়। ফল পাকবার আগেই পাঁচজনে চুরি করে ফলগুলি খেয়ে ফেলে। সে নিজে আর ভোগ করতে পারে না। এই বিষয়ে পরিবাবের সঙ্গে তার প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ হয়। লোকটি ঘোর বিষয়ী। রাতদিন বিষয়চিন্তাতেই সে মগ্ন থাকে। অতিরিক্ত বিষয়চিন্তার ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে অকালেই তার মৃত্যু ঘটে। বিষয়-আশয় থাকা সত্ত্বেও সে সেগুলি ভোগ করে যেতে পারেনি। সুতরাং স্বোপার্জিত বিষয়ের মোহাকর্ষণে কয়েকবছর পরে ঐ পরিবারেই আবার তার জন্ম হয়। ইতিমধ্যে সেই ফলের বাগান পাঁচজনের দ্বারা বেদখল হয়ে যায়।

ছেলেটি যখন নাবালক তখন এক ফকির তাদের বাড়িতে আসে। বালককে দেখে ফকির এক ভবিষ্যদ্বাণী করে। তিনি বলেন—এই বালক এই জীবনেও বহু কিছু সঞ্চয় করে যাবে কিন্তু কিছুই ভোগ করে যেতে পারবে না।

এই ধরনের বিষয়াসক্ত মোহগ্রস্ত লোকের সহজে ত্যাগ-বৈরাগ্য আসে না এবং নিষ্কাম কর্মের মহিমা বুঝতে পারে না। বৈষয়িক লোকসানে ও প্রিয়জন বিয়োগের মর্মান্তিক আঘাতে কঠিন পীড়াক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল ভুগে অথবা মানী লোকের বজ্রাঘাততুল্য অপমানের ফলে এই ধরনের লোকের মধ্যে কখনও কখনও সংসারবৈরাগ্য প্রকাশ পায়। তখন তাদের মধ্যে অনেকে গৃহত্যাগ করে কিছুকাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা সাধুসন্তের আশ্রমে যাতায়াত করে। দৈবকৃপায় বা সাধুসঙ্গে এসে এদের মধ্যে কিছু লোক যথার্থ ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধনে লিপ্ত হয়। তারা আর সংসারে

ফিরে আসে না। এই রকম ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে থেকে দু-একজন আবার লালাবাবুর মতো অবস্থায় এসে সর্বত্যাগী হয়ে ঈশ্বরের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

বিশ্বজগৎ হল চৈতন্যের স্পন্দিত রূপ। বোধের স্পন্দন শব্দ এবং শব্দের স্পন্দন বৈচিত্র্য সৃষ্টির কারণ। সুতরাং বোধস্বরূপই স্বয়ং সর্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান।

১। ৯। ৬৮

৩১

পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা হল বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ, কেন্দ্র ও তুরীয় সত্তা। তাঁর বক্ষে বোধের আদি স্পন্দনকেই নাদব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম বা কার্যব্রহ্ম বলে। এই নাদব্রহ্মকেই পরমাত্মার স্বভাবশক্তি বা অনন্ত মন বলে। তা সগুণ ঈশ্বর, আদ্যাশক্তি, মহাপ্রাণচৈতন্য প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

সগুণ ঈশ্বরের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য ব্যবহারই তাঁর স্বভাববিজ্ঞান। সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবনের মাধ্যমে সগুণ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশকেই বিশ্বলীলা বলে। ব্যষ্টি-জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমষ্টিজীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সাদৃশ্য ও যোগ আছে। যেমন অন্তঃপ্রকৃতির সাহায্যে বহিঃপ্রকৃতি কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়, সেইরূপ সমষ্টিজীবনের সাহায্যে ব্যষ্টিজীবনের পূর্ণতা, মুক্তি ও শান্তি লাভ হয়। ব্যষ্টিজীবন বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হয় অন্তঃপ্রকৃতির মাধ্যমে। তারপর সে অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হয় কেন্দ্রসত্তার অনুগ্রহে। বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে ব্যষ্টিজীবন প্রথমে অপূর্ণ, অসংযত, বস্তুনির্ভরশীল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ থাকে। অন্তঃপ্রকৃতির সাহায্য নিয়ে সে ক্রমপর্যায়ে সুসংযত, বিষয়নিরপেক্ষ ও পূর্ণতর হয়। তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্মজীবনে ঈশ্বরের বিগ্রহের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের বিগ্রহমূর্তিকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরের নাম, ভাব ও বোধের সাধনা অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাবে সাধনার উত্তম অবস্থায় ব্যষ্টিজীবন কেন্দ্রে বোধস্বরূপের পরিচয় অবগত হয়ে সিদ্ধ ও মুক্ত হয়। সাধনার উত্তম অবস্থায় বিগ্রহের সঙ্গে তার জীবন্ত সম্বন্ধ তৈরি হয়। তার সঙ্গে বিগ্রহ সাধারণ মানুষের মতো কথাবার্তা বলে ও আচরণ করে। চিন্ময় বিগ্রহ প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা বলছি শোন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত এক চৌধুরী পরিবারে কর্তা ও গিন্নির মনে খুব দুঃখ ছিল কারণ তাদের কোনও সন্তান ছিল না। চৌধুরীমশাই তার এক বন্ধুর (রায়মশাই) বাড়িতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যান। তার বন্ধু ধার্মিক এবং ভক্ত। তিনি প্রতিদিন ঠাকুরঘরে পূজার আসনে গোপালের বিগ্রহকে গভীর ভক্তি ও স্নেহ ভরে নানা রকম পোশাকে সাজান, নানাবিধ ভোগ নিবেদন করেন, খাওয়ান, তাঁর সঙ্গে আপন মনে কথা বলেন, গান করেন, কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা ভাবাবিষ্ট হয়ে তন্ময় বা ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। এই ভাবে মহানন্দে গোপালকে নিয়ে তার দিন কাটে।

চৌধুরীমশাই পূজা-অর্চনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নাস্তিক না-হলেও ধার্মিক নন। বন্ধুকে (রায়মশাই) পূজা-অর্চনার বিষয়ে প্রায়ই তিনি ঠাট্টা, বিদ্রূপ করেন। সেদিন

রায়মশাইয়ের বাড়িতে এসে ঠাকুরঘরে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন —গোপাল তো কথা বলতে পারে না, তাঁর সঙ্গে পাগলের মতো প্রলাপ বকে কী লাভ হয়?

রায়মশাই—আপনজন ও প্রিয়জনের মতো করে গোপালকে যে ভালবাসে তার সঙ্গে গোপাল মানুষের মতো কথা বলে এবং মানুষের মতো ব্যবহাব করে।

এই কথা শুনে চৌধুরীমশাই বিদ্রুপের হাসি হেসে অন্যপ্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে যান। বাড়ি গিয়ে গিন্নিকে সবিস্তারে রায়মশাইয়ের কথা বললেন। সেই দিন শেষরাতে তার বাড়িতে একজন বাউল এসে গেয়ে গেল—

"নন্দরানি মাগো, কানুকে সাজিয়ে দাও
গোষ্ঠের বেলা হল..................।"

গান শুনতে শুনতে চৌধুরীগিন্নি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। স্বপ্নের বিষয় হল—গোপালের মতো ছোট্ট একটি হাসিখুশি সুন্দর ছেলে তার বাড়ির একটি অব্যবহৃত ঘরে পূজার আসনে বসে খাবার খেতে চাইছে।

সেই দিন সকালে এক ফকির ভিক্ষে করতে এসে চৌধুরীগিন্নির বিষণ্ণ বদন দেখে তাকে বলল—সন্তান নেই বলে তোমাব এত দুঃখ কেন গো মা? সন্তান থাকলে কত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয তা তো জান না! তার অসুখবিসুখে দুঃখ হয়, সে অবাধ্য হলে দুঃখ হয়, আবাব মারা গেলেও দুঃখ হয়। এত দুঃখের কারণ যে সন্তান তার অভাবে কেন দুঃখ করছ? যে সন্তান মরে না, যার অসুখ হয না এবং কোনও রকম যন্ত্রণা দেয় না তাকে পেলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়। গোপালকে সন্তানবোধে সেবা কর, তাহলে তুমি আনন্দ ও শান্তি পাবে। এই বলে ফকির ভিক্ষা নিয়ে চলে গেল।

চৌধুরীগিন্নি স্বামীকে স্বপ্ন এবং ফকিরের বৃত্তান্ত সব বলে কাঁদতে কাঁদতে একটি গোপালের মূর্তি এনে দিতে বলল।

অনন্যোপায় চৌধুরীমশাই রায়মশাইয়ের শরণাপন্ন হলেন এবং তার সাহায্যে অষ্টধাতুর ছোট এক গোপালের মূর্তি কিনে এনে গিন্নিকে সান্ত্বনা দিলেন। গোপালের জন্য পূজার আসন ও নানাবিধ পূজার সরঞ্জামও আনা হল।

স্বপ্নে নির্দিষ্ট অব্যবহৃত ঘরেই গোপালের পূজার আসন পাতা হল। অপত্যস্নেহে প্রতিদিন চৌধুরীগিন্নি গোপালের সেবা করে। গোপালের সঙ্গে তাব মাতাপুত্রের সম্বন্ধ তৈরি হল। তাঁকে নিয়েই তার অধিকাংশ সময় কাটে। গোপালকে সাজায়, আদর করে, নানাবিধ খাবার ভোগ দেয়, খাওয়ায় আবার শাসনও করে। এই ভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তার অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তি জেগে ওঠে এবং গোপালের সঙ্গে জীবন্ত ভাবের সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। এখন গোপাল আর জড়মূর্তি নয়। জীবন্ত হয়ে তার সঙ্গে ব্যবহার করে আবার বিগ্রহের মধ্যে লুকিয়ে যায়। ছোট শিশু যেমন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে, গোপালও ঠিক সেইরূপ তার সঙ্গে ব্যবহার করে। তাঁর উৎপাত

দিন দিন বেড়েই চলে। চৌধুরীগিন্নি আর তাঁকে সামলাতে পারে না। স্বামীকে গোপালের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে অবিশ্বাসে তার কথা তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন।

স্ত্রীর কথাবার্তা ও ভাবগতিক দেখে তা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ ভেবে চৌধুরীমশাই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তার তার মধ্যে কোনও অসুখের লক্ষণ না-পেয়ে বাড়ি ফিরে যান।

এদিকে দিনের পর দিন গোপালের সঙ্গে চৌধুরীগিন্নির মাতাপুত্রের সম্বন্ধ নিবিড় হতে নিবিড়তর হতে থাকে। একদিন গোপালকে সে কেঁদে কেঁদে বলল—গোপাল তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কেন কথা বল না? উত্তরে গোপাল বলে—বাবা যে বিশ্বাস করে না। বাবা বিশ্বাস করলেই বাবার সঙ্গে আমি কথা বলব।

এই কথা শুনে চৌধুরীগিন্নি অনুযোগ করে গোপালের সেবার জন্য মাঝে মাঝে স্বামীকে ঠাকুরঘবে পাঠিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে চৌধুরীমশাই কোনও মতে গোপালের সেবা করেন। কিছুদিন ঐ রকম করার পরে গোপালের প্রতি তার একটা আকর্ষণ তৈরি হয় এবং সামান্য ভক্তিভাবেরও উদ্রেক হয়। তার ফলে সে মাঝেমাঝে গভীর রাতে গোপালের ঘর থেকে বাঁশি, নূপুরেব ধ্বনি এবং খোল-করতাল সহযোগে কীর্তনের ধ্বনি অথবা কোনও কোনও দিন শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনিও শুনতে পান। কিন্তু ঠাকুরঘরে গিয়ে মশারির ভিতরে শায়িত গোপালকেই শুধু দেখতে পান আর কিছু দেখতে পান না। এগুলি ভ্রম মনে করে তিনি এ সবের কোনও গুরুত্ব দেন না।

ইতিমধ্যে প্রায়ই তার স্ত্রী ঠাকুরঘরে গোপালের আসনের পাশে মাদুরের উপরে শুয়ে রাত কাটায়। একদিন রাতে গোপাল তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মাকে বলল—আমি আজ এক জাযগায় যাব। আমার সঙ্গে তুমিও যাবে। সেই জায়গার অপূর্ব বর্ণনা শুনে মা তাঁব সঙ্গে যেতে বাজি হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে চৌধুরীমশাই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঠাকুরঘরে ছুটে যান। তিনি দেখেন জীবন্ত গোপাল তাঁর মায়ের গলা জড়িয়ে মাদুরের উপবে শুয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার করে ওঠেন এবং গোপালকে ধরতে যান। গোপাল অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি গোপালের মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন তা প্রাণহীন।

এর পরে তিনি বাড়িঘর ত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে বহু দিন ভ্রমণ করেন এবং পরে বৃন্দাবনে গিয়ে গোপালের ভজন করেন। গোপালের ভজন করে অবশেষে তিনিও গোপালের সঙ্গে মিশে যান।

ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে হলে তাঁর বিগ্রহকে অবলম্বন করে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা ভাবে অথবা গুরু, মাতা, পিতা বোধে সম্বন্ধ পাতিয়ে একনিষ্ঠ ভাবে সাধনভজন করলে বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং সাধকও দিব্যজীবন লাভ করে।

শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসই হল সাধনভজনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বিশ্বাস করে শ্রদ্ধাসাগরে ভক্তিবারিতে জীবনকে নিমগ্ন করতে হয়। ব্যাকুলতা সহকারে আন্তরিক ভাবে তাঁকে ভজন করলে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন এবং অনুভূতি লাভ হয়।

শ্রদ্ধাবানের সঙ্গ করলে শ্রদ্ধা জাগে, বিশ্বাসীর সঙ্গ করলে বিশ্বাস জাগে, জ্ঞানীর সঙ্গ করলে জ্ঞান বাড়ে এবং ভক্তের সঙ্গ করলে ভক্তির উন্মেষ হয়।

'ডাকো ডাকো তাঁরে সকাতরে
ব্যাকুল হয়ে বারে বারে।'

কাহিনিটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আলোচ্য ঘটনাটি অনেকের কাছে আজগুবি বলে মনে হবে আবার অনেকের কাছে বাস্তব বলে মনে হবে। শুদ্ধ চিত্ত ভক্তের কাছে ঘটনাটি সর্বতোভাবে সত্য বলে গ্রাহ্য হবে।

সংসারে মানুষ ত্রিবিধ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক প্রকৃতির মানুষ হল ইন্দ্রিয়প্রবণ; রাজসিক যারা, তারা ভোগী ও কর্মপ্রবণ; সাত্ত্বিক যারা, তারা ধর্মকর্মে বিশ্বাসী এবং সেই ভাবে অধিক মনোনিবেশ করে। তাদের চিন্তা ও কর্ম তাদের ভাব অনুযায়ী হয় বলে অন্যের সঙ্গে তাদের ভাবের মিল খুব কমই হয়। অন্তরের ভাব অনুযায়ী মানুষ জীবনযাপন করে। তার আচারব্যবহারও সেই অনুরূপই হয়। অধ্যাত্মজগতে বা ধর্মজগতে তামসিকের দলই সংখ্যায় বেশি। রাজসিকের সংখ্যা তামসিকের থেকে কম এবং সাত্ত্বিক যারা তাদের সংখ্যা রাজসিকদের থেকেও কম। এ ছাড়া শুদ্ধসাত্ত্বিকদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। কদাচিৎ দু-একজন খুঁজে পাওয়া যায়, আবার তাও পাওয়া যায় না।

জাতমাত্রেই সবাই শূদ্র বা অজ্ঞানী। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ উন্নত হয়, দ্বিজ হয়। শিক্ষার সম্যক্ বিকাশের ফলে মানুষের জাগতিক জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান বাড়ে। সেই অনুরূপ হয় তার জীবনযাপন, তখন সে হয় বিপ্র। অন্তরের ভাবের তাড়নায় মানুষ সাধনার গভীরে প্রবেশ করে ব্যাকুলতা অবলম্বনে। সাধনার উত্তম অবস্থায় বা চরম অবস্থায় মানুষ যখন পরমজ্ঞান লাভ করে তখন সে হয় ব্রাহ্মণ।

অন্তরের ভাব অনুসারে এবং জন্মগত সংস্কার অনুসারে কেউ কর্মের, কেউ যোগের, কেউ ভক্তির, কেউ বা জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করে। ভাবকে আশ্রয় করেই হয় জ্ঞান বা অনুভূতি। তদনুরূপ হয় সিদ্ধি বা পূর্ণতা। সঙ্গের গুণে ভাবের বিকাশ হয়। কর্মীর সঙ্গে থেকে কর্মের, যোগীর সঙ্গে থেকে যোগের, ভক্তের সঙ্গে থেকে ভক্তির এবং জ্ঞানীর সঙ্গে থেকে জ্ঞানের প্রেরণা আসে। কর্ম, যোগ, ভক্তি তিনটি এক পর্যায়ের, কিন্তু জ্ঞান স্বতন্ত্র। পরিণামে সবই এক অখণ্ডবোধে পর্যবসিত হয়।

অকর্মীর কাছে কর্মীই হলেন দিশারি। অযোগীর কাছে যোগী, অভক্তের কাছে ভক্ত এবং অজ্ঞানীর কাছে জ্ঞানীই হলেন গুরু-ইষ্ট। কিংবদন্তী হল "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস।"

আলোচ্য কাহিনির মধ্যে সৎসঙ্গের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনা না-হলে মানুষের চেতনা (চৈতন্য) জাগে না। যার জীবনে ঘটনা যতবেশি তার অভিজ্ঞতা ও চৈতন্য অপেক্ষাকৃত বেশি। জীবনের সর্ববিধ উন্নতি, মুক্তি, শান্তি প্রভৃতি

সিদ্ধ হয় ঐকান্তিক ভাবে সৎসঙ্গের প্রভাবে। নিত্য স্মরণীয় একটি কথা হল, শরণাগতের জীবন সর্বতোভাবে উত্তম। 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল শরণাগতের লক্ষণ। আপনবোধে সব কিছু ভাবা, জানা ও ব্যবহার করাই হল মানার লক্ষণ। মানলে আর জানার অপেক্ষা থাকে না—'মানলে হবে অমর, না-মানলে কর সমর।'

ভগবানকে যারা মানে তারা ভগবানের করুণা লাভে ধন্য হয়। আত্মাকে যে মানে ও অনুসরণ করে সে আত্মজ্ঞান লাভে ধন্য ও পূর্ণ হয়। মানতে গেলে সতত সচেতন হয়ে চলতে হয়। বিচারের পথে এবং মানার পথেব মধ্যে পার্থক্য নেই। মূলত কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি সবই অখণ্ড একবোধে বা আপনবোধে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গিমা মাত্র।

২০। ৯। ৬৮

৩২

শুভ, অশুভ ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্মের ফল অশুদ্ধ জীবের নিত্য সাথি এবং জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্যনিয়ন্তা। ঈশ্বরের কৃপায়, গুরুর আশীর্বাদে এবং স্বকীয় চেষ্টায় বা সাধনায় জীব এই ত্রিবিধ কর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে। মৃত্যুকালে জীবাত্মা ত্রিবিধ কর্মের ফল নিয়ে যায়। এগুলির মাধ্যমেই আবার নূতন দেহ ধারণ করে জীবাত্মা তার কৃত কর্মের সংস্কারের বশে পরিচালিত হয়ে পূর্বাপর শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে। এই হল সকাম কর্মের বিজ্ঞান। এর পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান নিষ্কাম কর্মের অন্তর্গত। নিষ্কাম কর্মের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান ঈশ্বরাধীন। এই প্রসঙ্গের ভিত্তিতে একটি গল্প বলছি শোন।

প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী এক শেঠ একবার একজন উচ্চকোটির মহাত্মার কাছে যায় এবং তাঁর সেবার জন্য কিছু অর্থদান করতে চায়। মহাত্মা কারও দান গ্রহণ করেন না। অর্থের তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই বলে তিনি শেঠের দান প্রত্যাখ্যান করেন। উপরন্তু তিনি শেঠকে বলেন—তোমার কোনও প্রার্থনা থাকলে তা বল।

শেঠ—আমার মনে খুব অশান্তি। আপনি কৃপা করলে আমি শান্তি পেতে পারি।

মহাত্মা—তোমার প্রচুর টাকা আছে। হঠাৎ কোনও অপরিচিত লোক এসে তোমার কাছে লক্ষ টাকা চাইলে তুমি তাকে লক্ষ টাকা দেবে কি?

শেঠ—না। বহু পরিশ্রম করে যে টাকা আমি উপার্জন করেছি তা থেকে এক লক্ষ টাকা অপরিচিত লোককে বিনা শর্তে চাওয়ামাত্র কখনওই দেব না।

তার কথা শুনে মহাত্মা বললেন—বহু সাধনা করে আমি শান্তির অধিকারী হয়েছি। সেই শান্তি হঠাৎ তোমার মতো অপরিচিত লোক এসে চাইলে তা আমিও কখনওই দিতে পারি না। কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে তোমাকে ন্যায় ও অন্যায় ভাবে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও শান্তি পাওয়া যায় না। আমি গুরুনির্দিষ্ট ধর্ম ও ন্যায়ের পথে যে কঠোর সাধনা করে শান্তির অধিকারী হয়েছি তা জাগতিক ঐশ্বর্যের বিনিময়ে কেউ পেতে পারে না। তা ত্যাগ-বৈরাগ্য,

যোগ, ভক্তির মাধ্যমে সাধনা করে গুরু ও ঈশ্বরের কৃপায় লাভ করা যায়। কোনও সাধনা না-করে পূর্ণ শান্তি তুমি কখনওই পাবে না। শান্তিসাধনার পথ খুব সুগম নয় এবং সকলের পক্ষে তার সাধনও সম্ভব নয়। অতএব তোমাকে শান্তি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সাধনা করার মতো মনের অবস্থা শেঠের ছিল না। সে ব্যবসায়ী বুদ্ধি নিয়ে কিছু টাকার বিনিময়ে মহাত্মার কাছে শান্তি লাভের আশায় গিয়েছিল। শান্তি না-পেয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। টাকার বিনিময়ে শান্তি পাওয়া যায় না। তা জেনেও শান্তি লাভের জন্য সাধনা করার ইচ্ছা তার হল না।

কাহিনির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়টি তত্ত্বের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ব্যক্ত করলেন —বিষয়ভোগ করতে করতে মানবজীবন যখন শ্রান্তক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয় তখনই সে বৃহত্তর শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। ভোগের কর্তা অহংকার প্রথমে মহৎকে ও বৃহৎকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে নিজে প্রাধান্য পেতে চায় এবং ভোগ করতে চায়। ভোগের মাধ্যমে বিকারের মাত্রা বেড়ে নিজের যোগ্যতা, সামর্থ্য, ক্ষমতা দুর্বল ও হীন হলে নিজের স্বার্থে অপরকে মানার স্বভাব আপনিই ভিতর থেকে প্রকাশ পায়। তখন জীবের অহংকারই আবার নিজেকে সমর্পণের জন্য নূতন ভাবে চেষ্টা করে। অন্তঃপ্রকৃতি তখন তার সহায়ক হয়। অন্তঃপ্রকৃতির কৃপা, করুণা ও অনুগ্রহ লাভ করে অহংকার নূতন ভাবে পুষ্ট, তুষ্ট এবং বিষয়মুক্ত হয়ে শান্তি লাভের অধিকারী হয়।

সংসারবিমুখ চিত্ত হয় ঈশ্বরে আসক্ত। মহাত্মা মহাপুরুষদের শিক্ষাদীক্ষায় তারা হয় কৃতকৃত্য অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। মহাত্মা এবং মহাপুরুষদের ব্যবহারের বিশেষত্ব দুর্বোধ্য হলেও সাধনার মাধ্যমে তার তাৎপর্য অনুভবগম্য হয়। ঈশ্বরের সর্বোত্তম আশিস্, কৃপা, করুণা, অনুগ্রহ উচ্চকোটির মহাত্মা ও মহাপুরুষদের মাধ্যমেই যোগ্য অধিকারিগণ যথাবিধি পেয়ে থাকে।

মানবজীবনের তাৎপর্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অবগত হওয়া যায় স্বানুভূতির জ্যোতিতে। মানুষের যেমন শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এই চারটি অবস্থা আছে, সেইরূপ বোধেরও চারটি অবস্থা হল শূদ্রত্ব, দ্বিজত্ব, বিপ্রত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব। অন্য ভাবে বোধের এই চার স্তরকেই যথাক্রমে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় বলা হয়। বোধের (অনুভূতির) শৈশব হল শূদ্রত্ব, কৈশোর ও যৌবন মিলে হল দ্বিজত্ব, প্রৌঢ়ত্ব হল বিপ্রত্ব এবং বার্ধক্য হল ব্রাহ্মণত্ব। শৈশব হল শূদ্র অবস্থা। তা-ই মানবের প্রথম অবস্থা। দ্বিজত্ব লাভ না-করা পর্যন্ত এই অবস্থা চলে অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা মার্জিত ও সংস্কৃত হলে হয় দ্বিজ। এই হল মানবের দ্বিতীয় অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্জিত বিদ্যা সম্প্রসারিত হয়ে পূর্ব অবস্থাকে সংস্কৃত ও মার্জিত করে জীবন তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছায়। তখন সংসারজীবনে যোগ্যতা ও জ্ঞান লাভ করে সে বিপ্র হয়। এই তৃতীয় স্তরের জীবনও তার শেষ অবস্থা নয়। বহু পরিশ্রমের দ্বারা তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম

করে চতুর্থ স্তরে যেতে হয়, অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সমস্ত কিছুর সাথে মিলিত হয়ে বিশ্বের অন্তরে, স্বভাবের কেন্দ্রে ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা-ই হল ব্রাহ্মণত্ব। প্রথম স্তর হল পশুত্বের বা জীবত্বের স্তর। দ্বিতীয় স্তর হল দেবত্বের স্তর। তৃতীয় স্তর হল ঈশ্বরের স্তব এবং চতুর্থ স্তর হল পরমেশ্বর-পরব্রহ্ম-পরমাত্মবোধের স্তর। মানুষ প্রথমে দেবত্ব অর্জন করে, তারপর ঈশ্বরত্ব এবং পরিশেষে ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২। ৯। ৬৮

৩৩

আত্মার বা ঈশ্বরের কৃপায় জীব তাব আপনস্বরূপ ফিরে পায়। মহাত্মা মহাপুরুষের মাধ্যমে ঈশ্বর জীবকে মায়ামুক্ত করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেন। মহাপুরুষগণ জীবের মায়াপ্রকৃতির লক্ষণ বুঝে তাদের কৃপা করেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দু'টি গল্প বললেন।

(ক) ঈশ্বরদর্শনের আশায় এক গৃহী বিশেষ একজন মহাত্মার কাছে গিয়েছিল। মহাত্মাকে নিজের মনের কথা সে জানায় এবং ঈশ্বরকে দেখাবার জন্য তাঁকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে। মহাত্মা তার ব্যবহার দেখে তাকে কাছে ডেকে তার পিঠে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল—মরে গেলাম, মরে গেলাম, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! কয়েকমিনিট পব মহাত্মা তার গায়ে গঙ্গাজল ঢেলে দিলেন। তখন গঙ্গাজল ও কাদামাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে লোকটি শান্ত হল। মহাত্মা তাকে এর পরে বললেন যে, তিনি তাকে ভগবান দর্শন করাবেন। কিন্তু গৃহী তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। গৃহী মহাত্মাকে জানাল যে, ভগবান দেখবার সাধ আর তার নেই।

(খ) হৃষ্টপুষ্ট শক্তিমান এক সাধুর কাছে এক নাস্তিক ভগবানকে দেখবার বাসনা প্রকাশ করল। সাধু তাকে বললেন—তোমাব ভগবান তোমার মধ্যেই আছে, তাঁকে দেখ। সাধুর কথা শুনে নাস্তিক অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল—নিজে নিজে ঈশ্বর দেখতে পারলে তোমার কাছে এসেছি কেন? উভয়ের মধ্যে এই ভাবে কিছুক্ষণ বাদবিতণ্ডা হল। ইতিমধ্যে স্নানের সময় হওয়াতে সাধু নদীতে স্নান করতে যাবার সময় নাস্তিককেও সাথে করে নিয়ে গেলেন। বাদানুবাদ করতে করতে দু'জনেই নদীতে পাশাপাশি স্নান করতে লাগল। কথার মাঝে হঠাৎ সাধুটি নাস্তিককে অল্প সময়ের জন্য জলের নিচে ডুবিয়ে রাখলেন। নাস্তিকের শ্বাসরোধ হবার পূর্বেই সাধু তাকে ছেড়ে দিলেন। কোনও মতে তীরে উঠে নাস্তিক সাধুটিকে গালাগালি করতে লাগল। তার গালাগালি শুনে সাধু হেসে তাকে বললেন—যেমন বিনামূল্যে বহু দামি জিনিস নিতে চাইলে খুব খাতির থাকা চাই, বিনা খাতিরে এবং বিনামূল্যে দামি জিনিস পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিনা সাধনায় ঈশ্বরের দর্শনও মেলে না। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরের সাধনাও হয় না। ঈশ্বরদর্শনের জন্য অন্তরের প্রস্তুতি দরকার। জলে ডোবা অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাঁচবার জন্য তোমার যেমন অন্তরে ব্যাকুলতা জেগেছিল, সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জাগলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

গল্প দু'টি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—সর্ববস্তুকে চৈতন্যবোধে ব্যবহার করলে অথবা অন্তরে-বাইরে সব কিছুকে গুরু-ইষ্ট-মাতা-ঈশ্বর-আত্মা যে কোনও এক বোধে গ্রহণ ও ব্যবহার করলে ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি সহজ হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বরের সাধনা ফলবতী হয়। ঐকান্তিক ব্যাকুলতা থাকলে অচিরেই ঈশ্বরের দর্শন মেলে।

২২ । ৯। ৬৮

৩৪

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনাকালে জগন্মাতার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর অনেক কথাই বলেন তাঁর স্বানুভূতির ভাষায়। তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল।

মায়ের ব্যবহারের তারতম্য দেখে মাকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক বলে অনেকে। যে যা-ই বলুক ঐ সবগুলি মায়েরই গুণ ও ব্যবহার। আদর করলেও মা, রাগ করলেও মা এবং শান্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকলেও মা। এক মায়েরই ত্রিবিধ আচরণ। মাকে বাদ দিয়ে কোনও আচরণ হয় না। মা থাকলে তাঁর আচরণ থাকে। মাকে দেখতে হলে আচরণের মাধ্যমেই তাঁকে দেখতে হয়। ক্রিয়াশূন্য অনুভূতি হয় না। সর্বোত্তম অনুভূতি হল বোধের সূক্ষ্মতম ক্রিয়া।

মা সব করছেন—তা অপরকে না-বলে প্রথমে নিজের বোধে রাখতে হয়। বাইরে প্রকাশ করলে ত্যক্ত-বিরক্ত হতে হয়। সেই জন্য বলা হয়—

'মনের কথা রেখ মনে।
একান্তই বলতে হলে
বলো মায়ের কানে।'

কেন না একমাত্র মা-ই সন্তানের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু চান না। পিতা, গুরু, ইষ্ট, মা এক কথা।

প্রকৃত সাধু কে? যথার্থ সাধুর পরিচয় একটি গল্পের মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ব্যক্ত করলেন।

গ্রামের একপ্রান্তে এক সাধু বাস করতেন। অনেকেই তাঁকে ভণ্ড বলত, আবার কেউ কেউ সাধু বলেও তাঁকে মানত। গালাগালি বা প্রশংসায় তাঁর চিত্তবিকার হত না। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ তাঁর ছিল না। সাধুর নির্বিকার ভাব দেখে পাঠশালার এক পণ্ডিত তাকে 'নঞ্ তৎপুরুষ' বলত। একদিন সেই সাধুবাবা সাধু প্রসঙ্গে গ্রামবাসীদের একটি গল্প বললেন—এক জায়গায় এক সাধু ছিলেন। তাঁর পোশাক ছিল সাধারণ মানুষের মতো, সাধুদের মতো নয়। তিনি এত সহজ ও সরল ছিলেন যে লোকে তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা বলত।

সেই সাধু একবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি নানা তীর্থে বহু সাধুসঙ্গ করলেন। তাঁর চালচলন ও হাবভাব দেখে প্রত্যেক সাধুর চেলারাই ভাবত যে, তাদের

গুরুদেব তাঁকে কৃপা ও আশীর্বাদ করলেন। সাধুটি চলে গেলে তাঁর সম্বন্ধে কেউ ভাল বলত, কেউ সমালোচনা করত। তীর্থভ্রমণ ও বহু সাধুসঙ্গ করে অনেকদিন পরে সাধুটি গ্রামে ফিরলেন।

বহুদিন পরে সাধুকে পেয়ে গ্রামের লোকেরা তাঁকে ঘিরে নানা কথা জিজ্ঞাসা করল। সাধু তাদের তীর্থদর্শন এবং সাধু প্রসঙ্গে অনেক কথাই বললেন। অবশেষে তিনি বললেন—ভাল-মন্দ, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখ, সম্মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, প্রাচুর্য-অভাব প্রভৃতি দ্বারা যিনি বিচলিত হন না তিনিই প্রকৃত সাধু—তাঁর মধ্যেই ঈশ্বর পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হন। সেই জন্য সাধু সদাতুষ্ট, ভয়শূন্য, নিশ্চিন্ত, ভাবনাশূন্য ও নির্বিকার হয়ে পরমশান্তিতে অবস্থান করেন। সাধু পৃথিবীর সকল ধনী, জ্ঞানী ও রাজা অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

গল্পটি শেষ করে তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সহজবোধ্য করে এই ভাবে বললেন—সাধুর সাধুতা যথার্থ সাধুই জানতে পারেন, ভোগীরা জানতে পারে না। সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষদের মহিমা অনুভবসিদ্ধ মুক্তপুরুষদের পক্ষেই জানা সম্ভব। অপরে না-বুঝে, না-জেনে স্বার্থের লোভে তাঁদের পিছনে ছোটে। অবশ্য ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তি এবং ভক্ত সাধক শুধু সত্য উপলব্ধির জন্যই তাঁদের সঙ্গ করে।

সাধু হওয়া খুব কঠিন। সাধুতা রক্ষা করা ততোধিক কঠিন। সাধশূন্য হলে সাধু হয়। সাধশূন্য হওয়া কঠোর তপস্যার ফল। মনে সাধ রেখে যেমন সাধু হওয়া যায় না তেমনই সাধু হলে সাধের পরিচর্যা করা যায় না। সংসারী ভোগীদের জীবন কিন্তু সে রকম নয়। তাদের সাধ-আহ্লাদ আছে বহু, কিন্তু সাধ্য বড় কম। তাই তাদের সাধ-আহ্লাদ পূরণ হয় না। অপরপক্ষে যথার্থ সাধুর সাধ্য থাকে পূর্ণ, সাধ কিন্তু শূন্য। এ সব অনুমানের বিষয় নয়, অনুভবসিদ্ধ বিষয়। অসাধু সাধুর মর্ম বোঝে না। সাধু যেমন সাধুকে চেনে তেমন অসাধুকেও চেনে। এটাই সাধুর স্বভাবধর্ম।

২০। ১০। ৬৮

৩৫

শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ প্রেমের ব্যবহারিক তারতম্য থাকলেও উভয়ই তত্ত্বত এক বা সমান। জ্ঞানীর প্রথমে সদসৎ বিচার থাকে, পরিশেষে ব্রহ্মবোধে তিনি অখণ্ড ব্রহ্মে বিচরণ করেন। কিন্তু প্রেমিকের কাছে সর্ব অবস্থাতেই সব সমান। যাঁরা মায়েতে (মাধব, মহেশ, মা ও মহৎ) হয়েছে হারা তাঁরাই প্রেমিক। আপন-পর ভেদ ও দেহবোধ তাঁদের থাকে না। অন্তরে-বাইরে সব কিছুর মধ্যেই তাঁরা চিদানন্দময়ী মাকেই (মাধব, মহেশ, মা, মহৎ) দেখেন। প্রেমসাধনার ভাষা হল তুঁহু তুঁহু, নাহং নাহং। অকারণ প্রেমাশ্রুধারা তার লক্ষণ। তা দিব্য আনন্দের প্রকাশ। প্রেম হল ভগবৎ বোধে সব কিছু করা। সমবোধ না-হলে প্রেম হয় না। তুমি সত্য, আমি মিথ্যা—এ হল প্রেমের ব্যবহার। ভক্ত হল মায়ের কণ্ঠহার। ঐশ্বর্য হল মায়ের নূপুর। কণ্ঠ হতে পড়লে

বড়জোর মায়ের কোলে পড়বে। ঐশ্বর্য ভাবের সাধকের পতন হয়, কিন্তু প্রেম বা মাধুর্য ভাবের সাধকের কখনও পতন হয় না। মাধুর্যের সাধকরা করে আলিঙ্গন। ভাব ছাড়া অভাবে তাঁদের ধরা যায় না। তাঁরা প্রেম যাচেন, প্রেম দেন। প্রেমিকেব প্রেমের জন্যই প্রেম। শুদ্ধ প্রেমে বিরোধ, হিংসা, দ্বেষ, কলহ, দুঃখ, মৃত্যুভয় প্রভৃতির ভাবনা থাকে না। বিশুদ্ধ প্রেমিকের হৃদয় রসাল। উপনিষদের "রসঃ বৈ সঃ" তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই বোধ এলে মানুষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিতে ভেদজ্ঞান থাকে না। এই জন্য দিব্য প্রেমিকদের লোকে পাগল বলে এবং দেবতারা তাঁদের দিকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পরমাত্মার এক ধর্ম, এক স্বভাব, এক কাজ, কিন্তু দেবদেবীদের পৃথক পৃথক স্বভাব ও কার্য। মধুমাখা 'মা' (মাধব, মহেশ, মা, মহৎ) নামে প্রেমিক মেতে থাকেন। প্রেমিক মায়ের তালে মাতাল। 'হরি' বললেও তাঁরা বোঝেন 'মা' এবং 'মা' বললেও তাঁরা বোঝেন 'হরি'। প্রেমিকের সাথে থেকে তাঁর সঙ্গগুণে অপরেও প্রেমিক হয়ে যায়। অন্যের হল চতুর্বর্গ, কেবল 'দেহি দেহি' অর্থাৎ 'দাও, দাও'। কিন্তু প্রেমিকের হল পঞ্চবর্গ, কেবল 'নমো নমঃ' অর্থাৎ 'নাও মা, নাও মা'। আর সর্বোত্তম হল 'ন মম'। প্রেমিকের মাথা, যোগীর গাথা, জ্ঞানীর আধা, ভক্তের সাধা এবং কর্মীর কাঁধা (কাঁদা)। প্রেমিকের মাথা মানে তিনি নিত্য মা, মাধব, মহেশ ও মহতে থাকেন। যোগীর গাথা অর্থ তিনি ঐশ্বর্য ও সিদ্ধিতে থাকেন। জ্ঞানীর আধা অর্থ তিনি অখণ্ড আনন্দধারাতে থাকেন। ভক্তের সাধা মানে ভক্ত নিত্য ইষ্ট প্রীত্যর্থে ইষ্টসাধনা, ইষ্টভজনা এবং ইষ্টসেবায় যুক্ত থাকেন। কর্মীর কাঁধা অর্থ হল কর্মী নিজ হাতে কাজ করেন এবং কষ্ট হলেও কাঁধে ভার বহন করেন। প্রেমিকের মধ্যে ভক্ত, যোগী সবাই পড়ে। জ্ঞানীর স্বতন্ত্র ভাববোধ প্রেমিকের সঙ্গে অভিন্ন হলেও অন্যদের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য থাকে। কারণ জ্ঞানী স্বয়ং তত্ত্বস্বরূপ সর্ব উপাধিশূন্য—নিরুপাধিক নির্গুণ নির্বিকার নির্বিকল্প নিরবলম্ব। অন্যদের ক্ষেত্রে উপাধি, গুণ ও ক্রিয়া বিকল্প সূক্ষ্ম ভাবে থাকে।

প্রেমিকের পরিচয় ও লক্ষণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক প্রেমিক সাধু বনপথে যাবার সময় এক ভীষণ হিংস্র বাঘ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ে। প্রেমিকও বাঘকে জড়িয়ে ধরে। সে বলে—ওগো তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাঘও নখাঘাতে তাঁকে তার স্বভাবসুলভ আদর জানায়। অবশেষে প্রেমিককে সে খেয়ে ফেলে। মৃত্যুর পূর্বেও প্রেমিক বাঘের মধ্যে তার ইষ্টকেই অনুভব করে শুধু বলতে থাকে—ওগো প্রিয়তম, তোমার এত প্রেম তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রেমিকের আচরণে ভয়, ব্যথা ও কষ্টের কোনও লক্ষণ ছিল না।

দূর থেকে তার অপর এক সাধক গুরুভাই এই দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। সে প্রেমিক সাধুকে পাগল বলেই জানত। তাঁর অদ্ভুত প্রেমাচরণ ও নির্ভীক হৃষ্ট চিত্তে বাঘকে আত্মদান করার ঘটনা অন্য সাধকদের এবং নিজের গুরুকেও সে বলে। তার মুখে এই অদ্ভুত কাহিনি শুনে এক সাধক সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দেয়।

অশ্রুবিগলিত নয়নে সে কেঁদে কেঁদে উচ্চৈঃস্বরে শুধু বলতে থাকে—ওগো মহাপ্রেমিক, তোমার প্রেমের কণামাত্র দিয়ে আমাকে তুমি কৃপা কর। এই দৃশ্য দেখে ভীত শিষ্যটি তাকেও পাগল মনে করে।

এদিকে শিষ্যের মুখে মহাপ্রেমিকের দিব্য কাহিনি শুনে গুরু প্রেমানন্দে নৃত্য করতে থাকেন। তাঁর এই নৃত্য দেখে শিষ্য হতবাক হয়ে গুরুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। তখন গুরু বলেন যে, মহাপ্রেমের স্মৃতি তাঁব হৃদয়ে নৃত্য করছে। এই প্রেমের স্পর্শে জীবের জীবত্ব নাশ হয়। যে আপনাকে পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করতে পারে সে-ই একমাত্র এই প্রেমের পূর্ণ অধিকারী হয়। পাগল সাধুকে গুরু অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি বাঘের বেশে পাগল সাধকের কাছে গিয়ে তার অবশিষ্ট জীবত্ব নিজে খেয়ে নেন অর্থাৎ তাকে নিজের মধ্যে পূর্ণ করে মিলিয়ে নেন।

লৌকিক দৃষ্টিতে এই ঘটনাটি ভীতিপ্রদ। অশুদ্ধ চিত্তের জন্য ভীত শিষ্য এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। গুরুমুখে এই কথা শুনে সংশয় চিত্তে গুরুকে সে জিজ্ঞাসা করে—আপনার মধ্যে সেই পাগল যে মিশে আছে তা দেখাতে পারেন? শিষ্যের কথা শুনে গুরু বিকট ভাবে হেসে উঠলেন। তখন শিষ্য দেখে যে, গুরুর স্থানে সেই প্রেমিক পাগল এবং তাঁর কোলে এক ব্যাঘ্র শাবক। শাবকটিকে শিশুর মতো পাগল চুমু খেয়ে আদর করছে। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যটির মনে ভাবান্তর হয়। সে লোভ-পরবশ হয়ে পাগলকে ধরতে যায়। পাগলও ক্ষণিকের মধ্যে ব্যাঘ্র শাবক নিয়ে অদৃশ্য হন। তখন এই শিষ্য সেখানে আবোল-তাবোল বলে চিৎকার করতে থাকে এবং গুরুকে গালাগালি করতে থাকে।

সেই সময় যে সাধু ঘটনাস্থলে প্রেমে মত্ত হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়েছিল সে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং উন্মত্তপ্রায় শিষ্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। উভয়ের মধ্যেই উন্মত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। একজনের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রেমের লক্ষণ ও অপরজনের মধ্যে তামসিক বিকার অর্থাৎ উন্মাদের লক্ষণ ও কারণ প্রকাশ পেল। তার অন্তরে স্বার্থবোধ ছিল এবং চিত্ত মলিন ছিল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই ঘটনার বিষয় শুনে সত্ত্বগুণী প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হবে, রজোগুণী ও তমোগুণীর হৃদয়ে দ্বেষ, হিংসা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও ভ্রান্তধারণা জেগে উঠবে।

কাহিনির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সবার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না। এর অন্তর্নিহিত সত্যটি তত্ত্বের দৃষ্টিতেই কেবল অনুভবগম্য হবে বলে গল্পটির তত্ত্ব বিশেষ ভাবে সকলের শোনা প্রয়োজন।

সর্বজীবে আত্মারূপে অভিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। তাঁর মধ্যে দ্বৈত ভাববোধের যথার্থ কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। তথাপি তাঁর স্বভাবে দ্বৈত ভাববোধের লীলাবিলাসের অভিলাষ জাগে। সেই কারণে পরমাত্মদেবতা আপন পূর্ণ দিব্য অদ্বয়স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত

থেকে কেবলমাত্র তাঁর স্বভাবশক্তিযোগে এক তৃতীয়াংশে স্বভাবলীলার কল্পিতবিলাস রচনা করে তার তাৎপর্য স্ববোধে দর্শন, আস্বাদন ও অনুভব করেন। তাঁর স্বভাবের সামগ্রিক বৈচিত্র্যবিলাস স্ববোধের জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায়। তাঁর এই লীলাবিলাসের তাৎপর্য কেবলমাত্র আপনবোধের প্রেমে মেতে মাতোয়ারা না-হলে জীবের পক্ষে তা অনুভবগম্য হওয়া সম্ভব নয়।

স্বভাবের বোধ হল দ্বৈত, নানাত্ব-বহুত্ব ও বৈচিত্র্য, কিন্তু স্ববোধের স্বরূপ হল নিত্য অদ্বৈত অভেদে একবোধে সমবোধে আপনবোধে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত।

স্বভাবের দৃষ্টিতে দ্বৈত বৈচিত্র্যময় পরিদৃশ্যমান জীবজগতের পরিচয় সত্য বলেই অনুমিত ও প্রতিভাত হয়। কিন্তু তা বিকারী, বিকল্পিত ও পরিণামী বলে সাময়িক ভাবে আপাতমনোরম হলেও পরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে অসৎ বা মিথ্যা। সুতরাং অন্তরের ভাববোধ অর্থাৎ স্বভাবের দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান জীবজগতে সব কিছুর পরিচয় ছয়টি বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়। তা হল—জন্ম বা উৎপত্তি, সাময়িক স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ (মৃত্যু বা ধ্বংস)। ষড়বিধ এই ভাববিকারই হল দ্বৈতজ্ঞানের (জাগতিক দৃশ্য জ্ঞান) বৈশিষ্ট্য। দ্বৈতজ্ঞানের ঊর্ধ্বে হল অদ্বৈতজ্ঞান অর্থাৎ নিত্য সম-একজ্ঞান। এই জ্ঞান সর্ববিধ উপাধি, গুণভাব, অবস্থা, দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণ প্রভৃতি মলশূন্য। সেই জন্য তা হল অখণ্ড বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বা প্রজ্ঞানস্বরূপ।

জীবেব মধ্যে তাব স্বভাব পবিচালিত হয সগুণ দ্বৈত ভাববোধের মাধ্যমে, কিন্তু তার স্ববোধ-আত্মা নিত্য অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত—প্রশান্ত অমৃত ভূমা অখণ্ড। তাঁ ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত গুণাতীত। যাই হোক, তত্ত্ব তত্ত্বই এবং তথ্য তথ্যই। তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত অন্যনিরপেক্ষ, কিন্তু তথ্য গুণ-উপাধিযুক্ত, দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণ সাপেক্ষ।

কাহিনির বিষয়বস্তুর মধ্যে দ্বৈত ভাববোধের বিশেষ পরিচয় যেমন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমনই পরিণামে নির্গুণ অদ্বৈতবোধে তার সমাধানটিও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

২৪। ১০। ৬৮

৩৬

দিব্যপ্রেম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন।

এক দিব্য প্রেমিককে স্বার্থপর একজন ব্যক্তি ভুলবশত খুন করতে এসে নির্মম ভাবে তাকে জখম করে যায়। পরে ধৃত হয়ে সে পুলিশের হেফাজতে থাকে।

এদিকে দিব্য প্রেমিকের মরণাপন্ন অবস্থা। কিন্তু তার মুখে কোনও ভয়ের বা বেদনার চিহ্নমাত্র ছিল না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু লোক প্রেমিকের সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে এবং খুনির শাস্তির আয়োজন করে।

প্রেমিক সবাইকে বললেন—আমার এই প্রিয় বন্ধুটিকে (খুনিকে) একবার আমার কাছে নিয়ে এস। এই সংসারে বন্ধু খুঁজে বেরিয়েছিলাম। যথাকালে বন্ধু এসে উপস্থিত হয়েছে, তাকে প্রাণভরে দেখতে দাও এবং তার সঙ্গে মিশতে দাও। সকলের কাছে তিনি বিনীত ভাবে অনুরোধ করে বললেন—আমার পরমবন্ধুর মর্যাদা যেন নষ্ট না-হয়। তাকে কোনও শাস্তি দিও না।

প্রেমিকের কথা শুনে সকলে পুলিশের বড় কর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং পুলিশের বড় কর্তাও প্রেমিককে দেখতে আসে। প্রেমিক সাধু তাকেও পূর্বের মতো অনুরোধ জানায় এবং তার পরমবন্ধুকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন। তাকে একবার দেখবার জন্য তিনি ব্যস্ত হন এবং তাকে নিয়ে আসার জন্য তাদের অনুরোধ করেন। কেউই তার অনুরোধ রক্ষা না-করাতে অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে তার পরমবন্ধুকে দেখবার জন্য হাজতে যান। সেখানে cell-এর বাইরে থেকে তিনি সাশ্রুনয়নে সেই খুনিকে পরমবন্ধু বলে আহ্বান করে কাছে আসতে বলেন এবং তার মাথায়, বুকে, পিঠে ও হাতে হাত বুলিয়ে আদর করে পুনঃপুনঃ চুমু খেয়ে বলেন—তোমার মতো আপনজন পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। পাগলের মতো তাঁর আচরণ ও প্রলাপ বাক্য শুনে তাঁর বন্ধু (খুনি) হতবাক হয়ে শুধু তাঁর মুখের দিকে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে। উপস্থিত অন্যান্য সকলেও প্রেমিকের আচরণে মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর প্রেমিককে নিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে আসে। বহু যত্ন সহকারে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, কিন্তু অল্প কয়েকদিন পর তিনি দেহত্যাগ করেন।

এদিকে তাঁর বন্ধুর মামলা শুরু হয়। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে সে নির্দোষী সাব্যস্ত হয়ে খালাস হয়ে যায়। মুক্তি পেয়ে সে গৃহে না-ফিরে অন্যত্র চলে যায়। কিছুকাল নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে সে এক তীর্থক্ষেত্রে যায়। সেই তীর্থে এক দেবমন্দিরে ঢুকে আপন খেয়ালে সে বিগ্রহকে প্রণাম করে। বিগ্রহের মধ্যে সে প্রেমিক পাগলের মূর্তি দর্শন করে হতভম্ব হয়ে যায়। মন্দির থেকে বেরিয়ে সে আপনমনে এক বৃক্ষের নিচে বসে বিগ্রহ ও প্রেমিকের কথা ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে দু-তিন দিন একই ভাবে কেটে যায়। সে গাছতলাতেই থেকে যায় এবং ঐ ভাবনাতেই দিন কাটায়। কেউ কিছু দিলে খায় নতুবা খাবারের জন্য কোথাও সে যায় না।

এই ভাবে কয়েকবছর কেটে যাবার পর সে বিরাট এক সাধুতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সে শুধু সেই প্রেমিকের মহিমাই গেয়ে বেড়ায়। দিব্যপ্রেমের স্পর্শে তার মধ্যে যে প্রেমের বিকাশ হয় তার ফলে বহু ভক্ত, সাধক, জ্ঞানী ও যোগী তৈরি হয়।

ঘটনাটির উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সংক্ষেপে যা বললেন তা হল—প্রেমের শক্তি সর্বোত্তম। তা সব কিছুকে গ্রাস করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। নিঃশর্তে আত্মদানই প্রেমের বিশেষ ব্যবহারবিজ্ঞান। অপরকে আঘাত না-দিয়ে, বিনাশ না-করে, অপরের আঘাত গ্রহণ করে, সহ্য করে, তাদের দোষত্রুটিকে হজম করে প্রেম। প্রেম

ভগবানের সর্বোত্তম শক্তি ও সর্বোত্তম অস্ত্র শুধু নয়, তা হল ভগবানের হৃদয়স্বরূপ। দিব্যপ্রেমের অভিব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ আত্মদানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

Crucifixion of the body is the mark of Divine Love. The lover (devotee) gives his body to his beloved God and in return God gives His Spirit to him. Love is the Spirit and Spirit is Love. Love is Divine and Divine is All Love.

বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ বা আত্মদান অর্থাৎ নিজের সসীমতা হারিয়ে অখণ্ড অসীমের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়াই হল জীবনের সর্বোত্তম পরিণতি। কাজেই দিব্যপ্রেমে কোনও বিচার থাকে না। প্রেম জানে এক, দুই জানে না। এই প্রেমের অধিকারী অতীব দুর্লভ। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অলৌকিক প্রেমতত্ত্বের যথার্থ অনুভূতি মহাপুরুষদের মধ্যেই শুধু পাওয়া যায়। কামনাবাসনা, জ্ঞান ও বিদ্যার অহংকার দ্বারা মলিন চিত্ত বিশুদ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত প্রেমের কোনও আস্বাদন পাওযা যায় না। পরমহংস বা অবতারকল্প মহাপুরুষ এবং অবতারপুরুষদের মাধ্যমেই শুধু ঈশ্বরীয় প্রেমের যথার্থ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। কৃষ্ণ, যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি হলেন প্রেমের অবতার। প্রেমেব অবতারদেবই ভগবান বলা হয়। নিজেরা ধরা না-দিলে তাঁদের ধরা যায় না।

২৪। ১০। ৬৮

৩৭

আপন আপন বৃত্তি ও স্বভাব অনুযায়ী নিষ্ঠা সহকারে সরল অন্তঃকরণে যথার্থ ভাবে কর্ম করলে ঈশ্বরানুভূতি হয়। ঈশ্বরানুভূতির জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ব্যাকুলতা ও শরণাগতি। তার জন্য বস্তুজগতের শিক্ষা অবান্তর। গুরুর আদেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করার পরিণাম যে কী রকম হয় সে বিষয়ে একটি কাহিনি শোন।

এক পেশাদার নর্তকী রাজসভায় নৃত্যগীত পরিবেষণ করত। সে রাতে ঘরে ফিরে এসে নৃত্যের দ্বারা প্রীতিপূর্বক ঈশ্বরের সেবা ও পূজা করত এবং আত্মনিবেদন জানাত। তার গুরুদেব তাকে বলেছিলেন—তুমি টাকাপয়সা রোজগার করার জন্য দেহ বিক্রি করে যা-ই কর না কেন, রাত বারোটার পর তোমার নৃত্য ও সমস্ত বিদ্যা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে প্রতিদিন অন্তত দুই ঘণ্টা ধরে। নর্তকী নিষ্ঠা সহকারে প্রতিদিন তা যথাযথ ভাবে পালন করত।

এই ভাবে দশ-বারো বছর সাধনা করার পর একদিন সে দেখতে পেল তার গুরুদেবের ছবি থেকে মা সরস্বতী বেরিয়ে এসে তার দিকে হাত এগিয়ে দিলেন এবং স্নেহঘন ভাব নিয়ে নর্তকীকে স্পর্শ করলেন। দিব্য জ্যোতির্ময়ী সেই দেবীমূর্তির মধুর

ও স্নিগ্ধ করস্পর্শে তার চেতনা অবলুপ্ত হল। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল সে তখন এক নূতন অনুভূতির সন্ধান পেয়ে নৃত্য ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এই বিদ্যাদেবী মা সরস্বতীর স্মরণ, মনন ও পূজন করতে লাগল। উত্তরকালে সে একজন বড় সাধিকাতে পরিণত হয়েছিল। তার রচিত বহু ভজন, গান এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা ও বাণী ভক্তিমূলক গ্রন্থরূপে পরে প্রকাশিত হয়েছে। ভক্ত সাধকেব কাছে এই ভক্তিগ্রন্থ বিশেষ ভাবে আদৃত হয়েছে।

১৩। ১১। ৬৮

৩৮

'যখন প্রাণ ধরে, দেবে টান
তখন বুঝবে কেমন ভগবান।'

প্রাণ ধরে টান দিলে ভগবান, ভগবান আপনিই বেরিয়ে আসেন।

এক পাগলের কাছে দল বেঁধে লোক যেত। পাগল শুধু হাসে আর বলে—পাগলের কাছে হাকিমরা আসে কেন? পাগল হাকিমকে বলে—তোমরা বিচার করে যাদের শাস্তি দিয়েছ তারা আবার তোমাদের বিচার করে শাস্তি দেবে। তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, পাগলটি ভাল ভাল কথা বলে, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের যোগাযোগ আছে। সে নিশ্চয়ই দিব্যপাগল।

এই পাগলকে তাবা বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইল। পাগল শুনে বলল—আমি যেতে পারি, কিন্তু যে বাড়িতে যাব সেখানে কেউ থাকবে না। পাগলের কথায় শহরে একটি বাড়ি ঠিক করা হল। পাগল সেখানে গিয়ে বলল—তিন দিন কেউ এ বাড়িতে আসবে না। চতুর্থ দিন কাপড়চোপড় ও প্রচুর খাবার জিনিস নিয়ে আসবে।

তিন দিনের মধ্যে পাগল শহরের সব ভিখারির দল নিয়ে এসে জড়ো করল সেই বাড়িতে। চতুর্থ দিন সকলে এসে দেখল ভিখারির দলে বাড়ি ভরে গিয়েছে, কিন্তু পাগল সেখানে নেই। ভিখারিরা বলল—আমাদের কাপড়চোপড় দাও, খেতে দাও তবেই পাগলবাবাকে দেখতে পাবে, নয়ত পাগলবাবা রেগে গিয়ে তোমাদের ক্ষতি করবে। তারা প্রথমে কিছু জিনিস দিতে রাজি হয়। আবার পাগলের ভয়ে কেউ কেউ বলল—এগুলি সবই দিয়ে দাও। শেষ পর্যন্ত অল্পকিছু খাবার ও বস্ত্র দিয়ে বাকি সব নিয়ে তারা বাড়ি চলে গেল।

সেই রাতে তাদের অনেকের বাড়িতেই তিন-চারজন কঠিন কলেরা রোগে আক্রান্ত হল। প্রাণের ভয়ে তারা তখন ভগবানকে ও পাগলকে স্মরণ করে বলতে লাগল—আরও বেশি করে খাবারদাবার দেব, আমাদের বাঁচিয়ে দাও।

পরের দিন সকলেই পাগলের খোঁজে বেরোল। অনেক দূরে এক গাছের তলায় পাগলকে পাওয়া গেল। পাগল বসে বসে কাঁদছিল। তারা গিয়ে স্তবস্তুতি ও অনুনয় বিনয় করল পাগলকে। তাদের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাইল এবং পাগল যা বলবে তা-ই তারা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

তখন পাগল বলল—আমি ফিরে যেতে পারি একটি শর্তে। শর্তটি হল, এই শহরতলির যত গরিব, দীন, দুঃখী, দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত নারী, পুরুষ ও শিশু আছে তাদের সকলের জন্য একটা সুন্দর পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিতে হবে। নিজেদের পরিজনের পাঁচজনের মতো তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারলে তবেই আমি যাব এবং তাহলেই রোগীদের রোগও সেরে যাবে।

বহু চিন্তাভাবনা করে সকলেই তাতে রাজি হল। পাগল তাদের সাথে তখন গেল না বটে, কিন্তু তিন দিন পরে সে গেল। পাগলের কথা মতো তারা সব ব্যবস্থা করেছিল, তার ফলে সব রোগীই সুস্থ হল। গরিব, দুঃখীদেরও একটা ব্যবস্থা হল। পাগল দিনকয়েক তাদের মধ্যে থেকে নেচে-গেয়ে পরে কোথায় যে চলে গেল আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাগলবেশে ভগবানের আবির্ভাব কী করে মানুষের মনে পরিবর্তন এনে দেয় এই গল্পে তার পরিচয় পাওয়া গেল।

১৩। ১১। ৬৮

৩৯

জিজ্ঞাসার দু'টি দিক আছে। একটি জাগতিক দিক এবং অপরটি ঈশ্বরীয় দিক। জাগতিক জ্ঞানের জিজ্ঞাসা সহজে পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু ঈশ্বরীয় জিজ্ঞাসার সমাধান জাগতিক জিজ্ঞাসার মতো নয়। সেখানে ঈশ্বরকে জানবার বিষয় করে পেতে হলে জাগতিক জ্ঞানের পর্যায়ে এসে পড়ে। ঈশ্বরীয় সংজ্ঞা ধরে ঈশ্বরের যে পরিচয় পাওয়া যায় বা জানা যায় তা হল—ঈশ্বর স্বয়ং কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা নিয়ন্তা এবং তদতিরিক্ত পরিচয়ও তাঁর আছে। তিনি নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ অদ্বয় অব্যয়। তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং কোনও জুড়িও নেই। তাঁর স্বভাব সগুণ-নির্গুণ, আবার তিনি নির্গুণগুণী। সুতরাং তাঁর কেউ জ্ঞাতা-ভোক্তা হতে পারে না। তবে অনুভবকারীমাত্রই স্বয়ং তিনিই এবং তাঁর অঙ্গীভূত অংশ বা প্রকাশ—এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ। পরমেশ্বর স্বয়ং স্বেচ্ছায় প্রথমে জীবভাবে সসীম 'আমি আমার বোধে' লীলা করেন, পরিশেষে নিজের পূর্ণস্বরূপকে অখণ্ড 'আমিবোধে' বা 'তুমিবোধে' ব্যক্ত করেন। জীবের যে চৈতন্যসত্তা বা বোধসত্তা, তার লক্ষণ এবং প্রকাশ 'আমি আমার বোধেই' ব্যক্ত হয়। ঈশ্বরীয় বোধসত্তাও 'আমি আমার বোধে' অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এই 'আমি ও আমার বোধের' মধ্যে যে পার্থক্য তা সুস্পষ্ট। জীবের 'আমি আমার বোধ' সসীম, বিকৃত, পরিণামী ও গুণবদ্ধ। তাই তা গুণের অধীন এবং কালাধীন, কিন্তু ঈশ্বরীয় 'আমি আমার বোধ' অনন্ত অসীম। তা নির্বিকার অপরিণামী গুণমুক্ত গুণাধীশ কালাতীত। এই যে তফাত তা হল নিত্যসত্যের দু'টি ধারা। এই জীবরূপী ঈশ্বর সসীম 'আমি আমার বোধে' জীবন আরম্ভ করে এবং ক্রমবিকাশের ধারা ধরে এগিয়ে চলে। যখনই কোনও প্রতিবন্ধক বা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং নিজে অসহায় বোধ করে তখনই সে অন্তরে-বাইরে নিজ অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ সত্তাশক্তিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের অর্থাৎ অখণ্ড ও সর্বোত্তম

আমি-র সাহায্য প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রার্থনা করে। তখনই তার নিজের 'আমি আমার বোধকে' ঈশ্বরীয় 'আমি আমার বোধের' কাছে প্রার্থী, জিজ্ঞাসু, আর্ত, অর্থার্থী প্রভৃতি হিসাবে অনুগত হয়ে আবেদন, নিবেদন ও সমর্পণ করে। তখনই সে ক্ষুদ্র সসীম 'আমি আমার বোধ' ব্যবহারের পরিবর্তে বৃহত্তর ঈশ্বরীয় 'আমি আমার বোধকে' 'তুমি তোমার' বলে সম্বোধন করে এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

যতদিন পর্যন্ত এই সম্বন্ধ স্থাপন ও যোগাযোগ পূর্ণ ভাবে না-হয় ততদিন পর্যন্ত জীবচৈতন্যের 'আমি আমারকে' অনেক পরিবর্তন ও বিষম অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। ঈশ্বরকে মেনে চলার ফলে তাঁর প্রভাবে জীবচৈতন্যের গুণবৈষম্য এবং গুণের বাঁধন ক্ষীণ হয়ে অপসারিত হয়। তখন সে সমত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার মধ্যে সমভাবের প্রকাশ হতে থাকে। এই সমবোধের প্রকাশ যে-ভাবে হয় তার বিজ্ঞান পাওয়া যায় অনুভবসিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে।

পৌরাণিক কাহিনিতে নারদ ঋষি এবং শৌণিক ঋষির মধ্যে জিজ্ঞাসা ও উপদেশ রূপে এই তত্ত্বের পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায়।

নারদ ঋষি বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র এবং চৌষট্টি কলা বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। একটা অতৃপ্তভাব, বিশেষ কোনও একটা অভাবজনিত বোধ এবং অশান্তির কারণ কোনও মতেই অবগত হতে না-পেরে তিনি জিজ্ঞাসু হয়ে বহু ঋষির সঙ্গ করেন। কিন্তু কারও উপদেশে শান্তি না-পেয়ে অতৃপ্ত মনোভাব নিয়ে অবশেষে শৌণিক ঋষির কাছে এলেন এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন।

নারদের প্রথম জিজ্ঞাসা হল—এমন কোনও বিদ্যা বা জ্ঞান আছে কি না যা জানলে দেখা, শোনা, জানা, পাওয়া ও হওয়ার অবসান হয় অর্থাৎ সর্ববিধ অপূর্ণতা চলে যায় এবং জীবন শাশ্বত নিত্যপূর্ণ অমৃতময় পরম শান্তিময় নির্বিকার নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তখন শৌণিক ঋষি বললেন—হ্যাঁ, এ রকম একটি বিদ্যা আছে যার দ্বারা ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আরও বললেন যে, এই বিদ্যার সাথে তিনি পরিচিত আছেন। এই কথা শুনে নারদ মুনি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসপূর্বক অবনত চিত্তে তাঁর শরণাগত হয়ে সেই বিদ্যা প্রার্থনা করলেন।

শৌণিক—তুমি কোন কোন বিদ্যা শিখেছ?

নারদ—চতুর্বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন, নক্ষত্রবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা, আয়ুর্বিদ্যা (বেদ) এবং চৌষট্টি ভিন্ন ভিন্ন কলাবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি।

শৌণিক—যে-সমস্ত বিদ্যার কথা তুমি বললে তার সম্যক্ জ্ঞান তোমার হয়নি। সেই নামগুলির সঙ্গে তোমার মাত্র পরিচয় হয়েছে। এই নামের চেয়েও যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি।

নারদ—নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বস্তু কী আছে? কী দিয়ে নামকে জানা যায়?

শৌণিক—সংকল্পাত্মক মন নাম অপেক্ষা শ্রেয়। মন না-থাকলে সংকল্প রাখবে কোথায়? মন থেকে যে বৃত্তিসমষ্টি জেগে ওঠে তা-ই হল নাম। মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ—সংকল্পাত্মক মন অপেক্ষা বড় কী?

শৌণিক—সংকল্পাত্মক মন থেকে বড় (শ্রেষ্ঠ) হল ইচ্ছা। সংকল্প এই ইচ্ছা দ্বারা বিকশিত ও রূপান্তরিত হয়। ইচ্ছা হতেও বড় বস্তু আছে।

নারদ—ইচ্ছা কিসেব দ্বারা এবং কার সাহায্যে কার্যকরী হয়? ইচ্ছা অপেক্ষা বড় কী?

শৌণিক—ইচ্ছা অপেক্ষা বড় হল ব্যবহারবিজ্ঞান অর্থাৎ সৎ কর্ম। এই বিজ্ঞান অপেক্ষাও বড় বস্তু আছে যাকে কেন্দ্র বা অবলম্বন করে বিজ্ঞানের বিকাশ ও অভিব্যক্তি হয়।

নারদ—বিজ্ঞান অপেক্ষা বড় কী?

শৌণিক—বিজ্ঞান অপেক্ষা বড় হল শক্তি। শক্তিবই কার্যকরী প্রণালীকে বিজ্ঞান বলে। শক্তি হতেও বড় বস্তু আছে যার মধ্যে শক্তি পুঞ্জীভূত ভাবে সঞ্চিত ও রক্ষিত আছে। তা-ই হল শক্তির আধার।

নারদ—শক্তি অপেক্ষা বড় বস্তুটি কী?

শৌণিক—শক্তি অপেক্ষা বড় হল অন্ন। অন্নের অভাবে শক্তিমান পুরুষেব শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অন্ন থেকেও বড় বস্তু আছে।

নারদ—অন্ন অপেক্ষা বড় কী?

শৌণিক—অন্ন থেকে বড় জল। জল না-হলে অন্ন উৎপন্ন হয় না। জল অপেক্ষাও বড় বস্তু আছে।

নারদ—জল অপেক্ষা বড় বস্তু কী?

শৌণিক—জল অপেক্ষা বড় হল অগ্নি। কারণ অগ্নি জলকে রূপান্তরিত করতে পারে তার শক্তি দ্বারা। এই অগ্নি অপেক্ষাও বড় বস্তু আছে যা অগ্নিকেও পরিচালিত করতে পারে।

নারদ—অগ্নির চেয়ে বড় বস্তু কী?

শৌণিক—অগ্নির চেয়ে বড় হল বায়ু। বায়ু সর্বব্যাপী এবং তার শক্তি ও প্রভাব তদনুরূপ। বায়ুর চাইতেও বড় বস্তু আছে যাকে বায়ু অতিক্রম করতে পারে না অথচ যার বুকে বায়ু অবস্থান করে ক্রিয়াশীল হয়।

নারদ—বায়ুর থেকে বড় কী?

শৌণিক—বায়ুর থেকে বড় হল আকাশ, যার বিকার নেই শুধু আয়তন ও অবস্থান নিত্যবিদ্যমান। এই আকাশের চাইতেও বড় বস্তু আছে।

শৌণিক ঋষির মুখে এই সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় এবং বিশ্লেষণ শুনে নারদ মুনি হতবাক হলেন। এই রকম জ্ঞানের সূক্ষ্ম পরিচয় ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ইতিপূর্বে তিনি শোনেননি। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধের অনুভূতি যে এত সহজে হতে পারে তা তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। ক্রমশ সূক্ষ্মবোধের অনুভবজনিত আনন্দ তাঁর

অন্তরের জিজ্ঞাসাকে বাড়িয়ে দিতে লাগল। এই আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু কী আছে তা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতিটি জিজ্ঞাসাব সঙ্গে সঙ্গে যতই সহজ উত্তর তিনি পেতে লাগলেন ততই তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মাত্রা বাড়তে লাগল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শৌণিক ঋষি বললেন—দেখ তোমার অনুভূতির অন্তরায়গুলি যথাযথ সংশোধন করার ইচ্ছা তোমাকে কী ভাবে পবিচালিত করছে। আকাশের চাইতে সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু হল আশা। তার চাইতেও সূক্ষ্ম বস্তু আছে।

নাবদ—আশার চাইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু কী?

শৌণিক—আশার চাইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু হল প্রাণ। প্রাণেরই অভিব্যক্তি এই বিশ্বভুবন। বিশ্বচরাচরে যা-কিছু আছে—স্থূল-সূক্ষ্ম, কার্য-কাবণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুই অখণ্ড মহাপ্রাণসত্তার প্রকাশবিভূতি মাত্র। এই মহাপ্রাণসত্তাই হল মুখ্য প্রাণ/প্রজ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম-আত্মা। তাদের প্রকাশের মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধবে বৈচিত্র্য ও রকমারি পার্থক্য বা তারতম্য বহির্দৃষ্টিতে মেলানো সম্ভব নয়। উপরোক্ত অনুভূতির প্রণালী ক্রমে এই বৈচিত্র্যময় প্রাণের প্রকাশসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ধারা ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। তবে এই প্রাণকে জানতে হলে প্রাণের সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এই প্রাণের ধর্ম, নীতি, প্রকৃতি ও স্বভাব পূর্ণ প্রাণময়, অর্থাৎ প্রাণই সত্তা, প্রাণই শক্তি; প্রাণই কারণ, প্রাণই কার্য। প্রাণ থেকেই প্রাণ জাত। প্রাণের দ্বারাই প্রাণ বর্ধিত, পুষ্ট এবং রক্ষিত। প্রাণেব জন্যই প্রাণের প্রকাশবিকাশ। প্রাণেরই নানা লীলাবৈচিত্র্য। প্রাণেব সঙ্গে প্রাণের প্রাণময সম্বন্ধ। প্রাণেই প্রাণের নিত্য অবস্থান। এই প্রাণের ধর্ম হল—নির্গুণ-সগুণ, সগুণ-নির্গুণ; অব্যক্ত-ব্যক্ত, ব্যক্ত-অব্যক্ত; নিরাকার-সাকার, সাকার-নিরাকার; এক হয়েও বহু, বহু হয়েও এক; নির্বিশেষ-সবিশেষ, সবিশেষ-নির্বিশেষ; নৈর্ব্যক্তিক-ব্যক্তিক, ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক এবং তিনি-তুমি-আমি। এইরূপ কত রকম ভাবে সে অভাব, ভাব ও স্বভাবের খেলা নিত্য খেলে। তার এই নিত্যলীলায় তার শাশ্বতস্বরূপ কখনও স্থূল, সসীম ও সাকার রূপ ধারণ করে এবং তার মধ্যে তার অনন্ত বৈচিত্র্যময় মহিমা প্রকাশ করে। আবার কখনও সূক্ষ্ম, অনন্ত ও অসীম রূপে নিজেকে প্রকাশ করে পূর্বের স্থূল, সসীম প্রকাশের মহিমাকে আপনার মধ্যে বিলীন করে নেয়। তা-ই প্রাণের নিত্য শাশ্বত লীলা। এই অখণ্ড এক মহাপ্রাণসত্তা স্বরূপ মহিমায় স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ। এর সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এর অন্তরের ব্যবহারবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ ভাবে পরিচিত হতে হবে।

এই পর্যন্ত বলে শৌণিক ঋষি থেমে গেলেন এবং নারদের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা কতখানি বাড়ছে তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। অখণ্ড মহাপ্রাণের পরিচয় ও ব্যবহারবিজ্ঞান শুনতে শুনতে নারদের এমন মানসিক অবস্থা হল যে, শৌণিক ঋষির প্রতিটি কথার মধ্যে তিনি নূতন অনুভূতি ও বোধের সন্ধান পেলেন। সেই বোধের আলোর দ্বারা সংযুক্ত ও পরিচালিত হয়ে তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে শৌণিক ঋষিকে প্রণাম

করে অধিকতর আগ্রহ ও ব্যাকুলতার লক্ষণ প্রকাশ করে তাঁর জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে বিনীত হয়ে এই অখণ্ড মহাপ্রাণের বিজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শৌণিক ঋষি বললেন—এই অখণ্ড মহাপ্রাণের বিজ্ঞান অবগত হতে হলে একক বিজ্ঞানের ও একক মনের সাহায্য নিতে হয়। এই একক মন শুদ্ধ প্রাণের দ্বারা পাওয়া যায়। এই শুদ্ধ প্রাণ আবার সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর মাধ্যমে লাভ হয়। শ্রবণের পর যে মনন তা নির্ভর করে শ্রবণ অনুরূপ কর্মের উপর। এই কর্মই হল কীর্তি। এই কীর্তি নির্ভর করে নিষ্ঠার উপর। এই নিষ্ঠা হল অন্তর্বোধকে কেন্দ্র করে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির সম্মিলিত একক প্রচেষ্টা। তার দ্বারা অন্তরে-বাইরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমধারায় বোধের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই নিষ্ঠা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ প্রীতি ও সুখের উপর। এই সুখ নির্ভর করে ভূমার উপরে, কারণ স্বল্পে সুখ নেই। "স্বল্পৈব মর্ত্ত্যম্ ভূমৈব সুখম্"—স্বল্প এবং সংকীর্ণতার মধ্যে অভাব, অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু। ভূমাতেই সুখশান্তি। ভূমাই অমৃত অনন্ত অসীম অখণ্ড। এই ভূমাতে বিকার নেই, দুই নেই, দ্বন্দ্ব নেই। তা নিত্য শাশ্বত অদ্বয় অব্যয় সর্বশক্তি সর্বজ্ঞান সর্ব আনন্দ এবং সর্বপ্রেমের এক ঘনীভূত পূর্ণসত্তা যাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হয়। এই ভূমাই হল সবার সত্য পরিচয়, সুতরাং তোমার পরিচয়ও ভূমাই। এই ভূমাস্বরূপ তোমাব অধঃ-উর্ধ্বে, অন্তর-বাইবে, পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে, ডান-বাঁয়ে, সম্মুখ-পশ্চাতে। এই ভূমাস্বরূপ স্বয়ং তুমি স্বমহিমায় নিত্যবিদ্যমান। তোমাকে ছাড়া ভূমা নয় এবং ভূমাকে ছাড়া তুমিও নও। এই ভূমার পরিচয় অতীতে তোমাব স্মৃতিতে ছিল না বলেই তুমি শান্তি পাওনি। এখন তোমার অন্তরের অভাব, অশান্তি পরিপূর্ণ ভাবে বিদূরিত হয়েছে কি?

তার উত্তরে প্রেমবিগলিত সাশ্রুনয়নে শৌণিক ঋষিকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসযুক্ত প্রণতি জানিয়ে উৎফুল্ল চিত্তে নাবদ বললেন—আজ আমি কৃতকৃত্য হলাম আপনার অনুগ্রহ, কৃপা ও প্রসাদে। যে ভূমাতত্ত্বের সূক্ষ্মতম বহস্যেব বিজ্ঞান দ্বারা আপনি আমাকে ভূমাতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন তা অবগত হলে সাধকের ব্যষ্টিসত্তা অনন্ত অসীম পূর্ণ শাশ্বত নিত্যসত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। সমস্ত জিজ্ঞাসা যেখানে বিলীন হয়ে যায় এবং দেখা, শোনা, জানা, পারা, হওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না, সেই ভূমাস্বরূপ পূর্ণসত্তাকে আপন হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন আপনি। আপনি স্বয়ং ভগবান। আপনার প্রকাশের মধ্যে আপনি স্বয়ং প্রকাশমান হলেন। আপনার পূর্ণতা দিয়ে অপূর্ণ আমিকে আপনার পূর্ণ আমিতে রূপান্তরিত করে নিলেন। আপনার জয় আদিতে, মধ্যে ও অন্তে। এই বলে নারদ ঋষি অখণ্ড ভূমার সঙ্গে স্ববোধে মিলিত হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরুর সান্নিধ্যে গুরুর কৃপায় তাঁর কথার মাধ্যমে যে জ্ঞানলাভ হয় তা-ই হল শুদ্ধ জ্ঞান। যদিও তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে তা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে তা শুদ্ধ জ্ঞান, যা অজ্ঞানের বাধক ও নাশক।

গুরুমুখে শাস্ত্রবাক্য তথা শাস্ত্রমহাবাক্য বিচার ও শ্রবণ ফলপ্রদ হয় উত্তম অধিকারীর পক্ষে। উত্তম জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের কাছেই সুসিদ্ধ হয়। আত্মজ্ঞপুরুষ ও আত্মজিজ্ঞাসু উত্তম ভক্তের পরস্পর যোগাযোগকে 'মণিকাঞ্চনযোগ' বলা হয়।

সুতপ্ত লোহার উপর জলবিন্দু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রাস করে নেয়, কিন্তু ঠান্ডা লোহার উপর জলবিন্দু পড়লে তা সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাধনার বা তপস্যার দ্বারা সংস্কৃত মার্জিত শুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞগুরুর আত্মবিদ্যার বিশ্লেষণ শ্রবণমাত্রই হৃদয়ে গেঁথে যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞগুরু ভিন্ন অপরের কাছে আত্মবিদ্যা বিষয়ে শ্রবণ করে জিজ্ঞাসু শ্রোতার আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আর অজিজ্ঞাসুর তো প্রশ্নই ওঠে না। গুরুবাণী হল তাঁর আত্মবাণী, যার মাধ্যমে উত্তম আত্মজিজ্ঞাসুর হৃদয়ে আত্মবোধের স্ফূর্তি জেগে ওঠে। সেই জন্য বলা হয় আত্মবিদ্যা হল গুরুগতবিদ্যা। অবশ্য সর্ববিদ্যা প্রসঙ্গেই এ কথা প্রযোজ্য। সাধনসিদ্ধ ও মুক্ত গুরুকেই উত্তম গুরু বা সদ্‌গুরু বলা হয়। আত্মজ্ঞানী/ ব্রহ্মজ্ঞানী মাত্রেই সদ্‌গুরু। তাঁর কৃপা, আশিস্, করুণা ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয় উত্তম অধিকারী আত্মজিজ্ঞাসু।

জাগতিক জ্ঞান বা বিদ্যা হল দ্বৈতজ্ঞান। তাকে অপরাবিদ্যাও বলা হয়। অপরাবিদ্যায় সিদ্ধ অধিকারী গুরুর কাছে এই বিদ্যা লাভ করতে হয়। এই বিদ্যার দ্বারা জাগতিক ব্যাপারাদির জ্ঞান বা পরিচয় হয় এবং তার ব্যবহারাদিও সিদ্ধ হয়। সত্য পারমার্থিক জ্ঞান হল অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞানের অধিকারী পুরুষ হলেন আত্মজ্ঞ/ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ। তাঁর মাধ্যমেই সর্বোত্তম যোগ্য অধিকারী আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

আত্মজ্ঞানী/ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্ম-আত্মা স্বয়ং। তাঁর মাধ্যমেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চারিত হয় উত্তম অধিকারীর জীবনে।

আলোচ্য আখ্যানটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল পরাজ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। যে-ভাবে সেই জ্ঞান উপলব্ধি হয় তার জীবন্ত প্রমাণই হল এই আখ্যানটি। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর স্বানুভূতির ভাষায় আখ্যানটি যেমন সুন্দর ও জীবন্ত ভাবে পরিবেষণ করেছেন তেমনই তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে স্বকীয় মৌলিকতা সহযোগে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্বানুভূতির মাধ্যমে তত্ত্বস্ফূর্তি হয়। তত্ত্বস্ফূর্তি হল স্বানুভূতি। গল্প, উপাখ্যান ও কাহিনির মাধ্যমে সেই স্বানুভূতি কী ভাবে লব্ধ হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল প্রতিটি আখ্যান ও তার বিষয়বস্তু।

১৪। ১১। ৬৮

৪০

একদিন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আজ বিকেলে এক পাগলের কথা মনে এল। সেই প্রসঙ্গে বলছি শোন। পাগলের উক্তি হল, অখণ্ডের কাছ থেকে যে যা চেয়ে পায় আবার তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হয়। মুক্তিও একটি অবস্থামাত্র। অনন্ত অসীমের কাছে মুক্তি চাইলে তা যিনি দেন, তিনি হলেন অনন্ত অসীম লীলাময়ী মা। তিনি আবার

যখন-তখন মুক্তপুরুষকে জগতে পাঠাতে পারেন। মুক্তকে মা বলেন—তুমি তো মুক্ত হয়ে আমার মধ্যেই আছ। জগৎ তো আমাকে ছাড়া নয়। সুতরাং আমার মধ্যে যে কোনও জায়গায় তোমাকে আমি রাখতে পারি।

এক সাধক বহু সাধনা করে ভগবানের দর্শন লাভ করেন। তখন তিনি ভগবানকে চারটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি হল—(১) এত শক্তির বৈষম্য তুমি সৃষ্টি করেছ কেন? তোমার এত বৈষম্য আমি পছন্দ করি না। (২) তুমি যা খুশি তাই করবে, এটা তোমার কী রকম ইচ্ছা? আমি যখন যা চাই তা আমাকে কেন দেবে না? (৩) কেউ না-চেয়ে মুক্তি পায়, কিন্তু আমি সাধন করে এত কষ্ট পাই কেন? তুমি আমাকে কষ্ট ছাড়া কী দিয়েছ? (৪) এমন কী বিশেষত্ব তোমার আছে যে তুমি চিরকাল একাই ভগবান হয়ে থাকবে? আর কেউ কেন ভগবান হতে পারবে না?

ভগবান তখন তাকে বললেন—তোমাকে যে-সব জিনিস বিভিন্ন সময়ে দিয়েছি তা এখন আমাকে ফিরিয়ে দাও। তাহলে তুমি যা চাইবে তা আমি পূর্ণ করে দেব।

কিন্তু অতীতের দেওয়া বস্তুগুলি সে হারিয়ে ফেলেছে, বিনষ্ট করেছে, বিস্মৃত হয়েছে। অবশিষ্ট এখনও তার যা আছে তাও যে ঈশ্বরের দেওয়া এও সে ভুলে গিয়েছে। ঈশ্বর তাঁর দেওয়া সব জিনিসই তার কাছে ফেরত চাইলেন। প্রথমে সেই সাধক সব অস্বীকার করে, কিন্তু পরে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমানবশত সবই ছুঁড়ে ফেলে দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার সে বুদ্ধি তখন ছিল না যে, সব দেওয়া যায় কিন্তু সত্তাকে কখনও দেওয়া যায় না। কাজেই সব দিয়েও সে তার আপনসত্তাকে দিতে পারেনি।

ভগবান তখন বললেন—ঐ অবশিষ্ট যা আছে তা আমার জিনিস, আমাকে দিয়ে দিতে হবে। তোমার অস্তিত্বটা আমার, তাও আমাকে দিতে হবে।

সাধকের অস্তিত্বে যখন টান পড়ল তখন সে দেখল যে, সে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তখন অসহায়বোধে সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কারণ এই অবস্থায় সে বুঝতে পারল ঈশ্বরের দেওয়া যে-সব জিনিস পেয়ে তার জীবন গড়ে উঠেছিল এবং যা-কিছু প্রয়োজন তা ঈশ্বরই জুগিয়েছেন নিরন্তর। তার নিজস্ব কিছুই নেই। তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ঈশ্বরের সত্তা।

ঈশ্বর ব্যষ্টি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই নিজের স্বরূপ মহিমা প্রকাশ করেন। কাজেই ঈশ্বরের স্বরূপ মহিমা কীর্তন করাই ব্যষ্টিজীবনের একমাত্র কাজ এবং তা-ই হল তার পরিচয়। ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের সব কিছু পেয়ে তা অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এই অকৃতজ্ঞতার জন্যই ব্যষ্টিজীবনকে কষ্ট পেতে হয়। আবার কৃতজ্ঞতাবোধে ঈশ্বরকে মেনে জীব দুঃখকষ্ট ও ভবব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে।

সাধকের শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের বিজ্ঞানটি যথাযথ সম্পাদিত হলে ঈশ্বর তাঁর স্বভাবস্বরূপের প্রকাশ তার মধ্যে পুনরায় ব্যক্ত করলেন। সাধক তখন যথার্থ ভাগবতে পরিণত হল।

ভক্ত শরণাগত হয়ে ভগবানের কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করার পরে ভগবান প্রসন্ন চিত্তে তার সব প্রশ্নের উত্তরগুলি বলে দিলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—বৈচিত্র্যসৃষ্টি হল ভগবানের আনন্দলীলা। বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই ভগবান নিজের মহিমাকে নিজে আস্বাদন করেন। ব্যষ্টিজীবনের পুষ্টি, তুষ্টি ও পূর্ণতা বিধানের জন্য বৈচিত্র্যের একান্ত প্রয়োজন আছে। বৈচিত্র্যময় জগতে পরস্পরের মাধ্যমে পরস্পরের দ্বারাই পরস্পর পূর্ণতা লাভ করে। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ এগুলি ব্যষ্টিজীবনের ক্রমবিবর্তন ও পরিণাম লাভের জন্য সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে। জড়ত্ব ও একঘেয়েমি দূব করার জন্য বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন মানের প্রকাশের সাহায্য নিতে হয়। বৈচিত্র্য না-থাকলে ধর্মকর্ম, সাধনভজন, শক্তি-জ্ঞান-সুখ-আনন্দ-প্রেম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বৈচিত্র্যের কারণেই সাধনভজন করে ব্যষ্টি-জীবন সিদ্ধিলাভ করে এবং মুক্তি, অমৃতত্ব ও পূর্ণতা আস্বাদন করে। তিনি আরও বললেন—আমি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছি বলেই তুমি জীবন পেয়ে সাধনভজনের মাধ্যমে আমাকে দর্শনের চেষ্টা করেছ এবং আমাকে দর্শন করে পূর্ণতা লাভ করেছ, সত্য উপলব্ধি করেছ বা বিজ্ঞানের মাধ্যমে অজ্ঞানের শোধন হওয়াতে জ্ঞানের জ্ঞান—প্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছ। এবার অমৃতত্ব, মুক্তি ও শান্তি আস্বাদন কর।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—ঈশ্বরের ইচ্ছা বিশ্বে সর্বজীবের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। সৃষ্টির সর্বস্তরে তাঁর ইচ্ছা ও শক্তি সক্রিয় আছে। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মাধ্যমে তাঁর মহাশক্তি সকলের সঙ্গেই যুক্ত আছে। সুতরাং প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিরই অংশবিশেষ। অখণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যষ্টিজীবনের মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরেই সক্রিয় হয়। ইচ্ছার পরিবর্তনের জন্য চাওয়ারও পরিবর্তন হয়। ইচ্ছা অনুরূপ কর্ম এবং কর্ম অনুরূপ ফল হয়। চাওয়া হল ইচ্ছার অংশবিশেষ। পূর্ণ ইচ্ছা না-হলে কোনও চাওয়ার ফলই পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় না। তীব্র ইচ্ছা হল তীব্র সংকল্প। তীব্র সংকল্প হলেই চাওয়ার ফল পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। ভক্তকে ভগবানও বলেছেন—তোমার ইচ্ছা ও সংকল্পের সঙ্গে চাওয়ার যতদিন তারতম্য ছিল ততদিন চাওয়া অনুরূপ তোমার প্রাপ্তি হয়নি। তীব্র সংকল্প ও তীব্র ইচ্ছা অনুরূপ তোমার কর্ম ও সাধনার ফলসিদ্ধিরূপে তুমি আমার দর্শন পেয়েছ।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—সিদ্ধি হল কর্ম ও সাধনার ফল। কর্ম ও সাধনা হয় ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রভাবে। তীব্র ইচ্ছা থেকে তীব্র সংকল্প হয় এবং তীব্র সংকল্প থেকেই কঠোর তপস্যা ও সাধনভজন হয়। কঠোর তপস্যা ও সাধনভজনের পরিণামে সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং সিদ্ধি লাভের পশ্চাতে পূর্ব তপস্যার ফল জমা থাকে। তপস্যা পূর্ণ না-হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফল সঞ্চিত হয়ে বিশেষ কোনও জন্মে তা পূর্ণতা লাভ করে। তার ফলে সেই ঋদ্ধি, সিদ্ধি জন্মে এবং ঈশ্বর-আত্মার সত্যানুভূতি লাভ হয়। স্বল্পমাত্র তপস্যা করে যার ঈশ্বরোপলব্ধি হয় তার কারণ

সকলে জানে না। অতীত অতীত জন্মে তার তপস্যার অবশিষ্ট অংশ বর্তমান জীবনে পূরণ করে সে সিদ্ধিলাভ করে। সুতরাং তোমার অতীত অতীত জন্মের তপস্যার ফল যা জমা ছিল তা পূরণ করার জন্য তোমাকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। যে কষ্ট তুমি পেয়েছ তার দ্বারা তোমার তপঃশক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। সব রকম কষ্টের মাধ্যমে একটা তপঃশক্তি সৃষ্টি হয় এবং অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তা মূল তপস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণরূপ নেয়। সুতরাং তুমি যে কষ্ট পেয়েছ তার পরিণামে তোমার মঙ্গল ও কল্যাণই হয়েছে। তোমার তপস্যা পূর্ণ হয়েছে এবং আমাব দর্শন পেয়েছ।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—নিজেকে পরিপূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে আমি চাওয়া-পাওয়াশূন্য হয়ে থাকি। এই হল আমার পূর্ণতাব লক্ষণ। যে আপনাকে বিলিয়ে দেয় সে-ই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যে কোনও লোক ভগবৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারে যদি সে নিজেকে সব কিছুর জন্য বিলিযে দেয়, অর্থাৎ সর্বপ্রাণের হিত ও সুখের জন্য যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে সে-ই ভগবৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এর তাৎপর্য হল অখণ্ড আমিবোধে বা আপনবোধে অথবা অখণ্ড তুমিবোধে, সমবোধে বা একবোধে সব কিছুকে গ্রহণ করা, জানা ও 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল ভগবৎ স্বরূপ লাভ করার উপায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের নিগূঢ় তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—কোনও রকম পৃথকবোধ, অভিমান-অহংকার থাকলে ভগবৎ স্বরূপ লাভ করা যায় না। আত্মার বা ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে অথবা পরমসত্যের জ্ঞান লাভ বা উপলব্ধি করে সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে।

এই উপাখ্যানের মাধ্যমে এক নিত্য শাশ্বত সর্বব্যাপী অখণ্ড সত্তা ও শক্তির যথার্থ সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। অখণ্ড 'আমি আমার বোধ' অথবা অখণ্ড 'তুমি তোমার বোধ' হল ঈশ্বরীয় সত্তার পরিচয়। এই বোধের ব্যবহার দ্বাবা জীবের জীবত্ব ঘুচে যায়।

কেউ সত্তার বাইরে যেতে পারে না। পরমাত্মা নিজেই সংসাবী সেজেছেন—অন্য কারওর সে যোগ্যতা নেই। সর্বদা কর্তা সেজে সকলে কাজ করে, কিন্তু খারাপ কাজ করলে ভগবানের দোহাই দেয়। যখন জয়-পরাজয় দু'টিই সমান হয়ে যায় তখনই বোঝা যায় ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়েছে যে, তিনিই কর্তা। একেই বলে পরাবৈরাগ্য।

ঈশ্বর-আত্মা সত্তা ও শক্তির দ্বারাই সর্বসৃষ্টির মধ্যে মাত্রা অনুসারে অনুস্যূত হয়ে আছেন। সত্তা থাকে শক্তির অভিব্যক্তির পশ্চাতে নির্বিকার ও নির্বিকল্প রূপে। মূল সত্তার কখনও রূপান্তর, বিকার বা পরিণাম হয় না। বিকারাদির পরিণাম শক্তির অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে হয়। শক্তির লীলায় তার ইচ্ছা সংকল্প-বিকল্পের মাধ্যমে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মাধ্যমে এবং আপাতপ্রতীয়মান স্ববিরুদ্ধ গুণভাব ও বোধের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাহ্যদৃষ্টিতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে পরস্পর প্রকাশমানের মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য প্রতিভাত হয় তা স্থায়ী নয়, সাময়িক। বিকারের বা পরিণামের ক্রম কার্য-কারণ এবং কারণ-কার্যের সূত্র ধরে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিব্যক্ত হয়।

সর্বপ্রকার প্রকাশের ধারার মধ্যে যতই বৈচিত্র্যের প্রভাব প্রতীয়মান হোক না কেন তাদের পশ্চাতে সত্তা সর্ব অবস্থায় সর্বকালে এক বা সমান থাকে।

শক্তির অভিব্যক্তি আভ্যন্তরীণ সংকল্প, উদ্দেশ্য ও কারণ অনুসারে কোথাও তীব্রতম, কোথাও তীব্রতর, কোথাও তীব্র ভাবে আবার কোথাও মৃদুতম, কোথাও মৃদুতর, কোথাও বা মৃদু ভাবে প্রকাশ পায়। সেইরূপ কোথাও সূক্ষ্মতম বা সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্ম রূপে, আবার কোথাও স্থূলতম বা স্থূলতর বা স্থূল রূপে, কোথাও স্থিতি বা গতি রূপে, কোথাও জড় বা চেতন রূপে, কোথাও নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় রূপে, কোথাও নির্বিকার বা সবিকার রূপে, কোথাও পরস্পরবিরোধী ভাব বা ক্রিয়া রূপে অথবা পরস্পর সম্মিলিত ভাবে। এককরূপে কোথাও, বিষমরূপে কোথাও, সমতারূপে কোথাও, অনৈক্যরূপে কোথাও, ঐক্যরূপে কোথাও, দুঃখকষ্ট-অভাবরূপে কোথাও, সুখশান্তি-বৈভবরূপে কোথাও, বন্ধন বা মুক্তি রূপে কোথাও, দ্বৈত বা অদ্বৈত রূপে কোথাও, অপূর্ণ বা পূর্ণ রূপে কোথাও, কোথাও শূন্য বা অশূন্য রূপে নিজবক্ষে নিজের দ্বারা অখণ্ড অবিভক্ত নিজেকে বহুবিধ খণ্ড ও বিভক্ত রূপে প্রকাশ করে যাদুকরের যাদুখেলার মতো আপনার ইন্দ্রজাল বিস্তার (প্রকাশ) করে আবার স্বেচ্ছায় তা সংবরণ করে গুটিয়ে নেয়। শক্তির এই স্বভাবলীলা ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং সমষ্টির অতীত সর্বত্রই সাধিত হয় সত্তাকে ববণ করে। খেলতে খেলতে যখন তাঁর খেলা পরিপূর্ণ ভাবে গুটিয়ে নিয়ে সত্তার বুকে তিনি লীন হয়ে যান, তখন কেবল স্বতঃসিদ্ধ সত্তার স্ফূর্তি স্বানুভূতিরূপে ফুটে ওঠে। তাঁর এই স্বরূপ মহিমা অভিনব, আশ্চর্যতম এবং সর্বোত্তম আনন্দপ্রদ। নিজেকেই নিজে তিনি নিরন্তর প্রকাশ করছেন। এ-ই হল তাঁর সত্য পরিচয়।

ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান, গল্প ও কাহিনির মাধ্যমে পবমাত্মদেবতার স্বভাব ও স্ববোধের সত্য পরিচয়টি তত্ত্বের দৃষ্টিতে স্বানুভূতির ভাষায় সর্বত্রই ব্যক্ত হয়েছে।

১৫। ১১। ৬৮

৪১

জগতের সব কিছুই মাতৃময় ও ঈশ্বরময় অর্থাৎ চৈতন্যময়। সাধনভজনের ফল হল আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সমজ্ঞান। সমজ্ঞানকেই বেদান্তজ্ঞান বলা হয়। এই বেদান্তজ্ঞান নিয়ে জীবন আরম্ভ করতে মা বলে দিয়েছেন। 'না' ও 'মা' অভেদ। 'না' হল মায়ের সর্বোত্তম রূপ। রোগমুক্ত হবার জন্য যেমন রোগীকে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলতে হয়, ডাক্তার হিন্দু না মুসলমান, লম্বা না বেঁটে, ফর্সা না কালো, মোটা না রোগা ইত্যাদি বিচার করে রোগী উপকৃত হয় না, সেইরূপ ভবরোগ থেকে মুক্ত হবার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের শরণাগত হতে হয়। তাঁদের দোষগুণ বিচার করে বিশেষ উপকার কারও হয় না। এই প্রসঙ্গে একটি রাজার গল্প বলি শোন।

এক রাজা জগৎসংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে একদিন তার মন্ত্রীকে বললেন যথার্থ সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধান করতে। তিনি রাজ্যভোগ ত্যাগ করে ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল

হয়ে সদ্‌গুরুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মন্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীদের একত্র করে রাজার কাছে এনে হাজির করল। তাঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন ইষ্টের মহিমা, সাধনপদ্ধতি ও গুণকীর্তন করে রাজাকে সেই মতপথ অনুসরণ করতে বললেন এবং তা হলেই রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, এ কথাও জানালেন।

সাধুগুরুদের মুখে এক ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদের কথা শুনে রাজা বিভ্রান্ত হলেন। যথার্থ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব থাকাতে তিনি সাধুদের মধ্যে কারওকেই গুরু বলে বরণ করে নিতে পারেননি। সাধুদের ন্যায্য প্রাপ্য দক্ষিণা দিয়ে তিনি তাঁদের বিদায় করলেন।

মন্ত্রী রাজার মনের ভাব বুঝতে পেরে কিছুদিন পরে আরেকজন সাধুকে রাজার কাছে নিয়ে আসে। রাজা সাধুকে ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাধুটি রাজার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তদনুরূপ ব্যবস্থা করলেন ও রাজাকে বললেন যে, বনে নির্জন স্থানে যথার্থ ভাবে তিনি ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আলোচনা করবেন।

রাজা সাধুর সঙ্গে বনের পথে কিছুদূর গিয়ে সামনে এক বড় নদী দেখতে পেলেন। নদী পার হবার জন্য রাজা মন্ত্রীকে নৌকার ব্যবস্থা করতে বললেন। মন্ত্রী যতবার যত রকম নৌকার ব্যবস্থা করে ততবারই সাধু সেই নৌকা নাকচ করে দেন। কোনও বার তিনি বলেন লম্বা নৌকায় চলবে না, কোনও বার বলেন নৌকাটি ছোট, কোনও বার বলেন নৌকাটি পুরানো ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বহু রকম নৌকা আনা হল, কিন্তু একটি নৌকাও সাধুবাবার পছন্দ হল না। তখন রাজা বিরক্ত হয়ে সাধুবাবাকে বললেন—যে কোনও একটি নৌকা দ্বারাই তো নদীর ওপারে যাওয়া যায়। তার জন্য এত বিচারের কী প্রয়োজন?

রাজার মুখে এই কথা শুনে সাধু মহাত্মা হেসে রাজাকে পুনরায় বললেন—হ্যাঁ, যেমন যে কোনও একটি নৌকার মাধ্যমেই নদী পার হওয়া যায়, সেইরূপ যে কোনও একটি মতপথ অবলম্বন করে যে কোনও এক নামের মাধ্যমে ভবনদী পার হয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। ঈশ্বরের নাম ও মতপথ নিয়ে যুক্তিতর্ক, বিচারের প্রয়োজন হয় না।

সাধুর মুখে এই কথা শুনে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেখানেই সেই সাধুকে গুরু বলে বরণ করে তাঁর কাছেই ঈশ্বর লাভের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। তখন সেই সাধুগুরু রাজাকে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ মহিমা শোনালেন। তিনি বললেন—ঈশ্বর সবারই নিকটতম অতি আপনজন। প্রত্যেকের হৃদয়েই তিনি বিরাজ করেন। তিনি সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধের কেন্দ্র। সর্বপ্রকাশের তিনি প্রকাশক। সর্বকার্যের তিনিই নিয়ন্তা। সর্বকর্মফলের তিনিই ভোক্তা। তিনি জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ। তিনি গুণ ও শক্তি, তিনিই সত্তা। তিনি বহিঃসত্তা, অন্তঃসত্তা, কেন্দ্রসত্তা এবং তুরীয়। তিনি ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং সমষ্টির অতীত। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। তিনি সগুণ, নির্গুণ এবং

নির্গুণগুণী। তিনি ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্ত। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি, আবার পুরুষ, প্রকৃতি, নপুংসক কিছুই নন। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শাশ্বত অচ্যুত নিত্য অদ্বৈত। তিনি মাতা, ধাতা, পিতা ও পিতামহ। তিনি জীবজগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব। তিনি দেশ ও কাল, আবার দেশাতীত ও কালাতীত। তিনি ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, আনন্দশক্তি ও পরমতত্ত্ব। তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁর সত্তায় সবাই সত্তাবান এবং তাঁর শক্তিতে সবাই শক্তিমান হয়ে সংসারে জীবনযাপন করে। সমগ্র বিশ্ব তাঁর বহিঃরূপ। সবার হৃদয় তাঁর লীলাভূমি। তাঁর লীলা ও মহিমা অনাদি অনন্ত। পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মাধ্যমে কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির সাধনবিজ্ঞানরূপে ও তার পরিণাম বা ফল রূপে নিজের স্বরূপকে তিনি ব্যক্ত করেন। স্রষ্টারূপে তিনি ব্রহ্মা, পাতারূপে তিনি বিষ্ণু এবং সংহর্তারূপে তিনি রুদ্র বা মহেশ্বর। মাতাপিতারূপে তিনি মহাগুরু বা শিক্ষাগুরু। জাগতিক বিদ্যা ও তার শিক্ষাগুরুও তিনি। আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও তার দীক্ষাগুরুও তিনি। তিনি আত্মগুরু পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।

রাজাকে ঈশ্বরের এই মহিমা হৃদয়ে ধারণ করে রাজকার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়ে এবং আশীর্বাদ করে সাধুগুরু বিদায় নিলেন। রাজাও যথার্থ সদ্‌গুরুর আশীর্বাদ লাভ করে ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণে তুষ্ট হয়ে ঈশ্বরীয়বোধে রাজকার্য পরিচালনায় ব্রতী হলেন।

কিছুকাল গুরুর নির্দেশ অনুসারে রাজকার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করে রাজা রাজপুত্রকে সিংহাসন ও রাজ্যশাসনের দায়িত্বভার দিয়ে রানিকে নিয়ে বানপ্রস্থে গেলেন।

নগরের প্রান্তদেশে এক বনভূমি ছিল। সেখানে তিনি কুটির বেঁধে গুরুনির্দিষ্ট আত্মচিন্তায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন পর সেখানে দু-একজন বানপ্রস্থী ও সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়। তারা রাজার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তার মনোভাব অবগত হয়ে তাকে কিছু সদুপদেশ দিয়ে যান। মাঝে মাঝে এসে রাজার সঙ্গে তারা তত্ত্ব আলোচনাও করেন। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর রাজার মনে নির্জনবাসের ইচ্ছা জাগে। কিন্তু রানি নির্জনবাস করতে রাজি নন। রাজা রানিকে সেই সাধন কুটিরে রেখে নির্জনে যাওয়ার সংকল্প করলে রানি তাতে অসম্মত হন। তিনি রাজপুত্রকে খবর দিয়ে নিয়ে আসেন এবং রাজার সংকল্পের কথা তাকে জানান। এদিকে রাজাও তার সংকল্প ছাড়তে রাজি নন।

ইতিমধ্যে ভিন্ন দেশের রাজা ঐ রাজ্য আক্রমণ করলে রাজপুত্রকে রাজ্যরক্ষার্থে চলে যেতে হয় এবং রানিমাতাকেও সে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। এই সুযোগে রাজা সেই কুটির ত্যাগ করে বহু দূরে নির্জন এক স্থানে সাধনভজন শুরু করেন। কিছুদিন পর সেখানে এক সাধক এসে উপস্থিত হন। রাজা তখন মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। সাধক রাজার সঙ্গে কথা বলতে চান কিন্তু রাজা কোনও কথারই উত্তর দেন না। সাধক দু-তিন দিন অপেক্ষা করে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি রাজাকে বলে যান— আবার আমি আসব তোমাকে নিয়ে যেতে। তুমি নির্জনতা পছন্দ কর, এমন এক

নির্জন স্থানে নিয়ে যাব যেখানে তোমার সাধনভজন ঠিক মতো হয়। এই বলে সাধক চলে যান। দু-তিন দিন পর তিনি এসে দেখেন রাজা সমাধিতে লীন হয়ে বসে আছেন। সাধক বহু চেষ্টা করেও রাজার ধ্যানভঙ্গ করতে না-পেরে আরেকজন সাধককে সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসেন। দুই সাধক মিলে ধ্যান ভাঙাবার অনেক চেষ্টা করার পর রাজার ধ্যানভঙ্গ হয়। তখন সাধক দু'জন রাজাকে অনেক প্রশ্ন করেন। রাজা আকার ইঙ্গিতে জানান যে, এই প্রশ্নগুলি আত্মজ্ঞানের অন্তরায়। তিনি আকার ইঙ্গিতে আরও জানান যে, সমগ্র জিজ্ঞাসাকে বা প্রশ্নকে পরিহার না-করলে আত্মসাধন সিদ্ধ হয় না। তারাও রাজার সাথে থেকে মৌনব্রত অবলম্বন করে আত্মসাধন করতে আরম্ভ করলেন। এই সময় একজনের দেহপাত হয়। এই সাধকটি পরে রাজপুত্রের ঘরে সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শুভ সংস্কার নিয়ে জাত এই পুত্রটি অল্পদিনের মধ্যেই অপরাজ্ঞানের চর্চার দ্বারা খুবই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সকলের কাছে প্রিয় হয়। সে যখন ষোড়শ বছরে উপনীত হয় তখন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। বহু দেশ ঘুরে সে নির্জনবাসী আত্মসাধনে রত রাজার কাছে উপস্থিত হয়। সেই আত্মসাধক রাজা রাজকুমারকে দেখে চিনতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, এ-ই হল সেই বিগত আত্মসাধক যার সঙ্গী সাধকটি তখনও সেখানে বর্তমান। তিনি কিন্তু তাকে চিনতে পারেননি। রাজকুমার রাজার কথাবার্তা ও আচরণে প্রীত হয়ে সেখানে কয়েকদিন থেকে যায়। স্বভাবজাত শুভ সংস্কারের পরবশ হয়ে রাজকুমার রাতে আত্মধ্যানে রত বৃদ্ধ রাজাকে দেখে নিজেও আত্মধ্যানে রত হয়। ধ্যানের গভীরে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হয় এক বিশেষ জ্ঞানভূমিতে। ধ্যানভঙ্গের পরে উভয়ে উভয়কে চিনতে পেরে আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। সেই দৃশ্য দেখে অন্য আত্মধ্যানী সাধক খুব বিস্মিত হয় এবং নিজের অন্তরের ভাববোধের কথা তাদের জানায়। এই ভাবে তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত আত্মবোধের মিলন ঘটে। ইতিমধ্যে আরও একজন আত্মধ্যানী পুরুষ সেখানে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর সমাধিসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অপর তিনজনকে আপনবোধে গ্রহণ করেন। এই নবাগত আত্মসাধকও বৃদ্ধ রাজার গুরুর আশ্রিত। তাঁরই কৃপা অনুশাসনে সাধনভজন করে তিনি পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। বৃদ্ধ রাজাকে তাঁর গুরুভ্রাতা জানতে পেরে তিনিও কয়েকদিনের জন্য সেখানে আনন্দে থেকে যান এবং আত্মধ্যানের মাধ্যমে প্রত্যেকেই আত্মানন্দ অনুভব করেন। কিছুদিন পরে তিনি আপন গন্তব্যস্থলে ফিরে যান।

এদিকে রাজকুমার বৃদ্ধ রাজাকে তার রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু রাজা রাজি না-হয়ে রাজকুমারকে আশীর্বাদ করে বিদায় দেন।

কয়েকদিন পর রাজা সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন এবং আপন গুরুর সঙ্গে মিলিত হন বিদেহী অবস্থায়। উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে—একজন সূক্ষ্ম দেহে আরেকজন স্থূল দেহে। গুরুও বুঝতে পারলেন তাঁর দেহ ছাড়ার সময়

হয়েছে। তিনিও ধ্যানযোগে সমাধির মাধ্যমে দেহত্যাগ করে আপন শিষ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয়ে আপন আপন কারণ দেহ অতিক্রম করে তুরীয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন।

গল্পটি এখানে শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর জীবনে আত্মসাধনার তাৎপর্যটি খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করলেন—আত্মজ্ঞানীর আশ্রিত সাধকদের আত্মজ্ঞানের সাধনা যে কত সহজসাধ্য এবং ফলপ্রসূ হয় তার যথার্থ প্রমাণ ও পরিচয় আলোচ্য কাহিনিটির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনিটি পুনঃপুনঃ ভাবনা করলে সহজেই তার সত্য পরিচয় জানা যায়।

১৮। ১১। ৬৮

৪২

একই দিনে একই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও একটি গল্প বললেন।

এক নিষ্ঠাবান ভক্তের বাড়িতে তার এক আত্মীয় তার প্রিয় কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়। সে কুকুরটিকে এতবেশি ভালবাসে যে, কুকুরকে নিজের সাথেই খাওয়ায় এবং নিজের সাথেই শোয়ায়।

ভক্ত পূজার ঘরে তার বিগ্রহ নিয়েই বেশির ভাগ সময় থাকে। একদিন আত্মীয়টি কোনও কারণে ঠাকুরঘরে গেলে কুকুরটিও তার সাথে সাথে যায়। তখন ভক্তটি বিরক্ত হয়ে আত্মীয়কে কুকুর নিয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। আত্মীয়টি তাকে বলে—তোর কাছে যে God, আমার কাছে সে-ই dog হয়ে এসেছে। আমার কাছে আমার dog-ই হল God। তুই God-কে dog বলে দেখলি, কিন্তু আমি dog-এর মধ্যেই God-কে দেখছি। এই বলে সেই আত্মীয়টি কুকুর নিয়ে ভক্তের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

রাতে ভক্ত স্বপ্ন দেখল যে, তার ইষ্টই তাকে বলছে—আমি তোর পূজার ঘরে এলাম আর তুই আমাকে গ্রহণ করলি না। এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে রাস্তার কুকুর দেখলেই সে আদর করত এবং খাওয়াত।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অখণ্ডবোধে হয় শ্রদ্ধা-ভক্তি, খণ্ডবোধে হয় ভোগ। ভক্তির সাধনা দ্বিবিধ। প্রথমটি বিধি-নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠানযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি আর্তি, প্রীতি ও অনুরাগ প্রধান। অনুরাগের ভক্তিতে বিধি-নিয়মের প্রাধান্য থাকে না। ভাললাগা ও ভালবাসা ঘনীভূত ও বিশুদ্ধ হলে হয় অনুরাগ, প্রীতি ও প্রেম। ভাললাগা হল বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ধর্ম। তা হল রূপের সঙ্গে রূপের সম্পর্ক। রূপ-গুণ নষ্ট হলে সেই ভাব থাকে না। আর ভালবাসা হল অন্তরের স্বভাব—মনোধর্ম। প্রেম হল স্ববোধের ধর্ম। তা কেন্দ্রসত্তা আত্মার স্বভাব।

দেহেন্দ্রিয়-মন-প্রাণে যখন ধারাবাহিক ভাবে আত্মপ্রেমের অভিব্যক্তি হয় তখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের স্বতন্ত্র চেতনা থাকে না। সেই অবস্থায় দেহবোধ ও পৃথক ব্যষ্টিবোধও থাকে না। মহাভাবের মাধ্যমে প্রেমের অভিব্যক্তি হয়। মহাভাবের বিশেষ বিশেষ

লক্ষণ দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে। শুদ্ধ মহাভাবের প্রকাশই হল আত্মার স্বভাবের প্রকাশ। বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণের কাছে বিকার বলে মনে হলেও তা প্রেমভক্তির স্বাভাবিক অবস্থা।

১৮। ১১। ৬৮

৪৩

ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন। প্রতিটি প্রকাশের মধ্যেই তিনি নিত্যবিদ্যমান। এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় বিশ্বাসীর সঙ্গ দ্বারা। বিশ্বাস হল শক্তির কেন্দ্র। নিরন্তর তাঁর সঙ্গ করতে পারলে যে কোনও সময়ে অপরের মধ্যেও এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। এই রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অর্জুনের মধ্যে, বৃন্দাবনে গোপীদের মধ্যে, দক্ষিণেশ্বরে লাটু মহারাজ প্রভৃতি অনেকের মধ্যে। এঁরা নিরন্তর শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষের সঙ্গ করার ফলেই ঈশ্বরের কৃপা পেয়েছিলেন।

প্রেমিকের সঙ্গ করেই প্রেম লাভ হয়। প্রেম হল রাগাত্মিকা ভক্তি। তা স্বভাবতই বিশুদ্ধ ও পবিত্র। এর প্রভাবে অন্তরের মল বিধৌত হয় এবং আত্মার সঙ্গে পূর্ণ মিলন হয়। বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় হলে কোনও নির্দেশ বা বিধি-নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না। অনেকে কঠোর সাধনভজন করেও আশানুরূপ ফল পায় না অথচ অতি সাধারণ লোকের মধ্যে শুধু সঙ্গের প্রভাবেই ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি হতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প শোন।

কোনও এক জমিদারের এক কর্মচারী প্রজাদের খুব উৎপীড়ন করে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। আবার সপ্তাহে একদিন উপবাস করে সে খুব ঘটা করে ভগবানের পূজা-আরাধনা করত।

আরেক দিকে সেই গ্রামেরই এক জমাদার সারাদিন ধরে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে, নর্দমা প্রভৃতি ঝাড়ু দিয়ে রাতে তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে এসে হাত জোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলত—প্রভু, তুমি তো জান আমি কত অসহায়। আমি সকালে তোমার নাম করে তোমারই জন্য কাজ করি। আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার বড় হওয়ারও সাধ নেই। তুমি শুধু এইটুকু দেখো যেন তোমাতে মন সতত যুক্ত থাকে। তুমি যে কর্মের ভার আমাকে দিয়েছ তা যেন তোমাকে স্মরণ করেই আমি করে যেতে পারি।

গ্রামের লোক কেউ জানত না যে, খাজনা আদায়কারী কর্মচারী এবং জমাদারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। কিছুদিন পরে দু'জনেরই মৃত্যু হয়। সেই গ্রামে এক মহাপুরুষ এসেছিলেন। একজন লোক এসে মহাপুরুষকে সংবাদ দিল—বাবা, রামা জমাদার মারা গিয়েছে। এই সংবাদ শুনে সেই মহাপুরুষ হাত জোড় করে রামা জমাদারের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বললেন—আহা, লোকটি বড় ভক্ত ছিল। তার শুদ্ধ চিত্ত ছিল, কাজেই তার কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি হয়েছে।

একটু পরে আরেকজন লোক এসে মহাপুরুষকে জানাল জমিদারের খাজনা আদায়কারী কর্মচারী মারা গিয়েছে। শুনে মহাপুরুষ চুপ করে রইলেন, প্রণাম জানালেন না।

এই দু'জনের প্রতি মহাপুরুষের দুই রকম আচরণ দেখে কেউ কেউ এসে জিজ্ঞাসা করল—জমিদারের কর্মচারী তো কত পূজা-অর্চনা করত, কিন্তু রামা জমাদারকে কোনও দিন পূজা-অর্চনা করতে দেখা যায়নি। আপনার কথা যে সত্য তা কী করে বোঝা যাবে?

মহাপুরুষ তখন তাদের বললেন—দু'টি জবাফুল একটি রামা জমাদারের নামে এবং আরেকটি জমিদারের কর্মচারীর নামে জলের মধ্যে রাখ। তাঁর কথা অনুযায়ী দু'জনের নামেই দু'টি জবাফুল জলের মধ্যে রাখা হল। রামার নামে যে ফুল রাখা হল তা জলের মধ্যে ডুবে গেল এবং জমিদারের কর্মচারীর নামে যে ফুল রাখা হল তা ভেসে রইল।

তখন মহাপুরুষ বললেন—জমিদারের কর্মচারী এই জবাফুলের মতো অনেক জনম সংসারে ভেসে বেড়াবে। কিন্তু রামার নামে যে ফুলটি ছিল তা ডুবে গেল। কাজেই তার আর সংসারের বন্ধন নেই। সে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ভগবানকে ডাকতে হলে গোপনেই ডাকা ভাল। বাইরের লোককে জানিয়ে সাধনভজন করতে নেই। জানবে শুধু মন, প্রাণ এবং ভগবান। বাইরের আড়ম্বর প্রয়োজন হয় শুধু অন্তরে প্রবেশ করার জন্য। রূপ ধরে সাধনা শুরু করে পরে ক্রমশ নামে-ভাবে-বোধে যেতে হয়। পরিণামে হয় বোধের সঙ্গে অভেদে মিলন।

গল্পটি শেষ করে তার তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সবার হৃদয়গভীরে ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। সাধারণ মানুষের মন বহির্মুখী। বহির্মুখী মন বাইরের নাম-রূপের জগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে মেতে থাকে। তার পক্ষে ইষ্টসাধন যথার্থ হয় না। ঈশ্বর-আত্মাই হল সবার পরম ইষ্ট। বহির্মুখী মনকে সংযত ও শান্ত করে অন্তর্মুখী ভাবনা দ্বারা ইষ্টপূজা, ইষ্টসাধনা ও ইষ্টধ্যান করতে হয় এবং তা সম্পন্ন করতে হয় একান্ত গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে। অন্তর্মুখী মনে ইষ্টসাধন সুগম ও সহজসাধ্য হয় অনলস অভ্যাস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। অপরপক্ষে বহির্মুখী মনের ইষ্টসাধন প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সমক্ষে সবাইকে জানিয়ে সাধিত হয়। তার ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্টসাধন তমোরজোপ্রধান বলে সাত্ত্বিক ও শুদ্ধসাত্ত্বিক ফল সে পায় না। তমোরজোগুণের প্রভাবে যে ইষ্টসাধন তা অহংকার, স্বার্থ ও সকাম প্রণোদিত। অপরপক্ষে অন্তর্মুখী মনের ইষ্টচিন্তা, ইষ্টসাধন, ইষ্টধ্যান সাত্ত্বিক ও শুদ্ধসাত্ত্বিক পর্যায়ের বলে তার ফল ইষ্টপ্রীতির কারণ হয়। ইষ্ট প্রীত হলে সাধকের সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

মানুষের ভোগৈশ্বর্যের প্রসার হয় বহির্মুখী ধর্মকর্ম সাধনের দ্বারা। অন্তর্মুখী মনের ধর্মকর্ম ও সাধনার ফল দিব্যভাববোধের পরিপূরক। পরিণামে তা-ই হয় জীবনে মুক্তিশান্তি লাভের সহায়ক।

আলোচ্য ছোট গল্পটির বিষয়বস্তুর তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হল। মন দিয়ে তা ভাবনা করে অনুভব করার চেষ্টা করবে, তবেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

২১। ১১। ৬৮

৪৪

চেষ্টা করে একদিনে কেউ কারওকে শোধন করতে পারে না। হাজার চেষ্টা করার পরেও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করা যায় না। যা হবার তা-ই হয়, যা ঘটবার তা-ই ঘটে। কেউই মনের মতো করে সব জিনিস পায় না। ছেলেমেয়েকে মনের মতো করে মানুষ করা যায় না। তাদের সংস্কার অনুরূপ তারা গড়ে ওঠে। নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ভাল-মন্দ বোধ দিয়ে মাপলে চলে না। নিজে সত্যের পথে চলে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শুধু অপরের সামনে উদাহরণস্বরূপ থেকে অপরের সেবা ও কর্তব্য কর্ম ঈশ্বরীয়বোধে করে যেতে হয় কর্মফলে অনাসক্ত থেকে। তাহলে কোনও অবস্থাই মনকে আর বিব্রত করতে পারে না। এই বিষয়ে সুন্দর একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

এক সাধু মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসতেন। একদিন এক গরিব গৃহী তার ছোট ছেলেকে সাধুর কাছে নিয়ে এসে বলল—বাবা, আমার এই ছেলেটির মিষ্টির প্রতি এত লোভ যে, প্রতিদিন তার মিষ্টি চাই। মিষ্টি না-হলে তার চলে না। প্রত্যেকদিনই সে মিষ্টি খায়। কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করা যায় না। আমি গরিব মানুষ। প্রতিদিন তার জন্য মিষ্টি জোগাড় করাও আমার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু এ কথা সে বোঝে না। তা ছাড়া মিষ্টি খেলেই তার অসুখ করে। আপনি যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন।

সাধু গৃহীকে বললেন—তুমি এক মাস পরে ছেলেটিকে নিয়ে এস। সেদিনকার মতো গৃহী ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল। ঠিক এক মাস পরে সে আবার ছেলেকে নিয়ে সাধুর কাছে উপস্থিত হল।

সাধু ছেলেটিকে উপদেশ দিয়ে বললেন—মিষ্টি খেলে অসুখ করে। মিষ্টি খাওয়া ভাল নয়। তুমি আর মিষ্টি খেও না। আমিও মিষ্টি খাই না। এই সামান্য উপদেশ শুনে গৃহী সাধুকে বলল—বাবা, এ কথা তো এক মাস আগেই আপনি বলতে পারতেন।

সাধু বললেন—এক মাস আগে আমি এ কথা বললে কাজ হত না, কারণ তখন আমি নিজেই মিষ্টি খেতাম। যে ব্যবহার আমি নিজে করি না সেই ব্যবহার অভ্যাস করার জন্য অন্যকে উপদেশ দিলে কোনও ফল হয় না। সেই সাধুর কথায় বালক মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিল। নিজে আচরণ করে তা অপরকে শিক্ষা দিলে কার্যকরী হয়, নতুবা কোনও শিক্ষাই ফলপ্রদ হয় না।

সেই জন্য ঈশ্বরীয়বোধে প্রতিষ্ঠিত না-হয়ে, নিজে পূর্ণতা লাভ না-করে অপরকে সংশোধন করা যায় না। সত্য বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র বলতে পারেন যিনি সত্যকে বা ঈশ্বরকে জেনেছেন। তাই বলা হয়, সাধু চিনতে হয় তাঁর আচরণ বা

ব্যবহার দেখে। সহজ সরল আড়ম্বরহীন মধুর ব্যবহার, সমবোধের ব্যবহার দেখে সাধুকে চিনতে হয়।

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গল্পের বিষয়টি দৈনন্দিন জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনাকে ভিত্তি করে অসাধারণ যা-কিছু হওয়া সম্ভব এবং তা যে-ভাবে হয় তার আচরণপূর্বক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অপরকে সাহায্য করে। অভ্যাস ও আচরণ বিহীন কোনও শুকনো জ্ঞান দ্বারা নিজের যেমন কোনও উপকার হয় না তেমন অপরকেও অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ করা যায় না। পঠিত, অধীত বা শ্রুত জ্ঞান দ্বারা নিজের স্বভাবের যেমন সংশোধন হয় না, তেমন অপরকে সংশোধন করতেও তা সাহায্য করে না। সংসারে অনভিজ্ঞ অজ্ঞ লোকেরাই অপরকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। যা নিজেরা আচরণ করে না তা অপরের কাছে আশা করে এবং অপরকে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেয়। তাদের কথা শুনে তাদের অনুসরণ করে তাদেরই মতো যারা। কিন্তু যারা যথার্থ জানবার জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত তারা এদের সংসর্গ এড়িয়ে চলে। যারা নিজেরা জ্ঞান নিতে ইচ্ছুক বা সচেষ্ট নয় তারাই অপরকে জ্ঞান দিয়ে বেড়ায়। কর্মক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই এইরূপ লোকের সংখ্যা বেশি। এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না, পথ দেখাতে গেলে দু'জনেই গাড্ডায় পড়ে, সেইরূপ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর একজনকে জ্ঞান বা পরামর্শ দিতে গেলে উভয়েই সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়।

প্রাজ্ঞবিজ্ঞ যথার্থ গুরুর সংখ্যা খুব কম হলেও অজ্ঞ ও সাজা গুরুর বা সাধুর সংখ্যা এতবেশি যে তা চিন্তারই কারণ। যথার্থ সাধু বা গুরু সাধন ও আচরণের দ্বারা জ্ঞানলাভ করে নিজে যেমন উপকৃত হন, তেমনই অপরকেও সেই জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করে অপরের উপকার করেন। কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই মানুষের যথার্থ উপকার করা সম্ভব। তবে এ বিষয়ে একটি কথা হল, তাঁরা সেই জ্ঞান যদি একান্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয় বলে কেউ গ্রহণ করে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয় তাহলেই তা কার্যকরী ও ফলপ্রদ হয়, নতুবা নয়। জ্ঞান লাভের কোনও বিকল্প উপায় নেই। যথার্থ জ্ঞান যেমন দুর্লভ, জ্ঞানের গ্রহীতাও সেই রকম দুর্লভ। জাগতিক জ্ঞানের পরিবেষক ও গ্রহীতার প্রসঙ্গেও এই কথা প্রযোজ্য।

আচরণশূন্য জ্ঞান দ্বারা কোনও কর্ম শুভ ফলপ্রদ হয় না—অশুভ ফলপ্রদ হতে পারে। তা জেনেই সাধুগুরু প্রথমে বালকটিকে কোনও উপদেশ না-দিয়ে এক মাস পরে আসতে বলেছিলেন। প্রথম দিন তিনি উপদেশ দিলে সেই উপদেশে বালকের কোনও উপকার হত না। তা জেনেই তিনি এক মাস পরে বালককে আসতে বললেন। এক মাস তিনি নিজে আচরণ করে তদনুসারে সেই জ্ঞান দিয়ে বালককে সাহায্য করলেন, তাতে বালকের উপকার হল। গল্পটি ছোট হলেও তার মধ্যে যথার্থ শিখবার বিষয়বস্তু আছে।

২৪। ১১। ৬৮

৪৫

বিশ্বরূপই হল কৃষ্ণমূর্তি বা মাতৃমূর্তি। যে দিকে দৃষ্টি যায় শুধু মাতৃমূর্তি। যিনি প্রতিনিয়ত বিপদ-আপদ ও নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে সবাইকে পরিপালন ও পরিপোষণ করেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বা ঋণবোধ রাখতে হয়। কোনও রকম চাওয়া-পাওয়ার আশা না-রেখে যা হয়ে চলেছে, দ্রষ্টাবোধে থেকে তা শুধু দেখে যেতে হয়। তাহলেই অন্তর শান্ত হয়। প্রতিটি বিরুদ্ধ অবস্থাকে মাতৃবোধে মেনে নিলে সকল রকম বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থা অনুকূলে এসে যায়।

চাওয়া-পাওয়া দ্বারাই সকলে চিন্ময়ী মায়ের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখে। আসলে অখণ্ড থেকে কখনও পৃথক হওয়া যায় না। চাওয়া-পাওয়া দ্বারা বেদনা লাভই হয় শুধু। কিছু না-চেয়ে মায়ের কাছে সব সমর্পণ করে দিতে হয়। ব্যষ্টিজীবনের যা-কিছু আছে সব মাতৃবোধে গ্রহণ করা হলেই মাকে সব সমর্পণ করা হয়। তা-ই হল আত্মসমর্পণ করাব কৌশল। মনের প্রতিটি বৃত্তিব মধ্যে, প্রাণের প্রতিটি ক্রিয়া ও গতির মধ্যে ঈশ্বরকে বা মাকে বসাতে হয়। প্রাণ কখনও গতিশূন্য বা ক্রিয়াশূন্য হয় না।

একবার এক বাবুর বাড়িতে কাজের জন্য এক চাকর এল। বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী কাজ জান?

চাকর—কোনও কাজই জানি না।

বাবু—তবে এলে কেন?

চাকব—খাব কী?

বাবু—তবে তুমি গেটের কাছে বসে থাক। কেউ এলে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলবে 'আসুন'।

চাকর বাজি হল। প্রথম দুই দিন বাবুর নির্দেশ সে ঠিক ভাবে পালন করল, কিন্তু পরের দিন সে ঝিমোতে লাগল।

বাবু এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে! এ কাজটাও তুমি পারলে না?

চাকর—না বাবু, পারলাম না।

বাবু তখন বললেন—তুমি তাহলে যা পারবে তা-ই কর। তোমার কিছুই করতে হবে না, শুধু শুয়ে শুয়ে আরাম কর।

চাকর কয়েকদিন খুব আরামে শুয়ে দিন কাটাল। তার পরে একদিন দেখা গেল, সে স্থির হয়ে আর শুয়ে থাকতে পারছে না। বাইরে বেরোবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—প্রাণ থাকলেই তার গতি এবং ক্রিয়াও থাকে। সমর্পণ মানে সব ছেড়ে দিয়ে কিছু করব না তা নয়। তা সমর্পণের ভুল অর্থ। 'আমি আমার বোধে' জীবনের যে গতি চলে তা পরিবর্তিত হয়ে 'তুমি তোমার বোধে' চলবে। এই হল আত্মসমর্পণের তাৎপর্য।

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একটি গতিধারা অবলম্বন করে চলতে হয়, তাবই পরিণামে সফলতা লাভ হয়।

২৫। ১১। ৬৮

৪৬

সাধনার বহু রকম স্তর আছে। বারবাব বলা হয়, নিয়মিত ভাবে সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করা হলে কষ্ট করে কারওর আর সাধনা করার প্রয়োজন থাকে না। পরমেশ্বরী মাতা বিশেষ এক আধার তৈরি করে নিয়ে তার মাধ্যমে সত্যকে যুগোপযোগী করে প্রকাশ করেন। মতবাদের গোঁড়ামি সর্বসিদ্ধির অন্তরায়। উদার ও হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষেই সত্যকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয়।

ব্রহ্মের পরিচয় উপনিষদ পড়ে পাওয়া যায়, কিন্তু শুধু উপনিষদের কথাগুলির সাহায্যে ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না এবং ব্রহ্মময়ও হওয়া যায় না। যিনি সর্ববস্তুতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তিনিই একমাত্র অপরকে ব্রহ্মোপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারেন। সেই জন্য মহামুনি ব্যাসদেব আপন পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্যক্ত করে তার বিজ্ঞান উপলব্ধির সুবিধার জন্য রাজর্ষি জনকের কাছে পাঠালেন।

পিতার আদেশে শুকদেব ব্রহ্মোপলব্ধিব জন্য বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হয়ে রাজার দর্শনপ্রার্থী হলেন। রাজা কর্মচারীর মাধ্যমে শুকদেবের খবর জেনে তিন দিন পর তাঁব সঙ্গে দেখা হবে বলে খবর পাঠান এবং তাঁর থাকা-খাওয়ার সর্ববিধ ব্যবস্থা করে দেন। রাজার নির্দেশে তাপসকুমারের সেবাযত্নের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হয়।

প্রথম দিন নানাবিধ উত্তম ভোগ্য বস্তু দিয়ে তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করা হয। দ্বিতীয দিন ভোগৈশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে তাঁকে রাখা হয় এবং তৃতীয় দিন তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য অপ্সরীদের দিয়ে মনোমুগ্ধকর নৃত্যগীত পরিবেষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তপোবনে প্রতিপালিত হয়ে তাপসজীবনে তিনি অভ্যস্ত। ভোগৈশ্বর্যযুক্ত পরিবেশের মধ্যে এসে ভোগবিলাসের আড়ম্বর দেখে প্রথমত তিনি ভীত হন এবং পিতার উপর তাঁব অভিমান হয। পিতা জেনে-শুনে কেন তাঁকে এমন স্থানে পাঠিয়েছেন যে পরিবেশ সর্বতোভাবে তপশ্চর্যার প্রতিকূল! গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে তিন দিন তিনি কাটান। চতুর্থ দিন রাজসভায় জনকের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হয়ে শুকদেব রাজাকে দর্শন করে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর পরিচয় দেন এবং তাঁব আগমনের কারণ রাজার কাছে নিবেদন করেন।

রাজসভায় রাজার রাজকীয় বেশ, চিত্তাকর্ষক ঐশ্বর্যবিলাসের আতিশয্য, রত্নখচিত সিংহাসন ও চার দিকের আভিজাত্যপূর্ণ অমাত্যবর্গদের দেখে তিনি খুবই বিব্রত বোধ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি জনক শুকদেবের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—তাপসকুমার সব কুশল তো? এখানে তোমার কোনও প্রকার ত্রুটি বা

অসুবিধা হয়েছে কি? পিতার উপরে কি তোমার বিশ্বাস নেই? তিনি জেনে-শুনেই তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য এখানে পাঠিয়েছেন। পিতার বিচারবুদ্ধির উপর তোমার সন্দেহ বা সংশয় থাকা উচিত নয়। এই ভাবে জনক প্রথমেই তার বিশ্বাসের অভাবের প্রতি সচেতন করে দিলেন।

রাজার কথায় শুকদেব লজ্জিত হয়ে অধোবদনে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন—তোমার যদি বিশ্বাস থাকে তবে এখানে তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পার। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের কোনও প্রকার অসুবিধা যাতে না-হয় তার জন্য তোমার প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই যথাযথ করা হবে। ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও যদি মন কোনও রকমে চঞ্চল না-হয় তবেই ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা হবে এবং সেই ভাবেই হবে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা।

রাজার নির্দেশে শুকদেব ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সেখানে কিছুদিন থাকেন। তাঁর সাধনোপযোগী সব রকম ব্যবস্থাই রাজা করে দেন। কিন্তু এইরূপ পরিবেশের মধ্যে তাপসকুমারের পক্ষে বেশিদিন থাকা খুবই কষ্টকর হয়। চিত্তাকর্ষক মনোমুগ্ধকর ও চাঞ্চল্যকর পরিবেশ থেকে ব্রহ্মচারীদের দূরে থাকতে হয়। এইরূপ পরিবেশ তপশ্চর্যার বিরোধী। সুতরাং কয়েকদিন পরে বিষণ্ণ চিত্তে শুকদেব রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশাসন প্রার্থনা করেন। ব্রহ্ম বিষয়ে রাজা তাঁকে যা অনুশাসন করেন তা শুনে প্রত্যুত্তরে শুকদেব রাজাকে জানান যে, ব্রহ্ম বিষয়ে এ সব তত্ত্ব পিতার কাছ থেকে পূর্বেই তিনি অবগত হয়ে এসেছেন। তদতিরিক্ত জ্ঞান তিনি রাজার কাছে প্রার্থনা করেন।

সেই রাতে রাজা তাঁর হাতে একটি তৈলপূর্ণ প্রদীপ দিয়ে রাজপ্রাসাদের চার দিক ঘুরে সব কিছু দেখে আসতে বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দেন যে, প্রদীপ থেকে এক ফোঁটাও তেল যেন মাটিতে না-পড়ে। প্রদীপ হাতে শুকদেব রাজপথে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু কাজটি যত সহজ বলে তাঁর প্রথমে মনে হয়েছিল, পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, কাজটি তত সহজ নয়। কারণ চার দিকের দৃশ্য দেখতে গেলে প্রদীপের তেল পড়ে যায় আবার প্রদীপের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে গেলে বাইরের দৃশ্য আর দেখা যায় না। একসঙ্গে দ্বিবিধ মনের কাজে অনভ্যস্ত তাঁর চিত্ত কোনও মতেই দু'টি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করতে পারল না। বহু চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর পক্ষে এ এক কঠিন পরীক্ষা। এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কৌশল বা এই বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি অবগত নন। সেই কারণেই পিতা তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন—তা তখন তিনি বুঝতে পারলেন।

অধীত শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে এই বিদ্যার পার্থক্যও তিনি বুঝতে পারলেন। কিন্তু এই বিদ্যা সহজে আয়ত্ত করা খুব কঠিন। এই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে তিনি পরের দিন রাজাকে জানালেন যে, তাঁর পক্ষে ঐ কাজটি সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং তিনি কৃতকার্য হননি।

রাজা হেসে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—সব বিদ্যাই আরম্ভে দোষযুক্ত থাকে। অভ্যাসের ফলে তা আয়ত্তে আসে। ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রের মাধ্যমে অবগত হবার পর ব্যবহারবিজ্ঞানের মাধ্যমে তা অনুভবসিদ্ধ হয়।

পরা ও অপরা বিদ্যার বিজ্ঞান পৃথক হলেও উভয়ই এক ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্ম নির্গুণ হিসাবে প্রজ্ঞানময় এবং সগুণ হিসাবে বিজ্ঞানময়। এ ভাবে ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে রাজা তাঁকে আরও কিছুদিন সেখানে থাকতে বললেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আশায় শুকদেব সেখানে থেকে গেলেন।

রাজসভায় প্রতিদিনই তিনি উপস্থিত থেকে রাজার সঙ্গে অপরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, শাস্ত্রালোচনা ও ব্রহ্মবিচার সম্বন্ধীয় নানা প্রসঙ্গ কিছুদিন শ্রবণ করেন। রাজার অসাধারণত্বের পরিচয় ইতিমধ্যে তিনি অনেকটা অবহিত হন। রাজার মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির যুগপৎ অভিব্যক্তির পরিচয় পেয়ে শুকদেব অতীব বিস্মিত হন। তার ফলে রাজার প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁর পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায় এবং কৃতজ্ঞতাবোধে পিতাকেও তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা জানান।

কয়েকদিন পরে তাঁর মনে স্বগৃহে ফিরে যাবার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু রাজার কাছ থেকে আরও কিছু গভীর তত্ত্ব অবগত হবার জন্য তিনি আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। রাজা শুকদেবের মনোভাব যোগবলে অবগত হন। একদিন রাজসভায় বসে শুকদেবের সঙ্গে কথোপকথনকালে যোগবলে রাজপ্রাসাদে রাজা আগুন ধরিয়ে দেন। এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড দেখে সকলেই ভীত হয়ে চার দিকে ছুটোছুটি করতে থাকে। সকলেই আপন আপন প্রয়োজনীয় মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী এবং জীবন রক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভীত ত্রস্ত সকলের চিৎকারেও রাজা কিন্তু নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত ভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে শুকদেব তাঁর কৌপীনে আগুন ধরার পূর্বেই তা সরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে যান এবং পরে রাজার কাছে ফিরে এসে দেখেন রাজসিংহাসনের চার দিকে আগুন লেগে গিয়েছে। শুকদেবের কাণ্ড দেখে রাজা মনে মনে হাসলেন।

ইতিমধ্যে রাজার কাছে আগুন এগিয়ে আসছে দেখে শুকদেব ব্যস্ত হয়ে রাজাকে সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসতে বলেন। রাজা নিশ্চিন্ত মনে সিংহাসনে বসে থেকেই শুকদেবকে বললেন—ক্ষুদ্র একটি কৌপীন যা অনিত্য ও নগণ্য তার মায়াও তুমি ছাড়তে না-পেরে আগুন থেকে তা রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলে। অথচ মনে মনে তুমি নিজেকে ত্যাগী, বৈরাগ্যবান, শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানী ভেবে অভিমান কর। তাপসকুমার বৃহৎকে বা নিত্যকে ত্যাগ করে ক্ষুদ্রের বা অনিত্যের প্রতি আসক্তি রাখা নিশ্চয়ই ত্যাগ-বৈরাগ্যের লক্ষণ নয়। ক্ষুদ্রকে বা অনিত্যকে ত্যাগ করে বৃহতের বা নিত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকাই হল ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিশেষত্ব। একত্বকে বা সমত্বকে ছেড়ে বহুত্বকে গ্রহণ করার নাম ত্যাগ নয়। ত্যাগসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সকল অবস্থায় সমত্বে এবং নিত্য একত্বে বিরাজ করেন। ভোগ্য বস্তু ও ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার্থক্য হল অজ্ঞান, কিন্তু এর সমজ্ঞান হল প্রজ্ঞান। ভোগ্য বস্তুর মধ্যে থেকেও মন নিস্পৃহ, নির্বিকার, স্থির থাকলে তবেই হয় ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধি। ত্যাগ ও আসক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকা পর্যন্ত আসক্তি থাকে। আসক্তি ও

ত্যাগের মধ্যে সমত্বই হল পূর্ণত্যাগের লক্ষণ। বিশেষ ও সামান্যের মধ্যে পার্থক্যই হল ভ্রান্তি ও মোহ। বিশেষ ও সামান্য জ্ঞানের উর্ধ্বে হল সমত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান।

এই রাজসিংহাসন বহু দক্ষ লোকের, বহু পরিশ্রমের মাধ্যমে, বহু লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে বহু দিনে তৈরি হয়েছে। এই রাজ্য বিনষ্ট হতে দেখেও আমার চিত্তে কোনও বিকার নেই। আমার দেহে আগুন লাগাতে তুমি বিব্রত বোধ করেছ, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলাম, কারণ জনক তাঁর দেহ থেকে পৃথক। জনক দেহ নয় এবং জনকের কোনও দেহও নেই। সে বিদেহী সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপ। জনক কারও আপন নয়, জনকেরও কেউ আপন নয়। জনক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মা বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ ব্রহ্ম।

রাজা শুকদেবকে আরও বললেন—এখানে এসে প্রথমে সূক্ষ্ম বিদ্যার অভিমান অধিক থাকায় অনেক বিষয়ে বিপরীত ধারণা হয়েছিল তোমার। পিতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তিরও অভাব ছিল তোমার। ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা এমনকী শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। তোমার বিদ্যার বা জ্ঞানের অভিমানের মাত্রা অধিক ছিল। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই জ্ঞানের অভিমান থাকা সত্ত্বেও সামান্য কৌপীনের মায়া তুমি ছাড়তে পারনি। এখন নিশ্চয়ই এই অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞ হতে গেলে যা প্রয়োজন তার সম্যক্ শিক্ষা, যা তোমার প্রার্থনা ছিল, তা অনুধাবন করবে।

তখন শুকদেব ব্রহ্মোপলব্ধির অন্তরায়গুলি জনকের কৃপায় অবগত হয়ে ধন্য ও কৃতকৃত্য হলেন। তিনি পরমতত্ত্বের রহস্য যথার্থ ভাবে বুঝতে পারলেন। এক কারণে সব কারণ। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানই সর্বজ্ঞান। ব্রহ্মই নিত্য উপাদান। এই নিত্য এক ব্রহ্ম উপাদানই নানাত্ব-বহুত্বরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সর্বব্যাপী এই নিত্য সত্য অদ্বয়জ্ঞানই সর্বপ্রকাশের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। সেই সত্যের সঙ্গে জীবনের অভেদ সম্বন্ধ অবগত না-হওয়া পর্যন্ত বিদ্যার অভিমান থাকে এবং বুদ্ধি, মন ও দেহের বিকারও থাকে। শুধুমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য কর্ম-যোগ-ভক্তির সমন্বয়ে তার ব্যবহার-বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

সত্য ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। সর্বত্রই তাঁর অস্তিত্ব। বিশ্ব হল তাঁর বিজ্ঞানময় রূপ। এই বিজ্ঞানময় নাম-রূপের অন্তঃসত্তাই হল চিদানন্দঘন প্রজ্ঞানব্রহ্ম। তাঁর পরিচয় যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়।

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মতত্ত্ব ও তার বিজ্ঞানস্বরূপের পরিচয় আগম-নিগম উভয় মতেই অনুভবগম্য করিয়ে দেন। তখন অজ্ঞানের অভিমান, দ্বৈতপ্রতীতি, নানাত্ব-বহুত্বের ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ও ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মজ্ঞই হলেন ব্রহ্মের পরিচয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞের মাধ্যমে, ব্রহ্মজ্ঞের কৃপায় জীব আপনার ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

এবাব শুকদেব পূর্ণব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ বিদেহী জনককে পরিপূর্ণ অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর স্বানুভূতির ভাষায় গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—জনক ও শুকদেবের প্রসঙ্গে এমন অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের পরিচয সহজ ভাবে পাওয়া যায় যা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। উচ্চতম আদর্শের সাহায্যে অন্তরে ভাবের বিকাশ হয়। তত্ত্ব লাভেচ্ছু ব্যাকুল চিত্তের পক্ষে উচ্চতম জীবনের আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই অবলম্বনকে ধরেই সে তার সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। তত্ত্বজ্ঞপুরুষদের জীবন থেকে সব সময়ই অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গটি বর্ণনাকালে প্রসঙ্গেব সূত্র ধরে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিমায় এমন সুবোধ্য করে ব্যক্ত করেছেন যে, কাহিনিটির পরিসমাপ্তিও তিনি সরস করে প্রকাশ করেছেন। সমগ্র বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে আর পৃথক ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন রাখেননি।

[সৎপ্রসঙ্গকালে কোনও বিশেষ অংশের গুরুত্বকে বা তাৎপর্যকে সহজবোধ্য করার জন্য প্রসঙ্গভিত্তিক গল্প, কাহিনি, ঘটনা তিনি ব্যক্ত করে থাকেন। তার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টি যত জটিল ও দুর্বোধ্যই হোক না কেন, তা সহজ ও সুবোধ্য হয। শুধুমাত্র কাহিনি, গল্প বা উপমা দ্বারা তা পরিষ্কার হয় না, যদি না তার অন্তর্নিহিত রহস্যটি পরে না উল্লেখ করা থাকে। তাঁর দৈনন্দিন ভাযণে বা সৎপ্রসঙ্গকালে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। শ্রোতার বা পাঠকের কাছে অতি দুর্বোধ্য ব্রহ্মতত্ত্ব/আত্মতত্ত্বকে তিনি সহজসাধ্য ও সুবোধ্য করে প্রকাশ করতে গিয়ে যে-সমস্ত গল্প, উপাখ্যান, কাহিনি ব্যক্ত কবেছেন সে সবই স্বানুভূতিমূলক।]

২৬। ১১। ৬৮

৪৭

মন হল চিন্তার সমষ্টি (bundle of ideas)। অতীতের চিন্তাভাবনা, কর্ম ও কর্মফলের সংস্কার—সবগুলির স্মৃতিই মনে সঞ্চিত হযে থাকে। পুনঃপুনঃ সত্য শ্রবণের মাধ্যমে, হরি নাম বা মাতৃ নাম জপের মাধ্যমে অতীতের সঞ্চিত স্মৃতিগুলি শোধিত হয়ে রূপান্তরিত হয় এবং নূতন স্মৃতি তৈরি হয়। তখন অস্থিরতা, চঞ্চলতা কমে যায়। ভিন্ন ভিন্ন আবর্তগুলি বা বৃত্তিগুলি এক হয়ে যায়। এ সব নিজের চেষ্টায় করতে গেলে খুব পরিশ্রম করতে হয়।

এক সাধক কুড়ি-পঁচিশ বছর শুধুমাত্র আত্মচেষ্টা দ্বারা সাধনভজন করেও আশানুরূপ ফল পাননি, উপরন্তু দেহে কতগুলি বিকারের সৃষ্টি হয়। পরে এক যোগী মহারাজের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেই যোগী মহারাজ সাধকের অবস্থা দেখে তাকে আঠারো বছর নিজের কাছে রেখে তার সাধনার ভুলত্রুটিগুলি এবং দেহের বিকারগুলি শোধন করে দেন।

কয়েকবছর পর যোগী মহারাজ দেহত্যাগের পূর্বে শিষ্য সাধককে বললেন—পরের জীবনে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—তখন আপনাকে চিনব কেমন করে? যোগী মহারাজ তখন কতগুলি চিহ্ন বা লক্ষণ তাকে বলে দেন। তারপর যোগী দেহরক্ষা করেন।

কয়েকবছর পর সাধকও খুব বৃদ্ধ হয়েছে। তার কাছেও অনেক শিষ্য আসে। হঠাৎ একদিন অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে এক যুবককে দেখে এবং তাঁর মধ্যে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্ন দেখে তাঁকে নির্জনে ডেকে নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

যুবকের মুখ থেকে এমন অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হতে লাগল যা শুনে বৃদ্ধ সাধক সব বুঝতে পেরেও যুবকের সাথে পূর্বের মতো ব্যবহার করতে পারেনি। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ সাধক দেহরক্ষার আগে যুবকের কাছে পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করে। সেই বিষয়ে যথার্থ উত্তর দেওয়াতে বৃদ্ধ সাধক নিশ্চিন্তে দেহরক্ষা করে।

সাধনকালে ভুলত্রুটির জন্য যদি কোনও বিকার উপস্থিত হয় তা শোধন করতে বহু সময় লাগে, এমনকী তা শোধনের জন্য কয়েকজন্ম লাগে।

প্রত্যেক আধারের ভিতর দিয়ে যা প্রকাশিত হয় তা সত্য, কিন্তু পরস্পর প্রকাশের মধ্যে তারতম্য থাকে। গতিশীল জীবনে পূর্বাপর অবস্থা ও প্রকাশের সঙ্গে অনেক সময় গরমিল হলেও অন্তরে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র থাকে।

গল্পটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—দৈনন্দিন জীবনে পবস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধ ও ব্যবহারের মধ্যে অতীত অতীত জন্মের সংস্কার যে কতটা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে তা আচরণকারীর কাছে ধরা পড়ে না। পরস্পরের সঙ্গের ফল দোষ-গুণভেদে উভয়ের মধ্যেই কিছু কার্যকরী হয়। সেই ভাবে নূতন করে সংস্কার তৈরি হয়। দোষের ভাগ বেশি থাকলে গুণের ভাগ যথার্থ কার্যকরী হয় না। আবার গুণেব ভাগ বেশি থাকলে এবং দোষের ভাগ অল্প থাকলেও গুণের ভাগের মর্যাদার হানি করে। গুণের ভাগের যথার্থ ফল দোষশূন্য করতে গেলে দোষের ভাগের সম্যক্ নিরসন হওয়া দরকার।

জীবনে অভিজ্ঞতার মান বাড়ে বিশেষ অভিজ্ঞ একজনের সঙ্গলাভে ও সহায়তায়। অভিজ্ঞতার বা জ্ঞানের পূর্ণতা যথার্থ জ্ঞানীর কাছ থেকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। কেবলমাত্র উপদেশের মাধ্যমে যথার্থ জিজ্ঞাসু না-হয়েও শুধুমাত্র কৌতুহলের বশে বা গতানুগতিক সঙ্গের দ্বারা যথার্থ জ্ঞানলাভ হতে পারে না। সত্য, আত্মজিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্ন যার মনে জাগে না, সে সেই প্রসঙ্গ নিয়মিত শ্রবণ করলেও তার ফল পায় না।

জ্ঞানশিক্ষা ও তার অনুশীলন প্রসঙ্গে বিশেষ নির্দেশ হল—যথার্থ জিজ্ঞাসুই হল জ্ঞান লাভের অধিকারী, অন্যে নয়। জীবনের দোষত্রুটি কম-বেশি অনেকেরই থাকে, সেগুলি শোধনের বা নিরসনের চেষ্টা বিশেষ ভাবে অর্থাৎ তীব্র ভাবে না-হলে তা

বেড়েই চলে, কমে না। অভ্যাসের দ্বারা দোষও বাড়ে, গুণও বাড়ে। আবার অভ্যাসের দ্বারা দোষও কমে, গুণও কমে। অন্তরের দোষত্রুটিপূর্ণ যে মল, যা কতগুলি ভুল অভ্যাসের দ্বারা তৈরি হয়, তা বিশেষ অভিজ্ঞ যথার্থ জ্ঞানীর সঙ্গে থেকে তাঁর নির্দেশে সচেতন হয়ে অভ্যাসের বা ব্যবহারের দ্বারা শোধন ও নির্মূল করতে হয়।

অজ্ঞানমূলক ব্যবহারের দ্বারা অজ্ঞানজাত বিকার বাড়ে এবং তার কুফল জীবনে ভোগ করতে হয় নানাবিধ দুঃখকষ্টরূপে। তা থেকে মুক্ত হবার জন্য যথার্থ জ্ঞানীর সঙ্গ ও তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে বা সাহায্যে সেগুলি দূর করার অভ্যাস করতে হয়। নিজের খেয়ালখুশি মতো অভ্যাস বা অনুশীলন দ্বারা তা সম্ভব হয় না। জ্ঞানলাভ হয় জিজ্ঞাসার তীব্রতা অনুসারে জ্ঞানবিষয়ক শ্রবণ ও তা বিচারপূর্বক অভ্যাস দ্বারা। কেবলমাত্র গতানুগতিক বিশ্বাস দ্বারা তা সম্ভব হয় না। ভক্তির পথে ভক্তিসাধন বিশ্বাসসাপেক্ষ হলেও তা বিচারশূন্য হলে কখনওই পূর্ণ হবে না। জ্ঞানের সাধন মূলত শ্রবণ ও বিচার সাপেক্ষ, অন্ধ বিশ্বাসসাপেক্ষ নয়। জীবন্মুক্তির বিজ্ঞান বিবেকবিচার ও বৈরাগ্য সাপেক্ষ। ভক্তিসিদ্ধির বিজ্ঞান বিশ্বাস ও অনুরাগ সাপেক্ষ।

যোগসিদ্ধির বিজ্ঞান সিদ্ধগুরুর নির্দেশ অনুসারে নিরলস ক্রিয়াসাপেক্ষ। কর্মসিদ্ধির বিজ্ঞান কর্মফলে অনাসক্তি ও নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিনা শর্তে কর্মফল সমর্পণ সাপেক্ষ। নৈষ্কর্মসিদ্ধির বিজ্ঞান কর্মফল ও কর্তৃত্ব বিষয়ে উদাসীনতা ও নিরপেক্ষতা সাপেক্ষ। প্রেমসিদ্ধি ও জ্ঞানসিদ্ধির লক্ষণ অনন্যতা, আপনতা, পূর্ণতা, অভিন্নতা ও সমতাবোধ।

সংস্কারমুক্ত হবার সর্বোত্তম উপায় বা বিজ্ঞান হল অদ্বৈতজ্ঞানের, একজ্ঞানের বা সমজ্ঞানের অনুশীলন। সর্বসিদ্ধির লক্ষণ হল পূর্ণ আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের সাধন হল সচেতন ভাবে আপনবোধে, একবোধে বা সমবোধে সব 'মেনে, মানিয়ে চলা'।

দ্বৈতবোধে দ্বন্দ্ব, গুণভাবের বিকার, সংশয়, ভ্রান্তি, ভীতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে অদ্বৈতবোধে এ সবের একান্ত অভাব। সর্ববিধ বিকারের নিবৃত্তি বা নিরসন হলে পূর্ণ মুক্তিশান্তিতে প্রতিষ্ঠা হয়।

২৬। ১১। ৬৮

৪৮

সৎসঙ্গের সব কথা সবার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। তবুও পুনঃপুনঃ শ্রবণের ফলে তার প্রভাব চিত্তে অবশ্যই পড়ে। সঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প বলছি শোন।

এক জুয়ার আড্ডার পাশেই একজন খুব সৎ প্রকৃতির লোক থাকত। সে জুয়াড়িদের সর্বদাই জুয়াখেলা থেকে বিরত থাকার জন্য অনেক উপদেশ-নির্দেশ দিত এবং জুয়াখেলার কুফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করত।

কিছুদিন পরে দেখা গেল সেই সৎ প্রকৃতির লোকটি নিজেই একদিন জুয়াখেলায় ভিড়ে গেল এবং ক্রমশ তার স্বভাবে অনেক রকম দোষ দেখা গেল।

গল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঠিক এই রকম ভাবে সৎসঙ্গের প্রভাবও মানুষের উপর কার্যকরী হয়। নিরন্তর সৎসঙ্গের প্রভাবে সদ্‌গুণগুলি আপনা থেকেই জীবনের মধ্যে প্রকাশ পায়। গায়কের সঙ্গ করে একজন লোক সংগীত সম্বন্ধে পূর্বে কোনও অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও একদিন নাম করা গায়করূপে পরিচিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

যারা নিয়মিত সৎসঙ্গে আসে তাদের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা হলে অথবা না-হলেও ঈশ্বরীয় প্রকাশ সহজেই হতে পারে। সন্ন্যাসী হবার মতো যোগ্যতা না-হওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা এসে যায়, ফলে সমাজের ক্ষতি হয়। যাত্রাদলে সাজা কৃষ্ণ, সাজা রাম, সাজা রানির মতো শুধুমাত্র সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেই সাধুসন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যাঁদের চিত্ত স্থির হয়েছে, প্রজ্ঞাস্থিতি হয়েছে তাঁরাই হলেন প্রকৃত সাধু। বহু সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে একসময় যোগাযোগ হয়েছে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে)। তাঁদের আচারব্যবহার দেখে এবং কথা শুনে সাধুসমাজ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হয়েছে।

জীবনের দু'টি দিক আছে—(১) বহির্মুখী ও (২) অন্তর্মুখী। প্রথমটি ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ের জগৎ এবং দ্বিতীয়টি চিন্তা ও ভাব সাপেক্ষ অন্তর্জগৎ। উভয়ের পশ্চাতে আছে কূটস্থ ঈশ্বর-আত্মা। বহির্জগতে বিকার, পরিবর্তন এবং রূপান্তর সর্বাপেক্ষা বেশি। সেই জন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হল আপেক্ষিক জ্ঞান। তা হল জ্ঞানাভাসের জ্ঞানাভাস। তা দুঃখেরই কারণস্বরূপ। অন্তরের জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও তা জ্ঞানাভাসের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং তা পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। অন্তরের পশ্চাতে যে কূটস্থচৈতন্য তা-ই হল শুদ্ধ জ্ঞান ঈশ্বর-আত্মাস্বরূপ।

শুদ্ধ জ্ঞান অন্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন তা অন্তরের ভাব অনুসারে মলিন হয়। সেই জন্য তা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কেবল কূটস্থচৈতন্য ও তুরীয়চৈতন্য অভিন্ন বলে উভয়ই শুদ্ধ নির্মল স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। অন্তরের আভাসচৈতন্য ইন্দ্রিয়যোগে বাইরের বিষয় ও দৃশ্যাদির সংস্পর্শে এসে আরও মলিন হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে বস্তুজ্ঞান বা বিষয়জ্ঞান বলা হয়।

সংসারে মানুষ এই বিষয়জ্ঞান নিয়েই চলে। অন্তরের জ্ঞান সম্বন্ধে তার ধারণা বা অভিজ্ঞতা যথার্থ নয়। সেই জন্য তার চিন্তা, কর্ম ও ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকে। মিথ্যা ও কল্পনার সাহায্যে সে তা ঢাকার অভ্যাস করে। এই ভাবে গড়ে ওঠে তার মিথ্যা আচরণের স্বভাব।

মিথ্যার দ্বারা মিথ্যাকে অতিক্রম করা যায় না। সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে অতিক্রম করতে হয়। জ্ঞানাভাসের দ্বারা জ্ঞানাভাসকে অতিক্রম করা যায় না। কূটস্থজ্ঞান তথা আত্মজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানাভাসের প্রভাবকে অতিক্রম করতে হয়। দ্বৈতবোধে সংসার, অদ্বৈতবোধে সমসার।

যথার্থ সাধুর কাছে সাধু-অসাধু ভাবনা, অদ্বৈত-দ্বৈত ভাবনা, জ্ঞান-অজ্ঞান ভাবনা, ধর্ম-অধর্ম ভাবনা, সত্য-মিথ্যা ভাবনা, নিত্য-অনিত্য ভাবনা, অমৃত-মৃত্যু ভাবনা, মুক্তি-বন্ধন ভাবনা, নির্গুণ-সগুণ ভাবনা, নিরাকার-সাকার ভাবনা, অভেদ-ভেদ ভাবনা, সবই অবান্তর। এই সব ভাবনা যদবধি মনে থাকে তদবধি মন মলিন ও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ মনে অশুদ্ধ কল্পনাই স্বাভাবিক। শুদ্ধ মনে শুদ্ধ ভাবনা, স্ববোধে বোধের প্রকাশ, তা-ই হল স্বানুভূতি। স্বানুভূতি হল স্বসংবেদ্য স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং'।

২৬। ১১। ৬৮

৪৯

প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আছে। সেই গুণকে অবহেলা করতে নেই। কর্ম ও গুণের বিনিময়ে মানুষ মানুষের মর্যাদা দেয়। কারও কাছ হতে কর্ম আদায় করতে না-পারলে মানুষ তার মূল্য দেয় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক দ্বীপে এক বুড়োবুড়ি বাস করত। উভয়ের মধ্যে মনের মিল ছিল না। প্রতি রবিবার বুড়ি বাইবেল হাতে গির্জাতে প্রার্থনা করতে যেত, কিন্তু বুড়ো যেত না। সে বসে বসে গল্পের বই পড়ত। অশান্ত ও ব্যর্থ জীবন অসহ্য হয়ে ওঠায় বুড়ো একদিন বুড়ির সঙ্গে গির্জায় গেল। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার দেখে বুড়ো এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করল। এর কয়েকদিন পরে বুড়ো অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন বুড়ি তার সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই উভয়ে দ্বন্দ্ব করেই কাটিয়েছে। এতদিনে বুড়ির প্রতি বুড়োব মন ফিরেছে। সে তখন বুড়ির মূল্য বুঝতে পারে। বুড়ির সঙ্গে এখন সে প্রায়ই গির্জায় গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় এবং বাইবেল পড়ে। এই ভাবে উভয়ের মধ্যে আবার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে বুড়ির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে বুড়ি বুড়োর জন্য তার মনের কষ্ট জানিয়ে বলে—জীবনে বেশির ভাগ সময়ই মানুষ বর্তমানকে মূল্য দিতে পারে না! আপনজনকেও প্রিয় মনে করতে পারে না, কিন্তু যখন সে অতীত হয়ে যায় তখন তার অবর্তমানে তার মূল্য বুঝতে পারে এবং তার জন্য কেঁদে মরে।

বুড়ির অবর্তমানে বুড়ো প্রতিদিন সন্ধেবেলায় বাইবেল পাঠ করে এবং বুড়ির জন্য শান্তি প্রার্থনা করে। কিছুদিন পরে বুড়ো বাইবেল পড়তে পড়তেই দেহত্যাগ করে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মৃত্যুর পূর্বে জীবনের সব কৃত কর্মের মৌলিক অংশ চিত্তপটে ভেসে ওঠে এবং যে প্রবল চিন্তা নিয়ে সে দেহত্যাগ করে তা-ই তার পরবর্তী জীবনের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়। ধর্ম ভাবের প্রভাবে ধর্মজীবন লাভ হয়, কর্ম ভাবের প্রভাবে কর্মজীবন এবং অধর্মের প্রভাবে অধর্ম পশু জীবন লাভ হয়।

৩। ১২। ৬৮

৫০

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভগবৎ প্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আজ একটি গল্প বললেন।

এক যোগী গ্রামেব একপ্রান্তে কুটিব বেঁধে সাধনভজন করতেন। মাঝে মাঝে ভিক্ষে করে যা-পেতেন তাতেই তাঁর দিন চলত। কাবও সাথে তিনি বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। আপন কাজেই তিনি মত্ত থাকতেন। একদিন এক মাতাল নেশাখোর এসে তাঁকে মারধর করে। গ্রামবাসীবা এসে মাতালকে উচিত শিক্ষা দিতে গেলে যোগী মহাত্মা সকলকে লিখে জানান, মাতালকে তারা যেন না-মারে। ওকে মারা মানে যোগী মহারাজকেই মারা। তাঁর কথা শুনে সকলে মাতালকে ছেড়ে দেয়। মাতাল সকলকে গালাগালি করে চলে যায়।

যোগী মহারাজের ব্যবহারে আত্মপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রেম হল প্রেমিকের অনুভূতি। তিনি জানেন এক চৈতন্যসত্তাই সবার ভিতবে বিদ্যমান। বাইবে তার প্রকাশবিজ্ঞানের তারতম্য হয়। একেই সত্যানুভূতি বলে। বস্তুবাদীরা এই সব তত্ত্ব মানে না। স্বার্থবোধে তাবা যখন কোনও সমস্যার সমাধান করতে না-পেরে আরও জটিল করে তোলে তখন দোষ চাপায় অপবেব ঘাড়ে। কিন্তু আপন কর্মফল থেকে তারা কখনওই রেহাই পায় না।

কিছুদিন পবে এক বাতে একদল ডাকাত এসে সেই যোগীর ঘরে হানা দেয় কিছু পাবাব আশায়। কিন্তু মৌনী যোগী তাদেব প্রশ্নের কোনও উত্তর না-দেওয়াতে এবং তাঁব কাছে কিছু না-পেয়ে যাবার সময় তারা যোগীকে শারীরিক পীড়ন করে হাত-পা বেঁধে রেখে যায়। যাবার সময় যোগী তাদের ডেকে বললেন—তোমাদের দেবার মতো আমার কাছে কিছু নেই তবুও তোমরা ফিরে যাবে তা হয় না। আমার কাছে সামান্য খাবার আছে, তা তোমবা সকলে খেয়ে যাও। এই বলে সেদিনকার ভিক্ষালব্ধ খাদ্য তাদেব সমর্পণ করেন। তারা খাদ্য নিয়ে চলে যায়।

শুদ্ধ প্রেমের অভিব্যক্তিতে একাত্মানুভূতি হয় অথবা একাত্মানুভূতিতে শুদ্ধ প্রেমেব অভিব্যক্তি হয়। বিশুদ্ধ প্রেমিক, মহাযোগী এই অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এর কিছুদিন পরে সেই মাতাল অনুতপ্ত হয়ে যোগীর কাছে এসে ক্ষমাভিক্ষা চায় এবং যোগী মহারাজের ব্যবহারে ধীরে ধীরে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠে। ডাকাতদলের অধিকাংশই পরে এই যোগী মহারাজের ভক্ত হয়। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তারাও মহৎ হয়।

কাহিনিটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বিশুদ্ধ প্রেমে সর্বসমস্যার সমাধান সহজেই হয়। এই প্রেমের সাধনা মানুষকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। হৃদয় পবিত্র হলে মানুষ দিব্যচৈতন্য লাভ করে। প্রেম বিচ্ছেদকে যুক্ত করে মিলন ঘটায় এবং দ্বেষ, হিংসা, ভয় ও ভেদজ্ঞানের অপসারণ করে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রকাশ করে।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হল অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞানে কোনও গুণভাবাদির প্রকাশ থাকে না। অদ্বয়জ্ঞান মানে সমজ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান। তার ব্যবহারও সমবোধেই হয়।

সমবোধই হল প্রেমের লক্ষণ। এই সমবোধই হল আপনবোধ, আত্মবোধ। আপনবোধের ব্যবহারে কোনও বিকার বা প্রতিক্রিয়া থাকে না। আপনবোধের ব্যবহারই হল আত্মপ্রেমের বিশেষত্ব। প্রেমের ব্যবহার বলতে আপনবোধের ব্যবহারকেই নির্দেশ করা হয়। তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় এবং জ্ঞাতব্য।

আত্মজ্ঞানী সমবোধের বা আপনবোধের ব্যবহাব অপরের মধ্যেও বিস্তার করেন যথাকালে। প্রেমের ব্যবহার কখনও বিফল হয় না। সর্বপ্রকার হিংসার নিরসন হয় কেবলমাত্র আত্মবোধ, আপনবোধ, সমবোধের ব্যবহারের মাধ্যমে এবং প্রেমের মাধ্যমে। প্রেমের দ্বারাই হিংসা ও দ্বেষকে জয় করতে হয়। আত্মবোধের ব্যবহার এই প্রেমরূপেই পরমসার্থকতা প্রাপ্ত হয়। আত্মবোধে প্রেমসিদ্ধপুরুষ হলেন দিব্যমানব। তাঁর মাধ্যমে মানবসমাজ সর্বতোভাবে উপকৃত হয়। যদিও আত্মজ্ঞানী প্রেমিকপুরুষকে অনেক সময় অজ্ঞানিগণ ভুল বোঝে এবং তাঁর সঙ্গে ভুল ব্যবহার করে।

আত্মজ্ঞ প্রেমিকপুরুষের কোনও বিকার হয় না। চিত্ত তাঁর সর্বদাই সমবোধে বা আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই জন্য তাঁর কোনও ভেদপ্রতীতি হয় না। ভেদপ্রতীতি হল অজ্ঞানজাত। ভেদভাবনা ও ভেদজ্ঞানের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি বেশি হয়। তার ফলে ভেদভাবনা বেড়েই চলে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের পক্ষেই এই ভেদভাবনা হল সর্বতোভাবে ক্ষতিকর। সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-বিরোধের মূলেই হল ভেদভাবনা ও ভেদজ্ঞান। ভেদদৃষ্টিই হল সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট-অশান্তির কারণ। আপনবোধ বা সমবোধ হল অদ্বয় আত্মবোধ। তার ব্যবহার দ্বারা অন্তরের ভেদভাবনার নিরসন হয়। জীবনে সঙ্গদোষে দোষ ও সঙ্গগুণে গুণ বাড়ে। তাই বলা হয় 'যেমন সঙ্গ তেমন ভাবের অধিকারী।'

আত্মজ্ঞানী প্রেমিক সমাজে অতি দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়। তাঁদের আবির্ভাবে সমাজজীবন ও পারিবারিকজীবনে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে অমব বাণী হল—

'ভোগীর দলে ভোগী থাকে যোগীর দলে যোগী
জ্ঞানীর সঙ্গ করে জ্ঞানী ভক্তের সঙ্গ করে ভক্ত
প্রেমিকের সঙ্গে থাকে প্রেমিক এ সত্য পরম নিগূঢ় তত্ত্ব।'

৫। ১২। ৬৮

৫১

সমষ্টিবোধে মানুষ দিব্যজীবন লাভ করে। পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ব্যষ্টিজীবন সমষ্টিবোধ অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। সমর্পণ পূর্ণ না-হলে ঈশ্বরীয়-বোধের অনুভূতি হয় না। মানার মাধ্যমে অন্তরে অনুরাগ জাগে। তার ফলে মন ও বুদ্ধি ব্যষ্টিভাব ছেড়ে সমষ্টিভাব গ্রহণ করে। ব্যষ্টি ভাবে মনের চাওয়া অনন্ত এবং তার পরিণামে অনন্ত বিকার ও দুর্ভোগ। কিন্তু সমষ্টি ভাবের চাওয়া এক এবং তার

পরিণামও এক। ঈশ্বরের শক্তির (সমষ্টি শক্তি ও জ্ঞান) সাহায্যে ব্যষ্টিজীবন অর্থাৎ মানুষ বিকারমুক্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা প্রবুদ্ধ না-হয়ে কোনও বৃহৎ কর্ম করতে গেলে বহু বিকার সৃষ্টি হয়। স্বার্থবোধে মানুষ নিজেকেই নিজে আঘাত করে এবং আঘাতের ফল ভোগ করে।

সমষ্টি শক্তি ও বোধে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তার মধ্যে থেকেও তিনি নিত্য নির্বিকার। ঈশ্বরীয়বোধে মানুষও এইরূপ নির্বিকার চিত্তে সৃষ্টির মধ্যে বাস করতে পারে। আত্মবোধে বা ঈশ্বরীয়বোধে ভেদজ্ঞান ও দ্বৈতপ্রতীতি থাকে না। ইন্দ্রিয়বোধে ভেদজ্ঞান ও দ্বৈতপ্রতীতি হয়। মা কালী (দুর্গা) ও ব্রহ্ম অভেদ বা এক। সত্তা ও শক্তি অভেদ বা এক। সত্তারই শক্তি এবং শক্তিরই সত্তা। উভয়ের সম্বন্ধই নিত্য চিদানন্দের সম্বন্ধ। যা প্রকাশধর্মী তা-ই চিৎ এবং যা প্রীতিসুলভ তা-ই আনন্দ। চিৎ ও আনন্দ এক বস্তু। আনন্দের আকর্ষণে চিৎ প্রকাশিত হয় এবং চিৎ-এর আকর্ষণে আনন্দ লীলায়িত ও অনুভূত হয়। কর্ম ও জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দ নিত্যযুক্ত। আনন্দই মূল কারণ এবং কর্ম ও জ্ঞান হল কার্য।

আনন্দকারণে প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বিজ্ঞানময়রূপ ধারণ করে লীলা করেন। আবার আনন্দকে অবলম্বন কবে প্রজ্ঞানস্বরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পূর্ণ আনন্দকেই পূর্ণ প্রেম বলা হয়। প্রেম ও আনন্দ স্বরূপত অভেদ। এই প্রেমানন্দেব স্বরূপই হল পরব্রহ্ম বা পবমাত্মা। এই প্রেমানন্দের শক্তিই জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি রূপে অভিব্যক্ত হয়। কর্মশক্তি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, জ্ঞানশক্তি তার একরস বা সমরস আস্বাদন করে এবং প্রেমানন্দশক্তি তা দ্রষ্টাবোধে অনুভব করে।

মানা ও জানা তত্ত্বত অভেদ, কিন্তু তাদের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনি শোন।

কোনও এক মহাপুরুষের কাছে এক যোগী সাধক তাঁর যোগশক্তির বিভূতি প্রকাশ করেন এবং শক্তি লাভের আনন্দে তিনি গর্ব প্রকাশ করেন। মহাপুরুষ সব দেখে-শুনে শুধু হাসেন। কোনও কথা তিনি আর বলেন না। এই অবস্থায় হঠাৎ একটি মৌমাছি যোগী সাধকের গায়ে এসে বসে। সাধক বিব্রত বোধ করেন এবং তাকে সরিয়ে দেন। কিন্তু বারবার মৌমাছিটি তাঁকে বিরক্ত করতে থাকে। এই দেখে মহাপুরুষ হেসে তাঁকে বললেন—অখণ্ড আত্মবোধে বা সত্যবোধে ও তার ব্যবহারে বিকার থাকে না। যোগীবাবা, তুমি কর্তা সেজে শক্তি ব্যবহার করছ কেন? অখণ্ড শক্তিকে তুমি জান না। তার কাছ থেকে এক কণা শক্তি পেয়ে নিজেকে খুব বড় মনে করছ। মৌমাছিটি এসে দেখিয়ে গেল তোমার শক্তি কত নগণ্য। ছোট একটি প্রাণী তোমার সাধনলব্ধ যোগশক্তিকেও বিক্ষুব্ধ করল। সে তোমাকে ভয় করেনি কিন্তু তুমি ওকে ভয় পেয়েছ। যে শক্তি তুমি পেয়েছ তা যদি ঈশ্বর নিয়ে যান তখন কী হবে? শক্তির অপব্যবহার না-করলে এবং অখণ্ড সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকলে মৌমাছি থেকে তোমার কোনও বিকার হত না।

তুমি যতখানি জান তার কোটিগুণ তোমার অজ্ঞাত। ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত, তা জেনে শেষ করা যায় না। তাঁকেই সর্বময়প্রভু বলে মানবে। তা হলেই অন্তরে প্রেমানুরাগ জেগে উঠবে এবং ঈশ্বরের প্রেমানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবনে খেলবে। শক্তি ও জ্ঞান প্রেমানন্দযুক্ত হলেই অখণ্ড ভূমা হয়। কর্তৃত্ববোধে তা অপূর্ণ থাকে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঘটনাটির বিষয়বস্তু খুব সাধারণ এবং গতানুগতিক জীবনে তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু মহাত্মা মহাপুরুষের শুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ঘটনাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরা পড়েছে বলেই তিনি যোগীর আচরণে তাঁর যোগলব্ধ সিদ্ধাইয়ের অপব্যবহারকে কত সুন্দর ভাবে সহজবোধ্য করে যোগীর শিক্ষার জন্য ব্যক্ত করেছেন।

জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, মুক্তি, শান্তি আসে ব্যষ্টি ভাবনার মূলে যে অহংকার-অভিমান আছে তার অবসানে। ব্যষ্টিজীবনের প্রধান লক্ষণই হল অহংকার-অভিমান। তার শুদ্ধি হয় সমষ্টি জীবনবোধের উৎকর্ষের ফলে। সমষ্টি জীবনবোধের স্বরূপই হল ঈশ্বর। তাঁর শরণাগত হলে তাঁর কৃপায় ব্যষ্টিজীব ঈশ্বরীয় ভাববোধের অধিকারী হয়। সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলে জীবের জীবত্ব ঘুচে যায়। সে ঈশ্বরীয় ভাববোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়। তখন তাঁর মধ্যে আর ব্যষ্টি অহংকার-অভিমানের ব্যবহার থাকে না।

ব্যষ্টিজীবন সাধনভজনের মাধ্যমে সমষ্টি জ্ঞানশক্তির অধিকারী হতে চায় বলে সে কিছুদিন সাধনভজন অভ্যাস করে এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অহংকারবশে তার লব্ধ শক্তি ও গুণকে ব্যবহার করে অপরের কাছে প্রাধান্য পেতে চায়। সে জানে না যে, সামান্যমাত্র শক্তির অধিকারী হয়ে তা ব্যবহার করতে গেলে নিজের এবং অপরের মধ্যে বিকার সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া শক্তির অপব্যবহারের ফলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান লাভের জন্য একান্ত ভাবে শরণাগতি, তীব্র ব্যাকুলতা, আর্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সাধককে মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা ঈশ্বরের একান্ত আপন হওয়া সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হলে অসংযম ও অভিমানের বশে তার অপব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তার ফলে লব্ধ শক্তি ও জ্ঞান অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এ কথা মনে না-থাকলে সাধকের পতন হতে বিলম্ব হয় না। অপরপক্ষে ঐকান্তিক শরণাগতির মাধ্যমে ঈশ্বরের আপন হয়ে গেলে শক্তি ও জ্ঞানের অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে না।

ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ না-হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ না-হলে ঈশ্বরীয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বর ও আত্মা অভিন্ন হলেও ঈশ্বরের মাহাত্ম্য আত্মা হতে সামান্য ভিন্ন। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, প্রভু ও নিয়ন্তা। এ ব্যাপারে তিনি স্বয়ং প্রভু। অপরপক্ষে আত্মা অকর্তা-অভোক্তা-অজ্ঞাতা কেবল সাক্ষিচৈতন্যমাত্র। ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন সমবোধ বা তত্ত্বস্বরূপ কেবল। ঈশ্বর তত্ত্বস্বরূপ হলেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল

জগৎলীলা। এ সবই স্বানুভবসিদ্ধ বিষয়, অনুমানের বিষয় নয়, কেবল বুদ্ধিগত চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মবোধে, সমবোধে সবই সিদ্ধ হয়। আপনবোধের লক্ষণ হল অদ্বৈতবোধ। অদ্বৈতবোধে দ্বৈতব্যবহার থাকে না। দ্বৈতবোধে অদ্বৈতবোধ আবৃত থাকে, তাব প্রকাশ থাকে না। পূর্ণ আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে জীবন অহংকার-অভিমানমুক্ত হয় না। অহংকার-অভিমান দ্বারা ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভেদভাবনা দ্বারা অহংকার পরিচালিত হয় বলে তা ঈশ্বরের শক্তি বা আত্মশক্তির অপব্যবহার করে ফেলে। তার ফলে নিজের এবং অপরের ক্ষতি হয়।

যোগী সাধকের এই দোষটি তাঁর নিজের কাছে ধরা পড়েনি ভেদজ্ঞানের প্রভাবে। স্বানুভবসিদ্ধ মহাপুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে বলে তিনি সহজ করে যোগী সাধককে তা ব্যক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ঘটনাটি অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে না-হলেও মহাপুরুষের দৃষ্টিতে তা কী ভাবে ধরা পড়েছে এবং লোকের কল্যাণের জন্য তা কী ভাবে তিনি ব্যক্ত করেন তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

জীবনের অন্তরে ও বাইরে এক তত্ত্ব ও সত্য পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অভিমানী জীব তা অহংকারবশত অনুভব করতে পারে না। অহংকার-অভিমানবশে চলে মানুষের কামনাপূবণের ইচ্ছা ও স্বার্থ বেড়ে যায়। নিজ স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে অপরের সঙ্গে আপনবোধেব ব্যবহার বজায় থাকে না, ফলে দ্বন্দ্ব-বিরোধের মাত্রা বেড়ে যায়। দ্বৈতবোধের যত রকম পরস্পরবিরোধী দোষ ও বিকার সবই সুযোগ বুঝে প্রকাশ পায়। জীবনে তার ফলভোগ করতে হয়। অপরপক্ষে ঈশ্বরকে মেনে ঈশ্বরের নিমিত্ত যারা জীবনযাপন করে তাদের মধ্যে বহু সদ্‌গুণ ও দিব্যভাবের প্রকাশবিকাশ স্বাভাবিক ভাবেই অভিব্যক্ত হয়। জীবনের আচরণে ও ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়।

যথার্থভাবে সৎসঙ্গ হলে তার প্রভাবে ও সুফলে জীবনের দিব্য রূপায়ণ সম্ভব হয়। জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ও বিকাশ ঈশ্বরাত্মার কৃপা ভিন্ন সম্ভব হয় না। এ কথা যারা মানে ও 'মেনে, মানিয়ে চলে' তাদের দ্বৈতবোধজাত অভিমান-অহংকারের প্রভাব কমে তা ঈশ্বরের শরণাগতি লাভে এবং আত্মধ্যান ও আত্মবিশ্লেষণের সহায়ক হয়। অভিমান-অহংকার হল অজ্ঞানপ্রসূত। ঈশ্বর-আত্মার কৃপায় এই অজ্ঞান বিদূরিত হয়। তখন অমৃত মধুর দিব্যজীবনের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

১৩। ১২। ৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

৫২

অজ্ঞানীরাই অসমানবোধে অপরের সমালোচনা করে। সমালোচনা সমানবোধেই হয়। অসমানবোধে সমালোচনা হয় না, নিন্দা হয়। সমালোচনার অর্থ হল সমানের আলোচনা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে হয় অন্তরাত্মার পূর্ণ জাগরণ। এই ত্রিবিধ ভাব বর্জিত হলেই ব্যক্তি ও জাতির পতন হয়। এই ত্রিবিধ ভাবের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়। তাঁরা নিজেরা আচরণ করে তা অপরকে শিখিয়ে দেন।

একদিন ভগবান যিশু তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের নিয়ে পাহাড়ের উপর এক স্থানে ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনাকালে শিষ্যদের বলছিলেন—যেখানে অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও অবিশ্বাস প্রধান সেখানে ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করবে না। যারা ধর্মের বিরোধিতা করে তাদের কাছে যাবে না। যারা ভগবদ্বিশ্বাসী এবং ভগবানের বিষয়ে আগ্রহ সহকারে শুনতে চায় তারা তোমাদের আশ্রয় দেবে। তাদের কাছে ভগবৎ মহিমা কীর্তন করবে। এক রাতের বেশি কারও আশ্রয়ে থাকবে না। তোমাদের মঙ্গলকাজে ঈশ্বর সব সময়ই সাহায্য করবেন।

অন্য একদিন এক স্থানে তিনি যখন শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন একদল দুর্বৃত্ত এক যুবতী নারীকে প্রহার করে টানতে টানতে সেখানে নিয়ে এল। তারা যিশুকে উদ্দেশ করে বলল—আপনি ধর্মাবতার ন্যায়পরায়ণ। আপনি এই কুলটা নারীর বিচার করুন। এই অসৎ চরিত্রের নারী অধর্মের কাজ করছে এবং সমাজের বিশেষ ক্ষতি করছে। আপনি বিচার করে যা রায় দেবেন আমরা তা-ই মেনে নেব। আপনি একে মেরে ফেলার অনুমতি দিন, একে আমরা মেরে ফেলি।

সব দেখে-শুনে যিশু তাদের বললেন—তোমরা তো মারতে মারতে একে এনেছ আর বাকি কাজটুকু কে কে সমাধান করতে চাও?

তখন সমস্বরে দলের সকলেই বলল—আমরা সবাই মিলে ওকে মারব। উত্তরে যিশু বললেন—একটি শর্তে তোমরা ওকে মারতে পার। তোমাদের মধ্যে যে কোনও দিন কোনও অপরাধ, অন্যায় ও কুকাজ করেনি একমাত্র সে-ই এই নারীকে মারতে পারবে। এই বলে তিনি চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে রইলেন। তাঁর অনুগামীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে সব দেখছিল। এ কথা শুনে আগন্তুক সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তাদের মধ্যে কে প্রথমে সেই নারীকে মারতে যাবে। তারা সকলেই কুখ্যাত দুর্বৃত্ত। বিনা মতলবে তারা কোনও কাজ করত না। সব সময় তারা ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করেই জীবনযাপন করত। বিশেষ এক মতলব নিয়েই এই

নারীকে তারা মারতে চেয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে যিশুর হস্তক্ষেপে তারা বিরত হল এবং নিজেদের স্বভাবচরিত্রের কথা স্মরণ করে নারীহত্যার সংকল্প ছেড়ে একে একে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করল।

তারা সব চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে যিশু চোখ মেলে চাইলেন। তখন নির্মম ভাবে প্রহৃতা ও প্রাণভয়ে ভীতা যুবতী নারী দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। করুণ সুরে যিশুকে সম্বোধন করে সে বলল—বাবা, তুমি মহানুভব ভগবান। তুমি দয়া করে আততায়ীর হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচালে, কিন্তু পরে যদি আবার ওরা আমায় মারে তখন কে আমাকে বাঁচাবে?

উত্তরে যিশু তাকে বললেন—মা, জীবনে যে-সব অধর্ম আচরণ করেছ তার প্রত্যক্ষ ফল দেখলে তো? এখন থেকে ধর্মের পথে সদ্‌ভাবে জীবনযাপন কর। নিত্য ঈশ্বরের শরণ নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের শরণ যে নেয় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন। এখন থেকে পূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে জীবনে চলতে চেষ্টা কর। তাহলে তাঁর সর্বোত্তম কৃপা লাভে সমর্থ হবে। তিনি ধর্মস্বরূপ, ক্ষমাস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ। সত্যধর্ম রক্ষার জন্য তিনি দুষ্টের দমন করেন এবং শিষ্ট ও ধার্মিককে রক্ষা করেন। ধর্মপথে ঈশ্বর সর্বদাই তোমায় সাহায্য করবেন।

যিশুর উপদেশ শুনে সেই নারী তাঁকে প্রণাম করে সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রস্থান করে। ধর্ম ভাবে কঠোর জীবনযাপন করে উত্তরকালে সে যিশুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়েছিল। যিশুর দেহনাশের দীর্ঘদিন পরে ঐ দুর্বৃত্তদলের অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং ঐ ভক্ত নারীর কাছেই ধর্মশিক্ষা লাভ করে।

যারা অধর্মের পথে চলে ঈশ্বরের কৃপায় তারাই আবার কালক্রমে ধর্মপথে আসে। ঈশ্বরের কৃপা ও করুণা ছাড়া ধর্মপথে কেউ এগোতে পারে না।

অন্তরের বৃত্তিই কার্যের মাধ্যমে বাইরে প্রকাশ পায়। মলিন চিত্তই অস্থির, চঞ্চল যা গুণগ্রাহী অপেক্ষা অধিক দোষদর্শী হয়। অশুদ্ধ চিত্ত সমত্ববোধকে ধারণ করতে পারে না। অপরের দোষ দেখে তার চিত্ত অধিক মলিন ও দোষী হয়। আবার অপরের গুণ যে দেখে তার চিত্ত গুণগ্রাহী হয়। দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে সমজ্ঞান, একজ্ঞান। তাকেই বলে আত্মজ্ঞান।

২৪। ১২। ৬৮

৫৩

বর্তমানকে অবহেলা করে অতীতকে পূজা করা অর্থহীন। প্রসঙ্গটি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক রাজা তার কন্যাকে অপর এক রাজ্যের যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিছুদিন পরে যুবরাজ যুদ্ধে চলে যায়। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের দ্বারা সে বন্দি হয়। এদিকে যুবরাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে রাজা প্রাণত্যাগ করেন এবং যুবরাজের পত্নী স্বামীর ছবিখানা সম্মুখে নিয়ে দিবানিশি তার ধ্যানেই রত থাকে।

দীর্ঘকাল পরে যুবরাজ মুক্তিলাভ করে। সে তখন আর যুবাবস্থায় নেই। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে সে তার সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য হারায় এবং পক্বকেশ প্রাপ্ত হয়। সে তার নিজের রাজ্যে ফিরে আসে।

রাজকন্যা তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি, কিন্তু রাজ্যের সকলেই তাকে যুবরাজ বলে মেনে নেয়। বাধ্য হয়ে রাজকন্যাও তাকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু রাজকন্যা যুবরাজের পুরানো ছবিখানাই সর্বদা কাছে রাখত এবং মনে-প্রাণে যুবরাজের যুবাবস্থার ধ্যান করত। স্বামীর বর্তমান বার্ধক্য কবলিত চেহারার দিকে সে ফিরেও তাকায় না এবং সেবাযত্নও বিশেষ করে না। তখন রাজকন্যার পুরানো দিনের বৃদ্ধা দাসী তাকে বলে—তুমি ছবিতে কী দেখ? জীবন্ত রূপ ছেড়ে কেন তুমি যুবরাজের পুরানো ছবির ধ্যানে রত থাক? যার অতীতের রূপ তুমি চিন্তা কর সে স্বয়ং তোমার কাছে এতদিন পরে উপস্থিত হয়েছেন তাকে কেন যথার্থ ভাবে গ্রহণ করতে পারছ না? তুমি তার সেবাযত্নে রত হও।

দাসীর কথা শুনে রাজকন্যা বলল—ছবির রাজকুমারের ধ্যানের অভ্যাস আমার এতবেশি হয়েছে যে, দীর্ঘকাল সেই একই অভ্যাস আমার স্বভাবের মধ্যে মিশে গিয়েছে। সেই স্থানে অন্য আরেকটি রূপ খুব সহজে বসানো কঠিন। তখনকার যুবরাজের যে মনোভাব ও ব্যবহার ছিল তার সঙ্গে আমার অন্তরের ভাব ও ব্যবহারের যে মিল ছিল তাকে অবলম্বন করেই আমার দীর্ঘকাল কেটেছে। একের অবর্তমানে অপরের পক্ষে অন্য কোনও ব্যবস্থাই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। দীর্ঘকাল পরে যুবরাজ যে আবার জীবন্ত ফিরে আসতে পারেন সে রকম কোনও সম্ভাবনা তখন ছিল না। কাজেই অনন্যোপায় হয়ে আমি যা করে এসেছি তাতে আমার কোনও ত্রুটি হয়নি। তবে দীর্ঘকাল পরে যুবরাজ স্বয়ং ফিরে এসেছেন, কিন্তু তার দেহ-প্রাণ-মনের যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে তার পূর্বস্বভাবের সামঞ্জস্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং তার বর্তমানে মনের যে অবস্থা তার সঙ্গে আমার বর্তমান মনের অবস্থার মিল স্বাভাবিক ভাবেই না-হওয়ার কথা। তবে তাকে আমি আমার স্বামীরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করছি না, কিন্তু আমার মানসপটে তার যে রূপ দীর্ঘকালযাবৎ স্মরণ, মনন ও ধ্যান করে এসেছি তার প্রভাব এত দৃঢ় ভাবে আমার অন্তরে গেঁথে গিয়েছে যে আমি ইচ্ছামাত্র তার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি। তার সঙ্গে বাস্তবের মতোই কথোপকথন ও আলোচনা হয়। সেই জায়গায় বর্তমানে যুবরাজের যে চেহারার রূপান্তর ও ভাবের পরিবর্তন হয়েছে পররাজ্যে এতদিন বাস করে ও পরাধীন থেকে, তার সঙ্গে ছবির যুবরাজের যে জীবন্ত বিগ্রহ আমার চিত্তে ধ্যানের গভীরে পরিস্ফুট হয় ও প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এই উভয়ের মধ্যে কখনওই মিল বা সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব নয়।

সামাজিক ও লৌকিক দৃষ্টিতে পত্নীর সঙ্গে পতির দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ বা বিরহ হতে পারে কর্মব্যপদেশে। সেখানকার ব্যবস্থা তদনুরূপই হয়ে থাকে।

রাজকুমারী আরও বলল, তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। তথাপি তার লৌকিক স্বামী যখন ফিরে এসেছেন দীর্ঘকাল পরে তখন লৌকিক দৃষ্টিতে সমাজের নিয়ম অনুসারে তার যে কর্তব্য স্বামীর প্রতি তা সে নিশ্চয়ই পালন করবে এবং তার মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু যৌবনের ভাব প্রৌঢ়ত্বে খেলে না। যৌবনের যা-কিছু গোপনীয়তা, কমনীয়তা, শ্রী, লাবণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য সবই হৃদয়ের গভীরে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় নিহিত থাকে। যৌবনেই হয় তার স্ফূর্তি বা স্ফুরণ। তারপর প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই তা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। মনের স্তরের এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রৌঢ়ত্বের যে মন সেই মনে ভাবকল্পনা, সৌন্দর্য, স্ত্রীর প্রতি আসক্তি, তদ্‌ভাবনা, তন্ময়তা, যৌবনের প্রেমমাধুর্যের সাবলীলতা এবং তার অনবদ্য স্বকীয় ভঙ্গিমায় প্রকাশপ্রাচুর্য প্রৌঢ়ত্বে সম্ভব হয় না। প্রৌঢ়ত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই তখন স্বকীয় নিয়মে আত্মপ্রকাশ করে। বয়সের এমনই ধর্ম যে, যে বয়সের যা বৈশিষ্ট্য পরবর্তী স্তরে তা রূপান্তরিত হয়ে যায়, পূর্বের মতো আর থাকে না।

এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি তত্ত্ব হল—ভাবুক কবি, শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, প্রেমিক চিত্ত প্রভৃতির মধ্যে জীবনের ভাবমাধুর্যের উৎকর্ষতা যে বয়সে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা সম্যক্ অনুশীলনের বা ধ্যানধারণার মাধ্যমে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহুলাংশে রক্ষা করতে পারেন তারা। রাজকুমারীর পক্ষে তা অনেকাংশে সিদ্ধ হয়েছিল। সেই জন্যই যুবরাজের যৌবনের প্রভাব এতখানি প্রত্যক্ষ ভাবে জীবন্তরূপে তার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তা ছিল রাজকুমারীর জীবনসিদ্ধির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কাজেই উপরোক্ত গল্পটির বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐকান্তিক ধ্যানসিদ্ধির এক বিশেষ জীবন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে তা সম্পূর্ণরূপে রাজকুমারীর একান্ত নিজস্ব ভাবের বৈশিষ্ট্য বলে তার কাছে তা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অপরের কাছে তা সে রকম হতে পারে না।

দাসী তার এত গভীরের খবর জানত না। সে বাস্তব দৃষ্টিতেই রাজকন্যাকে যুবরাজের প্রতি সেবানিষ্ঠ হবার কথা বলেছে, কোনও ভুল করেনি সে। রাজকন্যাও তার কথার প্রতিবাদ না-করে তা মেনে নিয়েই পতিসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

একই ব্যক্তির দুই রূপ মানুষের অনুভূতির গুরুত্ব ভিন্ন ভাবে তৈরি করতে পারে। যে-ভাবে ভাববে, মন সেই ভাবাদর্শেই রূপায়িত হয়। একনিষ্ঠ ভাবনাই হল ধ্যান। ধ্যেয় বস্তুকে অন্তঃপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে কেউ অনন্য মনে দীর্ঘকাল সেবা করলে তার সঙ্গে তার তাদাত্ম্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গল্পটির তাৎপর্য খুব নিগূঢ়। ধ্যাননিষ্ঠ আত্মযোগী ও আত্মপ্রেমিকের পক্ষে এই কাহিনিটি আদর্শস্থানীয়। মানুষ অতীতকে পূজা করতে গিয়ে বর্তমানকে হারায়। সেই জন্য সচ্চিদানন্দময়ী মাতা একদিন বললেন, অতীতকালে অভিব্যক্ত আমার ভিন্ন ভিন্ন

বিশেষ রূপকে বর্তমানে সবাই লৌকিক আচার ও ধর্মের অঙ্গরূপে ব্যবহারে মত্ত আছে, কিন্তু বর্তমানে আমার যে-সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি, তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব মতবাদের গোঁড়ামি ও পক্ষপাত দোষের জন্য সকলে নিতে পারছে না। যুগের প্রয়োজনে যে-ভাবে তা অভিব্যক্ত হয়েছে তার প্রতি কারও দৃষ্টি নেই। বর্তমানের রূপ পুরানো হয়ে গেলে অর্থাৎ অতীত হয়ে গেলে তখন আবার তা অন্যান্য অতীতের রূপের মতোই গ্রাহ্য হতে থাকবে। সাধারণ লোকের ধর্মদৃষ্টি সব সময়ই সংকীর্ণতাপূর্ণ ও খণ্ড।

১। ১। ৬৯

৫৪

অখণ্ড সত্যের জ্ঞান দ্বারাই কলি যুগ সত্য যুগে রূপান্তরিত হবে। জানার জন্য বৃহৎকে বা মহৎকে মানতে হয়। মানার জন্য নিজেকে সমর্পণ করতে হয় বৃহতের বা মহতের কাছে। এই সমর্পণের অর্থ হল নিজেকে সম্বিৎস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেওয়া। আত্মবোধে মাতৃচৈতন্যকে সম্বোধন করে বলতে হয়—মাগো, এই 'আমার আমিকে' তোমার আপন করে নাও। এই ভাবে চৈতন্যের অনুশীলন ও তার পুনঃপুনঃ ব্যবহার দ্বারা সমর্পণ পূর্ণ হয়। সমর্পণ পূর্ণ হলেই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয়। পূর্ণ সিদ্ধিতে আর দ্বৈতের বা বৈচিত্র্যের প্রভাব থাকে না। তাই বলা হয় অহংকার মিটে গেলে মিটে যায় ঝামেলা।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার নারদ বৈকুণ্ঠে চলেছেন তাঁর প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। পথে এক সাধকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেই সাধক নারদকে বলল—ফিরবার সময় তুমি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করে এস, ঈশ্বরলাভ করতে আমার আর কত দিন লাগবে? নারদ 'আচ্ছা' বলে আবার চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর যাবার পর এক পাগলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেও নারদ মুনিকে চিনত। নারদকে দেখে তার খুব আনন্দ হয় এবং প্রভু হরির কাছে মুনিবর যাচ্ছেন শুনে তাঁকে সে বলল—ফিরবার সময় প্রভুর কাছে জেনে আসবে আমার জন্য তিনি কী ব্যবস্থা করেছেন এবং কতদিন আর এই ভাঙা দেহঘরে আমাকে থাকতে হবে? সব শুনে নারদ হেসে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

প্রভুর সঙ্গে নারদ দেখাসাক্ষাৎ করে ফেরার পথে প্রথম সাধকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর কথার উত্তরে নারদ বললেন—প্রভু বলেছেন তোমার ঈশ্বরলাভ করতে আরও চার জন্ম লাগবে। এই কথা শুনে সাধক হতাশায় ভেঙে পড়ল এবং সাধনা ছেড়ে দিল এই বলে যে, এত সাধনার পরেও যদি আরও চার জন্ম সাধনা করতে হয় তবে আমার দ্বারা আর ঈশ্বরলাভ হবে না।

তারপর পাগলের সঙ্গে নারদের দেখা হল। সেও নারদকে সম্ভাষণ জানিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাইল। তখন নারদ তাঁকে বললেন—তোমার কথা প্রভুকে

জিজ্ঞাসা করার সময় প্রভু সুচের ভিতর দিয়ে একটি হাতিকে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছিলেন। বারবার চেষ্টা করেও তিনি হাতিটিকে কোনও মতেই সুচের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারছিলেন না। সুযোগ বুঝে তোমার কথা তাঁকে জানাতে তিনি বললেন, তুমি যে তেঁতুল গাছের নিচে থাক সেই গাছের যত পাতা আছে তত জন্ম তোমার বাকি আছে ঈশ্বরলাভ করতে। মুনির মুখে এই কথা শুনে পাগল প্রথমে হেসেই কাহিল, পরে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। সে বারবার বলতে লাগল—ত্রিভুবনের অধিপতি সর্বশক্তিমান প্রভু একটি সুচের মধ্যে হাতি গলাতে পারছেন না, এর চেয়ে হাসির কথা আর কিছু হতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত প্রভুর অশেষ কৃপা আমার প্রতি যে, তিনি আমার মতো মূর্খ সাধনবিহীন পাগলের জন্য একটি তেঁতুল গাছের যত পাতা, মাত্র তত জন্ম আয়ু মঞ্জুর করেছেন। প্রভুর নাম করে, নাচ-গান করতে করতেই তো এ কয়টা দিন ফুরিয়ে যাবে। এ তো মাত্র সামান্য কয়েকদিনের ব্যাপার।

ঈশ্বরের প্রতি পাগলের আস্থা ও অচল ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে নারদ মুনি বিস্মিত হলেন। তিনি মনে মনে পাগলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। সেই মুহূর্তেই রথসহ প্রভু স্বয়ং পাগলকে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হলেন এবং তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঈশ্বর-আত্মার অনুভূতি লাভের জন্য কী রকম মনের প্রস্তুতি দরকার আলোচ্য আখ্যানটি তার একটি দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর-আত্মা, মুক্তিশান্তি লাভের অন্তরায় হল নিজ মন। এই মন বা অন্তঃকরণ হল মানুষের জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ও সুখ-দুঃখের কারণ। বন্ধন-মুক্তির কারণও মন। সকাম মন হল বন্ধনের কারণ। নিষ্কাম মন হল মুক্তির কারণ। আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, কিন্তু ভ্রান্তিবশত এই আত্মাই জীবরূপে প্রতিভাত হয় নিজ বুদ্ধিদোষে। আত্মা অতিরিক্ত কল্পনা ও ভাবনাই হল বুদ্ধিদোষ। মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত হল অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ হল স্বভাবপ্রকৃতিজাত। সুতরাং তা তিন গুণের অধীন এবং দেশ-কাল, কার্য-কারণের অধীন। আত্মবক্ষে আত্মার স্বভাব স্বেচ্ছায় লীলায়িত হয়। তাঁর প্রকাশধারার মধ্যে সর্বত্রই গুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গুণভাব অনুযায়ী জীবের চিন্তা ও কর্ম হয় এবং চিন্তা ও কর্ম অনুযায়ী গুণভাবের প্রকাশবিকাশের মধ্যেও ব্যতিক্রম হয়।

সাধারণত জীবের অন্তঃকরণ ভোগেচ্ছা কামদোষে মলিন থাকে। সেই জন্য তার আত্মস্মৃতি আবৃত থাকে। শরণাগতি, বিবেকবিচার ও অনাসক্তিযোগে জীবের অন্তঃকরণের মল বিদূরিত হয় এবং তা সম্ভব হয় সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরুসঙ্গের প্রভাবে। সাধুসঙ্গের ফলে অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস জাগে এবং তদনুরূপ হয় জীবের চিন্তা ও কর্ম। বিবেকী বিচারী পুরুষ ও শরণাগত ভক্তের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেই জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রতিকূল অবস্থাকে সহজে অনুকূল অবস্থায় পান। তখন তাঁর সিদ্ধি ও সাধ্য সহজেই অধিগত হয়। তত্ত্বত সিদ্ধি ও সাধ্য নিত্য—আত্মাতিরিক্ত বা স্বভাবকল্পিত

কোনও বস্তু নয়। আত্মস্বরূপে তা নিত্যবর্তমান থাকে। স্বকল্পিত ভাবনার দ্বারাই তার বিস্মৃতি ঘটে, আবার কল্পনা নাশেই তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। ঈশ্বর-আত্মা স্বয়ং সর্বজীবেরেই হৃদয়ে নিত্যবর্তমান। জীবের সত্য পরিচয় তা-ই। অনাত্মা বিষয়প্রীতির জন্যই জীবের ঈশ্বর-আত্মার প্রীতি ও স্মৃতি বিস্মরণ হয়। এই নষ্টস্মৃতি উদ্ধারই হল জীবনসাধনার চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাতে সংশয়, শঙ্কা, ভ্রান্তি. ভীতি ও হতাশা হল অন্তরায়। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও আত্মস্মরণ বা আত্মচিন্তাই হল ঈশ্বরাত্মবোধের সর্বোত্তম উপায়। তা পূর্ণ হয় নিত্য সচেতন ভাবে আপনবোধে সব 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র অভ্যাস দ্বাবা। তার ফলে জীবন হয় ধন্য, কৃতকৃত্য এবং অদ্বয়স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১। ১। ৬৯

৫৫

ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-ভগবানের সঙ্গে জীবের অভেদ সম্বন্ধ। অজ্ঞানবশত জীবেব স্বরূপজ্ঞান আবৃত থাকে বলে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ কল্পিত হয়। ঈশ্বরের হয়ে সর্বকর্ম সম্পাদন করার ফলে এই ভেদবুদ্ধি অপসারিত হয়। ভাল-মন্দ সর্বকর্ম, কর্মের ফল ও কর্তৃত্ববুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হয়। এই ভাবে কর্ম করার ফলে মন্দ কর্ম করার বৃত্তি ধীরে ধীরে চলে যায়। তখন সর্বকর্মই সৎ কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম হয়। মন্দ কর্মও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করলে তার ফল বা সংস্কার ঈশ্বরের কাছে চলে যায়। সেই কর্ম ও কর্মফল জীবকে স্পর্শ করে না। এই হল চিত্তশুদ্ধির উপায়। শুদ্ধ চিত্তেই ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক দেবীমন্দিরে এক পূজারি প্রায়ই পাঁঠা বলি দিত। দীর্ঘকাল পূজারির কাজ করে সে সহস্রাধিক ছাগবলি দেয়। কিছুদিন পরে একদিন রাস্তায় একজন লোককে ছুরিকাহত হতে দেখে সে ভয়ে ও দুঃখে চিৎকার করে ওঠে। দীর্ঘকাল বলিদানে অভ্যস্ত তার নির্দয় কঠোর মনও অস্বাভাবিক-দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই দিন থেকে রাতে সে আর ঘুমাতে পারে না। ঘুমাতে গেলেই সে নানাবিধ খুনের স্বপ্ন দেখে।

অনেকদিন পরে বলিদান করার কাজে আবার মন্দিরের তরফ থেকে তার ডাক আসে। লোকটি কাজে যোগদান করে এবং পুনরায় রীতি মতো বলিদান করতে শুরু করে। এই সময় শাস্ত্রমতে তার দীক্ষা হয়। দীক্ষাকালে প্রাপ্ত গুরুর নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করে চলে। বলির কাজও সে গুরুর নির্দেশ অনুসারেই সম্পন্ন করে। এই ভাবে বলি দিতে গিয়ে একদিন বলি দেবার সময় বদ্ধ ছাগের স্থানে তার ছোট ছেলের, গুরুর ও ইষ্টের মুখ ভেসে ওঠে তার সামনে। সেই মুহূর্ত থেকে সে বলি দেওয়া ছেড়ে দেয়।

গল্পটি শেষ করে গল্পের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঈশ্বরার্পণ বা ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করার ফল যে কী হতে পারে তার

উদাহরণ পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে। নিষ্কাম কর্মের লক্ষণই হল এইরূপ। এই ভাবে কর্ম হলেই চিত্তশুদ্ধি হয় ও ভগবৎ অনুভূতি লাভ হয়।

২। ১। ৬৯

৫৬

ঈশ্বরার্পণ বা ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করার ফল যে কীরূপ সুন্দর হতে পারে এবং অতি নিষ্ঠুর ভাবও যে কীরূপ দিব্যভাবে রূপান্তরিত হয় তার উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে

দুর্ধর্ষ এক ডাকাত ছিল। সে ডাকাতি করার সময় নির্বিচারে মানুষকে খুন করতেও দ্বিধা করত না। জীবনে বহু নরহত্যা সে করেছে ডাকাতি করতে গিয়ে। একবার এক বাড়িতে সে ডাকাতি করতে যায়। সেই বাড়িতে এক ঘরে একজন মহিলা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। ডাকাতের সাড়া পেয়ে ভয়ে শিশুসন্তানকে বুকে নিয়ে সে চিৎকার করে। ডাকাত সেই ঘরে ঢুকে ভীত সন্ত্রস্তা মায়ের কোল থেকে নির্দয় ভাবে ক্রন্দনরত ভীত শিশুটিকে কেড়ে নেয়। তারপর রামদা দিয়ে তাকে কাটতে যাবার আগেই তার নিজের শিশুপুত্রের মুখটি ঐ ভীত শিশুটির মুখের মধ্যে ফুটে ওঠে। শিশুর মাও তখন করুণ ভাবে মিনতি করে ডাকাতের কাছে তার সন্তানের প্রাণভিক্ষা চায়।

পরিবেশ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ ডাকাতের অন্তরে ভাবের পরিবর্তন হয়। সে শিশুকে হত্যা না-করে এবং সম্পত্তি লুঠপাট না করে দলবল নিয়ে চলে যায়। এর পরে সে ডাকাতি করা ছেড়ে দেয় এবং দলও ভেঙে দেয়। কিছুদিন পরে তার ছোট ছেলে মারা যায়। সপরিবারে সে অন্যত্র চলে যায়। নানা স্থানে ঘুরে সে একজন মহাত্মার কৃপালাভ করে কোনও এক তীর্থস্থানে ধর্মসাধনায় রত হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—অবস্থা ও ঘটনা ক্রমে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন কী ভাবে হয় তার দৃষ্টান্ত এই ডাকাতের জীবন। কার জীবনে কী ভাবে যে পরিবর্তন আসে তার নির্দিষ্ট কোনও বিধি-নিয়ম নেই। অনেকের জীবনে প্রথম দিকেই ধর্মভাব লক্ষিত হয় আবার অনেকের জীবনে শেষ বয়সে পরিবর্তন আসে। আবার দেখা যায় কোনও বিশেষ ঘটনার মাধ্যমেও কারও কারও জীবনের ধারা রূপান্তরিত হয়। জীবনে ধর্মভাব সবার এক রকম ভাবে আসে না। বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ধর্মভাব জাগরিত হয়। ধর্মের বিকাশ, আত্মবোধের বিকাশ ও সত্যানুভূতি অবিমিশ্র, সহজতম ও সরল হলেও তার অনুভূতির পথ সোজা নয়। তা অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল। তাই উপনিষদের বাণী হল—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" অর্থাৎ ক্ষুরের ধারের উপর চলা যেমন অতীব কঠিন, সেইরূপ ঈশ্বরানুভূতির পথও অতীব সূক্ষ্ম ও দুর্গম, অর্থাৎ সদা সতর্ক না-থাকলে অধ্যাত্মপথে চলা সম্ভব হয় না। একমাত্র সদ্‌গুরুই হলেন সহায়।

ঈশ্বরের কৃপায় ও সদ্‌গুরুর সাহায্যে তীব্র সংবেগপূর্ণ প্রচেষ্টা ও পুরুষকারের মাধ্যমে এই পথ অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নতুবা নয়।

২। ১। ৬৯

৫৭

অদ্বয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে কোনও প্রকার ভেদনীতি ও ভেদমূলক আচরণ সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভক্তির মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। জ্ঞানী শক্তির খেলাকে মায়া বলেন। শক্তিশূন্য জ্ঞানই হল জ্ঞানীর কাছে সত্য ব্রহ্ম। মায়া হল অসত্য বা মিথ্যা। শুদ্ধ জ্ঞানের বিচার দ্বারা অসত্য মায়াকে অতিক্রম করে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সত্য ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হল জ্ঞানীর সাধনা। প্রেমিক ভক্তের কাছে সবই সত্যময়, ঈশ্বরময়, আত্মময় ও ব্রহ্মময়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক প্রেমিক ভক্ত সন্ন্যাসীর আশ্রমে একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী উপস্থিত হলেন এবং উভয়ের মধ্যে মিলন হল। ভক্ত সন্ন্যাসী জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে ভক্তিপূর্বক পূজা করে তাঁর সেবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে দেন। ভক্ত সন্ন্যাসীকে জ্ঞানী সন্ন্যাসী ঠিক সমানবোধে নিতে পারেননি। উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হত। জ্ঞানী হলেন মায়াবাদী ও নির্গুণতত্ত্ব তাঁর উপাস্য। ভক্ত হলেন লীলাবাদী, সগুণতত্ত্ব তাঁর উপাস্য। আপন আপন ভাবের দিক থেকে উভয়েই সত্যের মহিমা গুণকীর্তন করেন। জ্ঞানী সন্ন্যাসী বিচার ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের জয়গান করেন। ভক্ত সন্ন্যাসী প্রেমভক্তিমূলক গাথা পরিবেষণ করেন। তাঁর গদগদ ভাবটি জ্ঞানীর চিত্তকে স্পর্শ করেনি। আপন আপন ভাব অনুসারে উভয়েই সাধনভজন করেন। সেই আশ্রমে খুব বানর ছিল। একদিন জ্ঞানী সন্ন্যাসীর কৌপীন বানরে নিয়ে যায়। তিনি তখন বানরকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়াবার চেষ্টা করেন। তখন প্রেমিক ভক্ত তাঁকে বললেন—ওকে কেন মারছ? ও তো ব্রহ্ম। জ্ঞানী বললেন—আমার কৌপীন নিয়ে গিয়েছে। তখন প্রেমিক বললেন—ও তো মায়া। ওর জন্য এত আসক্তি কেন তোমার? প্রেমিকের কথা শুনে জ্ঞানী একটু বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন।

সেই আশ্রমে মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন পন্থীর সাধুসন্ন্যাসী এসে কয়েকদিন থেকে আপন ভাবে সাধনভজন করে যথাস্থানে আবার চলে যেতেন।

আরেকদিনের ঘটনা। কয়েকজন ভিন্ন পন্থীর সাধু আশ্রমের একপ্রান্তে ধুনি জ্বেলে বসেছেন। একটু দূরেই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর আসন ছিল। জ্ঞানী সন্ন্যাসীরও ধুনি ছিল। জ্ঞানী নদীতে জল আনতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, তার ধুনি থেকে একজন সাধু আগুন নিয়ে যাচ্ছে। তাতে তিনি খুব রেগে যান। তাঁর রাগ দেখে প্রেমিক ভক্ত তাঁকে বললেন—ধুনি কখনও অপবিত্র হয় না, সবই তো ব্রহ্ম। তুমি ব্রহ্মবাদী। তোমার কাছে তো অব্রহ্ম কিছু নেই। জ্ঞানবিচারের দ্বারা তুমি মায়া অতিক্রম করেছ।

তোমার তো ক্রোধ থাকা উচিত নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ক্রোধ থাকে না। জ্ঞান লাভের আগে ক্রোধ থাকে। ক্রোধ হল অজ্ঞানের কারণ। জ্ঞানী সন্ন্যাসী প্রেমিকের মুখে এই কথা শুনে খুব বিস্মিত হলেন। বহু ব্যাপারে তিনি প্রেমিক ভক্তের আচরণ লক্ষ্য করেন। তাঁর যে খুব উন্নত অবস্থা তা তিনি পরে অনুভব করেছিলেন। সব ব্যাপারে, এমনকী সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও তাঁর সমান মর্যাদাবোধ ও সমদৃষ্টি পরম জ্ঞানসিদ্ধির লক্ষণ বলে জ্ঞানীর মনে হত। ক্ষুদ্র জিনিস ও বিরুদ্ধ অবস্থাকেও যথার্থ ভাবে নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করা, সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার প্রভৃতি আচরণ দেখে তাঁকে যোগযুক্ত বলেই তিনি গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়বোধে ব্যবহার করেন। সমজ্ঞানই হল ব্রহ্মজ্ঞ/আত্মজ্ঞপুরুষের লক্ষণ।

জ্ঞানীকে প্রেমিক ভক্ত একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এক পরমতত্ত্ব নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—জ্ঞানী নির্গুণভাব বেশি ভালবাসেন এবং ভক্ত সগুণভাব ভালবাসেন। উভয়ের সাধন ও আচরণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথক দেখালেও মূলত এক, কারণ উভয়ের লক্ষ্য এক। পরমতত্ত্বকে জ্ঞানী বলেন ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম, যোগী বলেন আত্মা বা পরমাত্মা এবং ভক্ত বলেন ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা ভগবান। প্রেমিক যাঁকে পরমেশ্বর বলেন, তাঁকেই আবার কেউ কেউ মাতৃবোধে ভজন করে তাঁর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। এই মা-ই সবার অন্তরে পরমাত্মারূপে নির্বিকার সাক্ষিদ্রষ্টা এবং জীবাত্মারূপে ও তার স্বভাবপ্রকৃতিরূপে নিজেই বৈচিত্র্যময় আচরণ করেন। মায়ের নামে, মায়ের বোধে সব গ্রহণ ও ব্যবহার করলে আত্মসমর্পণযোগ হয়। সর্বকর্ম মায়ের নামে করে মাকে সমর্পণ করলে কর্মফল থেকে জীব মুক্ত হয়। তা-ই হল কর্মফল থেকে মুক্ত হবার সাধন রহস্য। কর্মবন্ধন থেকেই জীবের ভেদজ্ঞান, অজ্ঞান ও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ হয়। জ্ঞানীর ভাষায় এই হল অবিদ্যামায়া। ভক্তের কাছে তা হল ঈশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা বা তাঁর খেলা। জ্ঞানী ত্যাগ-বৈরাগ্য সহকারে বিচার করে বিকারমুক্ত হন। ভক্ত সব সমর্পণ করে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদন করেন। তার ফলে তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। জ্ঞানবিচারের মাধ্যমে জ্ঞানী অনাসক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হন। ভক্ত ঈশ্বরে সব সমর্পণ করে নিষ্কাম কর্ম দ্বারা অনাসক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হলে কর্মফলের আর বন্ধন থাকে না। অনাসক্তিযোগ হল সন্ন্যাসযোগ। তাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন তিনিই হলেন যথার্থ সন্ন্যাসী। পদ্মপাতা জলে জাত হয়েও জলের দ্বারা যেমন সিক্ত হয় না, সেইরূপ অনাসক্ত যোগী সংসারে থেকে সর্বকর্ম করেও কর্মফলে লিপ্ত হন না।

৬। ১। ৬৯

৫৮

দেবতাদের প্রকাশ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণকে অবলম্বন করেই হয়। যখন কোনও জীবনের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে দৈবীগুণের প্রকাশ হয় তখন লোকে তাঁকে মান দেয়, শ্রদ্ধা

করে এবং পূজা করে। দেহাবসানে তাঁর মূর্তি তৈরি করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে এবং পূজা করে। এই ভাবে তিনিও দেবতার পর্যায়ভুক্ত হন।

একজন পূর্বজন্মে অতি বড় সাধক ছিলেন। তাঁর দেহান্তে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সকলে পূজা করে। সেই সাধকও পরের জন্মে ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন পরিবারে নূতন দেহধারণ করেন। যৌবনে তিনি বহু স্থানে ঘুরতে থাকেন। তার পরে সেই মন্দিরে এসে তিনি সেবকের বা পূজকের কাজ নেন। সাধকের পূর্বজন্মের স্মৃতি আবৃত ছিল। কিন্তু কোনও এক উচ্চপর্যায়ের মহাপুরুষ মন্দিরে পূজারত সেই সাধককে দেখে চিনতে পারেন যে, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাই সেবক স্বয়ং। নিজের অতীত মহিমা বিস্মৃত হয়ে নিজেকেই নিজে পূজা করে যাচ্ছেন। তা খুবই বিস্ময়কর।

গল্পটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষের জীবনে এইরূপ ঘটনা স্বাভাবিক। স্মৃতির অতলে অতীত লুকিয়ে থাকে। অতীতের অংশমাত্র বর্তমানে নূতন ভাবে রূপায়িত হয়। সেই জন্য বর্তমান অতীতের স্মৃতি ভুলে যায়। অতীত হল কারণ এবং বর্তমান হল কার্য। আবার বর্তমানের কার্যই ভবিষ্যতের কারণ হয়। কারণ অবগত হওয়া মানে অতীতকে অবগত হওয়া। অতীত অবগত হলে পূর্ণসিদ্ধি আসে। বর্তমানের প্রভাবের জন্য সকলের পক্ষে অতীতের স্মৃতি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সেই কারণে পূর্বজীবনে সিদ্ধ সাধককেও পরের জন্মে সিদ্ধির জন্য নূতন করে সাধনা করতে হয়। অখণ্ড ঈশ্বরের প্রকাশধারাও অনন্ত ও অখণ্ড। ঈশ্বরই স্বয়ং জীবনরূপে লীলায়িত হন বলে জীবনের ধারাও অনন্ত অসীম। তবে তাঁর প্রকাশের মাত্রার তাবতম্য হয় মাত্র। জীবনপ্রবাহ অবিরামধারায় চলে। এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভগবানই স্বয়ং জীবনের রূপ, ভূমিকা, পরিবেশ প্রভৃতি পরিবর্তন করে নিত্যনূতন ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত হয়ে খেলেন। কোনও জীবনে পূর্ণতা লাভ হয়, কোনও জীবনে আংশিক ভাবে সিদ্ধিলাভ হয়, আবার কোনও জীবনে হয়ত একেবারেই হয় না। এক জীবনে রাজা, আরেক জীবনে প্রজা বা ভিখারি। আবার এক জীবনে ভিখারি, আরেক জীবনে রাজা। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, সাধুতা-অসাধুতা, ধর্ম-অধর্ম, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, মুক্তি-বন্ধন প্রভৃতি চক্রাকারে পর্যায়ক্রমে জীবনে অভিব্যক্ত হয়। এই ভাবে জীবনের মাধ্যমে জীবনদেবতা অনন্ত ভূমিকায় লীলা করেন।

৯। ১। ৬৯

৫৯

জীবনে চলার পথে প্রলোভন, মোহ, ভয়, রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপর্যয়ই আসে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলি একত্র হয়ে কখনও কখনও প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে, আবার কখনও কখনও জীবনে অনুকূল অবস্থাও আসে। প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় অবস্থার মধ্যে দিয়েই জীবনযাত্রায় অগ্রসর হতে হয়। স্বয়ং ভগবানও যখন দেহরূপ ধারণ করে অবতরণ করেন তখন তাঁকেও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করেই চলতে হয়।

অনেকে সাধুসন্ন্যাসীর খুব কাছে এসে বসতে ভয় পায়। সাধুসঙ্গ করতে এসে সাধুদের ভয় করলে উপকার বিশেষ পাওয়া যায় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক প্রেমিক সাধুর কাছে অনেক গৃহী ভক্ত যাতায়াত করত। তারা এসে প্রেমিক সাধুবাবার কাছ থেকে বেশ দূরেই বসত। একদিন সৎপ্রসঙ্গকালে সাধুবাবা লক্ষ্য করলেন, সকলে যেখানে বসেছে তার মধ্যে বেশ খানিকটা খালি জায়গা আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই খালি জায়গাতে বসে পড়ে তাদের বললেন—ওষুধ খেতে ভয় পেলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে যেমন লাভ হয় না, সেই রকম সাধুসঙ্গ করতে এসে সাধুকে ভয় পেলে কোনও উপকার পাওয়া যায় না। তারপর সেই প্রেমিক সাধুবাবা ভক্তদের কাছে একটি গল্প বললেন—কোনও এক ভক্তের দুঃখকষ্ট দেখে পার্বতী একদিন শিবকে বললেন—এই ভক্তের দুঃখকষ্ট দেখে আমার খুব মন খারাপ, কাজেই আমি নিজে তার কাছে যাব। তখন শিব পার্বতীকে সেখানে যেতে নিষেধ করে নিজেই গেলেন। ভক্তের বাড়ি যাবার পথে শিব বিষ্ণুর কাছে আগে গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে জানালেন যে, পার্বতীর বায়না রাখার জন্যই তাঁর যেতে হচ্ছে ভক্তকে কৃপা করতে। বিষ্ণু সব শুনে বললেন—এ রকম অবস্থা আমারও মাঝে মাঝে হয়। তারপর শিব এক শিশু বালকের বেশ ধারণ করে ভক্তের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে, ভক্তের বাড়িতে পূজা হচ্ছে। বালকবেশধারী শিব ভক্তের কাছে প্রসাদ খেতে চাইলেন। ভক্ত তাঁকে পূজা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। পূজা শেষ হলে বালক হাত বাড়িয়ে নাড়ু চাইল। ভক্ত তাঁকে বলল—আমি অত্যন্ত গরিব, নাড়ু প্রভৃতি দিয়ে ভগবানকে পূজা করার ক্ষমতা আমার নেই। শুনেছি ভগবানকে শুধু গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করলেও তিনি তুষ্ট হন। সেই জন্য শুধু গঙ্গাজল আর বেলপাতা দিয়েই আমি ভগবানের পূজা করেছি।

ভক্তের মুখে এই কথা শুনে বালকবেশী শিব নিজরূপ ধারণ করে ভক্তকে বললেন —আমার এক হাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং আরেক হাতে ঐশ্বর্য। তোমার যা খুশি তা-ই নাও। ভক্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্য চেয়ে নিল। শিব 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন।

কৈলাসে শিব ফিরে এলেন। পার্বতী সব শুনে শিবকে বললেন—ভক্তের এত দুঃখকষ্ট দেখেও তুমি তাকে শুধুমাত্র জ্ঞান-বৈরাগ্য দিয়ে এলে? এই বলে পার্বতী ভক্তের কাছে নিজেই গেলেন এবং তাকে কিছু ঐশ্বর্যও দিয়ে আসেন। কিন্তু ভক্ত সেই ঐশ্বর্য ব্যবহার করেনি। অবশেষে শিব কিছুদিন পরে সেই ভক্তের ঘরে পুত্ররূপে এসে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করলেন।

প্রেমিক সাধুর এই কাহিনি উল্লেখ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—একনিষ্ঠ ভক্তির ফলে জ্ঞান-বৈরাগ্যের উদয় হয়। তার পরিণামে পরাভক্তির বা প্রেমের প্রকাশ হয় এবং ঈশ্বরদর্শন হয়।

১০। ১। ৬৯

৬০

দুঃখকষ্টময় সংসারজীবনে মানুষের যেমন চাওয়া থাকে, সেইরূপ অধ্যাত্মজীবন শুরু করেও সাধকরা অনেক সময় চাওয়ার উর্ধ্বে যেতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

একসময় এক সাধক হিমালয়ে তপস্যায় রত ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সিদ্ধিলাভ করে গুরুর আদেশে লোককল্যাণের জন্য তিনি লোকালয়ে নেমে আসেন। তাঁর কাছে বহু লোক যাতায়াত শুরু করে। সাধক বুঝতে পারলেন যে, সকলেই তাঁর কাছে আসে শুধু কামনাবাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। ভগবানকে কেউ চায় না। সাধকের মনে খুব দুঃখ হল। একদিন তিনি তাঁর গুরুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—প্রভু, তুমি আমায় কোথায় পাঠিয়েছ? এখানে কেউ নিজের কল্যাণ চায় না। সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত।

তখন গুরু তাঁকে বললেন—তুমি ভগবানের দর্শন লাভ করতে চেয়েছিলে এবং তুমি তা পেয়েছিলে। কিন্তু ভগবৎ দর্শন লাভের পরে তাঁর কাছে নিজেকে তো সমর্পণ করে দাওনি। তুমি যদি পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণের মাধ্যমে একান্ত ভাবে তাঁর হয়ে যেতে পারতে তাহলে তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিতেন উপযুক্ত কবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কেউ চায় ধনৈশ্বর্য, যশ-খ্যাতি-মান, আবার কেউ চায় জ্ঞান-বিশ্বাস-ভক্তি। এগুলিও চাওয়ার পর্যায়েই পড়ে। সাধক যদি বলে, কী চাইতে হয় আমি জানি না, তুমি আমার ভার নাও, তবে সেই সাধককে মা নিজের মধ্যেই রেখে দেন।

গল্পটি থেকে এই প্রমাণ হয়, যুগে যুগে কদাচিৎ দু-একজন সাধকই ঈশ্বর লাভের পরে নিজেকে তাঁর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দেন। এইরূপ সমর্পণের ফলে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদে মিশে যান এবং পরিণামে পরমেশ্বরীয় ভাবে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হন। এই হল অমৃতত্বলাভ।

১২। ১। ৬৯

৬১

মায়ের ব্যষ্টিভাব জীবনরূপ নিয়ে মাতৃবক্ষে মায়ের দ্বারাই ভেসে বেড়ায়। তারা কিন্তু মায়ের স্বরূপ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। ব্যষ্টি আমি মায়ের আমি-র স্ফুলিঙ্গ, মায়ের আমি-র মধ্যেই পুনঃপুনঃ ওঠে, ভাসে ও ডোবে। মা জানেন সন্তানের (প্রকাশের) পরিচয়, সন্তান মাকে মেনে তাকে আপন বলে জানে। আপন বলে জানার চরম উৎকর্ষতাই হল মায়ের স্বরূপ অনুভূতি। মা ও সন্তানের সম্বন্ধ হল দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ। মূলত কিন্তু তা এক, 'নিত্যাদ্বৈত অ-ভেদাভেদ তত্ত্ব'। দ্বৈতাদ্বৈতের অর্থ হল, ব্যবহারে দ্বৈত, কিন্তু অনুভূতিতে অদ্বৈত। তথ্যবোধে দ্বৈত, কিন্তু তত্ত্ববোধে অদ্বৈত।

মা ও সন্তানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কাজির বিচারের একটি কাহিনি বললেন।

এক কাজির কাছে একবার দু'জন স্ত্রীলোক বিচারপ্রার্থী হয়ে আসে। তাবা উভয়ে একই সন্তানের জননী বলে দাবি করে। কাজি মহাবিপদে পড়ে যায়, কারণ সৎ মা ও আসল মা নির্ণয় করা খুব কঠিন। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে দু'জনকেই সে বলল—তোমরা দু'জনেই যখন একই ছেলের মা, তাহলে ছেলেকে দু'টুকরো করে তোমরা দু'জনে নিয়ে যাও। এ কথা শুনে আসল মা চিৎকার করে উঠল। সে বলল—সন্তান আমার দরকার নেই। সে জানে সন্তানের ব্যথা কোথায়। নকল মা কিন্তু রাজি হয়ে গেল দু'টুকরো করার ব্যবস্থাতেই। গর্ভধারিণী মা-ই জানে সন্তান হারাবার ব্যথা। ছেলেটির গর্ভধারিণী মা ছেলেকে কাটবার কথা শুনেই অজ্ঞান হয়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয় মায়ের বিশেষ কোনও ভাবান্তর হল না। এই দেখে কাজি ব্যাপাবটা বুঝে নিল। সে লোকজন ডেকে মূর্ছিত মায়ের সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করল। জ্ঞান লাভ করে সে হাউ হাউ করে কেঁদে কাজিকে বলল—বাবা, আমার সন্তানের দরকার নেই। সে জীবনে বেঁচে থাকুক, তাকে দয়া করে কেটে ফেল না। দ্বিতীয় মায়ের হাতেই সে সন্তানকে দিয়ে দিতে বলল এবং ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগল। প্রথম মহিলাই যে সন্তানের গর্ভধারিণী মা এবং দ্বিতীয় মহিলা যে নকল মা তা কাজি ঘোষণা করল। সকলে মিলে তখন নকল মাকে ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিল। আসল মায়েব স্বরূপ যথাকালে প্রকাশ হয়ে পড়বেই। এই কথা আর গোপন থাকে না। কাজি বড় অদ্ভুত ভাবে ন্যায়বিচার করলেন। তার ফলে মা ও সন্তান উভয়েই উভয়কে ফিরে পেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গর্ভধারিণী মায়ের মতো সন্তানের ব্যথা আর কেউ বোঝে না এবং বুঝতেও পারে না। অপত্যস্নেহ শুধু মানুষের মধ্যে নয়, পশুপাখির মধ্যেও সমান ভাবে দৃষ্ট হয়। যেখানে স্নেহ নেই, সেখানে প্রাণের কোনও মর্যাদা নেই। স্নেহ হল প্রেমের অভিব্যক্তি। ঘনীভূত স্নেহই হল প্রেমের পরিচয়। এই প্রেম আসক্তিমুক্ত, বোধের স্বভাবধর্ম।

মাতৃঋণ পরিশোধ করা যায় না। পিতৃলোক ও মাতৃলোক তুষ্ট না-হলে জীবনসাধনার সিদ্ধি এবং তপস্যার পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁদের আশীর্বাদে দেবলোক ও ঋষিলোকের অনুগ্রহ লাভ করে তপস্যার চরমসিদ্ধি—মুক্তিশান্তি অনায়াসেই লাভ করা যায়। ঋণ শোধ হয় কৃতজ্ঞতাবোধে। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে কৃতজ্ঞ চিত্তে 'মেনে, মানিয়ে চললে' কোনও প্রতিক্রিয়া আর থাকে না। অকৃতজ্ঞ চিত্তকেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে নিজ কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কৃতজ্ঞ চিত্ত ভগবৎ বোধে ভগবানের নিমিত্ত কর্ম করে। কর্ম ও কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করে কর্মফল হতে সে মুক্ত হয়। নিষ্কাম কর্মীর কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি থাকে না। সমত্বযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে কর্ম করে বলে কর্মফলের বন্ধন আর থাকে না। কর্মবন্ধনমুক্ত জীবের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি

হয় অর্থাৎ সমত্বযোগে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের সম্যক্ অভিব্যক্তি হয়। তার ফলে তার সমগ্র সত্তার দিব্য রূপায়ণ হয়। শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান একমাত্র ভগবানের কৃপায় শুদ্ধ চিত্ত যোগী লাভ করে।

১৪। ১। ৬৯

৬২

পূর্বস্মৃতি ও অভিজ্ঞতা না-থাকলে কোনও জিনিসকে হঠাৎ দর্শনে জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলছি শোন।

কলকাতা শহরে এক শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক কোনও এক বিদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। উত্তর কলকাতার কোনও এক পাড়াতে এক ভাড়া বাড়িতে তিনি বাস করতেন। একসময় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে কয়েকবছরের জন্য বিদেশে যেতে হয়। যাবার পূর্বে তাঁর শিশুপুত্র ও পরিবারবর্গকে তিনি তার কলকাতার বাড়িতেই রেখে যান।

দশ-বারো বছর পর্যন্ত তাঁকে বিদেশেই থাকতে হয়। ইতিমধ্যে তার পরিবার পুরানো বাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় নূতন এক ভাড়া বাড়িতে যায়। এই নূতন বাড়িতে সাত-আট বছর থাকার ফলে প্রতিবেশী সকলের সঙ্গেই তাদের জানাশোনা হয়ে যায়। তার শিশুপুত্রটি এখন বড় হয়েছে। চৌদ্দ বছরের বালক সে এখন। সে ইস্কুলে পড়ে ও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। বারো বছর পরে ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফিরে আসেন। যেদিন কলকাতা এসে পৌঁছবার কথা, তার দু-তিন দিন আগেই তিনি এসে পৌঁছান। রাস্তায় কয়েকটি ছেলে খেলাধুলা করছিল। তাদের কাছে বাড়ির নম্বর খোঁজ করে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন।

রাস্তায় যে ছেলেরা খেলাধুলা করছিল তাদের মধ্যে তার নিজের ছেলে ছিল এবং তার সঙ্গেই তিনি কথাবার্তা বললেন। কিন্তু দীর্ঘকাল অদর্শনের ফলে স্মৃতির অভাবে কেউ কারওকেই চিনতে পারেনি। এক ঘণ্টা পরে খেলা শেষে ছেলেটি বাড়ি ফিরে আসে। তখন ছেলেটির মা তাকে তার পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দর্শনে পিতা ও পুত্র উভয়েই অবাক হয়ে যায়, কারণ রাস্তায় পরস্পরের সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পরিচয়ের অভাবে কেউ কারওকে চিনতে পারেনি। বাড়িতে মায়ের মাধ্যমে পিতাকে চিনতে পেরে উভয়েই খুব আনন্দিত হয়। প্রথম দর্শনে পরস্পরকে যে চিনতে পারেনি এ নিয়েও তাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পরিচয়ের পূর্বস্মৃতি না-থাকলে দীর্ঘকাল পরে আপনজনকেও প্রথম দর্শনে চেনা যায় না। পূর্বস্মৃতি ও অভিজ্ঞতা না-থাকলে কোনও জিনিসকে হঠাৎ দর্শনে জানা যায় না। জ্ঞান হল অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির ফল।

দর্শনের অনুভূতিও স্মৃতিমূলক। সাধনার মাধ্যমে এই স্মৃতি চয়ন করে পূর্ণ করতে হয়। স্মৃতি পূর্ণ হলেই দর্শনের ফল সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শন পূর্ণ ও সিদ্ধ হয় তদ্‌বিষয়ের স্মৃতি পূর্ণ হলে। গুরু ও আচার্য মুখে শাস্ত্রের মর্ম ও ঈশ্বরীয় বিজ্ঞান শ্রবণের ফলে তদ্‌বিষয়ের স্মৃতি খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়।

২০। ১। ৬৯

৬৩

বিশ্বাস আসে শ্রদ্ধা থেকে। প্রীতিপূর্বক প্রিয় এবং অপ্রিয় সব কিছুকে মেনে নেওয়াই হল শ্রদ্ধার লক্ষণ।

ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে মনকে সর্বাগ্রে অন্তর্মুখী করা প্রয়োজন। অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের উৎস প্রত্যেকের ভিতরেই আছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত যে কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধনার পরিণামে এই আনন্দময় হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা সকলের প্রধান কর্তব্য। সাধনভজন অভ্যাসকালে কষ্টকর হলেও পরিণামে তার ফল সুখদায়ক। কেবলমাত্র তার মাধ্যমেই অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। অশান্তভাব, অস্থিরতা প্রভৃতি রজোগুণসম্ভূত। এগুলি হল মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

প্রহ্লাদ অতি শৈশবে তার মায়ের কাছে শুনেছিল যে, একমাত্র হরিই নিত্য পূর্ণ সত্য। তিনি সকলের অকৃত্রিম বন্ধু, সকলের প্রিয়তম আত্মা। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হরিই হলেন সকলের আরাধ্য দেবতা। তিনি সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্ববস্তুর মধ্যে নিহিত আছেন। অনন্যা ভক্তির দ্বারা আপনবোধে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। হরিকে ডাকলে হরিই সকলকে রক্ষা করেন। মায়ের এই কথাকে বিশ্বাস করেই সে হরির ভজন করতে শুরু করে। তার এই বিশ্বাসের জন্য ও হরির ভজন করার জন্য পিতা হিরণ্যকশিপু তাকে নানা ভাবে উৎপীড়ন ও তাড়ন করে এবং বধ করার জন্যও চেষ্টা করে। পিতার সর্ববিধ উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা একান্ত বিশ্বাস এবং হরিভক্তির জোরে সে সহ্য করতে পেরেছিল। হরি তাকে প্রতিপদে রক্ষা করেছিলেন। অবশেষে পিতার নিষ্ঠুরতা, উৎপীড়ন যখন চরম সীমা অতিক্রম করে তখন ভক্তের বিশ্বাস ও ভক্তির সততা রক্ষার জন্য ভগবান হরি স্তম্ভের মধ্যে থেকে নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হন এবং নিষ্ঠুর ও ঈশ্বরবিদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে আপন উরুতে রেখে নখদন্তের দ্বারা উদর বিদীর্ণ করে বধ করেন। সেই ভয়ংকর নৃসিংহ অবতার উন্মত্ত হয়ে সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলে দেবগণ, মুনি, ঋষি, সাধ্য, সিদ্ধ, লোকপাল প্রভৃতি সকলে ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে সৃষ্টি রক্ষার জন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে নৃসিংহ অবতারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। নির্ভয়ে প্রহ্লাদ প্রেম গদগদ চিত্তে নৃসিংহদেবের স্তব করতে থাকে। ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব হরি প্রহ্লাদের অঙ্গ লেহন করে ক্রমে শান্তরূপ ধারণ করেন। হিরণ্যকশিপুর সমর্থনকারী ও তার আজ্ঞাবাহক যে-সকল দৈত্য প্রহ্লাদের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করেছিল তাদের বধ করার জন্য নৃসিংহদেব উদ্যত হন এবং প্রহ্লাদের কাছে অত্যাচারী দৈত্যদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। প্রহ্লাদ ভক্তিবিনীত চিত্তে ভগবান হরিকে নিবেদন করে বলে, এক হরিকেই সে সর্ব অবস্থায় সকলের মধ্যে যথার্থ ভাবে মেনে হরিবোধে সকলকে গ্রহণ করেছে। হরি অতিরিক্ত আর কারওকে সে দেখেনি ও জানেনি। তা শুনে নৃসিংহদেব দিব্যপ্রেমের মহাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদকে

জড়িয়ে ধরে আহ্লাদ করেন। প্রহ্লাদকে হরি বর প্রার্থনা করতে বললে প্রহ্লাদ তাঁর কাছে বিনীত ভাবে নিবেদন করে বলে—স্বেচ্ছায় হরি যাকে দর্শন দিয়ে আপন করে নেয় তার আর কোনও প্রার্থনা বাকি থাকে না। সে ঈশ্বরের সর্বোত্তম অনুগ্রহ লাভ করে কৃতকৃত্য হয়। সুতরাং তার আর কোনও প্রার্থনাই নেই। তবুও কৃপাধন্য হরির অনুগ্রহভাজন প্রহ্লাদ আদেশ পালনের নিমিত্ত বলল—বিষয়ী লোকের বিষয়ের প্রতি যেরূপ সুদৃঢ় আসক্তি থাকে, জন্ম জন্মান্তবে যখন যেখানে যে কুলেই আমার জন্ম হোক, হে প্রভু জগদীশ্বর অচ্যুত সচ্চিদানন্দ হরি তোমার প্রতি আমার যেন তদ্রূপ ভক্তি ও প্রীতি অটুট থাকে। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

প্রহ্লাদের এইরূপ অনন্যসাধারণ প্রার্থনা শুনে হরি পরমানন্দে প্রসন্ন চিত্তে তাঁকে বললেন—হে ভক্ত শিবোমণি প্রহ্লাদ, তোমার এই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে এবং তা সর্বযুগে সর্বশ্রেণীর ভক্তের হৃদয়ে হরিভক্তি জাগরণে বিশেষ সাহায্য করবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা প্রথমে শ্রেষ্ঠকে ও মহৎকে মেনেই আরম্ভ হয়। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বিচারসাপেক্ষ নয়, তা মানাসাপেক্ষ। কিন্তু জ্ঞানের সাধন হল বিচারসাপেক্ষ। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য ‘মেনে, মানিয়ে চলা’ অর্থাৎ শ্রবণ অনুরূপ অনুশীলন করাই হল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাধন। বিশ্বাস থেকে ভক্তি জাত হয় এবং বিচার থেকে জ্ঞান জাত হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয না এবং বিচার বিনা জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা জাগতিক জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান হল শুদ্ধ নির্মল অবিমিশ্র জ্ঞান। বিশ্বাস, ভক্তি এবং জ্ঞানবিচারের সাধনপদ্ধতি বাহ্যত পৃথক হলেও মূলত উভয়ই একতত্ত্ব, অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান একই বস্তু। অখণ্ড বিশ্বাস হল অখণ্ড জ্ঞানের লক্ষণ। খণ্ড বিশ্বাস তার সাধনমাত্র। খণ্ড বিশ্বাসের সাধন দ্বারা অন্তরে নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতির ক্রমবিকাশ হয় এবং যথাকালে তা অখণ্ড বিশ্বাসে পরিণত হয়। আবার বিচারেব মাধ্যমে অজ্ঞান, আসক্তি ও অবিদ্যার প্রভাব সরে যায়। তখন অন্তরে জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং অবশেষে জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। সংসারে মানুষ অধিকাংশ কাজই অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েই নিষ্পন্ন করে। যুক্তিবিচারের সাহায্যে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মুক্তিশান্তি লাভ তো দূরের কথা, জাগতিক জীবনেও অধিক উন্নতি হয় না।

২৭। ১। ৬৯

৬৪

সৎসঙ্গে সদ্‌গুরু সকলকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, সব কিছুর কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর বা চিতিমাতা স্বয়ং। প্রত্যেকের ভিতরে বসে আমিরূপে তিনিই সব করেন। বহু আমিরূপে এক ভূমা আমি স্বয়ং বিদ্যমান। এই জ্ঞানকেই বলা হয় যথার্থ জ্ঞান বা ত্রিনয়ন। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই সব করছেন—অর্জুন নিমিত্তমাত্র।

সৎসঙ্গের পরিণামে জীবনের যে কী রকম আমূল পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক রাজা তাঁর একমাত্র বিলাসী ও উদ্ধত পুত্রকে সুশিক্ষার জন্য তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। গুরু দেখলেন যে, রাজপুত্রের স্বভাবে অনেক দোষ আছে এবং তা শোধন করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তিনি তার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আশ্রমের নিয়ম থেকে একটু স্বতন্ত্র ভাবে করতে চাইলেন যাতে তার স্বভাবে তা ধীরে ধীরে খাপ খায়। কিন্তু রাজার আপত্তিতে তা না-করে সর্বসাধারণের মতোই তার খাওয়াদাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

কঠোর সংযম, বিধি-নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীনে চলে প্রথম প্রথম তার খুব কষ্ট ও অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কয়েকবছরের মধ্যে রাজকুমার ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং তার স্বভাবের পরিবর্তন হল।

কয়েকবছর পরে রাজা তার স্বভাবের পরিবর্তন দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে রাজ্যে ফিরে আসতে বললেন। কিন্তু রাজপুত্র রাজ্যে ফিরে যেতে রাজি হল না। পিতাকে সে বলল—যে যোগ্যতা লাভের জন্য আপনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন সেই যোগ্যতা আমার এখনও লাভ হয়নি। আপনি আপনার পার্থিব রাজ্যের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনার রাজত্ব হল পার্থিব, কিন্তু ভগবানের রাজত্ব হল অপার্থিব। তিনি সমগ্র বিশ্বের রাজা তো বটেই উপরন্তু সবার অন্তরের রাজা। অন্তরের রাজ্য পার্থিব রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি অন্তররাজ্যে অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাম্রাজ্যের যোগ্য সম্রাট হবার জন্য সাধনসংকল্প নিয়েছি, সুতরাং আরও বারো বছর গুরুর আশ্রমে আমায় থাকতে হবে, তার পরে অন্য কথা।

বারো বছর পরে রাজা রাজকুমারকে রাজ্যে ফিরিয়ে নেবার জন্য আশ্রমে এলেন। রাজা আশ্রমে রাজকুমারকে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি গুরুমুখে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাও শুনতে পেলেন। কয়েকঘণ্টা পরে তার ধ্যানভঙ্গ হলে রাজার সঙ্গে তার দেখা হয়। রাজা তাকে রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য বারবার বলার পরে তপস্বী রাজকুমার রাজাকে বলে যে, সংসার তার জন্য নয়। পৃথিবীর রাজ্যও তার জন্য নয়। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর রাজাধিরাজ পরমাত্মা তার হৃদয়ে আসীন। পরামুক্তি ও পরাশান্তির আনন্দে সে ব্রহ্মবোধে বিহার করে। বদ্ধ জীবনের কারণ কামনাবাসনা তার নাশ হয়েছে। মুক্তজীবন সংসারে বাস করে না। রাজাকে সে ফিরে যেতে বলল। রাজা বহু চেষ্টা করেও রাজপুত্রের মনকে ফেরাতে না-পেরে গুরুর শরণাপন্ন হন। গুরু রাজাকে সমস্ত বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর পুত্রকে রেখে রাজা রাজ্যে ফিরে যান। তিনি একান্ত মনে ঈশ্বরের ধ্যান করেন এবং সংসারের অনিত্যতা ভাবনা করেন। ইতিমধ্যে গুরুদেবের দেহাবসান হয় এবং তাপস রাজকুমারই আশ্রম পরিচালনা করে।

কিছুকাল পরে বৃদ্ধ রাজা সেই আশ্রমে এসে আপন পুত্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বরের ধ্যানে রত হন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গের প্রভাবে কী ভাবে স্বভাবের এবং জীবনের দিব্য রূপায়ণ হয় তার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুভবসিদ্ধ পরিচয় এই কাহিনির মধ্যে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়।

২৯। ১। ৬৯

৬৫

সৎসঙ্গে এসে রুচি, কর্ম, সঙ্গ এবং বোধও পাল্টে যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একজন ভদ্রলোক এক সাধুর কাছে গোপনে যাতায়াত করত। তার বন্ধুরা এ কথা জানতে পেরে তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ কবত। ফলে লোকটি সাধুর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন সে পুরানো বন্ধুদের দলেই ফিরে যায়, ফলে তার জীবনে পুরানো দোষত্রুটির প্রভাব আবার প্রবল হয়ে ওঠে। বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত পুরানো বন্ধুদের ছেড়ে আবার সে সাধুর কাছে ফিবে যায়। অনেকদিন বাদে তাকে দেখে সেখানেও সৎসঙ্গের কেউ কেউ ঠাট্টা পরিহাস করে। কিন্তু সে তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপে কান না-দিয়ে সাধুসঙ্গেই থেকে যায়। সে নিয়মিত ভাবে সাধুসঙ্গ করে এবং সাধুর নির্দেশ পালন করে চলে। এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে তার স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়। এদিকে তার পুরানো বন্ধুবান্ধবরা নানাবিধ দুঃখকষ্টে পড়ে খুব অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। ঘটনাচক্রে সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে তার আবার একদিন দেখা হয়। বন্ধুরা তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়, কারণ ইতিমধ্যে তার স্বভাব, চেহারা ও পোশাকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সব দেখে-শুনে ও তার সঙ্গে কথা বলে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়।

তার বন্ধুরা তাকে বলল—সৎসঙ্গে থেকে তোমার যে এ রকম পরিবর্তন হয়েছে তা আমরা জানতাম না। তুমি আগে আমাদের বিশেষ করে কেন বলনি? আমরাও তাহলে তোমার মতো সৎসঙ্গ করে উপকার পেতাম। এখন আমরা দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, আর্থিক, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত। কোনও সমাধান আর হচ্ছে না, বড় অশান্তি।

এই সব শুনে সৎসঙ্গী বন্ধুটি হেসে বলল—আমাকে তো প্রথমে তোমরা ঠাট্টা করে সৎসঙ্গ থেকে ফিরিয়ে এনে তোমাদের দলে আবার নিয়েছিলে। তোমরা তো সবই জানতে, কিন্তু সৎসঙ্গের মর্যাদা বুঝতে পারনি। আমি বাধ্য হয়ে শেষে তোমাদের দল ছেড়ে আবার সৎসঙ্গে ফিরে যাই। তোমাদের ঠাট্টা বিদ্রুপের জন্য আমিও তো সাধুসঙ্গে টিকতে পারতাম না, যদি সাধুবাবা আমাকে আকর্ষণ করে না-রাখতেন। সাধুবাবার কৃপায় তাঁর শিক্ষাধীনে থেকে আমি জীবনের আসল বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং গুরুর কৃপা।

২৯। ১। ৬৯

৬৬

অনেকে অতি গোপনে মনে মনে ঈশ্বরচিন্তা করে, বাইরে কারওকে তা জানতেও দেয় না। ঈশ্বরের উপর তাদের প্রগাঢ় নির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। অন্তরে স্মরণ-মনন করা খুব ভাল। প্রতিদিন চার-পাঁচ ঘণ্টা বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনা করা অপেক্ষা সরল অন্তঃকরণে অতি অল্প সময় স্মরণ-মনন করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। সরলতা হল ভক্ত মনের লক্ষণ।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্যদেবের সময়ের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করলেন।

একবার পথে যেতে যেতে মহাপ্রভুর সঙ্গে এক তপস্বীর দেখা হয়। তাঁর বিচারধারা অতি কঠোর এবং কঠোর তপস্যার ফলে তাঁর শরীরও খুব ক্ষীণ ছিল। মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—অনেক সাধনভজন করেছ, আর কতদিন করবে?

তপস্বী—যতদিন দেহ আছে করে যাব।

মহাপ্রভু—আনন্দ আস্বাদন করবে না একটু?

তপস্বী—আমি শাস্ত্রসম্মত জীবনযাপন করছি এবং ধ্যানধারণাতেই জীবন অতিবাহিত করছি। এর চাইতে আর বড় আনন্দ কী থাকতে পারে?

মহাপ্রভু—(একটু চিন্তা করে) তোমার আর তপস্যা করার দরকার নেই।

তপস্বী—তুমি আমাকে তপস্যা বন্ধ করতে বলছ কেন?

মহাপ্রভু তখন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে একটু স্পর্শ করে তিনবার কৃষ্ণ নাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীর মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা গেল। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনবরত তাঁর মধ্যে কৃষ্ণ নাম হতে লাগল। মহাপ্রভু তখন তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তপস্বীর দু'নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে গেলেন। মহাপ্রভুকে তিনি বললেন—প্রভু, তুমি আমায় কী করে দিয়ে গেলে!

মহাপ্রভু তখন তাঁকে বললেন—তোমার এখন থেকে অন্য কোনও রকম তপস্যার আর প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু কৃষ্ণ নামে ও কৃষ্ণ ভাবেই ডুবে থাক। এ-ই হল তোমার একমাত্র সাধন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পূর্ণ আনন্দ আস্বাদনের জন্য প্রেমের স্পর্শ প্রয়োজন হয়। দেহ-মন-প্রাণ শোধন করার জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। শুদ্ধ চিত্তের জন্য আবার দিব্যপ্রেমের স্পর্শ প্রয়োজন হয়। কঠোর তপস্যার দ্বারা অনেক সময় হৃদয় শুষ্ক হয়ে যায়। তাতে মাধুর্যের খুব অভাব থাকে। সেই জন্য পূর্ণ ভাবে আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। পূর্ণ আনন্দানুভূতির পরেই প্রেমের অভিব্যক্তি হয়। ভগবান স্বয়ং মানুষের বেশে এসে এই প্রেমানন্দের সন্ধান দিয়ে যান সকলকে। তাঁর এই প্রেম সঞ্চারণ অতীব নিগূঢ় তত্ত্ব, যুক্তিতর্কের অতীত। বিশেষ বিশেষ ভাগ্যবান এর অধিকারী হয়। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এইরূপ ভাগ্যবান দিব্যপ্রেমের আস্বাদন

পায়। কার কী রকম সুকৃতি তা প্রেমাবতার ভগবানই জানেন এবং সুকৃতির মাত্রার তারতম্য অনুসারে তিনি অধিকারী নিরূপণ করেন তাঁর লীলাসহচর হিসেবে—এ সব মন-বুদ্ধির অগোচর। ঈশ্বর যাঁকে বরণ করে নেন সে-ই শুধু এর রহস্য অবগত হতে পারে, অপরে নয়।

নরবেশে ভগবানের লীলা সরল হলেও সহজবোধ্য নয়, কারণ তাঁর প্রতিটি আচরণ এবং ব্যবহার সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও অসাধারণ। এর রহস্য সাধারণ মানুষের কাছে তো দূরের কথা, আপ্তকাম মুনিদের কাছেও দুর্বোধ্য মনে হয়।

৩১। ১। ৬৯

৬৭

ভগবানের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করতে নেই। ভগবানের সমালোচনা করো না। আপনজনের সঙ্গে অভিমান করা চলে, কিন্তু পরের সঙ্গে অভিমান করা চলে না। আগে ভগবানের সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে হয়। অনুরাগ প্রগাঢ় হলে তাঁর কাছে আবদার করা চলে, অভিমান করা চলে। আবদার করে ভগবানের কাছে এমন কিছু চাইতে নেই যার দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয়, তাহলে নিজেকেই সেই ফল ভোগ করতে হয়। ভক্ত হল চতুর্বিধ, যথা—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী।

বিভিন্ন প্রকারের ভক্ত প্রসঙ্গে আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি পৌরাণিক কাহিনি বললেন।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে অর্জুন, নারদ, দ্রৌপদী এবং আরও অনেকেরই অন্তরে যথেষ্ট অহংকারের ভাব ছিল। নারদাদির অহংকার ভগবান বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে দূর করে দেন এবং অর্জুনের এই অহংকার চূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ একদিন ছদ্মবেশে তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এক বনপ্রদেশে যান। সেখানে তাঁরা এক তপস্বীর আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই আশ্রমে প্রবেশ করে তাঁরা দেখতে পান, এক তাপস ব্রাহ্মণ একখানা তরবারি ধার দিচ্ছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—দেখ সখা, কী অদ্ভুত ব্যাপার! তপস্বী হয়েও এই যুবক অস্ত্রে ধার দিচ্ছে, কিন্তু এর কারণ কী? সব জেনে-শুনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেই বললেন তাপসকে এর রহস্য জিজ্ঞাসা করতে।

তাপসকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ব্রাহ্মণ তপস্বী হয়েও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র নিয়ে কী করছেন?

তাপস বলল—বিশেষ তিনজনকে বধ করার জন্য এই আয়োজন। এই তিনজন আমার ইষ্টকে বিশ্রাম করতে দেয় না এবং রাতেও ঘুমাতে দেয় না। একজন হলেন নারদ। তিনি সারাদিন হরি নাম করেন, ফলে আমার ইষ্ট একটুও বিশ্রাম করতে সময় পান না। দ্বিতীয়জন হলেন অর্জুন। তাঁর সাহস কত বড় যে, তিনি আমার ইষ্টকে তাঁর রথের সারথি বানিয়েছেন। অর্জুনের এত বড় আস্পর্ধা আমি কিছুতেই সহ্য করব না। তৃতীয়জন হলেন দ্রৌপদী। রাজসভায় দুঃশাসন যখন তাঁর বস্ত্রহরণ করছিল তখন অলক্ষ্যে

থেকে আমার ইষ্টকে অসাধ্যসাধন করতে হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণার বসন যুগিয়ে দিতে হয়েছে। সেই জন্য আমার ইষ্টকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে!

তাপসের সব কথা শুনে অর্জুন অন্তরে ভীত হলেন এই ভেবে যে, তাঁকে যদি সে চিনতে পারে তাহলে সেখানেই সে তাঁকে বধ করবে। তিনি ভয়ে ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন। যাবার আগে তাপসকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম জানিয়ে গেলেন। তিনি তাপসের ইষ্টপ্রীতি (কৃষ্ণপ্রীতি) দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং নিষ্কাম ভক্তের যথার্থ পরিচয়ও জানতে পারলেন। তাপসকুমার যে তাদের চাইতে শ্রীকৃষ্ণের আরও অনেক বড় ভক্ত তা জেনে অর্জুন খুব আনন্দিত হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই কাহিনির মাধ্যমে রাগভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান সব সময়ই তাঁর ভক্তকে নিজের চাইতেও বড় করে প্রকাশ করেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, ভক্তের জন্যই সব কিছু করেন। নিজ মহিমা নিজে ব্যক্ত না-করে ভক্তের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন অথবা ভক্ত সেজে তার মধ্যে নিজেই খেলা করেন, নিজের মহিমা নিজেই ব্যক্ত করেন।

৩১। ১। ৬৯

৬৮

ভগবানকে উপলব্ধি করার সাধারণ বৃত্তি থাকে সকলের মধ্যেই। তবে সেই বৃত্তি মোহ, অজ্ঞানের আবরণে সুপ্ত থাকে। এই মোহ আবরণ যখন সরে যায় তখনই ঈশ্বরজিজ্ঞাসা জাগে এবং পরে সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সে জানতে পারে যে, সে নিজেই ঈশ্বর। একটি মজার পুরাণের কাহিনি বলছি শোন।

ব্রহ্মার একবার সাধ হল যে, সে সংসার করবে। সুতরাং সে শুয়োর হয়ে জন্মাল। সংসারে এসে সে ছানাপোনা নিয়ে একেবারে মত্ত রইল। পুরানো স্মৃতি সে একেবারেই ভুলে গেল। সে সুখেই সংসার করতে লাগল। সেখান থেকে আর যেতে চায় না। নিজের স্বরূপকে সে একেবারে ভুলে বসে আছে। বাচ্চাকাচ্চা নাতিপুতি নিয়ে একেবারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে সে সংসার করতে থাকে।

বিষ্ণু এই অবস্থা দেখে নারদকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রহ্মাকে বলবার জন্য যে, তাঁর আর সংসার করতে হবে না, এখন ফিরে যাবার সময় হয়েছে। শুয়োররূপী ব্রহ্মা তো নারদকে চিনতেই পারল না এবং সে তাঁর কোনও কথাই শুনল না। বিষ্ণুর কাছে ফিরে এসে নারদ সব কথা তাঁকে জানালেন। বিষ্ণু দ্বিতীয়বার নারদকে শুয়োরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন শুয়োর তার ছেলে, নাতিপুতি নিয়ে নারদকে তাড়া করল। নারদ আবার এসে বিষ্ণুর কাছে সব জানালেন।

এবার উপায় না-দেখে বিষ্ণু নিজেই সুদর্শন চক্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। শুয়োরের নাতিপুতি ও ছেলেদের সব এক এক করে সংহার করে তিনি ফিরে এলেন এবং

নারদকে আবার পাঠালেন ব্রহ্মার কাছে। বিষ্ণু নারদকে বললেন—এবার ব্রহ্মা তোমাকে চিনতে পারবে, যাও তাঁর কাছে।

নারদ এবার শুয়োরের কাছে আসতেই শুয়োর নারদকে চিনতে পারল এবং ধীরে ধীরে অতীতের কথা স্মরণ হল। তখন ব্রহ্মা নারদের সঙ্গে নিজের জায়গায় চলে গেলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষের ঠিক এই রকম অবস্থা। প্রথমে সংসারের ভোগাসক্তিতে সে মেতে থাকে। তারপর বহু ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখকষ্টের পরে ঈশ্বরের কথা স্মরণ হয়। তখন তার খেয়াল হয় যে, যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যেতে হবে।

ঈশ্বরকে জানতে হলে, কেন্দ্রে ফিরে যেতে হলে, অর্থাৎ যেখান থেকে সবাই এসেছে সেখানে যেতে হলে সৎসঙ্গের মাধ্যমে তার বিজ্ঞানটি জেনে সেই বিজ্ঞানপদ্ধতি অনুযায়ী তাকে চলতে হবে। যেমন করে ধাপে ধাপে অতিক্রম করে সে এসেছে ঠিক তেমন ভাবেই তাকে পৌঁছতে হবে।

কেন্দ্রে যেতে হলে সৎসঙ্গ ছাড়া উপায় নেই। অসৎসঙ্গের প্রভাবে যেমন নেমে আসতে হয়, তেমনই সৎসঙ্গের প্রভাবে আবার ফিরে যেতে হবে। এ কথা শুনে ভয় পাবার কিছু নেই, বিব্রত হবারও কিছু নেই। যত দুঃখকষ্টই জীবনে আসুক, তাঁর বক্ষে আছি—এই বিশ্বাসটুকু থাকলেই যথেষ্ট।

১৬। ২। ৬৯

৬৯

প্রাণরূপী নারায়ণ নিত্যবর্তমান। তাঁকে একবার জাগিয়ে দিলে তার সহজ গতিটা নষ্ট হয় না। প্রাণের সহজ গতিটা পরে নষ্ট হয়ে যায় অহংকারের ছাপ পড়ে ।

শিশুমাত্রেই দেবতা। এই শিশুর মধ্যেই অহংকারের ছাপ পড়তে পড়তে পরে ক্রমশ সে-ই আবার দানব হয়ে যায়। কত জনম কত রকম ভোগের সংস্কার নিয়েই সে আসে! সেই সকল সংস্কার ভোগের মাধ্যমেই আবার ক্ষয় করতে করতে এগিয়ে যেতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক পাহাড়ে ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরি বানিয়ে একদল প্রবীণ সাধু সাধনভজন করার উদ্দেশ্যে থাকতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, সকলেই সকালে উঠে দেখতে পেতেন যে, কোনও সাধুর হয়ত লোটা নেই, কোনও সাধুর হয়ত কমণ্ডলু নেই, কারও বা কম্বল নেই, আবার কারও বা খড়ম নেই। পরে খুঁজে পেতে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, জিনিসগুলি চুরি হয়ে যায়নি সত্য, কিন্তু পাওয়া যেত ভিন্ন ভিন্ন সাধুর কুঠুরিতে। এক সাধুর জিনিস অন্য সাধুর কুঠুরিতে, এই সাধুর জিনিস অন্য কুঠুরিতে, আবার সেই সাধুর জিনিস অন্য সাধুর কুঠুরিতে। সেই রকম ভাবে সাধুদের জিনিসপত্রগুলি রোজই ওলটপালট হয়ে থাকত। এই রকম হবার রহস্যটি আর কেউ ধরতে পারে না।

অবশেষে দু'জন সাধু রাত জেগে পাহারা দেবেন এই সংকল্প নিয়ে কারওকে কিছু না-জানিয়ে রাত জেগে রইলেন। রাত জেগে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, এই কাজটি হল তাঁদের মহান্ত মহারাজের। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মহান্ত মহারাজ সকলের ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরিতে প্রবেশ করে প্রত্যেকের ব্যবহার্য ছোটখাট জিনিসগুলি নিয়ে এক কুঠুরির জিনিস আরেক কুঠুরিতে এবং সেই কুঠুরির জিনিস আরেক কুঠুরিতে ওলটপালট করে রেখে আসতেন।

সাধু দু'জন মহান্ত মহারাজের এই কীর্তিকলাপ সকালবেলা উঠে অনেককেই বলে দেন। ক্রমশ কথাটি মহান্ত মহারাজের কানেও গেল যে, তাঁর এই হীন কাজের কথা সবাই জেনে গিয়েছে। তিনি তখন কেঁদে ফেলে সকলের কাছে স্বীকার করলেন যে, জ্ঞানপথে এতদিন সাধনভজন করা সত্ত্বেও অতীত অতীত কোনও জন্মের এই সংস্কার থেকে তিনি এখনও মুক্ত হননি। অতীতের কোনও জন্মে কর্মসংস্কারবশত তিনি সাধুদের এক একটি জিনিস লুকিয়ে রাখতেন। তার পরে এরটা তার কাছে এবং তারটা এর কাছে—এ রকম ওলটপালট করে রেখে দিতেন।

সাধুর এই রকম আচরণ যে অতীতের কোনও কুকর্মের সংস্কার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতি জনমে মানুষ যা করে যায় এবং তার থেকে যে সংস্কার তৈরি হয়, তা নূতন জীবন নিয়ে এসে আবার নিজেকেই ভোগ করে যেতে হয়। এই রকম ভাবে অজ্ঞাতসারে কত রকম সংস্কারই যে জীবনে তৈরি হয় তার হিসাব পাওয়া যায় না।

মহান্ত মহারাজের আচরণে অন্য কোনও দোষ নেই, শুধু এই একটিমাত্র পরপীড়াদায়ক দোষ ছিল। বহু জনম সাধনা করে তবে সর্বসংস্কার মুক্ত হওয়া যায়। সময় যখন হয় তখন অবশ করে সংস্কার অনুযায়ী ভোগ করিয়ে নেয় নিয়তি। মহান্ত মহারাজ কী রকম নিজের দোষ সহজ ভাবে স্বীকার করলেন—এটা কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের শেষাংশ বললেন—মহান্ত মহারাজ অন্যান্য সাধুদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের কার কী দোষ আছে অকপটে বল তো শুনি।

কম-বেশি দোষ তো সবারই থাকে। অন্য কোনও সাধু তাঁদের নিজেদের দোষ মুখ ফুটে আর বলল না। সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল মাথা নিচু করে।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—মহান্ত মহারাজ যথার্থ সত্যসেবী ছিলেন। তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে সত্যরক্ষা করেছেন। অপর সাধুরা তা পারেননি। সংস্কারের দোষ স্বীকার করা এবং সকলের কাছে তা ব্যক্ত করা মহত্ত্বেরই পরিচয়। এই মহত্ত্বের ফলে তিনি নিশ্চয়ই সংস্কারমুক্ত হবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অপর সাধুদের সংস্কারমুক্ত হবার পথ পরিষ্কার নয়। সাধুদের জীবনের আচরণ থেকে মহত্ত্বের শিক্ষালাভ সকলেই করতে পারে। সেই জন্য সাধুদের জীবনাদর্শ সকলের কাছেই সমান মূল্যবান। গৃহস্থ ও কুটিরবাসী সাধক উভয়ের কাছেই সত্য হল চরম আদর্শ ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে কেবলমাত্র সততার মাধ্যমেই পৌঁছানো যায়। উপরোক্ত গল্পটির মধ্যে সেই শিক্ষাই পাওয়া যায়।

২৩। ২। ৬৯

৭০

একজন মস্ত বড় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তাদের জ্ঞান হঠাৎ একজনকে দিয়ে দিতে পারে না। তার জন্য সময়ের দরকার হয়। আগে তার ground তৈরি হবে ক্রমপর্যায়ে, তারপর সেই জ্ঞান গ্রহণ করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা তৈরি হলে তবেই ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার তাদের জ্ঞান দিতে পারে। সেই জন্য বলা হয়, আগে তুমি নিজে perfect হও, তারপর অপরকে reform করতে যেও।

মহাপুরুষগণ বলেন, কারওকে reform করা যায় না। Reform করবে nature, তুমি তাকে শুধু help করতে পার। তাঁরা আরও বলেন—আমি যতখানি সত্য অপরেও ততখানি সত্য। কেউ ভুল নয়।

অপরের কাজে বাধা সৃষ্টি করা হল animal nature-এর কাজ। অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা হল human nature-এর লক্ষণ এবং divine nature-এর কাজ হল শুধু দিয়ে দেওয়া। দিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তারই যার অর্জন হয়েছে। কিন্তু যদি অর্জন করা না-থাকে তবে তা দেবার উপায়ই থাকে না।

প্রাণবিজ্ঞান সমষ্টি অর্থে গ্রহণ করতে হয়, ব্যষ্টি অর্থে নয়। তাহলেই তার তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য স্থূলতা বা সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

প্রাকৃত বস্তুর বিজ্ঞান দ্বারা সমগ্রতার বোধ হতে পারে না। তাই এই বিজ্ঞান দ্বারা সবাইকে গ্রহণ করা যায় না। অতিপ্রাকৃত বস্তুর বোধ হল ঈশ্বর-আত্মার বোধ। তা দেশ-কাল, কার্য-কারণ নিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব। এই হল নিত্য-সত্যের পরিচয়।

অজ্ঞানঘন অবস্থা থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানঘন অবস্থা পর্যন্ত সবগুলি অবস্থাই হল প্রাণেরই বিস্তার। পরস্পরের সাথে সমভাবে বদ্ধ হলেই হয় সম্বন্ধ। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

একজন মহাপুরুষের কাছে এক বিজ্ঞানী এসে একবার বলেছিল—তুমি যে সত্যের উপলব্ধি করেছ তা কি আমাকে দিতে পার?

মহাপুরুষ বললেন—তোমার কী qualification আছে?

বিজ্ঞানী—আমি scientist, radio engineer।

মহাপুরুষ—আমাকে কি তোমার এই বিদ্যা শিখিয়ে দিতে পার?

বিজ্ঞানী—তাহলে তোমাকে আমার laboratory-তে যেতে হবে।

তার laboratory-তে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ছিল বলে বিজ্ঞানী সাধককে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বলল এবং আরও বলল যে, এ সব ধীরে ধীরে শিখতে হবে।

মহাপুরুষ—তুমি যে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাইছ তার জন্য তো তোমাকেও আমার laboratory-তে (আশ্রমে) আসতে হবে। বিজ্ঞানী মহাপুরুষের এই কথায় রাজি হয়ে গেল।

বিজ্ঞানী একদিন মহাপুরুষের আশ্রমে গেল। মহাপুরুষ তাকে শক্ত একটি আসন করতে শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী সেই আসনটি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারল না।

তখন মহাপুরুষ তাকে বললেন—তাহলে তোমার আসন করা ঠিক হোক তার পরে আস্তে আস্তে methodically সব শিখবে।

কাহিনি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এক-দুই না-শিখে কি অঙ্ক শেখা যায়? নিয়মিত সৎসঙ্গে আসার ফলে আপনা হতেই একটি training হয়ে যায়। সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের সময়, ধ্যান করার সময় স্থির হয়ে বসবার অভ্যাস তৈরি হয় এবং দেহ-মন-প্রাণ আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে physical body, vital body, mental body এবং intellectual body এক ভাবে ছন্দিত হয়ে চলে। এ সবই হয় ক্রমপর্যায়ে। সর্বোত্তম ফল লাভ করতে হলে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর ব্যবহার মনোযোগ সহকারে, ধৈর্য ধরে, সচেতন ভাবে করা দরকার। ব্যবহারে কোনও ত্রুটি থাকলে সুফল পাওয়া যায় না।

২৫। ২। ৬৯

৭১

গুরু তাঁর শিষ্যভক্তদের সমান ভাবে ভালবাসেন, যদিও প্রয়োজনবোধে অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে তারতম্য দেখা যায় তার পশ্চাতে বিশেষ কারণ থাকে। সেই কারণ শুধু সদ্‌গুরুই জানেন, অন্য কেউ জানতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক গুরুর আশ্রমে পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচ রকম শিষ্য এসেছে। গুরু তাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রকম ব্যবহার করেন। এই দেখে একজন জিজ্ঞাসা করল—আপনি এ রকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেন কেন? গুরু তখন কোনও উত্তর দিলেন না।

রাতে খাওয়ার সময় গুরু এক রকম খাদ্য সকলকে পরিবেষণ করলেন। তখন সেই শিষ্যটি বলল—এই রকম খাবার আমার পেটে সহ্য হয় না। তখন গুরু বুঝিয়ে দিলেন যে, খাদ্যের বেলায় যেমন এক প্রকার খাদ্য সকলের সহ্য হয় না, প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ প্রয়োজন অনুসারে গুরু প্রত্যেকের সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরু জানেন কার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করলে তার কল্যাণ হয়। সকলের ভবব্যাধি দূর করার জন্য এমন যিনি প্রেমঘন কল্যাণময় গুরু রয়েছেন, তাঁর কাছে ছুটে যেতে হয়। গুরুর স্নেহ কিছু দিয়েই মাপা যায় না। তিনি দেবার জন্যই এসেছেন। তাঁকে যদি কেউ না-চায় বা না-ডাকে তবুও তিনি দিয়েই যান সর্বদা, তবে তাঁকে ডাকলে এবং সম্পর্ক হলে জানা যায় যে, তিনিই দিচ্ছেন সব কিছু—ফলে তাঁর উপর নির্ভরতা আসে। কিন্তু যারা গুরুর আশ্রয় নেয়নি, তারা জানে না যে, গুরু সর্বদাই সাহায্য করছেন অলক্ষ্যে থেকে, ফলে তারা সর্বদাই অশান্ত, অস্থির ও চঞ্চল হয়ে থাকে।

গুরুকরণ হওয়া সত্ত্বেও যদি শিষ্য গুরুর উপর নির্ভর না-করতে পারে তবে সে চঞ্চল ও অস্থির হয়। কল্যাণময় সদ্‌গুরু সকলের মধ্যে দিয়েই কাজ করছেন। তবে যারা সচেতন থাকে তারা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ্ করে। কোনও কিছুতেই তারা চঞ্চল হয় না। তারা জানে গুরুশক্তিতে সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে। বিশ্বাসী মন কখনও অস্থির হয় না। দারিদ্র, রোগ, শোক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনও তাদের অস্থির করে না। তাদের চালচলন, আচারব্যবহার দেখলে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, এ ভাবে নির্ভর করলে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কখনও কারওকে ঈর্ষা করতে নেই।

প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসীরা সর্বদা অপরের কল্যাণই শুধু চান। যেখানে যে অবস্থাতেই তাঁরা থাকুন না কেন বিশ্বের কল্যাণই তাঁরা সর্বদা কামনা কবেন। যিনি সর্বদা সকলের কল্যাণ কামনা করেন, তিনিই যথার্থ সাধু।

১। ৬। ৬৯

৭২

Limited form of consciousness-কে বলে ego। এই ছোট আমি বা ego বড় হতে হতে perfection-এ পৌঁছায়। তখন তাকেই বলে Pure Consciousness। যে শক্তির সাহায্যে limited form of consciousness ক্রমশ বড় হয় তাকেই বলে মাতৃকাশক্তি বা গুরুশক্তি। বৃহতের দিকে সকলকেই পৌঁছতে হবে। উৎপত্তি সকলের একসঙ্গে হয়নি। কাজেই প্রত্যেকের মধ্যে গতির তারতম্য দেখা যায় experience-এর তারতম্য অনুসারে। Form দিয়ে বয়স মাপা হয় না। Experience দিয়ে আধ্যাত্মিক পথে বয়স মাপা হয়। Form দিয়ে বয়স মাপা হলে---একজনেব উৎপত্তি হল চল্লিশ বছর আগে, আরেকজনের আশি বছর আগে। চল্লিশ বছরের লোকটির যদি বেশি experience থাকে, তবে বুঝতে হবে তার বেশি জন্ম পূর্বে অতিক্রম করা হয়ে গিয়েছে।

ক্ষুদ্রের উপর বৃহতের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, কিন্তু বৃহতের উপর ক্ষুদ্রের প্রভাব পড়ে না। গুরুশক্তির সাহায্য ছাড়া শুধু self-effort দ্বারা সাধনা কবলে অনেক বেশি সময় লাগে। Divine force বা গুরুশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে যেমন দেহের বিকার সারাতে হয়, সেইরূপ অন্যান্য বিকার সারাতে গেলে মহতের কাছে যেতে হয়।

প্রীতিপূর্বক ঈশ্বর-আত্মার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ গুরু যে-ভাবে বাড়িয়ে দেন তার নামই হল দীক্ষা[১]। গুরু কখনও নাম, কখনও ভাব, কখনও কর্ম প্রয়োজন মতো দিয়ে

১। (ক) ঈশ্বব-আত্মাব সঙ্গে অন্তরেব বা স্বভাবের সম্বন্ধ প্রীতিপূর্বক করে দেওয়াই হল দীক্ষা। (খ) গুরু ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব, নাম, ব্যবহাব প্রভৃতির মাধ্যমে আপন শক্তি সঞ্চার করেন। তা অতীব নিগূঢ় বিষয়।

দেন। অনেক সময় দেখা যায় শুধু স্পর্শ বা দৃষ্টিপাত করেও তিনি ছেড়ে দেন। কিছুদিন পরে তার মধ্যে কাজ শুরু হয়। এটাও এক প্রকার দীক্ষা। প্রীতিপূর্বক আকর্ষণ শুধু প্রয়োজন। গুরুর প্রতি আকর্ষণ থাকলেই সিদ্ধি হয় একলব্যের মতো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ছোট গল্প বললেন।

কবিরের খুব ইচ্ছা ছিল রামানন্দস্বামীর কাছে দীক্ষা নেবার। কিন্তু জোলা হবার জন্য তিনি নাম পেলেন না। রামানন্দস্বামীর মুখে একটি নাম শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর। কবিরের রামানন্দস্বামীর উপর তীব্র আকর্ষণ ছিল। একদিন মনে মনে সংকল্প করে ভোর তিনটের সময় গঙ্গার ধারে গিয়ে সিঁড়ির উপর শুয়ে রইলেন। তিনি ভেবেছিলেন রামানন্দস্বামী গঙ্গাস্নান করে নাম করতে করতে যখন ঘরে ফিরবেন তখন তাঁর মুখে নাম শুনতে পাবেন।

যথাসময়ে গঙ্গাস্নান করে রামানন্দস্বামী গুনগুন করে রাম নাম করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। অন্ধকারে হঠাৎ কবিরের গায়ে পা ঠেকে যায়। চমকে উঠে স্বামীজি বলে উঠলেন—জয়রাম, জয়রাম। তিনি ঝুঁকে দেখলেন যে, সিঁড়িতে কবির শুয়ে আছেন। কবির কিন্তু স্বামীজির মুখে 'রাম নাম' শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। কবির 'নাম পেয়েছি' বলে লাফিয়ে উঠলেন। এই ভাবেই তিনি গুরুবরণ করেছিলেন।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই কাহিনি থেকে বোঝা যায়, কী রকম তীব্র বিশ্বাস ছিল কবিরের রামানন্দস্বামীর উপর। Urge এসে গেলেই হয়। আকর্ষণ তো কবিরের প্রথম থেকেই ছিল। বিশ্বাসটিই মন্ত্রের কাজ করে। রামানন্দ কবিরের উপর প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন, তথাপি কবির তাঁকে বললেন—আপনি যা-কিছু শাস্তি দেন ক্ষতি নেই, আমি তো আপনার মুখে শুনে নাম পেয়েছি।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—যে নাম চার দিকে শোনা যায় তা-ই সিদ্ধগুরুর মুখে শুনে প্রীতিপূর্বক বা অনুরাগের সঙ্গে স্মরণ করলে ফল পাওয়া যায়। যে কোনও লোককেই ঈশ্বরাত্মবোধে অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করলেই গুরুবরণ করা হয়। শালগ্রামশিলাকে ও শিবলিঙ্গকে ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চনা করলে যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে মানুষকে বিশ্বাস করে তার কথা গ্রহণ করলে কেন হবে না? Urge বেশি থাকলে হয়, কম থাকলে হয় না। ঈশ্বরের প্রয়োজনবোধ তীব্র হলে কাঠের পুতুলের মধ্যেও ভগবানকে পাওয়া যায়, তা না-হলে জগন্নাথদেবের মূর্তির মধ্যে ঈশ্বরকে সকলে পায় কী ভাবে?

বিশ্বাসীর সঙ্গ করলে তবেই বিশ্বাস আসে। বিশ্বাসের foundation দৃঢ় করতে হলে বিশ্বাসীর কাছে যেতে হবে। যোগীরা যোগের foundation দৃঢ় করে যোগীর কাছে গিয়ে, ভক্তরা ভক্তের কাছে গিয়ে ভক্তির foundation দৃঢ় করে আর জ্ঞানীরা জ্ঞানীর কাছে গিয়ে জ্ঞানের foundation দৃঢ় করে। মহতের সঙ্গের শক্তি ছাড়া foundation দৃঢ় হয় না। ক্ষুদ্রের সঙ্গ করলে মহৎ হওয়া যায় না। গুরু তাই বলেন—গুরুশক্তি শুধু একটি body-তেই নয়, সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তাঁর দিকে দৃষ্টি খোলা

রেখে চলতে হয়। গুরুশক্তিই যে সর্বত্র কাজ করছে সে বিষয়ে conscious হয়ে চলতে হয়।

গুরুবাদ ও ঈশ্বরবাদ একই। ঈশ্বরবাদকে limited করার জন্যই progress হয় না। জীবন ক্রমোন্নতির পথেই চলছে। Life-এর actual aim-ই হল এক-এর দিকে যাওয়া। মহতের সঙ্গ পেলে এক-এর দিকে যাওয়া যায়। মহতের সঙ্গ না-পেলে বিভ্রান্ত হতে হয়।

গুরুকে 'খুঁটি' করে চললে, বিশ্বাস করে চললে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। 'খুঁটি' হল বিশ্বাস অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন—এটা মনে রাখা। মহতের বা গুরুর উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়। ঈশ্বরমুখী গতি এলে প্রথম প্রথম মানুষ মন্দিরে যেতে শুরু করে। এই ক্ষুধা ক্রমশ বাড়লে মন্দিরে যাতায়াতও ক্রমশ বেড়ে যায়। তার পরে হঠাৎ একদিন সে মহতের সংস্পর্শে আসে এবং তার উপর মহতের প্রভাব পড়ে। এই ভাবে ক্ষুধা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে Divine help-ও পাওয়া যায়। স্বয়ং চিতিমাতাই গুরুমূর্তির রূপ বা সৎসঙ্গের রূপ নিয়ে বসে থাকেন। প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে Divine force প্রত্যেককে উপযুক্ত সম্ভার যুগিয়ে দেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

নানা রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সকলে অগ্রগতির দিকেই চলেছে। গুরুশক্তিই একটির পর একটি অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়ে একটি থেকে আরেকটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে mould করতে করতে নিয়ে চলেছে।

Desire প্রত্যেকেরই থাকে তবে সেগুলি আবার change-ও হয়। ঈশ্বরমুখী গতি যাদের, তাদের মধ্যেও নানা রকম standard আছে। কেউ মন্দিরে যায়, কেউ গির্জায় যায়, আবার কেউ বা মসজিদে যায়। কেউ শাস্ত্র পড়ে, কেউ জপ-ধ্যান করে, কেউ বা সৎসঙ্গ করে। Life-এর touch-এ যে আসে সে উপকার পায় সবচেয়ে বেশি।

সমগ্র বিশ্ব হল Divine institution। Divinity-র বাইরে কিন্তু কেউই নেই। একটি মাধ্যমের ভিতর দিয়েই ঈশ্বর তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন।

মানুষের মধ্যে যখন ঈশ্বরকে কাজ করতে হয় তখন মানবদেহ ধারণ করেই তাঁকে কাজ করতে হয়। সচেতন হয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সর্বত্রই একটি guiding force আছে এবং এই ভাবেই Divinity play করছে।

সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গ যেখানে হয় সেখানেও একজন মহাপুরুষের বা সাধু ব্যক্তির মাধ্যমেই সদুপদেশ সকলে শুনতে পায়। স্বয়ং ঈশ্বরই মহাপুরুষ বা সাধুর মাধ্যমে বলেন। ক্লাবে একজন প্রেসিডেন্ট এবং একজন সেক্রেটারি থাকেন। তাকে যেমন অন্যান্য পাঁচজন follow করে, খেলার মাঠে যেমন একজন ক্যাপ্টেন বা মনিটর থাকে যার নির্দেশ সকলে মেনে চলে, স্কুলে বা কলেজেও তেমনই শিক্ষকের বা প্রফেসরের নির্দেশ ও শিক্ষা ছাত্ররা গ্রহণ করে। এই সকল ক্ষেত্রেই এক ঈশ্বরই প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ক্যাপ্টেন বা মনিটর, প্রফেসর বা শিক্ষক প্রভৃতির মাধ্যমে কাজ করে

যাচ্ছেন। এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সর্বত্র এক ঈশ্বরীয় শক্তিই নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তা-ই হল আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে সব পৃথক পৃথক ভাববোধে ব্যবহৃত হয়।

একদিন Divinity সম্বন্ধে সুন্দর একটি formula এসে গেল। তা সাজালে এই রকম দাঁড়ায় ঃ

1. Absolute stage-ই হল eternity
2. Eternity comes from infinity
3. Infinity comes from immortality
4. Immortality comes from divinity
5. Divinity comes from impersonality
6. Impersonality comes from tranquility, serenity
7. Tranquility comes from equanimity, equality
8. Equality and equanimity comes from simplicity and humility
9. Simplicity, humility comes from sincerity
10. Sincerity comes from generosity
11. Generosity comes from originality
12. Originality comes from unity
13. Unity comes from identity
14. Identity comes from beauty
15. Beauty comes from truth
16. Truth comes from Existence

The Existence is undivided Oneness or the Absolute, the Eternal, the Self or Spirit.

সব কিছুর সঙ্গে সকলেই connected। Existence-এর বাইরে যাবার উপায় কারও নেই। প্রত্যেকেই আমরা সদাশ্রিত। তবে এই বোধ ব্যাপক ভাবে আসে না। অসৎ বলে কোনও জিনিস নেই। সৎ-এর তারতম্য অনুসারে অসৎ বলা হয়। মিথ্যা বলে কিছু নেই। সত্যেরই অল্প পরিমাণ ব্যবহারকে মিথ্যা বলা হয়। জ্ঞানের অল্প ব্যবহারকে অজ্ঞান বলা হয়। জীবের অন্তরে ঈশ্বর অল্প জ্ঞান হতে ক্রমধারায় প্রকাশ হয়ে চলেছেন পূর্ণ জ্ঞানের দিকে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা সকলে হয়েই চলেছি অর্থাৎ Being-ই becoming। আমরা বর্তমানে partly Divine, ভবিষ্যতে full Divine হব।

গুরু হলেন Absolute One। তিনিই কৃপাঘন, করুণাঘন মূর্তিতে মানবদেহ ধারণ করে আবির্ভূত হন। গুরু ও ইষ্ট তাই অভেদ। ভেদ করাটাই ভ্রান্তি। গুরুই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তিনিই সব। যদি বল সব সময় নয়, কখনও কখনও, তাহলেও মনে রাখবে

তিনিই মহান। তাঁর মহত্ব কোনও ভাবেই খর্বিত হয় না। মাবাবাকেও তো কখনও কখনও পছন্দ হয় না। এখানে মাবাবার greatness-কেও তো অস্বীকার করা যায় না। গুরুকে মনুষ্যবোধে নিতে নেই, ঈশ্বরাত্মবোধে নিতে হয়।

Divine is always living—গুরু সর্বদা সকলের বোধের মধ্যেই আছেন। তাই বলা হয় 'গুরুর মাথা, শিষ্যের পা' আবার 'শিষ্যেব মাথা, গুরুর পা'। এই দু'টি উক্তির তাৎপর্য অভিন্ন হলেও ব্যবহার ভিন্ন। গুরু যদি শিষ্যের মাথায় না-থাকেন তবে কে শিষ্যকে চালাবে? গুরু শুধু একটি body নন। গুরুর বোধটিই ধরে রাখতে হয়। স্মৃতির মধ্যে গুরুবাক্য ধরে রাখতে হয়। গুরুবাক্য মানে Great-এর idea—সৎপ্রসঙ্গ।

গুরুশক্তি একটি body শুধু নয়। গুরুশক্তি অনেক সদাশ্রিত দেহের মাধ্যমে কাজ করে। যে নাম ভাল লাগে প্রীতিপূর্বক সেই নাম করে গেলেই হয় দীক্ষা। দীক্ষা একটি rigid idea। দীক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যই, যারা liberal view গ্রহণ করতে পারে না।

যেখানে ঈশ্বরীয় নাম বা প্রসঙ্গ হয় সেখানে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ, সমস্ত শক্তি, দেবদেবী সকলেই উপস্থিত থাকেন। Form থাকে না, তাঁদের ভাবঘন মূর্তিগুলি থাকে। এটা আমার প্রাণের পরিপূর্ণ বিশ্বাস। সব credit তাঁদের। তাঁরাই 'এই body'-র (নিজেকে নির্দেশ করে) মাধ্যমে সব বলে দিয়ে যান। যে দা দিয়ে গাছ কাটা হয়, গাছ কাটার credit দা-এর নয়, যে গাছ কাটে তার। গুরুগিরি করা 'এর' function নয়। প্রার্থনা করা হয়েছিল, যার যেমন খুশি ব্যবহার কর। পাঁচজনের সুবিধার জন্য 'এই body'-টা medium হিসাবে ব্যবহার করবে।

'এখান থেকে' (নিজেকে নির্দেশ করে) যে-সব ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা সত্যের কথা প্রকাশ হয়ে চলেছে সেগুলি একজনের উক্তি নয়। জগতে যত সদ্‌গুরু এসেছিলেন, যত দেবদেবী Divine direction-এ কাজ করেছেন, সকলেই 'এই দেহটি' ব্যবহার করেছেন। তাঁরা ভালবেসে সব দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা জগতের কল্যাণচিন্তা করে যাচ্ছেন। লোকপাল বা দিকপাল্ বলে যাঁদের উল্লেখ করা হয় তাঁরা সবাই Divine soul। তাঁরা হলেন মায়ের হাতের অস্ত্র। এক ঝলকে বিদ্যুতের মতো তাঁরা আসেন এবং যা দেবার তা দিয়ে যান। তাঁদের মাধ্যমে সব কাজ স্বয়ং ভগবানই করেন। এঁরা নিত্যবিদ্যমান। সদাশ্রিত হওয়ামাত্র নিত্যবিদ্যমান হয়ে যায়। কোনও কোনও ভাগ্যবান ভাবঘন নয়ন দিয়ে তাঁদের দর্শন পায়। ভাবের development-এর প্রয়োজন হয় যখন, তখন ভাবুকের সঙ্গ করার দরকার হয়। যে সঙ্গে মেশা হয়, সেই সঙ্গের প্রভাব পড়ে।

১৬। ১১। ৬৯

৭৩

গুরুকে সর্বদা অখণ্ডবোধে মানতে হবে। প্রত্যেক রূপ, নাম, ভাব এক বস্তু দিয়ে তৈরি এবং তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক। প্রত্যেক সদ্‌গুরুর এক উদ্দেশ্য—ছোটকে বড় করে তোলা, লঘুকে গুরু করে তোলা, small-কে great করে তোলা। যখন যে যা পায়

কোনওটিই ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে পাওয়া হয় না। 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) কাছ থেকে যা শুনছ তা সমস্ত মতবাদের মিশ্রণ ও সব মতপথের সমন্বয়। তাতে সারবস্তু আছে। সকলের গুরুকেই যেন নিজের গুরু বলে ভাবা হয়। কোনও মতপথের মধ্যেই বিরোধ নেই। সব যাতে গ্রহণ করা যায় এই যোগ্যতাটুকু শুধু বাড়িয়ে নিতে হয়।

গুরুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে, শ্রবণের দ্বারে, রসনার মধ্যে ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারে বসিয়ে রাখতে হয়। সব আছে প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই, কিন্তু আবরিত। শুধু আবরণ সরানো দরকার। সকলে বাইরে খোঁজে। পাহাড়পর্বত, গুহাগহ্বরে বৃথাই খোঁজে। এটাই ভ্রান্তি। কাছে থাকতে বাইরে খুঁজে বেড়ানো হয় প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে। একজন চশমা চোখে দিয়ে ভ্রান্তিবশত সারা বাড়ি চশমা খুঁজে তোলপাড় করছে, বাড়ির সবাই খুঁজছে। কারওরই খেয়াল নেই যে চশমাটি চোখেই রয়েছে। চশমা চোখে থাকা সত্ত্বেও অন্ধ। এক পথিক গোলমাল শুনে কাছে গিয়ে সব ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে বলল—চশমা তো চোখেই রয়েছে! পথিকের মতো গুরু এসে ঈশ্বর-আত্মার সন্ধান প্রত্যেকের নিজের মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে যান।

ভিতরে যথার্থ বস্তুটি ধরতে পারলে বাইরে গুরুর আর প্রয়োজন হয় না। বাইরে গুরুর প্রয়োজন ততদিনই যতদিন অন্তরে গুরুর সন্ধান না-পাওয়া যায়। গুরু কোথায় কত মাইল দূরে থাকেন তাঁকে খুঁজতে যাবার প্রয়োজন হয় না। যাদের মনে দুঃখ আছে যে, তাদের গুরু দূরে আছেন ফলে তারা গুরুসঙ্গ করতে পারে না অথবা তিনি স্থূল দেহে নেই, কী ভাবে তাঁর সঙ্গ করা যাবে—তাদের বারবার বলা হচ্ছে যে, গুরু বলতে যাঁকে বোঝায় তিনি প্রত্যেকের অন্তরেই আছেন। ভুল যেন কেউ না-করে। গুরু বলতে অখণ্ডকেই নির্দেশ করা হয়। অখণ্ডের মধ্যে শুধু আমার গুরুই আছেন এমন নয়, সবার গুরুই আছেন। গুরু যদি জ্ঞানময় ও বোধময় হয়ে থাকেন তবে সব গুরুই জ্ঞানমূর্তি। বাইরের coating বা dress দেখলে বহু বলে ধারণা হয়। এক অখণ্ড গুরুমূর্তি বাইরে ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকাশিত হন, ভিতরে কিন্তু এক।

সদ্‌গুরুর কাজ এক বস্তুকে, এক জ্ঞানকে ধরিয়ে দেওয়া। এক জ্ঞান মানে তৃতীয়-নয়ন, সমদৃষ্টি। এক ছাপেই সব কিছুকে মিলিয়ে নিতে হয়। এক দৃষ্টিই হল আসল। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক ভদ্রলোকের পাঁচটি ছেলে। বাবার বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা যার যা খুশি চেয়ে নিল। প্রথম ছেলে নিল বাড়ি, দ্বিতীয় ছেলে নিল নগদ টাকা, তৃতীয় ছেলে নিল সম্পত্তি, চতুর্থ ছেলেও তার রুচি মতো কিছু চেয়ে নিল। কিন্তু পঞ্চম ছেলে বলল—আমার কিছু দরকার নেই। তোমাকে পেলেই চলবে। আমি শুধু তোমাকেই চাই।

জীবনকে যে চায় জীবন সে পায়, বস্তুকে যে চায় সে জীবনকে পায় না, বস্তুই শুধু পায় এবং তা অনিত্য বলে হারায়। চার ছেলে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে হিমশিম খেতে থাকে। কিন্তু পঞ্চম ছেলে তার বাবার সঙ্গে তীর্থধর্ম করে। বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে

সে। বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতে ধর্মের দিকে তার টান এল, তার জীবনে ধর্মের প্রভাব এল। এই ভাবেই দিন যায়। তারপর একদিন বৃদ্ধের শেষ সময় ঘনিয়ে এল। ছেলে বাবাকে প্রাণপণে সেবা করতে লাগল। মৃত্যুর আগে বাবা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে গেলেন। তার ফলে পঞ্চম পুত্রই সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার পেয়েছিল।

৩। ১২। ৬৯

৭৪

সব কিছুই চিদাত্মগুরুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। পরস্পরের সঙ্গে মতের অমিল বা বিরোধ হলে ভাবতে হয় নিজের ইষ্টের বা গুরুর আরেকটি প্রকাশ সেখানে। শ্যামার জায়গায় শ্যাম, শ্যামের জায়গায় মা। মায়ের জায়গায় গুরুকে বসিয়ে নিলেই সব বিরোধ মিটে যায়। গুরুর বা মায়ের মহিমার অন্ত নেই।

মৃত্যুকে লোকে ভয় পায়, কিন্তু সে যে কত উপকারী তা তারা জানে না। মৃত্যু যাকে নিয়ে যায় তার যে কত উপকার করে দিয়ে যায় তা মানুষ বোঝে না। যে যায় সে বোঝে। মৃত্যুভয় চলে গেলেই Divine chapter এসে যায়। মৃত্যুকে যে ভয় করে না সে অমরত্ব লাভ করেছে। মৃত্যু হল মা বা গুরু। তিনি সকলের বিকারগ্রস্ত ছিন্ন মলিন দেহ বদলে নূতন দেহ বা জামা পরাতে আসেন। গুরু বা মা যে মৃত্যু, এ কথা জানতে পারলে কোনও ভয় আর থাকতেই পারে না। সমগ্র বিশ্বই হল মায়ের বা গুরুর রূপ।

কারও সম্মুখে মা বা গুরু ছাড়া আর কেউ আসতেই পারে না। অখণ্ড সত্যমূর্তি গুরু বা মা এক অর্থবোধক। তিনি বহুরূপ নিয়ে প্রকাশ হন। এই কথা স্মরণে থাকলে আর কোনও শাস্ত্রকথা মনে রাখার দরকার হয় না।

সন্তান সব কিছু সইতে পারবে না বলে এবং তার দুঃখবেদনা লাঘবের জন্য গুরু বা মা সন্তানকে টেনে নেন আপনবক্ষে। গুরু বা মাতৃ মহিমা যত শোনা যায় তত তাঁব প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়। 'গুরু' শব্দটি মনে রাখলেও চলে। রূপ হয়ত ভুলে যাবে। ঈশ্বরের নামটি শুধু মনে রেখ। রূপ হারিয়ে যায়। রূপ থাকে না, নামটিই ধরে রেখ।

নামকে অবতার বলা হয়। নাম স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তেতো ওষুধ খাবার মতো জোর করে নাম করতে পারলেও একসময় উপকার পাওয়া যায়। নামই মা বা গুরু। মা বা গুরু বললেই তাঁদের আবির্ভাব হয়। নাম Itself গুরু। এখন শুনে বিশ্বাস করে শুধু একটু মেনে চল। তারপর একসময় নিজের জীবনেই দেখবে নামের মধ্যে সব আছে। এটাই হল 'স্বভাবযোগ'। নামই হল সকলের আসল পরিচয়। স্ব-ই হল প্রত্যেকের পরিচয়। স্ব-ই প্রত্যেকের সম্মুখে আসেন গুরুবেশে। স্ব মানে আপন, অর্থাৎ নাম Itself —বোধস্বরূপের পরিচয়।

প্রত্যেকেই স্ব বা নামময়। তা এখন আবরিত হয়ে আছে। গুরু এসে আবরণ উন্মোচন করে সবাইকে ধরিয়ে দেন। অরূপের প্রকাশ রূপের বেশে এসে আমাদের

ধরিয়ে দিয়ে যান। তাঁরা নামময় হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের দেহের প্রতিটি কোষই নামময়। শব্দ বা বোধ অবিনাভাবী। নামময় হতে গেলে বোধময় হতে হবে। আবার বোধময় হতে হলে নামময় হতে হবে।

জ্ঞানবিচার দ্বারাও বোধময় হওয়া যায়। বোধময় নামময় গুরুময় আত্মাময় ব্রহ্মময় কৃষ্ণময় রামময় মাতৃময় শিবময় আল্লামময় যা-ই শোন না কেন, একই বোধ। এই একবোধ নিয়ে সকলের সঙ্গেই চলা যায়।

ভূমাবোধে মাকে বা গুরুকে অখণ্ড বলে ধরে নিলে দেখবে সব কিছুর মধ্যে তিনিই বিরাজমান। প্রথমে অসুবিধা হলেও পরে অসুবিধা আর হয় না। সৎসঙ্গের মাধ্যমে তিনি যে কী ভাবে কাজ করেন পরে তা বোঝা যায়। সব নষ্ট হতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রেম থেকে কেউ বঞ্চিত হতে পারে না। মাকে বা গুরুকে ধরে থাকলে নরকে গেলেও সেখান থেকে তিনি টেনে তোলেনই। গুরু এত বড় আশ্বাস দিতে পারেন এই জন্য যে, তিনি সর্বত্র সব কিছুর সঙ্গে মিশে রয়েছেন। প্রতিটি ব্যক্তিরূপের মধ্যে নামও মিশে আছে। গুরু রত্নাকরকে কী রকম নিম্নতম অবস্থা থেকে তুলেছেন।

গুরুর একটি ছোট উপমা শোন। এক বাড়ি থেকে ধোপাকে একসঙ্গে অনেক কাপড় ধুতে দেওয়া হল। তার মধ্যে একটি কাপড় বেশি রকম ময়লা হয়েছে দেখে গিন্নি বললেন—এই ময়লা কাপড়টি ফর্সা হবে না, বরং এটা অন্য কাপড়ের সঙ্গে ধুতে গেলে অন্যগুলিও ফর্সা হবে না। ধোপা বলল—কোনও ভয় নেই মা, সবই পরিষ্কার করে আনব।

গুরু ঠিক এই রকম করে পরিষ্কার করে দেন সকলকেই। গুরু হলেন যেন ধোপা। তিনি শরণাগত সকলেরই চিত্তমল পরিষ্কার করে ছেড়ে দেন।

গুরুর উপমা দিতে গিয়ে একটি গল্প মনে এল, শোন।

বাংলাদেশে এক মহাপুরুষ ছিলেন অতি সহজ সরল। একজন তার ছেলেকে নিয়ে এসে মহাপুরুষকে বলল—বাবা, আমার এই ছেলেটি বড় অশান্ত। পাঁচজনে পাঁচ রকম অভিযোগ করে। কী করা যায় একটু উপদেশ দিন।

মহাপুরুষ শুধু হেসেই যান, বিশেষ কিছুই বলেন না, শুধু বলেন—ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিবারই মহাপুরুষ এই উক্তিই করেন। একদিন সহ্য করতে না-পেরে ছেলের বাবা তাঁকে বলল—আপনি তো বিশেষ কিছুই বলেন না, একই কথা বারবার বলেন। কিন্তু কোথায় আমার ছেলে তো ভাল হল না।

ছেলেটির বাবার মুখে এই কথা শুনে মহাপুরুষের চোখ দিয়ে শুধু জল পড়তে লাগল। তিনি কোনও কথাই আর সেই দিন বলেননি। সেই মহাপুরুষ ক'দিন পরে চলে গেলেন। সেই লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সেই ছেলেটি কিন্তু পরে খুব ভাল হয়ে গেল এবং পরবর্তীকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল সে। ছেলেটির বাবা পরে খুব দুঃখ করত, মহাপুরুষের কথা সে তখন বিশ্বাস করতে পারেনি বলে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মহাপুরুষের চোখ দিয়ে তখন জল পড়েছিল ভদ্রলোকের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব দেখে। তিনি ভাবছিলেন যে, তাদের একটু বিশ্বাসও দিয়ে যেতে পারলেন না। মহাপুরুষদের কথা সর্বদা সবাই মেনে নিতে পারে না। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাসে মেনে নেওয়া ছাড়াও তো কোনও উপায় নেই।

১২। ১২। ৬৯

৭৫

প্রেমের সূর্য যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তার কিরণ থাকে স্নিগ্ধ মধুর। তখন তা avail করলে পরে তার প্রখরতা সহ্য করার শক্তি জন্মায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

মধু বলে এক গোয়ালা ছিল। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠে দুধ দুইয়ে সে মাখন তুলে নিত। প্রচুর মাখন তার উঠত। পাশেব বাড়ির আরেক গোয়ালা অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠত। তার পরে সে দুধ দুইয়ে মাখন তুলতে বসত। অত দেরিতে মাখন তোলার ফলে প্রতিদিনই তার মাখন হত খুব কম। গোয়ালাটি ভাবল, তার গরুর দুধই খারাপ, সেই জন্য এত কম মাখন ওঠে।

গোয়ালাটির মা তাকে বলল—তুই মধু গোয়ালার কাছ থেকে আগে জেনে আয় তার এতবেশি মাখন কী করে হয়।

মায়ের নির্দেশ মতো গোয়ালাটি মধু গোয়ালার কাছে গিয়ে জানতে পারল যে, অতি প্রত্যুষে উঠে মাখন তুলতে হয়। এ-ই হল বেশি মাখন তোলার কৌশল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে অনেকেই ভাবে, আমাদের এখনও কেন development হল না, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে সেই গোয়ালার মতো সময়ের মূল্যবোধ তারা কেউ দেয়নি।

যে chapter একবার হয়ে গিয়েছে, তা আর ফিরে আসে না। সূর্য কি বসে থাকবে? Mail train স্টেশন থেকে ছেড়ে গেলে সেই স্টেশন থেকে train-টি আর ধরা যাবে না। সময় মতো কাজ করলে কাজের ফল ঠিক মতো পাওয়া যায়। সব কিছুর যথার্থ ব্যবহারের উপরেই জীবনে সফলতা নির্ভর করে। জড়তা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মবিমুখতা জীবনের সফলতা ও সুখশান্তির অন্তরায়। অলস ও নিষ্কর্মা যারা, তারা কোনও দিনই সুখশান্তির অধিকারী হতে পারে না। জীবনে উদ্যমশীল, সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বপরায়ণ কর্মীরাই পুরুষকারের মাধ্যমে সর্বকর্ম করে সফল হয়। তারাই সুখে থাকে।

মহৎ ব্যক্তি হল সাধারণ মানুষের কাছে আদর্শ। মহতের আদর্শ হল ঈশ্বর-আত্মা-গুরু। মহৎ আদর্শকে জীবনে অবলম্বন করে যারা অনলস ভাবে কর্ম করে তারা মহৎ হয়ে যায়। মহৎ আদর্শ অনুসরণ না-করে কোনও কর্মই সুষ্ঠু ভাবে করা যায় না। সোজা কথায়, অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করলে কর্মে কোনও দোষ থাকে না।

অহংকারে মত্ত হয়ে অভিমানে যে কর্ম করে তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। গুরুকে বা ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কর্মফল নিবেদন করে যে কর্ম করে তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয় না। কর্ম ও কর্মফল কখনও নিজের নামে রাখতেও নেই, করতেও নেই। অকর্তাবোধে এবং যন্ত্রবোধে যিনি কর্ম করেন, তিনি কর্মফলে বদ্ধ হন না। তাঁরাই মুক্তপুরুষ।

১৪। ১২। ৬৯

৭৬

আধ্যাত্মিক পথে চলতে গেলে সাম্যভাবটি বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। শুদ্ধ ভাবকে বলা হয় ঈশ্বরীয় শক্তি বা গুরুশক্তি। ভাব যেন বিকৃত না-হয় তার জন্য কতগুলি নির্দেশ মনে রাখতে হয় এবং তা পালন করতে হয়। সাম্যভাবটির উপর এই জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে ভাবের দ্বন্দ্ব যে কী ভাবে চলে, নিম্নোক্ত গল্পটির মাধ্যমে তা বুঝতে পারবে। গল্পটি মন দিয়ে শোন।

দুই ভাই ছিল। একজনের নাম হরিচরণ, আরেকজনের নাম কালীচরণ। হরির স্বভাব ছোটবেলা থেকেই খুব অস্থির ও চঞ্চল, কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমান এবং ধর্মপ্রাণ। অল্প বয়স থেকেই সে সাধুসঙ্গ করে এবং দেব-দ্বিজেও তার খুব ভক্তি। বড় হয়ে সে দীক্ষা নেয় এক বৈষ্ণব বাবাজির কাছে। সে বৈষ্ণব হল এবং বৈষ্ণবসমাজে বেশ খ্যাতিও অর্জন করল।

কালীচরণ ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির এবং একটু বোকাও ছিল। বাড়িতে কোনও ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান হলে তাও সে পালন করে একটু একটু, তবে কোনও কিছু নিয়েই সে বাড়াবাড়ি করে না। একটু তন্ময় ভাবেই সে চলে, কোনও ঝামেলাতে সে থাকতে চায় না। বাড়িতে সাধু এলে তাঁর সঙ্গ করে, কিন্তু দীক্ষা নেয় না। বাইরে তার কোনও ধর্মের আচরণও নেই।

যথাকালে দুই ভাই সংসারী হল। তাদের ছেলেপিলেও হল এবং ক্রমে ক্রমে অশান্তিও এল। বড় ভাই হরিচরণ ছোট ভাই কালীচরণের বিরুদ্ধে মামলা সাজাল। ফলে ছোট ভাইয়ের ঘরদোর যায় যায় এমন অবস্থা।

ছোট ভাইয়ের স্ত্রী স্বামীকে বলল—ছেলেপিলে নিয়ে যে একেবারে ভেসে যাব, কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

ছোট ভাইকে শেষ পর্যন্ত কোর্টে যেতে হল, কারণ তার বিরুদ্ধে শমন জারি হয়েছে। মামলার অবস্থা খুব খারাপ। বড় ভাইয়ের বউ ছোট জাকে ভালবাসত। সে এসে দেবরকে বলল—তুমি এত বোকা হলে কেন? আমার তো হাত-পা বাঁধা। তুমি রুখে দাঁড়াও। অন্তত একটু সত্যি কথা বল। ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে পথে বসিও না।

কালীচরণ বলল—বেশ, আমি তা-ই করব তবে আমাকে কিন্তু আর দোষ দিও না।

পাড়ার লোকজন বড় ভাই হরিচরণকে কালীচরণের বিরুদ্ধে আরেকটু উসকে দিল। শুনানির শেষ দিনে হাকিম কালীচরণকে ডেকে বললেন—আপনার কিছু বলবার আছে?

কালীচরণ—কী আর বলব? বললে তো সব কিছু উল্টে যাবে।

এদিকে হাকিমও ছিলেন বৈষ্ণব, এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বড় ভাই হরিচরণের জয় তো হবেই।

ছোট ভাই কালীচরণ বলল—হুজুর আমি খুব সংক্ষেপেই কয়েকটি কথা বলব, ভাল করে আপনি শুনুন। দ্বন্দ্ব-বিরোধ তো শুরু হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে মিথ্যা অনেক কিছুই জট পাকিয়েছে। সত্য ঘটনা উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না। আমি তো বোকাহাবা। মুখ যখন খুলতেই হবে তখন কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করি—কোন বৈষ্ণব ধর্মে আছে যে ধর্মাচরণের জন্য নিজের ভাই ও আত্মীয়স্বজনের সর্বস্ব কেড়ে নিতে হয়? কোন বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে এটা, তা দেখিয়ে দিন। তা যদি থাকে তবে বৈষ্ণব শাস্ত্র মিথ্যা—এই প্রমাণিত হবে। শাস্ত্রে আছে সর্বভূতে প্রীতিভাব রাখার কথা, বিষয়ে অনাসক্ত থাকার কথা, মান-অভিমান পরিত্যাগ করার কথা। তা-ই যদি হয় তবে আমার দাদা বৈষ্ণব হয়েও তার ভাইয়ের সব সম্পত্তি কেড়ে নিতে যাচ্ছে। তাহলে আপনি ঘোষণা করে দিন, দাদা বৈষ্ণব নয়। সে যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হয় তাহলে তার মধ্যে সর্বভূতে প্রীতি থাকতে হবে এবং তাকে নিরভিমান ও অনাসক্ত হতে হবে। প্রকৃত বৈষ্ণব হলে এ সবে কোনও লোভ থাকবে না। বৈষ্ণব না-হলে তার কাজ ঠিকই আছে। মামলা প্রভৃতি যা করছে সবই সে করতে পারে, তা-ই সে করুক।

হাকিম এবার মহাবিপদে পড়লেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে তিনি কী করে বাঁচাবেন!

ছোট ভাই এ কথা বলে তো চলে গেল। হাকিম এক মাসের মধ্যেও রায় লিখে উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে লিখতে হল, প্রকৃত বৈষ্ণবের এ সব করা উচিত নয়। ছোট ভাইকে আদালত থেকে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল। এমনকী বড় ভাইয়ের সম্পত্তিও ছোট ভাইকে দেওয়া হল। রাতে ছোট ভাইয়ের কাছে এসে বড় বউ চুপিচুপি বলল—আমি খুব খুশি হয়েছি। যে ধার্মিক তাকে ভগবান রক্ষা করেন ঠিকই।

ছোট ভাই বলল—ধর্ম শুধু ধার্মিককেই রক্ষা করে না, অধার্মিককেও রক্ষা করে।

ছোট ভাই অর্ধেক সম্পত্তি বড় ভাইকে ফিরিয়ে দিল।

এই ব্যাপারে বড় ভাই খুব আঘাত পেল। পরে সন্ন্যাসী হয়ে সে গৃহত্যাগ করল। বহুদিন পরে প্রকৃত বৈষ্ণব হয়ে একদিন সে সংসারে ফিরে এল। সে এসে দেখল তার আগেই ছোটভাই কালীচরণ সিদ্ধিলাভ করেছে।

গল্পটি থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান নিয়েই অনেকে বেশি মাথা ঘামায়। আসলে ধর্ম হল ভিতরের জিনিস। বাইরের লোক টেরই পাবে না, এমনভাবে ধর্ম আচরণ করতে হয়। সাধনা হল অন্তরের ব্যাপার।

আসল ধর্ম হল right action। সৎ কর্ম বিহীন যে, সে পশুর মতন। সৎ কর্ম হল অন্তরে-বাইরে সমানভাবটি রেখে জীবনে কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধরে জীবনে

চলা। ঈশ্বর কোনও ব্যক্তিতে বা গুণেতে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সমষ্টি গুণ, শক্তি ও বোধের অধিষ্ঠান। অখণ্ড চৈতন্য হল ঈশ্বর। অখণ্ড চৈতন্য যখন দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মাধ্যমে অথবা কোনও রূপের বা আধারের মাধ্যমে প্রকাশ হয় তখন তাকে গুণ, শক্তি বা প্রকৃতি বলা হয়। এই অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যকে আধ্যাত্মিক অর্থে মা বা গুরু বলা হয়। যখন এই গুণ বা শক্তি united হয় শুদ্ধ ভাবের মাধ্যমে তখন তাকে অখণ্ড সত্তা, চৈতন্যসত্তা বা ব্রহ্ম-আত্মা বলা হয়। এই গুণগুলি বাড়াতে হলে কর্ম ছাড়া উপায় নেই। কর্মহীন জীবন হল ধর্মহীন জীবন।

ঈশ্বরকে ধরে সর্বকর্ম করতে হয়। তাই আমাদের দেশে কোথাও কর্মত্যাগের কথা বলা হয়নি। কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ঈশ্বরযুক্ত কর্মই হল ধর্ম। এই জন্যই সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান কর্মের মাধ্যম ছাড়া হতে পারে না। কর্মের ব্যবহারগুলি না-ধরতে পারলে হয় না। কাজেই যুগে যুগে এগুলি যাঁরা ধরিয়ে দিয়ে যান তাঁদেরই বলা হয় গুরু বা মহাপুরুষ।

১৯। ১২। ৬৯

৭৭

গুরু চতুর্বিধ—স্থূল গুরু, সূক্ষ্ম গুরু, সূক্ষ্মতর গুরু এবং সূক্ষ্মতম গুরু। এই সূক্ষ্মতম গুরু হলেন অখণ্ড চৈতন্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান বা অখণ্ড মহাপ্রাণ। বেশির ভাগ লোকই নিজেকে পৃথক ভেবে, খণ্ড ভেবে খণ্ড প্রাণের মধ্যেই থাকে। তাদের বুঝতে হবে এবং স্মরণ রাখতে হবে যে, এই খণ্ড প্রাণ অখণ্ড মহাপ্রাণের মধ্যেই বিরাজমান। অখণ্ডের বাইরে যাবার কারও উপায় নেই। খণ্ড নিয়ে চললেও সকলের অধিষ্ঠান অখণ্ডের মধ্যেই। পুনঃপুনঃ সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের মাধ্যমে ক্রমশ অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের ফলে জীবনে যে কীরূপ রূপান্তর ঘটে সে বিষয়ে একটি ঘটনা বলছি শোন।

কোনও এক সাধু মহাত্মার কাছে প্রায়ই বহু ভক্তশিষ্য আসে। একদিন এক ভক্ত তার বন্ধুকে নিয়ে এল মহাত্মার কাছে। সেই বন্ধুটিকে কেউই পছন্দ করত না, কারণ তার স্বভাব অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং সে গুন্ডাপ্রকৃতির লোক ছিল। প্রথম দিনই সে মহাত্মাকে খুব কটু কথা বলে অপমান করল। মহাত্মা কিন্তু তাকে কিছুই বললেন না, শুধু একটু হাসলেন। তাঁর ভক্তরা এই গুন্ডাপ্রকৃতির লোকটির ব্যবহারে খুব বিরক্ত হল। মহাত্মা একটু পরেই লোকটির সামনে গিয়ে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তার ফলে ভক্তরা আরও চটে গেল এবং যে ভক্তটি তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল সেও খুব লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হল।

গুন্ডাপ্রকৃতির লোকটি কিন্তু মহাত্মার এই ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গেল। এই রকম সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পরেই তার মনে ভাবান্তর হল। মহাত্মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—

নারায়ণ তুমি তো ঠিকই আছ। এর মধ্যে কাকতালীয় একটি ঘটনা ঘটে গেল। এই লোকটি ছোটবেলায় খুব সৎ প্রকৃতির ছিল এবং তার দিদিমা তাকে নারায়ণ বলেই ডাকতেন। বড় হবার পরে সঙ্গদোষে তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎ এতকাল পরে মহাত্মার মুখে 'নারায়ণ' সম্বোধনটি তার অন্তর স্পর্শ করল। তার ছোটবেলার কথা স্মরণ হল এবং মনটা দুর্বল হয়ে গেল। তার উদ্ধতভাব চলে গিয়ে শান্তভাব এল। লোকটি সাধু মহাত্মার কথা খুব মন দিয়ে শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে লোকটি মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি আমাকে 'ঠিকই আছ' এই কথাটি বললেন কেন আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমি তো জীবনভর খারাপ কাজই করে এসেছি।

তার উত্তরে মহাত্মা বললেন—তোমার ভিতরে যে দৃঢ় বিশ্বাস দেখলাম তা অত্যন্ত দুর্লভ। এই বিশ্বাসটি যে কাজেই লাগাবে তাতেই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। তোমার এই বিশ্বাস নিয়ে যে কাজ তুমি করেছ, তার ফল তুমি সেই রকমই পেয়েছ। আমিও ঠিক এই রকম বিশ্বাস নিয়ে আমার বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে এই অবস্থায় এসেছি। আমাদের দু'জনের means-টা একই রকম আছে, শুধু গন্তব্যস্থল ভিন্ন।

লোকটি সেই দিন চলে গেল। কয়েকদিন পরে নদীর পার দিয়ে সে একটি কুকাজ করতে যাচ্ছিল। মহাত্মাও ঠিক সেই সময়ে নদীতে গিয়েছিলেন স্নান করতে। মহাত্মা তাকে দেখে বললেন—নারায়ণ তোমার জয় হোক। লোকটি তার কাজে জয়লাভ করল। তখন লোকটি ভাবল, সাধু আমার শত্রু নয়। সে যখন আমার মঙ্গল ও জয় কামনা করে তখন সে নিশ্চয়ই আমার মিত্র। যাদের আমি এতদিন মিত্র বলে ভেবে এসেছি তারাও তো আমার জয়লাভের জন্য কখনও প্রার্থনা করে না বরং উল্টোটিই করে। সেই দিন থেকে মহাত্মার প্রতি লোকটির মন একটু নরম হল এবং সময় পেলে সে মাঝে মাঝে তাঁব কাছে যাতায়াত করতে শুরু করল।

এই ভাবে দিন যায়। কয়েকদিন্ পরে দুষ্কর্ম করতে গিয়ে লোকটি সাংঘাতিক রকম বিপদে পড়ল। তার টাকাপয়সা তো সব গেলই, তা ছাড়া জীবন বাঁচাতেই সে হিমশিম খেতে লাগল। এই দুর্দিনে তার সঙ্গীসাথিরাও সব দূরে সরে গেল। এই চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে সে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পেল না। আত্মহত্যা করার পূর্বে তার সেই মহাত্মার কথা মনে পড়ল। সে মহাত্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

মহাত্মা তাকে দেখেই বললেন—তোমার তো এখন সময় অত্যন্ত ভাল। যদি উল্টো দিকে ঘুরে যাও তবে তোমার চরম মঙ্গল হবে। জীবনে যে শক্তির বা আত্মনির্ভরতার উপর ভরসা করে তুমি অনেক কাজ করেছ সেই ধারাটি একটু ঘুরিয়ে দিলে আরেক রকম জয়লাভ তোমার হবে। তুমি শক্তি নিয়েই জন্মেছ। সেই শক্তির উপর নির্ভর করে এতদিন তোমার বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করেছ, এবার তোমার সেই বৃত্তির দিকটি শুধু ফিরিয়ে আমার বৃত্তির দিকে নিয়ে এস। তাহলেই অন্য রকম জয়লাভ হবে। আজ

তো তুমি চরম পরীক্ষার জন্যই নেমে এসেছ। দেহ তুমি নষ্ট করতে পার ঠিকই, কিন্তু আরেকটি দেহ তুমি নূতন করে বানাতে পারবে না। তোমার দেহের পরিবর্তন হবে ঠিকই, কারণ তুমি খুবই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছ।

এই বলে মহাত্মা তাকে একটি বেল গাছতলায় নিয়ে গিয়ে বললেন—তুমি তো আজ পর্যন্ত অনেক কাজই করেছ তোমার শক্তি দিয়ে, পারনি শুধু সৎ বৃত্তি দ্বারা কোনও কাজ করতে। দেহ শেষ করতে দৃঢ় সংকল্প করেছ, তা তুমি পারবে তবে তার আগে তোমায় আরেকটি কাজ করতে হবে। তুমি আজ আরেকটি খুন কর। তোমার যা শক্তি আছে তার দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই পারবে। আজ তোমার অহংকার বৃত্তিকে খুন কর। স্থির হয়ে তুমি বস।

মহাত্মা একটি আসনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন, আরেকটি আসনে বসে সেই লোকটিও ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল। তিন-চার ঘণ্টা পার হয়ে গেল। লোকটি চোখ খুলে দেখল মহাত্মা ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। একভাবে থাকবার ফলে তার দেহে ও মনে একটি প্রশান্তির ভাব এসেছে। তার মনে কুবৃত্তির আর কোনও তাড়নাই নেই। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে গেল। এই ভাবে রাত ভোর হয়ে গেল। দু'জনেই ধ্যানস্থ।

বেলা যখন দশটা তখন মহাত্মার ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি দেখলেন তখনও লোকটি সমাধিমগ্ন হয়ে বসে আছে। লোকটির মলিনতা বা কালিমা সব ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গিয়েছে। মহাত্মা আসন থেকে উঠে লোকটির ধ্যান ভাঙালেন। তারপর তিনি তাকে বললেন—আজ থেকে তুমি প্রকৃত নারায়ণ হয়ে গিয়েছ। তখন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

গল্পটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মহাত্মার প্রভাবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার জন্যই গুন্ডাপ্রকৃতির অসৎ লোকটি আজ সাধু মহাত্মাতে পরিণত হল। এই গল্পটি আধ্যাত্মিক পথে যারা চলেছে শুধু তাদের জন্যই বলা হয়নি, সামাজিক অবস্থার মধ্যে যারা আছে তাদের জন্যও বলা হয়েছে।

সত্য প্রকাশের অবলম্বন হল বাক্। বাকের মাধ্যমেই সত্য প্রকাশ হয়। বোধে যে অনুভূতি হয় তাও প্রকাশ পায় বাকের সাহায্যেই। সেই বাকের দ্বারা আবার আরেকজন অনুপ্রাণিত হয়। সত্যবাক্ই হল গুরুমূর্তি। কেন্দ্র থেকে উঠে বৃত্তাকারে এসে আবার কেন্দ্রেই meet করে। বাক্ হল তেজের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি। পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে তেজের কথা যা বলা হয় তা অভিব্যক্ত হয় বাক্ দিয়ে। বাক্ সত্যের মহিমা ও স্বরূপের মহিমা প্রকাশ করে। রজ-তমোযোগে বাক্ কলুষিত হয়ে মিথ্যাকেও প্রকাশিত করে। মিথ্যাবাক্‌কে সত্যবাকে পরিণত করতে পারলেই পরাসিদ্ধি লাভ হয়।

৬। ১। ৭০

চতুর্থ অধ্যায়

৭৮

ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি অনেক রকম ভাবে আমাদের মধ্যে হতে পারে—বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে প্রকাশ হতে পারে, প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশ হতে পারে, নিষ্কাম কর্মের রূপ নিয়েও প্রকাশ হতে পারে। চলার পথে কত জিনিস আসতে পারে তার হিসাব নেই। আপনিই আসে, আপনিই চলে যায় পার হয়ে।

ডাক্তার জোর করে ওষুধ খাওয়ান রোগীকে, কারণ সে ওষুধ খেতে চায় না বলে। ভগবানের কথাও সর্বদা আমাদের ভাল লাগে না। জোর করে সৎসঙ্গের মাধ্যমে তিনি আমাদের দিয়ে জপিয়ে নেন। জপিয়ে নেওয়া হল তাঁর প্রথম grace। এই ভাবে একটু একটু করে ঈশ্বরীয় ভাব দিয়ে রাখেন। তার পরে দেখা যায় শয়নে-স্বপনে সে সব ভেসে আসছে সারাদিন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন।

এক ভদ্রলোক ধর্মপথে চলতে ভালবাসেন, শাস্ত্রও পড়েন। তার বন্ধুবান্ধবরা এই নিয়ে তাকে ঠাট্টাও করে। বন্ধুরা তাকে বিদ্রূপ করে বলে—তুমি বড় দুর্বল, টাকাপয়সা তোমার আছে অথচ এ সব কী দুর্বলতা! সময় সময় ঠাট্টার মাত্রা এত বেড়ে যায় যে ভদ্রলোকের চোখে জল এসে যায়। এই ভাবে কিছুদিন পরে যে সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ঠাট্টা করত সে বলল—পৃথিবীর লোকে যে 'ধর্ম, ধর্ম' করে ক্ষেপেছে তাও তো একটি ব্যাধি।

ভদ্রলোক—ব্যাধি তো ঠিকই। এই ব্যাধি তোমারও তো একদিন হতে পারে। ব্যাধি যে কখন কী রকম ভাবে infected হয় তা বলা যায় না।

বন্ধু—আমার হবে না। পরিবারের কারওকেই ধর্মের কাছাকাছি যেতে দিই না। তবুও সুযোগ পেলেই ভক্ত ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে ধর্মের কথা তাদের শোনান।

একদিন বন্ধুটি এসে মনখারাপ করে বলল—বাড়িতে অসুখবিসুখ, ডাক্তারও দেখিয়েছি, কিন্তু রোগ সারছে না। আরেক বন্ধু এসে হঠাৎ হাজির হল। সে এক মহাত্মার কতগুলি গল্প শোনাল সেই বন্ধুটিকে।

এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর বন্ধুটি এসে একদিন ভদ্রলোককে বলল—তোমরা তো ভগবানের কথা অনেক বলেছ, কাল তোমাদের সেই ভগবানের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছে। ভগবান একেবারে স্থূল রূপ নিয়ে এসে আমার সঙ্গে দাবা খেলেছেন। তার চেহারা ভারী সুন্দর আর গায়ে কী রকম অদ্ভুত সুগন্ধ।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের চেহারাটি কেমন? বন্ধু বলল—এই যেমন দেওয়ালে কৃষ্ণের ছবিটি আছে, এই রকম চেহারা। ভারী সুন্দর দাবা খেলেন।

কয়েকদিন পর বন্ধুটি ভদ্রলোককে বলল—কাল রাতেও আমি স্বপ্নে ভগবানের সঙ্গে দাবা খেলেছি। আবার একদিন এসে বলল—ভগবান আমাকে বড় সুন্দর সুন্দর দাবার চালও দেখিয়ে দিয়েছেন।

একসময় দেখা গেল যে, সেই বন্ধুটি খুব বড় দাবা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। দাবা খেলার প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে আর হারাতে পারত না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্প থেকে এটাই বোঝা যায়, ঈশ্বরীয় কথা ভদ্রলোকের কাছ থেকে মাঝে মাঝে শোনবার ফলে তা তার বন্ধুর স্মৃতিতে থেকে যায়। সেগুলিই তার ভিতরে কাজ করত। শেষ পর্যন্ত সে সত্যি সত্যিই ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিটি ছোঁয়াচে রোগের মতো, একবার ধরলে ছাড়ে না।

১। ২। ৭০

৭৯

গুরু এক অর্থে universal, সীমাবদ্ধ করলেই লঘু। গুরু হলেন অনন্ত অসীমের ideal অর্থাৎ মূর্ত বিগ্রহ। মনে যখন যে রূপ উপস্থিত হয়, সে সবই তাঁর রূপ বলে গ্রহণ করলে মন সহজেই বোধময়সত্তায় রূপায়িত হয়ে যায়। বোধময়সত্তা কেবল জ্ঞানমূর্তি, আত্মার যথার্থ স্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ বা ইষ্ট, গুরু ও মাতার স্বরূপ।

মহাপুরুষরা শিষ্যকে যার যেমন প্রকৃতি সেই অনুযায়ী সাধনার নির্দেশ দেন। ঋষি-যুগে খুব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সব কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেই যুগে গুরু শিষ্যকে প্রথমেই বেশি কিছু দিতেন না। শিষ্য এসে গুরুর কাছে সত্যের অনুশাসন প্রার্থনা করলে কোনও কিছু উপদেশ বা নির্দেশ না-দিয়ে, কোনও নির্দিষ্ট কাজ করতে পাঠিয়ে দিতেন। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পরে একদিন হয়ত নিজেই তাকে ডেকে পাঠাতেন। শিষ্য আসবার পরে তাকে, 'তুমিই সেই ব্রহ্ম'—এই বলে ছেড়ে দিতেন এবং বারবার তা স্মরণ করার অভ্যাস করতে বলতেন। শিষ্য চলে যেত। নিজের মনে বারবার শিষ্য খুঁজত ও বিচার করতে থাকত। এই ভাবে নির্দেশ অনুযায়ী খুঁজতে খুঁজতে এবং একই কথা স্মরণ করতে করতে তার মনে হত যে, স্থূল বস্তু অন্নই ব্রহ্ম। এই রকম ভাবতে ভাবতে একদিন গুরুর কাছে এসে শিষ্য বলল—অন্নই ব্রহ্ম।

গুরু বললেন—আরও খোঁজ।

শিষ্য বহু চিন্তা করে অনেকদিন পরে গুরুর কাছে আবার এসে বলল—অন্নের ভিতরে যে শক্তি ও প্রাণ আছে, যা সবকে ধরে রেখেছে, তা-ই ব্রহ্ম।

গুরু—আরও আছে, খুঁজে দেখ।

শিষ্য চলে যায় এবং আবার চেষ্টা করতে থাকে খুঁজে বার করার জন্য। খুঁজতে খুঁজতে তার মনে হল, মন ছাড়া প্রাণকে ধরে রাখা যায় না, সুতরাং মনই ব্রহ্ম। গুরুকে এসে সে বলল—গুরুদেব এবার বুঝেছি, মনই ব্রহ্ম।

গুরু—যথার্থই তোমার সাধু প্রচেষ্টা, তুমি মহৎ। তোমার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আছে। তুমি আরও খুঁজে দেখ, এর পরে আরও আছে। শিষ্য আবার চিন্তা করতে লাগল। বহুদিন চিন্তা করার পরে স্থির করল যে, বুদ্ধিবিজ্ঞান মনকে নির্দেশ দেয়, সুতরাং বুদ্ধিবিজ্ঞানই ব্রহ্ম। গুরুদেবকে তখন সে জানাল—গুরুদেব বুদ্ধিবিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এ-ই জেনেছি। গুরু খুশি হয়ে বললেন—ঠিক বলেছ, তবে আরও আছে, খুঁজে দেখ।

এবার শিষ্য বিব্রত হল। অনেক খুঁজে কিছু স্থির করতে না-পেরে সে গুরুদেবকে বলল—কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না তো গুরুদেব।

গুরু—নিশ্চয়ই তুমি পারবে, চেষ্টা কর।

ধাপে ধাপে গুরু কী ভাবে শিষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা-ই এখানে লক্ষণীয়। গুরুর কথা শুনে শিষ্য চলে যায়।

শিষ্য কিছুদিন পরে প্রসন্ন চিত্তে গুরুদেবকে এসে বলল—গুরুদেব, এবার যে সত্যের প্রকাশ হয়েছে তা নিবেদন করতে অনুমতি দিন।

গুরু—বল।

শিষ্য—আপনিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, আপনিই সেই আনন্দস্বরূপ, যিনি সর্ববস্তুতে সমান ভাবে মিশে আছেন। শিষ্য এখানে নিজেকে ব্রহ্ম বলে উল্লেখ না-করে গুরুকেই ব্রহ্ম বলল। আবার যখন গুরু আনন্দস্বরূপ হয়ে সকলের মধ্যেই মিশে আছেন, তখনও যে গুরু অভেদ—তা-ও প্রমাণিত হয়ে যায়। শিষ্যের উক্তির মধ্যে কত সুন্দর, বিনীত ও নম্র ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা-ই লক্ষণীয় বিষয়। শিষ্যের কথা শুনে গুরু আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এইরূপ ছিল শ্রুতিযুগের সাধনা। কালক্রমে তা বিকৃত রূপ নিয়েছে। সত্যপথের সাধকদের প্রতি নির্দেশ হল—প্রথমেই ইষ্টকে, গুরুকে, মাতাকে বা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখ এবং পরে নিজেকে রাখ। মা আসেন মায়ের কাছে, গুরু আসেন গুরুর কাছে। কারণ মা ও গুরু শিষ্যের সঙ্গে অভেদ। পৃথক পৃথক দেখালেও পৃথক কখনও হতে পারেন না, কারণ পরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

৩। ২। ৭০

৮০

ঋষিরা কী ভাবে ধৈর্য সহকারে শিষ্যদের তৈরি করতেন সে বিষয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনি শোন।

গৌতম ঋষির পুত্র অরুণ ঋষি। অরুণ অল্পবয়সে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলে বেড়াত। পিতার নির্দেশ কিছুই মানত না। তার পিতা খুব চিন্তিত হলেন। ঋষির বংশে জন্মে যদি কেউ ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যেত, তবে তাকে বলা হত ব্রহ্মবন্ধু। কোনও পবিত্র কাজে তারা আর আসতে পারত না। সুতরাং অরুণের এই অবস্থা দেখে গৌতম ঋষি অন্যান্য

ঋষিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, অরুণকে সৎপথে চালিত করার জন্য কী ব্যবস্থা করা যায় এই বিষয়ে।

গৌতম ঋষির একজন ঋষিবন্ধু পরামর্শ দিলেন অরুণকে আরেকজন নামী ঋষির কাছে নিয়ে যাবার জন্য। কয়েকদিন পরে গৌতম ঋষি এবং তাঁর ঋষিবন্ধু অরুণকে এক বড় নামী ঋষির কাছে নিয়ে গেলেন। সেই ঋষি অরুণকে একটি কাজের ভার দিলেন। সেই কাজটি অরুণের খুব প্রিয় কাজ ছিল। নূতন পরিবেশে নূতন কাজে লেগে অরুণের খুব উন্নতি হল। একদিন সেই ঋষি সব শিষ্যদের আহ্বান করে একটি গল্প বলতে লাগলেন।

অরুণের গল্পটি খুবই ভাল লাগছিল। কিন্তু ঋষি পুরো গল্পটি অরুণকে শোনালেন না। ছল করে তিনি তাকে অন্য ঋষির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অরুণ সেই ঋষির কাছ থেকে ফিরে এসে অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে গল্পের বাকি অংশটি শোনবার জন্য অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও শুনতে পেল না। কারণ ঋষি অন্যান্য শিষ্যদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন পুরো গল্পটি যেন অরুণকে না-বলা হয়। শিষ্যরা অরুণকে বলেছিল যে, তাদেরও গল্পের বাকি অংশ শোনা হয়নি। তারাও খুব উৎসুক হয়ে আছে বাকি অংশটি শোনবার জন্য।

অন্যান্য শিষ্যরা একদিন অরুণকে পাঠাল ঋষির কাছে গল্পের বাকি অংশটি শোনবার জন্য। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসিত হয়ে ঋষি আবার কিছু অংশ বলে চুপ করে গেলেন। অরুণ ও অন্যান্য শিষ্যদের ঔৎসুক্য শুধু বাড়িয়ে দিলেন এবং আবার একদিন ঔৎসুক্য চাপতে না-পেরে তারা ঋষিকে এসে অনুরোধ করল গল্পের বাকি অংশটি বলবার জন্য।

এই রকম ভাবে বারেবারে ঋষি অরুণকে গল্পের কিছু অংশ বলেন এবং আবার পরে বলবেন এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় দেন। এই ভাবে অরুণের মনে বারবার জিজ্ঞাসা জাগে এবং বারবার ঋষির কাছে যাওয়া শুরু করে। অধ্যাত্মবিদ্যা জিজ্ঞাসা দিয়েই শুরু হয়। এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে অরুণকে তিনি পথে আনলেন। পরবর্তীকালে অরুণ এক বিরাট ঋষি হয়েছিল।

জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই হয় জ্ঞানের সাধন ও অন্বেষণ এবং পরিণামে জ্ঞানস্বরূপের দর্শন ও অনুভূতি সুসিদ্ধ হয়। আলোচ্য কাহিনিটি তারই প্রমাণ।

৩। ২। ৭০

৮১

গুরুকে সর্বদা সঙ্গে পেলে আর ভয় থাকে না। যিনি পূর্ণ জ্ঞানের বিশ্বাসটি ধরিয়ে দিতে পারেন, তিনিই হলেন সদ্‌গুরু। এই রকম জ্ঞানকেই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বলা হয়েছে। গুরুর দায়িত্ব কম নয়। শিষ্যকে মুক্ত না-করা পর্যন্ত গুরুর দায়িত্বভার শেষ হয় না।

কী ভাবে যে শিষ্যের সঙ্গে গুরুর সম্বন্ধ থেকে যায় তা বুঝবার সুবিধার জন্য একটি গল্প বলছি। গল্পটি শুনলে তোমাদের কিছুটা ধারণা হবে। গল্পটি মন দিয়ে শোন।

এক সাধক একবার একটি বক পুষেছিলেন। বককে তিনি নিজের হাতে খাওয়াতেন এবং খুব যত্ন করতেন। একজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন—বকটির সঙ্গে আমার অনেক জন্মের যোগাযোগ ছিল। এক জন্মে ও মানুষ ছিল, কর্মদোষে বক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ থাকাকালীন ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল। তখন লোকটি দর্জিগিরি করত। আমার কাছে দীক্ষা নিয়ে নামও করত, কিন্তু বড় লোভী ছিল সে। রাজপরিবারে কাজ পেয়ে বহু টাকাপয়সা চুরি করে শেষ জীবনে খুব কষ্ট পেল। ফলে তার ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস এল। পরের জীবনে সে কুকুর হয়ে জন্মাল। চিনতে পেরে তখন ওর পিছনে খাটলাম। কিছুদিন পরে উধাও হল। অনেকদিন পরে আবার ওর সঙ্গে দেখা হল। তখন তার শরীরে নানা রকম রোগ, কাছে গেলেই কামড়ে দিতে চাইত। আরও কয়েকজন্ম পার হয়ে এসেছে—এবার বক হয়ে এল সে। ওকে আমার ওঠাতেই হবে। সেই জন্য বারবার আমাকে হয়ত আসতে হবে। ওকে না-তোলা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—কী ভাবে সাধুসন্তের সঙ্গে যে সবার যোগাযোগ হয় তা এই গল্পটি থেকে বোঝা যায়। Individual perfection হলেও রেহাই নেই। অন্যের জন্যও অনেক suffer করতে হয়। Divinity-র আরও chapter আছে যেখানে অপরের ভাল-মন্দের জন্য পরোয়া করতে নেই। অনেকে দীক্ষা দিতে চায় না, কারণ শিষ্যের উদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত গুরুর রেহাই নেই। আবার Divinity-র কতগুলি unit আছে—তাঁরা guidance, help, relief unconditionally দিয়ে যান। তাঁদের কোনও binding নেই, তবে তা খুবই rare।

যাঁরা দীক্ষা দেন তাঁরা appointed হয়ে আসেন। সাধারণত যে-ভাবে দীক্ষার কথা শোনা যায় তা দীক্ষা নয়, তা শিক্ষা। Divine শিক্ষা দিতে আসেন বিভিন্ন গুরুমূর্তির রূপে।

১৭। ২। ৭০

৮২

যিনি সব দিতে পারেন তিনিই তো যথার্থ গুরু। যে ভক্ত নিজে কিছু রাখে না অথচ তার মধ্যে সবই অবিকৃত ভাবে থাকে এ রকম আধার পাওয়া বড় মুস্কিল। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প শোন।

এক জ্ঞানী সাধক আরেকজন সাধককে একদিন প্রশ্ন করছেন—তোমার ভিতরে যে-সব সাত্ত্বিক বিকার হয় এবং দেহে নানা রকম পরিবর্তন হয় এগুলি কী করে, কী ভাবে সম্ভব?

জ্ঞানী সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ভক্ত সাধক বললেন—আমার কী হয় তা তো আমি জানি না। কেন যে আমার দেহে এ রকম হয় তাও তো আমি কিছুই জানি না, আমার গুরু জানেন।

এই উত্তর শুনে জ্ঞানী সাধকটি আরও অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তখন তার গুরুর কাছে গিয়ে ভক্ত সাধকটির প্রসঙ্গে বললেন। এই ভক্ত সাধকের গুরুতাদাত্ম্যভাব প্রসঙ্গ শুনে গুরুও মুগ্ধ হলেন। তিনি ভক্ত সাধককে দেখবার জন্য তার কাছে গেলেন এবং তাকে আরও বড় মনে করে প্রণাম করলেন। ভক্ত সাধকও গুরুকে প্রণাম করলেন।

ভক্ত সাধক গুরুকে প্রণাম করছেন আবার গুরুও ভক্ত সাধককে প্রণাম করছেন— জ্ঞানী সাধক তো দু'জনের এই অবস্থা দেখে আরও অবাক হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—জ্ঞান ও ভক্তি সাধনা ক্রম হিসাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবেই প্রথমে আরম্ভ হয়। উভয়ের পরিণাম ও লক্ষ্য অভিন্ন। সাধনকালে জ্ঞানীর লক্ষণ ও ভক্তের লক্ষণের মধ্যে আপাতমনোরম যে পার্থক্য বা ভেদ দৃষ্ট হয় তা কেবল অন্তরের ভাবশুদ্ধির মান অনুসারেই হয়ে থাকে। সাধনার মাধ্যমে অন্তরের ভাব শুদ্ধ হলে উভয়েরই ইষ্টতাদাত্ম্য হয়। ইষ্টতাদাত্ম্য হলে আর পরস্পরের মধ্যে ভেদদৃষ্টি বা পার্থক্য থাকে না। তখন উভয়ের মধ্যেই দিব্যভাবের অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

সাধনবিজ্ঞান বহুমুখী, মতপথ বহুবিধ। মানুষের রুচি, যোগ্যতা ও সংস্কার অনুসারে যার যে মতপথ ভাল লাগে সে সেই মতপথই অনুসরণ করে। সাধক অবস্থায় পূর্ণ উপলব্ধির অভাবে পরস্পরের মধ্যে অজ্ঞানবশত ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সমান ভাবের আদান-প্রদান নাও হতে পারে। এ বিষয়ে সদ্‌গুরুই সচেতন করে দেন সবাইকে। সব ভাব সবার জন্য নয়। ভাব অনুসারে হয় মানুষের সাধন ও সিদ্ধি। সর্বভাববোধের উর্ধ্বে হল সকলের নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অমৃতস্বরূপ। জ্ঞানসাধনার চরমে গিয়ে জ্ঞানী ভক্ত হয়ে যান এবং ভক্তিসাধনার চরমে গিয়ে ভক্ত জ্ঞানী হয়ে যান।

মূলত জ্ঞান আর ভক্তি এক তত্ত্বেরই দ্বিবিধ নাম। সুতরাং তত্ত্বানুভূতি প্রকাশের পূর্বে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ থাকে, তত্ত্বানুভূতি লাভ হলে ভেদ বা পার্থক্য থাকে না। তখন কেবল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থাকে।

এই গল্পটি থেকে বোঝা যায় যে, অধ্যাত্মপথে আত্মসমর্পণ যদি ঠিক মতো হয়ে যায় তবে নিজের আর কিছুই করার থাকে না। কিছু না-থাকার ফলে ব্যবহারদোষও আসে না, কারণ সবই তো গুরুকে বা ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে গুরু, ঈশ্বর তার মধ্যে কাজ করতে থাকেন। সে কিছুই করে না। তবে যে ভক্ত নিজে কিছু রাখে না অথচ তার মধ্যে সবই অবিকৃত ভাবে থাকে এ রকম আধার পাওয়া মুস্কিল। যেমন তবিলদারি মায়ের হাতে।

আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান শিবের আবিষ্কার। তিনি নিত্যকালের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত। নিজেকে বিলিয়ে দেবার শিক্ষা তাঁর অবদান, আবার আদ্যাশক্তি মাতারও এই অবদান। শিব বা আদ্যাশক্তি পুরুষ বা নারী নন। উভয়ই এক, এক উপাদানে গড়া। এক অঙ্গের মধ্যে পায়ে আঘাত লাগলে বা মাথায় আঘাত লাগলে যেমন বোধ একজনেরই হয়।

ভেদ হয় কার্যে বা প্রকাশে। মূল কারণকে ভাব বা আনন্দ বলা হয়। আনন্দ থেকে সব সৃষ্ট। আনন্দ ও হৃদয়ের একই অর্থ। আনন্দকে তাই মা বলা হয়। আনন্দই সব সৃষ্টির মূলে। তা-ই হল প্রণব, মাতা, গুরু ও হৃদয়। এই হৃদয়ই হল কেন্দ্র। এটা মূলের কথা, ফলের কথা নয়।

গুরু ছাড়া জ্ঞান প্রকাশ হয় না। গুরু মানে essence, কোনও ব্যক্তি নন। ব্যক্তির মধ্যে সব বস্তু রয়েছে, সত্তাশক্তির প্রকাশ রয়েছে। শক্তি হল কর্তা-করণ-কর্ম এবং কেন্দ্র হল সত্তা। মানুষের বুদ্ধি পর্যন্ত সবই মায়ের। এই দেহের সবটাই চিতিমাতার বা গুরুর। বুদ্ধি পর্যন্ত মায়ের বা গুরুর অধীন—এই ভাব বা বিশ্বাস দৃঢ় হলে দ্বন্দ্ব ও বিকার আর থাকে না। যে নাম এই অবস্থা আনতে পারে সেই নামের কাছে সমর্পণ করতে হয়। নাম হল শব্দ, শব্দই বোধ। আবার শব্দই গুরু বা মাতা। শব্দ, গুরু, মাতা বা বোধ সম অর্থবোধক।

মহাপুরুষমাত্রই গুরুর বা ভগবানের প্রকাশ। দেবদেবীগণও গুরুর প্রকাশ। গুরুকে পূজা করলে পৃথক ভাবে অন্য কোনও দেবতার পূজা আর করতে হয় না। সকলে তাঁকেই স্তবস্তুতি করে। সকলে তাঁর সাহায্যেই এগিয়ে চলেছে। ছোট থেকে সবাই বড় হয় তাঁরই সাহায্যে, তাঁরই করুণায়। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই সবাই আছে এবং তাঁর কাছ থেকেই চেতনা পাচ্ছে। গুরুর সঙ্গে অন্য কারওর তুলনা করতে নেই। তাহলে তাঁর কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। গুরুকে অন্তরে-বাইরে সর্বস্তরের মধ্যে মানতে হয়। মনের দ্বন্দ্ব হল ভাল বা মন্দ। একে বিচার বলে না। বিচার হল—সবই তুমি, এই ভাবে সব কিছুকে ভগবৎ বোধে গ্রহণ করা। বিচারক একজনই। তিনি হলেন আত্মা, গুরু বা ব্রহ্ম। বিচারের অর্থ হল, তাঁর মধ্যে বিচরণ করা, সব কিছুকেই নিত্যবোধে নেওয়া।

৪। ৩। ৭০

৮৩

সর্বক্ষণ সর্বকাজে, সর্বচিন্তায় মাকে ধরে চললে কাজে শ্রান্তিক্লান্তি, ভ্রান্তি কোনওটিই আসে না। তাঁকে ভুলে কাজ করলেই কাজে ভ্রান্তি আসে।

এক পণ্ডিত ছেলেকে শাস্ত্র পড়াতে পড়াতে বললেন—যা, মুড়ি নিয়ে আয় মায়ের কাছ থেকে চেয়ে। ছেলে মুড়ি চাইতে মা ছোট একটি ডালা করে মুড়ি এনে ছেলেকে বলল—ধর এই মুড়ির ডালা। ছেলে তার ছেলেমানুষি খেয়ালে একটি থামের দুই দিক দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে মুড়ির ডালাটি ধরল। ফলে তার দুই হাত জোড়া হয়ে গেল। চেষ্টা করেও সে মুড়ির ডালাটি আর কাছে আনতে পারছে না। বাবার মাথাতেও এল না যে, ডালাটি মাটিতে রেখে হাত ছাড়িয়ে এনে ডালাটি ধরা যায়। সে ভাবল, থামটি না-কেটে ফেললে কিছুতেই হবে না। সে করাত এনে থামটি কেটে ফেলল। পণ্ডিতকে থামটি কেটে বাদ দিতে দেখে একজন লোক অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—দুই দিন আগে নূতন থাম বসানো হয়েছে, কেটে ফেললে কেন? সব শুনে সে হেসে বলল—ডালাটি মাটিতে রেখেই তো হাতটা ছাড়ানো যেতে পারত। তখন পণ্ডিতের হুঁশ হল।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—জগৎটা যে হরির খেলা, এই বোধ হয়ে গেলে আর ভয় থাকে কি? তখনই মন অভী হয়ে যায়। তখন আমার বলে আর কিছু থাকে না।

১১। ৩। ৭০

৮৪

বিশ্বাস এমন বস্তু যার উপরে কিছু নেই। বিশ্বাস বস্তুটিই অদ্বৈত। মানলে আর সাধনার প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস ও সাধনার অভাবে মানা হয়-না বলেই সাধনার প্রয়োজন হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ছোট গল্প বললেন।

দৈত্যকুলের সন্তান সব সময় 'হরি, হরি' বলত বলে তার বাবা তাকে বনে ফেলে দিয়ে গেল। ছেলের কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

ছেলেটির প্রিয় ছিল একটি ছাগলছানা। বনে যাবার সময় সে বাবার কাছ থেকে ছাগলছানাটি চেয়ে নিয়েছিল। সারাদিন ছাগলছানাটির সঙ্গে সে মহানন্দে খেলে বেড়াত। সন্ধের সময় ছাগলের বাচ্চাকে যখন পাতা খাওয়াচ্ছিল এমন সময় একটি বাঘ এল ছাগলের বাচ্চাকে খাবার জন্য। কিন্তু ছেলেটি ভয় পেল না, বাঘটিকেও সে পাতা খাওযাতে লাগল ছাগলের মতো আদর করে।

দূরে এক সাধু গাছের কোটরে বসে এই কাণ্ড দেখে অবাক। তিনি ভাবছেন, হরি কী খেলাই না তুমি দেখাচ্ছ, তোমার কী মহিমা! এতকাল দেখে এসেছি বাঘ ছাগল পেলেই ধরে খায় আর এখানে দেখছি তুমিই বাঘের রূপে ও ছাগলের রূপে এসে একসঙ্গে বসে পাতা খাচ্ছ এবং আরেকরূপে এসে তুমি এদের খাওয়াচ্ছ।

গল্পটি শেষ কবে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ছোট ছেলেটি বাঘ দেখে ভয় পায়নি, কারণ সে জানে সবই হবি এবং শিশুকাল থেকে এই বিশ্বাসেই সে চলে এসেছে। হরি যার সহায় হয় তাকে কেউ মারতে পারে না।

পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস যেইমাত্র করলে সেইমাত্র তুমি সিদ্ধ হয়ে গেলে।

১১। ৩। ৭০

৮৫

একদিন সানাইয়ের বাজনা শুনে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—একটি মজাব ঘটনা মনে পড়ে গেল।

এক বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে। এক পাগল এসে উপস্থিত হল সেখানে। পাগল সানাইওয়ালাকে বলল—বর আসছে, করুণ সুর বাজাও। এর আগে পাগলটি বাজনার অনেক তারিফ করেছে, কাজেই ওর কথা শুনে সানাইওয়ালা করুণ সুরই বাজাতে লাগল। বরপক্ষের লোকেরা করুণ সুর শুনে অবাক হল এবং তাদের মনও খারাপ হল। বরকর্তা কন্যাকর্তাকে এই জন্য নানা রকম কথাও শোনাল। কন্যাকর্তা সানাইওয়ালাকে একটু ধমকও দিল।

পাত্র যখন বিদায় নেবে তখন পাগল সানাইওয়ালাকে বিদায়ক্ষণে আনন্দের সুর বাজাতে অনুরোধ করল। পাগলের নির্দেশে সানাইওয়ালা সেই রকমই বাজাল। কন্যাকর্তা রেগে গিয়ে সানাইওয়ালাকে বকুনি দিতে লাগল। তিনি বললেন—আমার মেয়ে চলে যাচ্ছে, এ রকম বিচ্ছেদের সময় তুমি এ কী রকম সুর বাজাচ্ছ? তোমাকে আমি টাকাপয়সা কিছুই দেব না।

সানাইওয়ালা নিরুপায় হয়ে বলল—আমার কী দোষ? আপনাদের বাড়ির লোকেরা কেউ কোনও ফরমাশ দিচ্ছিল না বরং এই পাগলটিই নির্দেশ দিয়েছে, কাজেই ওর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বাজিয়েছি।

পাগল তখন মালিককে বলল—ঠিকই তো বাজানো হয়েছে। যখন বর আসছে তখন সে ফাঁদে পড়ল বিয়ে করতে এসে। কাজেই এই যে বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল—এ ভাবেই দুঃখের কারণ শুরু হল তার জীবনে। সেই জন্য করুণ সুর বাজানো হয়েছে। আর বিদায়ের সময় বাজাল আনন্দের সুর। তোমরাই বল "ত্যাগাৎ শান্তি", তাই মেয়েকে যখন ত্যাগ করতে পেরেছ তখন তোমাদের সকল দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। সে চলে যাচ্ছে তাই তা তোমাদের শান্তি ও আনন্দের কারণ। সেই জন্য মেয়ে যাবার সময় আনন্দের সুর বাজানো হল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পাগল তো অনেক গভীরের কথা বলে গেল, কিন্তু মানুষ তো তা বোঝে না। সত্যিই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কত চিন্তাভাবনা। এখন পিতার যেন মুক্তি হল। পাগলের কথাগুলি সবই তত্ত্বমূলক। বাইরের দিক থেকে সাধারণ লোক অবশ্য তার অর্থ ধরতে পারে না ঠিক মতো। পাগল ওর জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে সব কিছু।

১৩। ৩। ৭০

৮৬

মানাই হল গ্রহণ করা, মানাই হল স্মরণ করা, মানাই হল ধ্যান করা। তা-ই নিরন্তর হয়ে চলছে। তা অভ্যাস করতে করতে সহজ হয়ে যাবে। এখন একবার মানছ, আরেকবার মানছ না, ফলে মিশ্রণ হয়ে যায় বারবার। এই মিশ্রণ হয়ে গেলেই বড় মুস্কিল হয়।

মিশ্রণ থাকে বলেই অনুযোগ অভিযোগ। যত মিশ্রণ কমে যাবে তত অনুযোগ অভিযোগও চলে যাবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক পাগল সাধকের কাছে একবার একজন সাধক এল। এই সাধকের অনেক বিভূতিশক্তি ছিল। সেই সাধক সকলকে তার বিভূতির খেলা দেখায় ও আকর্ষণ করে। এই সাধকের খেলা দেখে পাগল সাধক শুধু মুচকি হাসে। সাধকের বিভূতির খেলা দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। সকলেই তার বিভূতির খেলায় একেবারে মুগ্ধ। পাগল শুধু হাসে।

সাধকের খেলা দেখতে বহু লোকজন আসছে, যে যা চাইছে সাধক তাকে তা-ই দিচ্ছে। সেখানে একদিন হঠাৎ এক বালক এসে উপস্থিত হল।

সাধক বালককে জিজ্ঞাসা করল—কী চাই?

বালক—যা তোমার কাছে নেই তা-ই দাও।

সাধক—যা আমার কাছে নেই তা কী করে দেব?

বালক— তুমি কি দেবার মালিক?

এই ভাবে সাধক যা-ই দিতে চায় কোনওটিই বালক নেয় না। এই রকম ভাবে সারাদিন চলে গেল। বালক শুধু হাসে। সন্ধেবেলায় সাধকের মেজাজ একটু খারাপ হয়ে গেল। সে বালকের উপর রেগে গিয়ে তার গায়ে আঘাত করে বসল। কিন্তু সাধক দেখল সেখানে তখন বালক নেই, আঘাতটা গিয়ে লাগল সেই পাগলের গায়ে।

সাধক খুব অনুতপ্ত হল। সাধক তখন পাগলকে বলল—আজ মালিক তোমাকে মার খাওয়াল কেন?

সাধক সেই পাগলকে আরও বলল—তোমার কাছে এতদিন আছি, কিন্তু তোমার পরিচয় তো আমাকে দিলে না!

পাগল এই কথার কোনও জবাব দেয় না শুধু মাঝে মাঝে মুচকি হাসে। হঠাৎ সাধক দেখতে পায় সেই পাগলের মধ্যে বালকের রূপ মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তখন সাধক সেই পাগলের পরিচয় জানবার জন্য আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পাগল বিশেষ কিছু বলে না দেখে সাধকের ব্যাকুলতা বেড়েই চলে। অবশেষে বালকের রূপ ধরেই পাগল বলল—আমাকে জানতে হলে ষোলো আনা মানতে হবে। তোমার যাদুখেলা দেখে সবাই ভোলে যেমন, তুমিও তেমন যাদুখেলা শিখে আমায় ভুলেছ। যাদুখেলা শিখে আমাকে জানা যায় না ও পাওয়াও যায় না। পরিপূর্ণ ভাবে আপনবোধে মানলে আমাকে জানা যায়, আপনবোধে পাওয়া যায়। তখন আর যাদুখেলা ভাল লাগে না, অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ মনে হয়।

বালকবেশী পাগল আরও বলল—তোমার এই যাদুখেলা একদিন ভুলে যাবে, হারিয়ে যাবে, তখন কী করবে? আমাকে পেলে তোমার সব পাওয়া পূর্ণ হয়ে যাবে, আর অভাব কিছু থাকবে না, হারাবারও কিছু থাকবে না।

এই বলে বালক পাগলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তখন সাধক পাগলের রহস্য কিছুটা বুঝতে পেরে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। পাগল তাকে আত্মারামের ভজন করতে নির্দেশ দিল এবং পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাধক সব যাদুখেলা ছেড়ে আত্মারামের ভজনে কিছুদিন ডুবে রইল। যথাকালে তার সঙ্গে পাগলের আবার দেখা হল। তখন সে পাগলকে প্রণাম করতে গেলে পাগল সাধককে আলিঙ্গন করে বলল—আজ থেকে তুমি পূর্ণ হলে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন— আত্মজ্ঞানী পাগলের কৃপায় সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়। আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আত্মদেবতাই শ্রেষ্ঠ দেবতা।

১৮। ৩। ৭০

৮৭

শব্দের সঙ্গেও গুরু যুক্ত থাকেন। নামের গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি, রূপ-নাম-ভাব তাঁরই বক্ষে তাঁরই অভিব্যক্তি। সুতরাং জ্ঞান সবারই অধিষ্ঠান। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বক্ষে যত রকম অভিব্যক্তি হয় তাদের অন্তরে-বাইরে জ্ঞানই ওতপ্রোত ভাবে আছে।

নামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন।

কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গান্ধিজি একবার হাসপাতালে ছিলেন। তখনকার দিনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ছিল খুব বেশি। গান্ধিজি রোগশয্যায় শুয়ে ছটফট করছিলেন, কোনও ওষুধেই আরাম হচ্ছিল না তাঁর। গান্ধিজির কষ্ট দেখে nurse তাঁকে বলল— বাবা, কষ্ট পাচ্ছ খুবই, আমরা তো কোনও relief দিতে পারছি না, তুমি একটু রাম নাম কর। রাম নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট দূর করবেন। এই কথা বলতে বলতে nurse-এর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল।

গান্ধিজি nurse-এর কথা শুনে রাম নাম করতে শুরু করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত সত্যিই তাঁর দেহের কষ্টও দূর হয়ে যায়। সেই থেকেই রাম নামে তাঁর প্রীতি এল। পরে অবশ্য সিদ্ধগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের সময় অমৃতময় রাম নামই তিনি পেয়েছিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—নামের কথা যাঁরা বলেন তাঁরাই প্রকৃত বন্ধু ও আপনজন। সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ জ্ঞানের কথা বললেও ভক্তিকেই তাঁরা ধরিয়ে দেন। মা বা গুরু কখনও একঘেয়ে হন না। অতীত কাল থেকে মাতৃ মহিমা বা গুরুর মহিমা সবাই বলে আসছে, তবুও যেন তার অন্ত নেই। গুরু কখনও লঘু হন না। নিত্যকাল তিনি গুরুই থাকেন। স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে এসে আমাদের কাছে ধরা দেন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর ভালবেসে এসে ধরা দিচ্ছেন, সকলকে অসীমের দিকে নিয়ে যাবার জন্য আকর্ষণ করছেন। সদ্‌গুরুর কৃপা ও অনুগ্রহেই শরণাগত আশ্রিত সাধক সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর-আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অধিকারী হন। তার ফলে তিনি অমৃত দিব্যজীবন লাভ করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়ে অপরের কাছেও দিব্যাদর্শরূপে পূজিত বা আরাধিত হন।

৩০। ৩। ৭০

৮৮

জীবনে একটি বিশেষ অবলম্বন প্রত্যেকেরই প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরকে কেউ না-মানতে পারে, প্রকৃতিকে না-মানতে পারে কিন্তু great-কে বা মহৎকে না-মেনে উপায় নেই।

আদর্শের মান ছোট-বড় হতে পারে, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে চলার উপায় নেই। Without any ideal nobody can progress. আদর্শচ্যুত হয়ে গেলে একটি জাতি বিলীন হয়ে যায়। All perfection-এর অন্তর্ভুক্ত আপন প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। যেমন ছেলে বাড়ি থেকে রাগ করে না-খেয়ে চলে যায়, কিন্তু হোটেলে বা বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে খেয়ে নেয়। কোথাও না কোথাও তার খেতেই হয়। সেইরূপ বিকার নিয়ে কেউ যতই চঞ্চল বা অস্থির হোক না কেন, সেই বৃহৎ শান্তিস্বরূপকে একদিন তার মানতেই হবে। তবে ঠেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মানতে গেলে এক রকম হয় এবং সহজ ভাবে মানলে আরেক রকম হয়। বৃহৎকে না-মেনে চললে হয় আসুরিক জীবন। না-মানার ফলে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব হয়। যে মুহূর্তে মানা শুরু হয়, তখন থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসও আসে এবং আসুরিকভাবও আস্তে আস্তে সরে যায়। তার ফলে জীবনে upper nature-এর প্রভাব পড়ে।

সর্ববিধ বিকারের মধ্যে যখন নির্বিকার অবস্থায় থাকা যাবে, তখনই হবে perfection। যদি তোমার ভিতরে কেউ দোষদর্শন করে, সেও তোমার গুরুমূর্তি। দোষদর্শন করে সে তোমাকে সাবধান করে দিল। গুরু ছাড়া কেউ এ কাজ করতে পারে না। গুরুই নানা বেশে, নানা ভাবে এসে তোমাকে তোমার দোষগুলি সম্বন্ধে সচেতন বা জাগ্রত করে দিয়ে যান। তুমি যখন কারও কাছ থেকে আঘাত পাও বুঝতে হবে সেই আঘাত গুরুর কাছ থেকেই আসছে। কারণ source তো একটিমাত্র। তোমার মধ্যে একটা কিছু প্রকাশ করবেন বলেই আঘাত করেছেন। আঘাতে আঘাতে কত ভাবে কত যে প্রকাশ করছেন তিনি তার ঠিকঠিকানা নেই। ডিমটিকে বুকে রেখে তাপ দিয়ে পাখি তার বাচ্চার জন্ম দেয়। এটা এক প্রকারের আঘাত। খাদ্য প্রস্তুত করতে গেলে আগুনের তাপে চাল সিদ্ধ করা হয়, এটাও আঘাত। বিরুদ্ধ অবস্থাগুলি সাহায্য করার জন্যই বারবার আসে। যখন আর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না, তখন আর আঘাতও আসবে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একজন লোক সংসারে নানাবিধ ঝামেলায় জর্জরিত হয়ে ভাবল, কী দরকার এত ঝামেলায়! সে এক নির্জন পাহাড়ে চলে গেল। পাহাড়ের গহ্বরে সে এক বিরাট সাপ দেখতে পেল। তার পরে সে গেল এক গাছতলায়। সেখানে গিয়ে দেখে এক বিষাক্ত পোকা। আরেক গাছতলায় গিয়ে দেখে এক মৌচাক। মৌমাছির দল এল হুল ফোটাতে। কোথাও সে আর নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

তারপর হঠাৎ খুব শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হল। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে তার কাছে জল চাইল। সাধু তাকে জল ও একটু মিষ্টি প্রসাদ দিলেন এবং অতি স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে এসেছ বাবা?

এই স্নেহের কথা শুনে লোকটির চোখে জল এসে গেল। এতদিন সবার কাছ থেকে তাড়া খেয়েই সে এসেছে। আজ সাধুর কাছে এই রকম মিষ্টিমধুর ব্যবহার পেয়ে সাধুকে তার খুব ভাল লাগল।

অবশেষে একসময় সাধু তাকে বললেন—নামে থাক বাবা। বারবার 'নামে থাক, নামে থাক' শুনতে শুনতে দু-একবার রাম নাম তার মুখ দিয়ে বেরিয়েও এল। লোকটি ভাবল, সাধু আমাকে ধর্মের দিকে টানছেন।

সাধু তাকে বললেন—ধর্ম বাদ দিলে তুমি তো পশু হবে। পশুরও তো নিজস্ব ধর্ম আছে। পশু পালায়, তুমিও পালাও। পশু নাম করতে জানে না। মানুষ যতক্ষণ পশু ভাবে আছে ততক্ষণ নাম করে না, কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে নাম শুরু করে সেই মুহূর্তে পশুভাব চলে যায়।

এই সব কথা শুনে লোকটির খুব ভাল লাগল, তখন সে সাধুসঙ্গ করতে চাইল।

সাধু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি বিয়ে করেছ, ছেলেপিলেও হয়েছে, তবে কেন সে সব ছেড়ে এলে? মজা লুটবার সময় মজা লুটেছ, এখন কেন পালিয়ে এসেছ? যাও ঘরে গিয়ে কাজকর্ম কর আর তার সঙ্গে সঙ্গে রাম নাম কর।

লোকটি বৎসরান্তে ঘরে ফিরে এল। ঘরে ফিরে এসেও সাধুর কথা আর ভুলতে পারে না। সাধু বলেছিলেন—নামে থাক। এই কথাটি তার বারবার স্মরণ হতে লাগল। এই ভাবে সাধুর প্রভাব তার মধ্যে কাজ করতে লাগল।

গল্পটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সদ্‌গুরুর সঙ্গ অল্প সময়ের জন্যও যদি কেউ পায়, তবে জীবনে তাঁর প্রভাব আসবেই। বারো বছর পরে দেখা গেল সেই লোকটি শুধু নামের মধ্যে থাকতেই ভালবাসে। এই নামের মধ্যে থেকে সেই বিভ্রান্ত চিত্তের লোকটি পরবর্তীকালে প্রভূত উন্নতি করেছিল।

১২। ৪। ৭০

৮৯

সৎ-এর প্রভাব বুঝতে গেলে তা ধারণ করতে হবে। 'সত্যকে ধারণ করার শক্তিই হল শ্রদ্ধা।' সত্য শুধু মুখে বললে হবে না, ব্যবহারে আনতে হবে—life-এ আনতে হবে।

এক মহাপুরুষের অনুগত শিষ্য বহুকাল তাঁর সঙ্গ করার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার সঙ্গ করে আমাদের চরিত্র তো এখনও পাল্টাল না। কেন এ রকম হল?

উত্তরে মহাপুরুষ বললেন—আজ হঠাৎ এতদিন পরে কেন এটা strike করল? এতদিন আমার সঙ্গে থেকে favourable condition-এ ছিলে, বর্তমানে সেই favourable condition-টা নেই বলেই এ সব প্রশ্ন জাগছে তোমার। আসলে favourable condition-ই তো তুমি খুঁজছিলে, সৎ হবার চেষ্টা তো তোমার ছিল না। যদি সৎ হবার ইচ্ছা থাকত তবে এই প্রশ্ন তোমার বহুদিন আগেই জাগত। সৎ-এর প্রভাব বুঝতে গেলে তা ধারণ করতে হয়। সত্যকে শ্রবণ করে ধারণ করতে হবে, মুখে রাখলে চলবে না। মতলবের জন্য ব্যবহার হয় মুখে। তাতে সত্যের সঙ্গে মেশা যায় না। সত্যকে অহংকারের সঙ্গে মেশালে অর্থাৎ নিজের দোষের সঙ্গে মেশালে

সত্য আবরিত হয়ে যায়। আর নিজেকে যদি সত্যের সঙ্গে মেশাতে যাও তবে অখণ্ডের সঙ্গে মিশে যাবে।

মহাপুরুষ আবার বললেন—তুমি যদি সত্যি জানতে চাও তবে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। এতদিন সঙ্গ করেছ, কিন্তু নির্দেশ তো পালন করনি। এতকাল যে ফাঁকি দিয়ে এসেছ, তার জন্য যা cause সৃষ্টি হয়েছে, যতদিন না তা শেষ হয় ততদিন তোমার অনেকবার আসতে হবে। প্রতিটি cause-এরই effect তৈরি হয়, তাই right thought and action-এর প্রয়োজন হয়।

তিনি আরও বললেন—তোমার ভোগ্য বস্তুর মধ্যেও তো আমাকে বসাওনি। ভোগের মধ্যেও আমি ছিলাম, কাজেই আমাকেও তুমি ভোগ করেছ। সুতরাং কী করে তুমি তা হজম করবে? ভোগের মধ্যে যদি তাঁকে বসাও তবে ভোগের bad effect-টা আর থাকবে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—"অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতংকর্ম শুভাশুভম্"—তোমার কৃত কর্মের শুভাশুভ ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। জীবন এমন হওয়া চাই যেন অন্যের জন্য right cause রেখে যেতে পারা যায়। মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায় তাঁদের চালচলন ও ব্যবহারের মধ্যে তাঁরা একটি right cause রেখে যান যা অপরকেও সাহায্য করে এবং তাঁরা নিজেরা আবার যখন আসেন তখন সেই right cause-এর মধ্যেই এসে পড়েন।

৩। ৫। ৭০

৯০

জীবনে পরমজ্ঞানের শিক্ষা সংসারী মানুষের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

পণ্ডিত তার স্ত্রীকে মর্যাদা দিত না। স্ত্রী তার বাপের বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছে দুঃখ করে সব কথা বলল। মা ভাবল, এর একটা বিহিত করতেই হবে। একবার পণ্ডিত জামাই শ্বশুরবাড়ি এসে উপস্থিত হল। শাশুড়ি তাকে জলটল খাইয়ে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। তার পরে শাশুড়ি এসে জামাইকে বলল—বাবা, তোমার পাণ্ডিত্যের কথা পাড়ার সকলেই শুনেছে, তাই তারা তোমার কথা একটু শুনতে চায়। তুমি তাদের কাছে একটু শাস্ত্রকথা বল। এই বলে শাশুড়ি জামাইকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে পাড়ার যত অশিক্ষিত মেয়েরা বসে ছিল। সেখানে গিয়ে সেই গ্রাম্য মেয়েদের কাছে পণ্ডিত জামাই সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যা করতে লাগল, কিন্তু কেউই কিছু বোঝে না। তারা পণ্ডিতের কথা শুনছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

কথা বলতে বলতে পণ্ডিতের জলতেষ্টা পেল। জল চাইলে দিদিশাশুড়ি বলল—এতক্ষণ তো বললে সব মিথ্যা, আমরা সব মিথ্যা নিয়ে আছি। তুমি সত্য কথা তো কত শোনালে, তোমার তবে এই মিথ্যা জলের দরকার কি? পণ্ডিত তো সব শুনে

হতবাক, কোনও কথা আর বলতে পারে না। কেউ জলও দিল না। তারপর রাতে যখন খিদে পেল তখন ভাতও দেওয়া হল না। সেই একই কথা তাকে শোনানো হল, মিথ্যা খাদ্যের তার কিসের প্রয়োজন? পণ্ডিতের তো প্রতিবাদ করার আর কোনও উপায়ই নেই। খিদেটা চুপ করে সহ্য করে যেতে হল।

পরের দিন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পণ্ডিত জামাই যখন ডোবার জল খেতে যাচ্ছিল তখন রোগের ভয়ে তার শাশুড়িকে একটু খাবার জল দিতে অনুরোধ করল। শাশুড়ি তখন জামাইকে জল খেতে দিল। জামাইকে আরও কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার ভেবে শাশুড়ি গিয়ে জামাইকে বলল—আমি ও আমার মেয়ে দু'জনেই অসুস্থ, সুতরাং তোমাকে কী করে রান্না করে দেব? চাল, ডাল দিচ্ছি তুমি কষ্ট করে এ ক'দিন একটু ফুটিয়ে খাও। ইচ্ছে করে শাশুড়ি চালের পরিমাণে জল খুব কম দিল। অত কম জলে চাল ও ডাল সিদ্ধ হল না, ফলে পণ্ডিত জামাইয়ের খুবই কষ্ট হল। এই ভাবে তিন দিন জামাই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুবই কষ্ট করল। তিন দিন পরে পণ্ডিত জামাইয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা হল। সাংখ্য, বেদান্ত ও সব শাস্ত্রটাস্ত্র পুঁটলি করে নিয়ে সে পালিয়ে এল নিজের বাড়িতে। তখন পণ্ডিত বলল—আমি যে রকম ব্যবহার করেছি সেই রকম ব্যবহারই পেয়েছি।

৩। ৫। ৭০

৯১

যে শক্তি মানুষকে পূর্ণতা লাভের জন্য সাহায্য করে তাকে প্রকৃতি, মা বা গুরু বলে। মা, গুরু, ইষ্ট, হরি প্রভৃতি সব একবোধেরই প্রকাশ। এই ভাবেই সর্ব রূপ-নাম-ভাবের মধ্যে মিল বা সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।

নিষ্ঠা সহকারে গুরুসেবার মাধ্যমে জীবনে যে কী রকম রূপান্তর ঘটে সে বিষয়ে একটি গল্প শোন।

একজন মহাত্মাকে এক রাজারানি মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করতেন। কিছুদিন পরে মহাত্মা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা আমার এত সেবা করছ কেন তা তো বললে না!

রাজারানি বললেন—ভাল লাগে, আনন্দ পাই, তাই সেবা করি। মহাত্মা জানতে চাইলেন—আমার যাতে তৃপ্তি হয় সেই জন্য কি? রাজারানি বললেন—হ্যাঁ বাবা, আপনার তৃপ্তিবিধান করেই আমাদের আনন্দ, তাতেই আমাদের তৃপ্তি।

মহাত্মা তখন বললেন—আজ থেকে 'এই আমিকে' তোমরা সেবা কর, তবে এই শরীরে নয়, বন্দিশালায় আরেকজন রাজারূপে আমার যে আরেকটি শরীর আছে তাকে তোমরা সেবা কর। তাহলে আমি তুষ্ট হব অনেক বেশি। আমাকে এই দেহে যেরূপ সেবা কর তাকেও ঠিক সেই ভাবে সেবা করতে হবে। দেখা হলে প্রথমে যেমন আমাকে প্রণাম কর, সেইরূপ সেই দেহকেও প্রণাম করতে হবে প্রথম দর্শনেই।

রাজারানি কী আর করবেন, আগেই তো কথা দিয়েছেন যে, মহাত্মার তুষ্টিতেই তাঁদের তৃপ্তি, সুতরাং বন্দিশালায় সেই রাজাকে সেবা করতে রাজি হন। মহাত্মার আদেশ অনুযায়ী বন্দিশালায় গিয়ে সর্বপ্রথম রাজাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানালেন এবং পরে অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

বন্দিশালায় রাজা এতদিন কত দুর্ব্যবহার পেয়েছেন অথচ রাজারানির কাছ থেকে হঠাৎ আজকাল এত সেবাযত্ন পেয়ে তিনি খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই ভাবেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল।

তারপর আবার একদিন মহাত্মা রাজা ও রানির নিকট উপস্থিত হয়ে আরও কয়েকজনকে সেবা করার নির্দেশ দিলেন। মহাত্মার নির্দেশ রাজারানি অমান্য করতে পারলেন না। তাদেরও সেই ভাবে গুরুবোধে সেবা করতে শুরু করলেন। এই ভাবে বারো বছর বন্দিশালায় রাজাকে এবং আরও অন্যান্য কয়েকজনকে রাজারানি সেবা করলেন। তারপর একদিন রাজা দেখলেন রানির মধ্যে সেই মহাত্মাকে এবং রানিও দেখতে পেলেন রাজার মধ্যে সেই মহাত্মাকে।

তারপর ক্রমশ তাদের এমন অনুভূতি হল যে, অন্য সকলের মধ্যেও তারা মহাত্মাকেই দেখতে পেতেন। এই ভাবে তাদের স্বরূপের অনুভূতি ধীরে ধীরে এসে গেল। তার পরে মহাত্মা যখন দেহত্যাগ করলেন তার কয়েকঘণ্টা পরেই রাজা ও রানি দু'জনেই দেহত্যাগ করলেন। মহাত্মা নিজের মধ্যে তাদের মিলিয়ে নিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই হল স্বভাব অনুভূতির একটি লক্ষণ। এই ঘটনাটি মা vision-এ একদিন দেখিয়েছিলেন আজ থেকে কিছুদিন আগে। এটা একটি বাস্তব ঘটনা, মিথ্যা গল্প নয়।

৩১। ৫। ৭০

৯২

স্বানুভবসিদ্ধ গুরুই শিষ্যকে আত্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতে পারেন। যে body-র মাধ্যমে Infinite প্রকাশ হয় তাঁকেই বলা হয় Infinite-এ যাবার দরজা। যাঁরা Infinite Consciousness বা Universal Consciousness-এর সঙ্গে একীভূত হয়েছেন তাঁরাই হলেন সদ্‌গুরু। প্রত্যেক মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরু হলেন অসীম ও অখণ্ডের ঘরে পৌঁছবার এক একটি দরজা—যেমন একটি বড় বাড়িতে যাবার জন্য অনেক দরজা থাকে।

বই পড়ে ধর্মের সারটা গ্রহণ করা যায় না। নিজের খুশি মতো শাস্ত্র পড়ে সত্য জ্ঞান লাভ হয় না। যাঁরা শাস্ত্রের বোধটা অবগত হয়েছেন, তাঁদের কাছে শাস্ত্র পড়তে হয়। যারা তাঁদের নির্দেশ ছাড়া শাস্ত্র পড়ে, তারা শুধু শব্দ চয়নই করে। পরে নিজের জীবনে ফল পায় না বলে ভাবে সব বুজরুকি।

বিজ্ঞান শিখতে গেলেও teacher দরকার হয়। আর অধ্যাত্মবিজ্ঞান হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। সদ্‌গুরু ব্যতীত এই বিজ্ঞান জানা যায় না। এই আত্মবিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান

কোনও আত্মবিদ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে বা শাস্ত্র পড়ে শিখতে নেই। যদি কারও ভিতরে জানা, বোঝা ও শোনার জন্য ব্যাকুলতা বা আগ্রহ তীব্র ভাবে জাগে তাহলে তার অন্তর্দেবতাই ব্যবস্থা করে দেন। আত্মবিদ্ না-হলে কেউ নিঃসংশয়ে আত্মার কথা পরিবেষণ করতে পারে না। আত্মবিদ্ যারা নয় তারা সংশয় আরও বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে শ্রদ্ধার স্থানে অশ্রদ্ধা এবং ভক্তিব স্থানে অভক্তি এসে যায়। সেই জন্য অনেক সময় গুরুমহারাজগণ শিষ্যকে সব জায়গায় যেতে দেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে, ভগবানের কথা অনেকেই মুখে বলতে পারেন, কিন্তু বোধযুক্ত করে দিতে পারেন না সবাইকে। যাদের আধ্যাত্মিক বর্ণপরিচয়ই হয়নি তারা সত্যের কথা কী করে বলবে? আধ্যাত্মিক কথাই বা কী করে বলবে? সত্যের কথা তাঁরাই বলতে পারেন, সত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় হয়েছে। সত্য হল স্বানুভবের অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধির বিষয়।

যথার্থ জিজ্ঞাসু শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে বিনীত ভাবে স্বানুভবসিদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে যথাসময়ে সব সমাধান হয়ে যায়। যিনি যথার্থ সত্য অনুভব করেছেন তিনি যথাসময়ে শিষ্যকে প্রশ্নের উত্তর দেন। অযথা অবান্তর প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দেন না। প্রশ্নগুলি সত্যিই অন্তর থেকে উঠছে কি না অথবা বইয়ের সঙ্গে মেলাবার জন্য প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না, এ সব আত্মজ্ঞপুরুষ জিজ্ঞাসুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়ে যান। গুরুর কাছে কিছু পেতে হলে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তা না-হলে লাভ হয় না। এর একটি দৃষ্টান্ত বলছি শোন।

এক উচ্চকোটি মহাত্মার (ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের) এক আশ্রিত সন্তান ছিল এবং তার খুব অহংকার-অভিমানও ছিল। কিন্তু মহাত্মার কাছে এসে তাঁর ছোট ছোট কথায় সে খুব অবাক হয়ে যায়। সে শুধু ভাবে, মহাত্মার কত পড়াশুনা, কত জ্ঞান এবং to the point সব উত্তর দিয়ে দেন।

কিন্তু গুরুর কাছে থেকেও গুরুকে যতটা মর্যাদা দেওয়া উচিত ততটা মর্যাদা সে দেয় না। ধ্যানে ঠিক মতো মনও দিতে পারে না, কারণ মন তার অতি চঞ্চল ও অস্থির। কখনও কখনও সে তার অশ্রদ্ধার ভাবটিও প্রকাশ করে ফেলত।

গুরু তাকে একদিন বললেন—আমি তো তোমার কাছে যাইনি, তুমিই এসেছ আমার কাছে তোমার বিকার, অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দূর করার জন্য। কিন্তু আজ তুমি সে কথা ভুলে গিয়েছ। তুমি মনে ভেব না যে, আমি এ সব তোমাকে দিতে বাধ্য। যে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করবে তাকেই আমি সব দেব। আমি ফুটো পাত্রে জল ঢালব না বা যার পকেট ছেঁড়া সেই পকেটে টাকা দেব না। যে চৌবাচ্চায় জল বেরিয়ে যায় তাতে আমি কেন জল ঢালব? তোমার যদি এখানে সুবিধা না-হয় তবে তুমি অন্যত্র যেতে পার। তবে আমি জানি কোথায় তোমার সুতো বাঁধা আছে। যেখানেই যাও, ফিরে আবার আমার কাছেই আসতে হবে। তবে মনে রেখ, তখন তোমার আরও কঠোর মূল্য দিয়ে সব গ্রহণ করতে হবে।

মহাপুরুষেরা যতখানি নরম ততখানি শক্ত। করুণার্দ্র হৃদয় যখন বজ্রকঠিন হয়, তখন একবিন্দু করুণা আর আদায় করা যায় না। সন্তানের উপর মাবাবা যখন বিগড়ে যান তখন টাকাপয়সা সম্পত্তি অন্য কারওকে দেন, সন্তানকে দেন না। তখন সে শত কান্নাকাটি করেও বাবার মন গলাতে পারে না।

গুরুর বা ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখতেই হবে। মাকে ধরে যে জীবনে চলে তার জীবনে অশান্তি আসতে পারে না। তাঁকে ভুললে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও কিছু করতে পারেন না, কারণ তাঁরা তো মাকেই মানেন।

নিরন্তর ইষ্ট-গুরু-মাতার উপস্থিতি অনুভব করতে হয়। ভাবতে হয়, তিনিই আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবনা নিরন্তর রাখতে পারলে গুরুর বা ইষ্টের সঙ্গ থেকে আর বিচ্যুত হতে হয় না।

আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে হলে, গুরুকৃপা পেতে হলে নিজেকে আগে তৈরি করতে হয়।দেহের প্রীতি, স্বার্থবুদ্ধি, অস্থিরতা, চঞ্চলতা, ক্রূরমতিত্ব, দ্বেষভাব, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, অহংকার-অভিমান, দম্ভ, দর্প, অপরকে ছোট করার প্রবৃত্তি প্রভৃতি হল আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী। এ সব পরিত্যাগ করে দৈবীগুণগুলি বাড়াতে হয়। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির মধ্যে সাম্যভাব, সহজ সরল প্রকৃতি, কর্মে নিপুণতা, অভয়, বুদ্ধির বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি বা আগ্রহ, নিয়মানুবর্তিতা, নীতিকে মেনে চলার ইচ্ছা, সংযম, শুচিতা, পবিত্রতা, দয়ার ভাব, অপরের দুঃখকষ্ট দেখে অভিভূত হয়ে তাকে সাহায্য করা, নির্লোভ হওয়া, ভোগ্য বস্তু ও স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা, বিনয়, নম্রতা, অপরের প্রশংসা শুনলে আনন্দবোধ, কায়মনোবাক্যে অপরকে হিংসা না-করা, সর্বদা সর্বাবস্থায় তুষ্টির ভাব বজায় রাখা প্রভৃতি দৈবীপ্রকৃতির অভিব্যক্তি। এগুলি সব সময় একসঙ্গে প্রকাশ পায় না, একের পর এক প্রকাশ হতে থাকে।

শ্যামাচরণ লাহিড়ী যখন তাঁর গুরুর কাছে প্রথম গেলেন, গুরু তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। লাহিড়ীমশাইয়ের অতীতে অনেক সাধনা করা ছিল। তাঁর অপেক্ষাতেই গুরুদেব বসেছিলেন। লাহিড়ীমশাই তাঁর কাছে উপস্থিত হবার পরেই তাঁকে তিনি দীক্ষা দিলেন এবং একের পর এক সাধন প্রণালী দিয়ে যেতে লাগলেন।

গুরুদেবের কাছে তাঁর আরেকজন শিষ্য ছিল। সে গুরুদেবকে বিশ-পঁচিশ বছর যাবৎ সেবা করে এসেছে। সে মনে মনে ভাবল, আমি এতদিন যাবৎ আছি, আমাকে তো গুরুদেব কিছুই দেননি অথচ এই নূতন লোকটি আসবার সঙ্গে সঙ্গে কত সাধন প্রণালী দিয়ে দিচ্ছেন। একদিন সহ্য করতে না-পেরে সে গুরুদেবকে বলেই ফেলল এ কথা। গুরুদেব হেসে বললেন—তুমি তৈরি হও, তোমাকেও দেব। উপযুক্ত না-হলে তোমাকে কী করে দেব? শিষ্য এই কথা শুনে মর্মাহত হয়ে বলল—আপনি যদি আমাকে এ সব না-দেন, তবে এ জীবন রেখে কী লাভ? আমি নিচের এই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দেহ বিসর্জন দেব।

গুরুদেব—বেশ তা-ই কর।

শিষ্য—তাহলে ঝাঁপ দিলাম।

গুরুদেব—হ্যাঁ দাও। এর পরেই শিষ্য নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দেহ বিসর্জন দিল।

শ্যামাচরণ লাহিড়ী এই ঘটনাটি বসে বসে দেখছিলেন। তিনি পরে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—এতদিন আপনার কাছে থাকার পরেও ওর শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হল কেন?

গুরুদেব বললেন—এই জীবনে আমার কাছ থেকে ওর এটুকুই পাওনা ছিল, আর পাবার কিছু নেই। তাই ওকে চলে যেতে হল। Next life-এ আবার আমার কাছেই ওকে আসতে হবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আধ্যাত্মিক পথে শুধু দাবি করে কিছু পাওয়া যায় না। দাবি করতে হলে সে যে উপযুক্ত হয়েছে তার প্রমাণ দিতে হবে। সত্যের প্রতি কতটা নিষ্ঠা হয়েছে তা প্রমাণ করতে হবে ব্যবহার দিয়ে। আরেকজন শিষ্য তাঁর গুরুর কাছে আছে বিশ-পঁচিশ বছর। সে চুপচাপ থাকে আর গুরুর সেবা করে যায়। তার নাম মোহনলাল। অন্যান্য শিষ্যরা মোহনলালকে বোকা ভাবে। একদিন গুরু মোহনলালকে ডেকে বললেন—মোহনলাল, তোমার প্রাণ যা চায় তা খুলে বল, আমি তোমাকে তা-ই দেব।

মোহন—আপনি আমাকে চরণে স্থান দিয়েছেন, এই তো আপনার অশেষ কৃপা, আমি আর কী চাইব?

গুরুদেব—যা হয় একটা কিছু চাও তুমি।

মোহন—আপনার যা খুশি, তা-ই দেবেন।

গুরু তখন তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। তার ভিতরে কী যে উন্মেষ হল তা বোঝা গেল পরে। অনেকে বলে গুরুদেব স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সদ্‌গুরু, মহাপুরুষদের কৃপা পাবার জন্য এবং তাঁদের কথা শোনার জন্য দেবদেবীরাও এসে উপস্থিত হন। Good qualities-এর নাম হল দেবদেবী।

৮। ৬। ৭০

৯৩

আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম বাইরে থাকবেই। অন্তরে স্থির ও শান্ত থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ঘটনাটির মধ্যে একটি সুন্দর তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে সেই ঘটনাটি উল্লেখ করলেন।

এক গৃহী সাধক এক মহাত্মার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘরে বসেই যোগসাধনা করতেন। কিছুদিন পর তাঁর যোগসাধনার কথা বেশ একটু প্রচার হয়ে গিয়েছে—লোকে তা জেনে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

এক বিধবা সেই সাধকের কাছে তার রুগ্‌ণ ছোট শিশুসন্তানকে নিয়ে এল। ক্রমে ক্রমে ভাল করে পরিচয় হবার পরে সে প্রায়ই আসত। সাধক মাঝে মাঝে সুবিধা মতো তাদের সাহায্য করতেন, কখনও কখনও দু-চারটি সদুপদেশও দিতেন।

বিধবাটি ছিল অসহায়। বিপদে-আপদে সাহায্যের বা পরামর্শের জন্য সে সেই সাধকের কাছে উপস্থিত হত। একদিন বিধবার ছেলের কলেরা হল। তাকে কেউ দেখবারও

ছিল না। সাধকের কানে কথাটি যেতে তিনি বিধবার বাড়িতে ছুটে গেলেন। ছেলেটিকে সেবাযত্ন ও চিকিৎসা করে ভাল করলেন। সাধক এত পরিশ্রম ও সেবাযত্ন করছে কাজেই বিধবাটি তাঁর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও এই ক'দিন তার বাড়িতেই করল। লোকে তা ভাল চোখে দেখতে পারল না। বিধবা এবং সেই সাধকের বিরুদ্ধে তারা নানা রকম নিন্দা ও অপবাদ প্রচার করতে লাগল।

সাধকের তখন মনে হল যে, তাঁর পক্ষে নিন্দা হওয়া ক্ষতিকর। তাঁর সাধনার পক্ষেও ক্ষতি আর বিধবার পক্ষেও ক্ষতি। তিনি সাত-পাঁচ ভেবে সেই স্থান ত্যাগ করে চিরকালের জন্য চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিধবাটি যখন জানল সাধকের নামে কুৎসা রটেছে তখন সে ভাবল, তার জন্যই সাধকের এ রকম অপবাদ—এটা তো ঠিক নয়। তাঁর কাছে সকলে শান্তির আশায় বিপদে-আপদে সদ্‌পরামর্শের জন্য ছুটে যায়, কিন্তু সাধক যদি এখানে না-থাকেন কার কাছে তারা যাবে, কার কাছ থেকেই বা সাহায্য পাবে! সাধককে কিছুতেই এখান থেকে চলে যেতে দেওয়া হবে না। নিজে আত্মহত্যা করে সাধককে এই অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং তাঁকে গ্রাম ছেড়ে যেতে দেবে না—এই দৃঢ় সংকল্প করল সেই বিধবা। এই সব চিন্তা করে বিধবাটি যখন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল তখন সাধক ধ্যানে বসে তা জানতে পেরে তাঁর নিজের গুরুকে স্মরণ করে বললেন—গুরুদেব, তোমার সাহায্য ছাড়া এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি? তুমি এসে আমায় সাহায্য কর। গুরুদেব তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—তুই যদি অন্তরে সাধু থাকিস তবে ভয় কিসের? বাইরে লোকে নিন্দা ছড়াবে ছড়াক, এটা তো তাঁর আশীর্বাদ।

তখন সাধক সেই বিধবাটির কাছে গিয়ে বললেন—মা, তুমি এ কী করছ? আত্মহত্যা করা মহা অপরাধ। তুমি এ রকম কাজ কখনও করবে না। তুমি শুধু নাম করে যাও। তুমি নামকে আশ্রয় করে থাকলে অন্তরেই সব কিছু পাবে।

ধীরে ধীরে বিধবাটির খুবই উন্নতি হতে থাকে। নানা রকম দর্শন প্রভৃতিও হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এমন উন্নত অবস্থায় সে পৌছাল যে, যারা আগে তাকে নিন্দা-অপবাদ দিয়েছিল তারাই তাকে মা বলে তার কাছে আসতে লাগল। পরবর্তীকালে বিধবাটি অতি উচ্চ অবস্থার সাধিকা এবং তার শিশুপুত্রটিও খুব প্রতিভাবান পুরুষ হয়েছিল।

গল্প শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অন্তরে শুধু সাধু হয়ে থেক। অন্তরে ঠিক থাকলে বাইরে যা-ই আসুক বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। আজ যারা বিরোধিতা করবে, কাল তারাই আবার তোমার কাছে আসবে।

১৯। ৬। ৭০

৯৪

নাম-ই সব কিছুর source—যাঁরা এই কথা বলেছেন তাঁরা তো জেনেই বলেছেন। ব্যবহার করে তা দেখতে হবে জীবনে। অন্তরে শান্তি পেতে হলে একটি support দরকার। তাই মহাপুরুষরা নাম দেন। ছোট একটি নামের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর অভিব্যক্তি রয়েছে।

এক ভক্ত এক মহাত্মার কাছে ভিক্ষা চাইতে গেল।

মহাত্মা তাকে বলল—আমি নিজেই ভিক্ষা করে খাই, আমার কাছে তুমি এসে ভিক্ষা চাইছ, কী দেব তোমাকে আমি?

ভক্ত—তুমি ছাড়া এ জিনিস কার কাছে চাইব?

মহাত্মা—আমার তো সম্বল এই লোটা-কমণ্ডলু, আমি কী দিতে পারি বল?

ভক্ত—আমি বড় ক্ষুধার্ত, তাই এসেছি তোমার কাছে।

মহাত্মা—আমার এই লোটা-ঘটি ছাড়া আর তো বেশি কিছু নেই, কী তোমাকে খেতে দেব?

ভক্তটি কিছুতেই আসল রহস্য ভাঙছে না, শুধু বলছে—বাবা, আমি বড় ক্ষুধার্ত।

মহাত্মা—কী চাও তা তুমি বল, দেখি কী করতে পারি।

ভক্ত—তুমি যে নামটি কর সেই নামটি আমাকে দাও।

মহাত্মা এই কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। গুরুকে স্মরণ করে মহাত্মা বললেন—আজ এ কী পরীক্ষায় আমায় তুমি ফেললে? এই বলে গুরুকে অনবরত ডাকতে লাগলেন। তন্ময় চিত্তে গুরুকে স্মরণ করতে করতে হঠাৎ নামটি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভক্তও নামটি শোনামাত্র আনন্দে তা উচ্চারণ করতে লাগল। নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে গেল সেই ভক্তটি। কতখানি ক্ষুধার্ত ও prepared হয়ে এলে নাম শোনামাত্র সমাধি হতে পারে তা ভাবাও যায় না। মহাত্মা গুরুদেবকে বললেন—এ কী মহিমা তোমার! এ তো সাধারণ ভিখারি নয়। তোমার এ কী লীলা দেখালে! আকুল হয়ে তিনি গুরুকে ডাকছেন আর নামের এত বড় শক্তি দেখে অবাক হয়ে গুরুকে স্মরণ করে নাম করতে লাগলেন। এই ভাবে গুরুকে স্মরণ করে নাম করতে করতে তাঁরও সমাধি হল। এই প্রথম মহাত্মা feel করলেন আনন্দ সমাধি। তার পরে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে, কারওর মুখে কোনও কথা নেই। তার পরে পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কাঙালবেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরি, তাঁর ওই অমৃতময় নামটি ভিক্ষা করি। সব নামেই এই এক অবস্থা হয়। যে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ নামের তরঙ্গ রেখে গিয়েছেন তাতে কি অশান্তি হতে পারে? তবে তার ব্যবহার তো করতে হবে। ওষুধ শুধু থাকলেই হবে না, তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে তবে তো রোগ সারবে।

২১। ৬। ৭০

৯৫

মহামন্ত্র মহৌষধ এই নাম। নাম টানলে সব বিষয়-আশয় পড়ে থাকে—great loss-কেও তখন loss বলে মনে হয় না। এমনকী অঙ্গহানি হয়ে গেলেও ভ্রূক্ষেপ

থাকে না। নামের এমনই শক্তি। নামের উদ্দেশ্য ভববন্ধন থেকে মুক্ত করা। তাই যে কোনও নামই শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসযুক্ত চিত্তে করে গেলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে এক সাধকের গল্প বললেন।

একভক্ত এক সাধুর কাছে যাতায়াত করত। সাধু ছিলেন নাম-পাগলা। সবাইকে তিনি বলতেন—হরদম নাম কর। সেই জন্য সবাই তাঁকে 'নাম-পাগলা সাধু' বলত। সর্বদা তিনি এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। একবার একজন লোক তাঁকে বলল—তোমাদের এই নাম-টাম সব বাজে। এই তো তোমার দেওয়া নাম করে আমার কিছুই হল না বরং ক্ষতি হয়ে গেল।

সাধু—তুমহারা মন নামসে ছুট গয়া।

লোকটি কিছুতেই মানতে চায় না যে, নামের উপর থেকে তার শ্রদ্ধা চলে গিয়েছে। যতই সাধু নামের মহিমা বলেন ততই লোকটি তাঁর কথা উড়িয়ে দেয়।

সাধু নদীর পারে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখেন মালবোঝাই একটি বড় নৌকা নদীতে ভেসে চলেছে। নৌকার পাল তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু সেই দড়িটি কপিকল থেকে ছিঁড়ে গিয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়াতে পাল তোলা আর যাচ্ছে না। এই দেখে সাধু তাকে বললেন—তুমভি এ্যায়সা নাম সে ছুট গয়া, আভি ফির এক নাম পাকড়ো। নহি করোগে তো সব ছুট যায়েগা।

আসল খুঁটি থেকে মন ছুটে গিয়েছে—খুঁটি ধরা থাকলে আর পড়ে না। নাম থেকে মন ছুটে গেলেই নানা রকম ঝামেলা। সাধুসন্ন্যাসী, সংসারী সকলের জন্য এক নামই মহৌষধ। মনকে বশ করবার জন্য এত সহজতম উপায় থাকতে অত শক্ত process —প্রাণায়াম, যোগসাধনা প্রভৃতি করার কী দরকার? প্রাণায়াম, যোগসাধনা করার একটি মোহ আছে, কিন্তু একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেলেই দেহে নানা রকম বিকার এসে যায়। জ্ঞানবিচারে একটু ভুল হলেই মুস্কিল। কর্ম করতে গেলেও অহংকার-অভিমান এসে যাবার ভয় থাকে।

নামটি পৃথিবীর মানুষ জানত না। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরু নিজে পৃথিবীতে এসে নামটি দিয়ে না-গেলে উপায় ছিল না তা পাবার। নাম ছিল গোলকে অর্থাৎ প্রাণের কেন্দ্রে। দেবাদিদেব মহাদেব যোগেশ্বর শিব ছাড়া এই নাম কেউ দিতে পারেন না। গুরুর সঙ্গে শিব যুক্ত আছেন বলেই গুরু এই নামটি দেন।

মহাপুরুষদের কাছে শোনা যায় যে, বিশেষ একটি নাম দিয়ে আরম্ভ করলেই হয়। তবে তা পরে সব নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সব নামই সমান, এক স্থান থেকেই ওঠে। ওষুধ যেমন ভিন্ন ভিন্ন potency-র থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই রোগ সারানো। নামের উদ্দেশ্যও ভববন্ধন থেকে মুক্ত করা। তাই যে কোনও নামই শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসযুক্ত হয়ে করে গেলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরেকটি গল্প বললেন।

মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে এক বিরাট নামসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। একদিন রাজার সঙ্গে দেখা হওয়াতে রাজা বললেন—তুমি যে নাম করছ, এই নামে কী আছে? নামদেব ছোট একটি ফলের বীজ তাকে দিয়ে বললেন—এই বীজ থেকে কী হবে?

রাজা—এই বীজ থেকে গাছ ও ফল হবে।

নামদেব—তাহলে সেই নামের থেকেও পবে সব কিছুর বিকাশ হবে।

রাজা—বড় সুন্দর উপমা দিয়ে সব বোঝালেন তো। সব নাম থেকেই যে ঈশ্বর প্রকাশ হবেন তার প্রমাণ কী?

নামদেব একটি তুলসীপাতা দিয়ে বললেন—এর মধ্যে নাম লিখে দিলাম আপনি তুলাদণ্ডে মিলিয়ে দেখুন। নামদেব তুলসীপাতাটি দেবার সময় প্রার্থনা করে বললেন—তোমাব নামের মহিমা আমি বলেছি, এখন সে মহিমা যাতে বজায় থাকে সে ব্যবস্থা তুমিই কর।

রাজা তুলাদণ্ডের এক দিকে নাম লেখা তুলসীপাতাটি রাখলেন এবং আবেক দিকে সমস্ত ধনসম্পত্তি দিয়ে দেখলেন তুলসীপাতাটিই ভারী।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নামের মহিমা প্রসঙ্গে বললেন—নাম কবতে করতে যখন নিজেকে একেবারে নামের মধ্যে হারিয়ে ফেলবে তখনই নামের মহিমা বুঝতে পারা যাবে। বর্ণপরিচয় না-হলে বিরাট বিরাট গ্রন্থ পড়বে কী করে ? নামটাও হল বর্ণপরিচয়। দেহ-মন-প্রাণে harmony না-থাকলে নাম জাগ্রত হবে কী করে? সারাদিন কাজের মধ্যে নামটি যদি করে যেতে থাক তবে সব সহজ সরল হয়ে যাবে।

১৫। ৭। ৭০

৯৬

ভগবানকে কেউ চায় না, ভূমাকে কেউ চায় না, চায় শুধু নিজের প্রয়োজনের বস্তু। ভগবানকে ভগবানই স্বয়ং চান।

এক চাষির একটি বলদ ছিল। বলদটির অবস্থা এমন হল যে, আর সে হাল বইতে পারত না। রাতে বলদটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—ভগবান কবে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে এই হাল বহন করা থেকে? আর হাল বইতে পারছি না, বড় কষ্ট হচ্ছে। তার পরে চাষি একদিন বলদটি বিক্রি করে দিল। একজন বলদটি কিনে তাকে গরুর গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিল। সেখানে গিয়ে বলদটির আরও কষ্ট হতে লাগল। মালভর্তি গরুর গাড়ি টানতে তার ভয়ানক কষ্ট হল। তখন বলদটি আবার ভগবানকে স্মরণ করে বলল—ভগবান এত ভারী মালবোঝাই গাড়ি টানতে যে আরও কষ্ট হচ্ছে, এ তুমি কী করলে আমার ?

ভগবান—তুই যে চেয়েছিলি হাল বহন করার কাজ থেকে মুক্তি, তাই তো এই ব্যবস্থা করা হল।

বলদ—গাড়ি আর টানতে পারছি না। তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে দাও।

কয়েকদিন পরে বলদটি একটি গর্তে পড়ে যাওয়াতে গাড়ির মাল সব পড়ে যায়। বলদটিকে একেবারে বুড়ো ও অকর্মণ্য ভেবে গাড়ির মালিক তাকে এক কলুর কাছে বিক্রি করে দিল। কলু তার ঘানির মধ্যে তাকে জুড়ে দিল। সেখানেও বলদের খুব কষ্ট হল। দিনরাত ঘানি টেনে টেনে অস্থির হয়ে পড়ল। দুঃখ করে বলদটি ভগবানকে স্মরণ করে বলল—এই জন্যই বুঝি তুমি আমাকে বানিয়েছ, সারাজীবন শুধু কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ। খোলা মাঠে ময়দানে আমার ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে। তুমি সেই ব্যবস্থাই করে দাও এবার। ভগবান সেই ব্যবস্থাই করলেন। খোলা মাঠে ময়দানে প্রাণের আনন্দে ছুটে বেড়াতে লাগল, কিন্তু ঘাস, জল নেই—খিদেতে প্রাণ যায় তার।

বলদ আবার ভগবানকে বলল—আমি যে খিদেতে কষ্ট পাচ্ছি। তুমি তো ভগবান, আমার খাবারের কোনও ব্যবস্থা করলে না? তারপর কান্নাকাটি করার পরে তার খাবার ব্যবস্থাও হল। তার পরে ঘাস, জল খেয়ে তার পেট খারাপ হল। তখন বলদ আর কী করে—চুপচাপ পড়ে থাকে। ভগবানকে আর কতবার সে বলতে যাবে? কোনওবারই তো সে ঠিক মতো চাইতে পারে না। তখন ভগবান তাকে তাঁর খাসমহলে নিয়ে এলেন—সে হল খাসমহলের বলদ, মানে যে বল দেয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবান নিজেই ভগবানকে চান। মানুষের মধ্যে শিবই জীব হয়ে এসে শিবকে চান।

১৭। ৭। ৭০

৯৭

গুরু ছাড়া কেউ নাম দিতে পারেন না। শিব গুরু, গুরু শিব। তাঁর উপরে কোনও দেবদেবী নেই। গুরু মানে পূর্ণ। শিব হলেন দেবতার দেবতা। সব দেবতা শিবকে বন্দনা করেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একসময় বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল, ফলে ঝগড়া ও মান অভিমান শুরু হল। নারায়ণ লক্ষ্মীর কোনও একটি বায়না পূরণ করেননি, এই নিয়েই তাঁদের ঝগড়ার সূত্রপাত। যেমনটি ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হয় সে রকম ব্যাপার। নারায়ণ মন ভার করে কৈলাসে শিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন শিব ধ্যানমগ্ন। শিবের ধ্যান ভাঙবার পরে নারায়ণ শিবকে প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর, তুমি তো বেশ মজায় আছ। কী করে এত আনন্দে আছ? আর এদিকে আমি বড় ঝামেলায় আছি। সংসারে গোলমাল ও ঝামেলা লেগেই আছে, আর ভাল লাগে না।

শিব সব শুনে বললেন—কর্তৃত্বভারটুকু ছেড়ে দিতে হয় মায়ের উপরে। কর্তৃত্বভারটুকু রাখতে গেলেই গোলমাল। দেখ না, সব ভার পার্বতীর উপর ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু পরমতত্ত্বের নামটি নিয়ে আছি। ফলে আর কোনও গোলমাল, অশান্তি নেই।

নারায়ণ শিবের কাছ থেকে এই কৌশলটি জেনে পরমতত্ত্বের নাম দীক্ষা নিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে এলেন। বৈকুণ্ঠে এসেই নারায়ণ নাম করতে বসে গেলেন। নাম করতে করতে তিনি যোগনিদ্রায় ডুবে গেলেন। লক্ষ্মীঠাকুরানি ভাবলেন যে, এবার তো আরেক ফ্যাসাদ হয়ে গেল। লক্ষ্মীও তখন কৈলাসে পার্বতীর কাছে এলেন। পার্বতীকে তিনি বললেন—তোমরা কী করে সংসার কর? আমি তো একটির পর একটি ঝামেলা নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি।

পার্বতী বললেন—আমি তাঁর নাম নিয়ে সব করি। সব কাজই যথারীতি করে যাই আমি মহাদেবের নাম করে এবং কর্মফলটিও আমি নিজের করে রাখি না। তাঁর চরণেই সব সঁপে দিই, ফলে আমি কোনও কিছুতেই আর বিব্রত হই না।

লক্ষ্মীদেবীও পার্বতীর কাছে কর্মের কৌশল শিখে বৈকুণ্ঠে ফিরে এলেন এবং নারায়ণের ধ্যান করতে বসে গেলেন। লক্ষ্মী ধ্যানে রত হবার পরেই নারায়ণের ধ্যান ভেঙে গেল। স্বরূপ যে আধা-আধার ধ্যান করছে। এই ভাবে লক্ষ্মী মহালক্ষ্মীতে এবং নারায়ণ মহাবিষ্ণুতে transformed হয়ে গেলেন। অদ্বয়তত্ত্বের দ্বৈতবিলাস, একে অপরের পরিপূরক ও সম্পূরক। অথচ এক দুই হয় এবং দু'য়ের মধ্যে প্রকাশ পায়। আবার অদ্বয় ভাববোধেও প্রকাশ পায়। তত্ত্বত অদ্বয় অদ্বয়ই থেকে যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—পতি পরমগুরু—এটা শাস্ত্রের শিক্ষা ছিল। কিন্তু এটা এখন বেশির ভাগ লোকই ভুলে গিয়েছে। শিবঠাকুরকে পার্বতী মনুষ্যবোধে গ্রহণ করেননি, পরমগুরু পরমেশ্বর বোধে মেনে নিয়েছিলেন। শিবঠাকুরও তাঁকে পরমাপ্রকৃতি, আত্মশক্তি, ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মশক্তি রূপে গ্রহণ করেছিলেন, মায়াশক্তি বা অবিদ্যাশক্তি রূপে গ্রহণ করেননি।

২১। ৭। ৭০

৯৮

সাধকদেরও কম পরীক্ষা দিতে হয় না। ঈশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত হতে গেলে সকল রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নাম, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এ সবই প্রতিবন্ধক হয়। তখন বলতে হয়—তুমি ভার নাও, তুমি চালাও। আমাকে ভার দিও না। সাধকের সঙ্গে ঘুরলে অনেক রহস্যজনক ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার এক সাধক বলেছিলেন—ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শহরতলিতে এক গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। প্রথম দিন খুব অসোয়াস্তি হল, দ্বিতীয় দিনও তাই হল, কিন্তু কারণ বুঝতে পারলাম না। তৃতীয় দিন বুঝতে পারলাম যে, সেখানে গুপ্তধন রয়েছে মাটির নিচে। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে, আপনি তো সাধু মানুষ, আপনাকে পালাতে হল কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ওইখানে

কয়েকদিন থাকার পরে মনে হল, যদি মুহূর্তের জন্যও আমার ভিতরে লোভ এসে যায়—এই ভয়েই চলে গেলাম।

জ্ঞানী কভু বিষয়সঙ্গ করেন না, বিষজ্ঞানে বিষয়সম্পদ পরিহার করেন। তাঁর কাছে সম্পদের অর্থ সমপদ—একবোধ অর্থাৎ অদ্বয়বোধ। তা-ই হল স্ববোধ-আত্মা। জ্ঞানী অদ্বয় বোধাত্মাতে শান্তিতে অবস্থান করেন।

২২। ৭। ৭০

৯৯

সূক্ষ্ম শক্তি ও সূক্ষ্ম দেহেরও প্রতিকূল-অনুকূল অবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বললেন।

এক সাধু কয়েকজন ভক্ত নিয়ে এক গৃহস্থবাড়ির সামনে আম গাছের তলায় বিশ্রাম করছিলেন। অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে তারা সেখানেই থাকবেন, এই রকম স্থির করলেন। কিন্তু রাত গভীর হতেই সাধক তাঁর ভক্তদের বললেন—এক্ষুনি এই স্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভক্তরা ভাবল, এত রাতে কোথায় যাবে তারা! সেই রাতটুকু সেখানেই তারা থাকতে চাইল। কিন্তু সাধক কিছুতেই সেখানে থাকতে রাজি হলেন না। সেই রাতেই ভক্তদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। সেখানে সেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই নূতন স্থানে গিয়ে সাধু ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করলেন আসল ঘটনা—কেন তিনি স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন। তিনি ভক্তদের বললেন—ওখানে আম গাছের নিচে কয়েকজন লোককে কবর দেওয়া হয়েছিল। তাদের আত্মাগুলি অসুবিধা বোধ করছিল। কিছুক্ষণ থাকলেই সকলে টের পেতে। সেই জন্যই স্থান ত্যাগ করে চলে আসতে হল।

গাছপালা, বৃক্ষলতা, পুকুর—এ সবগুলিরই যেমন কতগুলি প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিণামপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ জীবাত্মারও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিণামপ্রাপ্তি হয়। তারা দ্বৈত অবিদ্যা-অজ্ঞানের বিকারমুক্ত হয়ে স্ববোধ-আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২। ৭। ৭০

১০০

কোনও কোনও সাধু মহাত্মা বিশেষ বিশেষ জায়গায় ইচ্ছে করেই থাকেন যদি কারওর কোনও কল্যাণ হয় সেই জন্য। অনেক সময় দেখা যায় কোনও মহাত্মা শিষ্যদের নিয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোথাও বসে পড়েন এবং শিষ্যদের বলেন নাম করতে। এই ভাবে কিছুক্ষণ নাম করার পর হয়ত সেই স্থান ছেড়ে চলে যান।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার এক পোড়োবাড়িতে এক সাধু দুই ভক্তকে নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাধু বুঝতে পারলেন যে, উইয়ের ঢিবির উপরে তারা বসে আছেন।

সাধু ভক্তদের বললেন—চল অন্যত্র যাই। উইদের অসুবিধা করে লাভ কী? ভক্ত বলল—জল ঢেলে দিলেই উই পালিয়ে যাবে।

সাধু—উইরা যখন দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করবে তখন সামলাতে পারবে? আর তা ছাড়া আমরাই বা তাদের শান্তির ব্যাঘাত করতে যাব কেন? আমবা অন্যত্র চলে যাই। তক্ষুনি সাধু ভক্ত দু'জনকে নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রকৃত সাধুব, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে adjust করার অভিজ্ঞতা থাকে বলে তাঁরা কারওকে কষ্ট না-দিয়ে চলেন। স্থির মনে থাকেন বলে তাঁরা এ সব reading ধরতে পারেন, সাধারণ লোক তা পারে না।

২২। ৭। ৭০

১০১

ভগবানকে যে চায় এবং তাঁকে যে বহন করবে তার সহ্যশক্তি থাকা দরকার। সহ্যের উপরে আর কোনও সাধনা নেই। সংসারে থেকে যারা সয় তাদের কখনও নাশ হয় না। ভক্তি নিয়ে যে ভক্ত ভগবানকে ডাকে ও ভগবানের নামটি নিয়ে পড়ে থাকে তার কোনও রকম দুঃখকষ্টই গায়ে লাগে না।

এক বাড়িতে এক বুড়ো কাজ কবত। সে ছিল খুব ভক্ত। সারাদিনই সে মনে মনে নাম করে আর কাজ করে। বয়স হয়েছে বলে কানে সে একটু কম শুনত। বাড়ির লোক অনেক সময় তাকে গালাগালি করত, বকাবকি কবত। কিন্তু সে কিছুই বলত না, শুধু মুচকি মুচকি হাসত। কেউ কোনও কাজের ফরমাশ দিলে সবই হাসিমুখে করত, কিন্তু কানে কম শোনার দরুন যদি সেটা শুনতে না-পেত তবে সেই কাজ করত না। তখন তাকে খুব বকুনিও খেতে হত। এমন দিনও গিয়েছে যে, কেউ হয়ত রেগে তার গায়েই হাত তুলত। এই ভাবে দিন যায়। সেই বাড়িতে একবার মালিকের এক বন্ধু বেড়াতে এসেছেন। তিনি ছিলেন খুব ভক্ত।

মালিকের বন্ধু একদিন দেখলেন যে, বুড়োটি কাজ করতে করতে বিড়বিড় করে নাম করছে। তিনি খেয়াল করে দেখলেন বুড়োর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বন্ধুটি বুড়ো চাকরটির এই অবস্থা দেখে খুবই অবাক হয়ে গেলেন ও অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর সুযোগ বুঝে তিনি একসময় মালিককে বললেন—বন্ধু, তুমি বড় ভাগ্যবান। মালিক বললেন—আজ আমাকে হঠাৎ ভাগ্যবান বলছ কেন?

বন্ধু—যে বস্তু টাকা দিয়ে বাজারে মেলে না সেই রকম এক বস্তু তোমার ঘরে তোমার কাছেই রয়েছে। অথচ তোমরা কিছুই জানতে পারছ না, বুঝতেও পারছ না। যাকে তোমার সেবা করা উচিত সে তোমার সেবা করছে। তোমাকে ভাগ্যবান বলব না তো কাকে বলব, তুমিই বল? আচ্ছা এই বুড়ো চাকরটিকে আমার কাছে দাও না, আমার কাছেই থাকবে।

মালিক একটু ভেবে বললেন—দেখি বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে যদি বুড়ো রাজি হয় তাহলে তুমি নিয়ে যেও সঙ্গে করে।

পরের দিন মালিক বুড়োকে ডেকে পাঠালেন। বুড়ো মালিকের কাছে এসে করুণ ভাবে বলতে লাগল—বাবু, এতদিন আপনার নিমক খেয়ে এলাম, আপনি আমাকে অন্য জায়গায় পাঠাবেন না। বুড়োর কথা শুনে মালিক তো অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে, বুড়োর তো জানবার কথা নয়—এই অন্যত্র পাঠাবার প্রস্তাবটি। মালিক জিজ্ঞাসা করল বুড়োকে—তোমাকে কি অন্য জায়গায় যাবার কথা কেউ বলেছে?

বুড়ো—না বাবু, কেউ কিছু বলেনি। আমার মনের ভিতর থেকেই কথাটি উঠেছে তাই আপনাকে বললাম। দয়া করে আপনি আমাকে অন্য কোথাও পাঠাবেন না।

মালিক—বেশ তাই হবে। এখানেই তুমি থাক, তবে তোমার আর কোনও কাজ করতে হবে না। অনেকদিন তো কাজ করেছ, এখন কিছুদিন তুমি বিশ্রাম কর।

বুড়ো—কাজ ছাড়া আমি কী করে থাকব? আমাকে এমন অনুরোধ করবেন না।

মালিক—তাহলে তুমি ঠাকুরঘরের কাজ কর, বিগ্রহসেবা কর। আজ থেকে এ-ই তোমার কাজ হবে।

বুড়ো তাতে রাজি হল। মালিক বন্ধুকে বললেন সব কথা। বন্ধু বললেন—এই বুড়োটি সাধারণ লোক নয়। যাঁকে তুমি ঠাকুরঘরে বিগ্রহের মধ্যে পূজা কর এই বৃদ্ধ চাকরটি কিন্তু তিনি-ই।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন মালিক ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখেন বিগ্রহমূর্তি নেই, সেই স্থানে বুড়ো চাকরের মূর্তি। নিজের চোখকেও যেন মালিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি চোখ রগড়ে রগড়ে ভাল করে দেখলেন যে, বিগ্রহমূর্তির মধ্যে বৃদ্ধ চাকরের রূপ। তাড়াতাড়ি মালিক বুড়ো চাকরটির কাছে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন বুড়ো চাকর যেখানে বসে আছে সেখানে তার জায়গায় রয়েছে বিগ্রহমূর্তি। এই দেখে মালিক লম্বা হয়ে শুয়ে সেই বুড়ো চাকরের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ চাকরও মালিকের পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করল। দু'জনেই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আছে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে।

মালিকের স্ত্রী, সন্তানরা এ সব দেখে তো হতভম্ব। তারা ভাবল, মালিকের কি মাথাই খারাপ হয়ে গেল, কে জানে। মালিক সেই দিন বাড়ির সকলকে ডেকে নিষেধ করে দিলেন যেন বুড়ো চাকরকে আর কেউ কোনও কটু কথা না-বলে। এই বুড়ো সাধারণ লোক নয়, তার প্রতি যেন ভাল ব্যবহার করা হয়।

সেই থেকে বাড়ির লোকেরা বুড়োকে আর কোনও কাজ করতে দিত না এবং খুব ভাল ব্যবহারও করত। বেশ কিছুদিন পরে বুড়ো সেই বাড়িতেই দেহরক্ষা করেছিল এবং বাড়ির মালিকও পরবর্তীকালে সেই বুড়ো চাকরের নাম করতে করতেই খুব উচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সইতে যে না-পারে সে কখনও ভক্ত হতে পারে না। মার খেতে খেতে যখন সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা এসে যায় তখনই সে ভক্ত হয়, তার আগে নয়।

২৪। ৭। ৭০

১০২

গুরুবোধে সব গ্রহণ করলে কামনাবাসনা ও ভোগের ইচ্ছা চলে যায়।

সদ্‌গুরু, মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায়—যে বস্তু থেকে লোভ, কামনাবাসনা প্রভৃতি আসে সেই বস্তুকে তাঁরা প্রণাম করেন গুরুবোধে, মাতৃবোধে বা ইষ্টজ্ঞানে। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে লোভ, মোহ ও অজ্ঞানতা চলে যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ঘটনার কথা বললেন।

প্রণবানন্দ স্বামীজি একবার কার্যোপলক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। তখন সন্তানরা তাঁর কাছে এল সেবা করার জন্য। একজন সন্তানকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী রান্না হয়েছে আজ? সন্তানটি জানাল, ছোলার ডাল ও তরকারি রান্না করা হয়েছে। ছোলার ডাল তৈরি হয়েছে শুনে, 'আঃ!' বলে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হল, আমার এ কী হয়েছে? সন্ন্যাসী হয়ে সব ত্যাগ করে চলে এসেছি অথচ এখনও লোভ রয়েছে এই সামান্য ছোলার ডালের জন্য। তিনি কেঁদে ফেললেন। আক্ষেপ করে তিনি বললেন—এ কী করলে ঠাকুর? ছোলার ডাল শুনে আনন্দ হল, এখনও এত লোভ রয়েছে?

খাবার যখন এল তখন মনে মনে বললেন—ভগবান তুমি এই বেশে এসেছ, তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি। ভগবানবোধ আসাতে সেই মুহূর্তেই লোভ চলে গেল তাঁর। এই ভাবেই লোভকে, কামকে জয় করতে হয়। প্রণাম করলে নিজেকে দিয়ে দেওয়া হয়, মান দেওয়া হয়, কিন্তু অভিমানে শুধু নিজেকে আলাদা করে রাখা হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সদ্‌গুরু ও মহাপুরুষদের বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তাঁরা চুপচাপ বসে আছেন, কিন্তু আসলে এক মুহূর্তও তাঁরা কর্ম ছাড়া থাকেন না। They are always in action. তাঁদের চিন্তার প্রবাহ নানা জায়গায় গিয়ে মানুষের অন্তরে শুভ প্রেরণা জাগায়। তা প্রতিনিয়ত দূর দেশান্তরে গিয়েও কী ভাবে যে কাজ করে সে সব মানুষ জানতেও পারে না। মাবাবা সন্তানের জন্য যে মঙ্গলচিন্তা করে যায় ঘরে বসে, সন্তান বহু দূরে দেশান্তরে থাকলেও সেই মঙ্গলচিন্তার প্রবাহ তাদের রক্ষা করে। শিষ্য যদি বহুদূরে থেকেও কোনও মহাপুরুষকে বা সদ্‌গুরুকে চিন্তা করে তক্ষুনি তিনি তা বুঝতে পারেন এবং শিষ্য বা ভক্ত যদি কোনও বিপদে পড়ে থাকে তাহলে তাকে উদ্ধার করেন।

গুরুর বা মায়ের কাছে কোনও ভয়ভাবনা থাকে না। বিশ্বাস রেখে সদ্‌গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে হয়। তা না-হলে তিনি কেন করবেন? Bank-এ টাকা না-থাকলে যেমন

সুদ পাওয়া যায় না, সেই রকম সদ্‌গুরুদের বা মহাপুরুষদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না-রেখে হঠাৎ ডাকলে চট করে সাড়া পাওয়া যায় না, সময় লাগে একটু। অবশ্য যে মুহূর্তে ডাকা হয় সেই মুহূর্ত থেকেই একটা যোগাযোগ হয়ে যায়। এই ভাবে শুরু করলে আস্তে আস্তে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়।

২৬। ৭। ৭০

১০৩

আমরা বই থেকে সত্যের বুলি আওড়াই কিন্তু জীবন থেকে যে সত্য ফুটে বেরোচ্ছে তা গ্রহণ করি না। জীবনের মধ্যে সত্যের Infinite প্রকাশ হয়ে চলেছে। আমাদের মধ্যে যা-কিছু সবই Consciousness নিজেই play করে যাচ্ছে। সমস্ত কিছু Infinite force-এর খেলা। আমাদের মধ্যে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধি সবই তো তাঁরই খেলা। দেহের মধ্যে যা প্রকাশ হচ্ছে তাও তো আমি—আমি-র বুকে শক্তি খেলছে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে একটি গল্প বলতে আরম্ভ করলেন।

এক class-এর সাধক আছেন যাঁদের পাগল পাগল দেখায়, তাঁরা প্রেমিক সাধক। এই রকমই একজন সাধকের পায়ে ঘা হয় এবং ঘায়ে পোকা কিলবিল করছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনও খেয়ালই নেই। সাধকের পায়ের এই অবস্থা দেখে এক ভক্ত ভাবল, সাধককে একটু সেবা করবে। সে পোকাগুলি দূর করবার জন্য ঘায়ে একটু ফিনাইল ঢেলে দিল। সাধক তো চটে গেলেন। তাকে বললেন—তোমার কোনও ক্ষতি হয়েছে কি? পোকাগুলি এখানে আশ্রয় পেয়ে পুঁজ খাচ্ছিল, তুমি কেন তাদের নিরাশ্রয় করছ? সাধকের চেঁচামেচি শুনে সেখানে লোক জড়ো হল। তারা সাধককে চিনত। তারা এসে সেই ভক্তটিকে বলল—করছেন কী? এই সাধক সাধারণ কেউ নন। ইনি স্বয়ং ভগবান। এঁকে চটাবেন না। এঁর বাইরের আচরণ এই রকমই। এ সব দেখে ভিতরের পরিচয় কিছুই বোঝা যাবে না। বাইরে উন্মাদ, কিন্তু ভিতরে প্রেমঘন রসবড়া। রাস্তার কুকুরকে ডেকে খাওয়ান, আদর করেন, চুমু খান। পাখিদের ডেকে ডেকে সব খাবার খাইয়ে দেন। অদ্ভুত চরিত্র তাঁর। এ রকম পাগল জগতে দু-একজনই থাকেন।

কয়েকদিন পরে দেখা গেল দু'জন যুবক সাধুর ওখানে এসেছে এবং খুব মহোৎসব লাগিয়েছে। কোথা থেকে যে নানা রকম খাদ্যসম্ভার জোগাড় হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অনবরত লোক আসছে এবং খুব ধুমধাম সমারোহ করে খাওয়ানো হচ্ছে সবাইকে। পর পর ক'দিন এ রকম হয়ে চলেছে। তখন একদিন সেই পাগল সাধক যুবকদের মধ্যে একজনকে ধমকে বললেন—খুব সিদ্ধাই হয়েছে, লোকজনদের খুব শক্তি দেখাচ্ছ, তাই না? দেখি তোমার কত শক্তি। তুমি সামলাও। এই কথা বলেই একখণ্ড পাথর তাকে দিয়ে বললেন—ধর, দেখি তোমার কত শক্তি। যুবকটি পাথরের

খণ্ডটা ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আরেকজন লোক তাকে বলল—সাবধান, তুমি এটা ধরতে যেও না।

সাধক তখন যুবক দু'টিকে খুব ধমক দিয়ে বললেন—কারওকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস দিতে পার না, শক্তির খেলা দেখাতে এসেছ? ঘরে চলে যাও, ভোগী কোথাকার। ঘরে গিয়ে সকলের সেবা কর।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—'ভগবান' সামনে বলি আমরা, কিন্তু এঁদের touch-এ এলে বোঝা যায় সত্যের কী সাংঘাতিক অভিব্যক্তি হতে পারে। সত্যের মধ্যে বুজরুকির স্থান নেই। মুক্ত অবস্থার কত expression হতে পারে! বামাক্ষেপাকে দেখা গিয়েছে শিয়াল, কুকুরের সঙ্গে একসঙ্গে খাচ্ছেন, কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখা যেত প্রায় সব সময় গঙ্গাবক্ষেই ভেসে বেড়াচ্ছেন, আবার ঠিক ঐ একই সময়ে দেখা গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেব 'মা, মা' করছেন আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে নিয়ে ঘরে বসে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করছেন। কারও সঙ্গেই কারওর জীবন মেলে না।

সচ্চিদানন্দঘন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-আত্মার স্বরূপ মহিমা ও স্বভাব মহিমা জীবনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। সর্বজীবন ঈশ্বরের অংশভূত হলেও বা স্বয়ং ঈশ্বর সেই রূপে অভিব্যক্ত হলেও সবার মধ্যে তাঁর সত্যস্বরূপের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় না। আবার যাঁদের মধ্যে তা প্রকাশ পায়, সর্বসাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না এবং সহজে মানতেও পারে না। সাধারণ মানুষের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য সবই সীমিত। তাদের মতো যারা, তাদের নিয়েই তাদের জীবন কাটে। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহান ও জ্ঞানীগুণীদের তারা বুঝতে পারে না, জানতেও পারে না। তারা ভয়ে অনেক সময় তাঁদের কাছে যায় না। শক্তি-জ্ঞানের নিম্ন ভূমিতে মোহ-আসক্তি, দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রভাব বেশি। দ্বৈতবোধেই যত ভেদজ্ঞানের আধিক্য বেশি। অপর অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, বাহাদুরি করা এবং নিজের যোগ্যতার মান না-বুঝে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করা অজ্ঞানেরই লক্ষণ। সংসারে অজ্ঞানীদের সংখ্যাই বেশি। সংসারধর্ম পালন না-করে মানুষ জ্ঞানলাভ করতে পারে না এবং জ্ঞানলাভ না-হলে অমৃত মুক্তি শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। সেবাধর্ম আচরণের মাধ্যমে সংসারী মানুষ ঈশ্বর-আত্মার কৃপা লাভে যোগ্য হয়। ঈশ্বরের কৃপা যারা পায় তারা দিব্যগুণের অধিকারী হয়ে পরিশেষে ঈশ্বরের আপন হয়ে যায়। তখন তাদের মধ্যে আর দ্বৈতবোধের প্রভাব থাকে না। অদ্বৈতবোধ হল আপনবোধ। তাতে আত্মপ্রেম উছলে পড়ে।

২৮। ৭। ৭০

পঞ্চম অধ্যায়

১০৪

শ্রদ্ধা সহকারে নত ও নম্র হয়ে গুরুর কাছে গেলে তবেই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। একবোধের ব্যবহার শিখতে হলে মহতের বা গুরুর কাছে যেতে হয়। যাঁর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর কাছে গিয়ে নত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে তা শিখতে হয়। যিনি জানেন, যাঁর অভিজ্ঞতা আছে, তাঁর সাহায্য ছাড়া তা পাওয়া যায় না। একমাত্র গুরুর বা মহতের কাছেই তা পাওয়া যায়। যারা আমাদের চেয়ে লঘু তারা আবার আমাদের কাছেই আসে। এই ভাবেই ধারাটা চলে এসেছে। ঋষিযুগের একটি গল্প বলছি শোন।

এক শিষ্য তার গুরুকে একদিন প্রশ্ন করল—এই উগ্র প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা কী উপকার পাচ্ছি?

গুরু—এ যে ভীষণ তা কী করে জানলে? বোধকে বাদ দিয়ে কি ভীষণ বলা যায়? এই বোধটি আছে বলে এবং ভীষণ সম্বন্ধে বোধ দেবে বলেই বোধ ভীষণ বা উগ্র রূপ নিয়ে এসেছে।

শিষ্য—অন্য উপায়ে কি এই ভীষণতা বা উগ্রতার বোধ দেওয়া যায় না?

গুরু—আগুনের বোধ দিতে গেলে আগুন দিয়েই দিতে হবে। জলের সাহায্যে যেমন আগুনের বোধ দেওয়া যায় না, সেইরূপ ভীষণের বোধ উগ্ররূপ বা ভীষণরূপ ছাড়া অন্য কোনও ভাবে পাওয়া যায় না।

শিষ্য—জীবন না-হলে ব্রহ্ম কী করে প্রকাশ হবে?

গুরু—ব্রহ্মকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। ব্রহ্ম জীবন ছাড়াও প্রকাশ হয়। জীবন ছাড়া যা, তা অব্যক্তের প্রকাশ, নির্গুণব্রহ্মের প্রকাশ।

শিষ্য—কোন প্রশ্নের উত্তর পেলে আর কোনও প্রশ্নই থাকে না এবং উত্তর পাবারও আর প্রয়োজন থাকে না?

গুরু—জ্ঞান কী বস্তু, বোধ কী বস্তু—এই প্রশ্ন যখন জাগবে ও তার উত্তর পাবে তখন সব কিছুর সমাধান হবে। তখন জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না।

শিষ্য—জ্ঞান কী বস্তু? তা কী করে জানব?

গুরু—অজ্ঞান কী বস্তু তা কি জান?

শিষ্য—অজ্ঞান কী বস্তু তা জানি।

গুরু—কী করে বলছ? অজ্ঞানবোধের পূর্বেও একটা জ্ঞান ছিল যে, আমি তা জানি না। তাহলে প্রমাণ হয় যে, জ্ঞান তখনও এক বিশেষ ভাবে তোমার মধ্যে ছিল।

একেবারে জ্ঞানশূন্য কখনওই কেউ হতে পারে না। জীবনে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার ব্যবহার নানা ভঙ্গিমায় হয়। দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের মাধ্যমে যে জ্ঞান হয় তা হল ব্যবহারিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনুভূতিকেই জাগ্রৎ অবস্থা বলে। দেহ-ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ কেবল মানসিক জ্ঞান হয় স্বপ্নাবস্থায় ও ধ্যানাবস্থায়। বাকি যা-কিছু তাকে প্রাতিভাসিক জ্ঞান বলা হয়। গাঢ় নিদ্রা অবস্থায় মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি অব্যক্ত কারণে লীন থাকে। এই সময় কোনও ইন্দ্রিয়-মনের জ্ঞান বা জাগতিক জ্ঞান থাকে না। গাঢ় নিদ্রা অবস্থাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় জীবের অন্তঃকরণবৃত্তি অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-অহংকারের কোনও কাজই থাকে না বলে তা হল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা, ত্রিগুণাপ্রকৃতির সাম্য অবস্থা বা কারণ অবস্থা। জ্ঞানের কোনও ব্যবহারই সেখানে সিদ্ধ নয় বলে জীবের পক্ষে তা অজ্ঞাত অবস্থা। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা-ই হল তাঁর প্রকৃতি। তার উর্ধ্বে হল বিশুদ্ধ জ্ঞান, গুণাতীত জ্ঞান। তা অখণ্ড জ্ঞান বা পারমার্থিক জ্ঞান। কথিত জ্ঞানের আগে এক প্রকার জ্ঞান বা বোধ ছিল তোমার। আবার যাকে জ্ঞান বলছ সেই জ্ঞান হবার পরে অন্য প্রকার জ্ঞান বা বোধ হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, জ্ঞান বা বোধ তোমার common ছিল সর্ব অবস্থাতেই। তবে ব্যবহারের শুধু পার্থক্য। তুমি একবার বলছ 'জানি না', একবার বলছ 'জানি'—এ হল বোধসত্তার ব্যবহার। নির্গুণ আর সগুণ তাঁর স্বভাব। 'হ্যাঁ' ও 'না' তাঁর প্রকাশ। সামনে-পিছনে, অধঃ-উর্ধ্বে, ডানে-বাঁয়ে সর্বত্রই তাঁর স্থিতি ও গতি। আবার 'হ্যাঁ'-তে বা 'না'-তেও তিনি আছেন সমান ভাবেই। এই হল তাঁর স্বভাব।

শিষ্য—স্বভাবে তিনি যা করছেন, তার উদ্দেশ্য কী?

গুরু—উদ্দেশ্য হল শুধু বোধের খেলা। বোধের খেলা খেলতে খেলতে তিনি বিশ্বরূপে ছড়িয়ে রয়েছেন।

শিষ্য—আমি তো জানি না যে আমি ব্রহ্ম।

গুরু—আমি কিন্তু সচেতন যে আমি ব্রহ্ম। তুমি যে বোধ দিয়ে বলছ তুমি জান না তুমি ব্রহ্ম, সেই বোধ দিয়েই পরে বলবে তুমি ব্রহ্ম। বোধ তোমার ভিতরেই আছে। এই বোধের কখনও অভাব হয় না। এই বোধের অনুভূতিকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

শিষ্য চলে গেল। এক বছর পরে আবার তার গুরুর সঙ্গে দেখা হল। গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী অনুভব করছ?

শিষ্য উত্তর দিল—আপনিও নেই, আমিও নেই, আছে শুধু ব্রহ্ম। যা দেখছি তা শুধু বোধের ব্যবহার।

গুরু—এইবার তোমার যথার্থ ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে।

১১। ৮। ৭০

১০৫

এই পৃথিবীতে কেউ হারায় না। স্বয়ং ঈশ্বরই সাধুবেশে আমাদের মধ্যে আসেন, কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। নিজের ভিতরে সাধুবোধ জাগলে তবেই সাধুকে

চিনতে পারা যায়। নামের আশ্রয় নিলে সাধু ও ভগবানকে চেনা যায়। যে কোনও একটি নাম নিয়ে চললেই নামসাগরে সবাই পৌঁছবে। নামই ভগবান। এই কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন, সাংসারিক জীবনের ছোট একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল।

একটি ছোট ছেলে অল্পবয়সেই বাবামাকে হারাল। তখন সে দাদুদিদিমার কাছে গেল। তারাও মারা গেল। তার পরে অন্য আত্মীয়স্বজনের কাছে গেলে তারাও তাকে ফেলে চলে গেল।

ছেলেটির ভারী দুঃখ। সে কাঁদে আর বাবামাকে স্মরণ করে বলে—তোমরা আমাকে ফেলে তো চলে গেলে। আমি এত অলক্ষুনে যে, যার কাছেই যাই সে-ই আমাকে ফেলে চলে যায়। আমার কেউ নেই সংসারে। এই ভাবে মনের দুঃখে তার দিন কাটে।

একদিন সে এক পুকুরের ধারে গেল খুব জলতেষ্টা পেয়েছে বলে। সেখানে এক সাধু হঠাৎ এসে হাজির হলেন। সাধু ছেলেটিকে দেখে বললেন—তোর বাবামা নেই?

ছেলেটি বলল—না।

সাধু—তোর কে আছে? কেউ নেই?

ছেলেটি—না, কেউ নেই।

সাধু—তুই জানিস না তোর একজন খুব আপনজন আছেন। তুই যাবি তাঁর কাছে?

ছেলেটি—না, আমি যাব না। তাঁর কাছে গেলে তিনিও তো আবার মরে যাবেন। আমি খুব অলক্ষুনে, যার কাছেই যাই সে-ই মরে যায়।

সাধু—তিনি মরবেন না। তোর এমন একজন আপনজন আছেন যিনি মরেনও না, কারওকে মারেনও না।

সাধু ছেলেটিকে কিছু খেতে দিলেন। তারপর তিনি ছেলেটিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সাধুর সঙ্গে ছেলেটি সারাদিন থাকে। সাধু কিন্তু দীক্ষার কথা কখনও বলেন না। দু'জনে হরি নাম করে আর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সাধুর সঙ্গে থেকে থেকে ছেলেটি ভজন করে, নাম করে এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ছেলেটিকে সাধুই খেতে দেন আবার অসুখ করলে সেবাযত্নও করেন। এই ভাবে অনেক বছর কেটে গেল।

একদিন সাধু ছেলেটিকে বললেন—এবার তোর আপনজনের কাছে যাবার সময় তো হয়ে এসেছে। তুই এখানে এসে বস, আমি একটু ভজন করে নিই। ছেলেটি বসে রইল। সাধু ভজন করতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ ছেলেটি দেখল সেই জায়গাটি আলোকিত হয়ে গিয়েছে। সাধুর মধ্যে সে তার মাবাবা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে এবং অন্যান্য দেবদেবীদেরও দেখতে পেল। কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি দেখল সাধু আর নেই—অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। আর এদিকে ছেলেটির মধ্যেও অনবরত আপনা থেকেই নাম হতে লাগল।

সেই ছেলেটি পরে সেখান থেকে একলাই উঠে পড়ল। ছেলেটি নিরন্তর নাম করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। উত্তরকালে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে আনন্দ ও অমৃতের সন্ধান দিয়ে গিয়েছে এই ছোট ছেলেটি।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে ঈশ্বরের সত্য নামের মহিমা বোঝা যায়। কলি যুগে নামাবতারই জীবের উদ্ধার সাধন কববে। ঈশ্বর ও তাঁর নাম অর্থাৎ নামী ও নাম অভিন্ন বলে তাঁর নামাশ্রয়ে ভক্তজনের জীবনসাধনা নামময় হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করবে।

২৩। ৮। ৭০

১০৬

কার এ সংসার—

স্থাবর বলে আমার জঙ্গম বলে আমার
জীব বলে আমার দেবতা বলে আমার
মানুষ বলে আমার সংসার শুনে হাসেন ঈশ্বর বারংবার।।
সবে বলে আমি আমার
কেবা বলে সত্য ক'রে কেবা দেয় সব তাঁরে
যা নিয়ে সে অহংকার করে কোথা হ'তে পায় সব।
কেবা জানে কারণ তাহার কোথা হ'তে সব আসে বারবার।।
কে কর্তা কর্তৃত্ব বা কার
ভোক্তা কে ভোক্তৃত্ব কার কে জ্ঞাতা জ্ঞাতৃত্ব কার
কেবা করে সৃষ্টি স্থিতি আর কেবা করে পুনঃ সংহার
সবে বলে আমার আমার শুনে ঈশ্বর হাসেন বারবার।।

গানটি শেষ হতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর হাসিমুখে মাথাটি একটু নেড়ে বললেন—কে দেবে এর উত্তর? বড় কঠিন, বড় কঠিন এর উত্তর। যাঁর সংসার তিনি কিন্তু একবারও বলেন না 'আমার, আমার'। যে মন নির্ণয় করতে যায় সে হারিয়ে যায়।

'আমার দেবতা', 'আমার গুরু', 'আমার ইষ্ট' তাও বলতে পারছে না সে। এখানে এসেই জ্ঞানীগুণী, পণ্ডিত সব পড়ে যায় বেড়িতে। কে জ্ঞানবিচার করছে? কার জ্ঞান? যে মুহূর্তে 'আমি' ও 'আমার' বলছে ওইখানেই শেষ হয়ে যায় সে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এক মহাপুরুষের কাছে এসে অনেক জ্ঞানের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। মহাপুরুষ শুধু শোনেন ও হাসেন, কোনও জবাব দেন না। পণ্ডিত বারবার মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করছেন—শুনছেন তো আমার কথা? মহাপুরুষ জবাব দেন না, শুধু হাসেন। একসময় মহাপুরুষ পণ্ডিতকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

পণ্ডিত বললেন—অমুক চন্দ্র শাস্ত্রী।

মহাপুরুষ—কোথা থেকে এসেছ?

পণ্ডিত তখন নিজের বাসস্থানের কথা বললেন। মহাপুরুষ তখন তাকে কিছু জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

পণ্ডিত তার উত্তরে শাস্ত্রের আরও কিছু কথা শোনালেন। মহাপুরুষ বললেন—ওটা তো শাস্ত্রে আছে, তোমার কী আছে? শরীরটা কার?

পণ্ডিত বললেন—আমার।

মহাপুরুষ—সব ঝুটা হয়ে গিয়েছে। শাস্ত্র পড়া তোমার হয়নি।

পণ্ডিত—কী বলছেন আপনি?

মহাপুরুষ—এই যে জ্ঞানের কথা এতক্ষণ বললে, কার এগুলি? পণ্ডিতের তখন খেয়াল হল। তিনি বললেন—এ সব অর্জন করেছি।

মহাপুরুষ—তিনি দিয়েছেন বলেই তো পেয়েছ। আচ্ছা, আরও কিছু জ্ঞানের কথা বল।

পণ্ডিত—সব ভুল হয়ে গেল।

পণ্ডিতের কী যে হল কোনও কথাই আর বলতে পারেন না, সব বিস্মৃত হয়ে গেলেন। তখন তিনি মহাপুরুষের চরণে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মহাপুরুষের কাছেই তিনি থেকে গেলেন। কিছুদিন থাকার পর শাস্ত্রের কথা যা এতদিন শুনেছেন সে সব আবার নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে শুনতে পেলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, অন্যান্য শিষ্যভক্তরা মহাপুরুষের কাছে এসে 'আমি আমার' ব্যবহার করছে না। কেউ বলে গুরুর ইচ্ছা, কেউ বলে মায়ের ইচ্ছা, কেউ বা বলে ইষ্টের ইচ্ছা। এই সব শুনে তার মনে হল, এ শিক্ষা তো আমি পাইনি! আমি তো সারাজীবন 'আমার ইচ্ছা' বলেই এসেছি। তার পরে পণ্ডিত একদিন মহাপুরুষের কাছে গিয়ে বললেন—এতদিনে আমার চৈতন্য হয়েছে। আমি এখন ফিরে যাব দেশে।

তখন মহাপুরুষ তাকে বললেন—আবার তো তুমি 'আমার' বলে ব্যবহার করছ। এটাই ভুল। 'আমার' বলে কোনও বস্তুই নেই। 'আমি আমার' বললেই সব সত্য নাশ—এত জ্ঞানপাণ্ডিত্য সব বৃথা হয়ে যায়।

গল্পটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তার তত্ত্বটি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন—

আমি পাই না কিছু খুঁজে পেতে হেথা
আমার বলিতে আর।
যে দিকে চাই যা দেখিতে পাই
কিছুতে নেই মোর অধিকার।।
দেহ মন প্রাণ বোধ বিজ্ঞান
এ সবই তো মায়ের দান।
ভালবেসে সে যে রেখেছে হেথা
নিজের ইচ্ছায় নিজের মতন

ভাঙে গড়ে স্বয়ং বারবার।।
সংসারে সে আনে বারেবারে
যা-কিছু প্রয়োজন দেয় পূর্ণ করে
শিখায় সে যে বলিতে মোরে
আমি আমাব আমি আমার।।
আপন হাতে গড়া তাঁর এই জীবন
সংসারেতে যন্ত্রের মতন
চালায় সে যে অনিবার।।

'আমি আমার' ত্যাগ হল আসল ত্যাগ—তবেই মুক্তি...।

২৬। ৮। ৭০

১০৭

তীব্র ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠা থাকলে গুরুকৃপা সহজে লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যখন তাঁর গুরুর কাছে সরোদ শিখতে গেলেন তখন তাঁর গুরু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কি আগে কারও কাছে শিখেছ? একটু একটু বাজাতে পার কি?

আলাউদ্দিন খাঁ উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, একটু একটু জানি।

এই কথা শুনে তাঁর গুরু বললেন—তোমার হাত উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমাকে আর শেখাতে পারব না।

কথাটি শুনে আলাউদ্দিন খাঁ খুব মর্মাহত হয়ে বললেন—তবে আমার কী উপায়?

তাঁর অত দৃঢ় সংকল্প ও সরোদ শিখবার জন্য ব্যাকুলতা দেখে তাঁকে কী ভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন এই ভেবে তিনি বললেন—বাঁ হাত তোমার উচ্ছিষ্ট হয়নি, সুতরাং ঐ হাতে তোমাকে শেখাতে পারি।

আলাউদ্দিন তাতেই রাজি হলেন। বাঁ হাতে সরোদ বাজানো খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার জন্য তিনি সরোদ বাজনায় দক্ষ হলেন। গুরু তাঁর নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি দেখে খুব প্রীত হয়ে তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—যতদিন তোমার প্রাণ থাকবে আমার সব গুণ তোমার মধ্যে প্রকাশ পাবে। সমস্ত পৃথিবী তুমি ঘুরে আসতে পারবে। চার দিকে তোমার জয় জয়কার হবে।

গুরুর আশীর্বাদে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জীবনে সবই ফলবতী হয়েছে। গুরুর আশীর্বাদে সবই সম্ভব। তবে আশীর্বাদ পাবার জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ব্যাকুলতা, যোগ্যতা ও শরণাগতি একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

১। ৯। ৭০

১০৮

শিষ্য কোনও গুরুতর অপরাধ করলেও গুরু তাকে পরিত্যাগ না-করে উপযুক্ত করে তোলেন। মা বা গুরু হলেন মধ্যম পুরুষ যাঁকে 'তুমি' বলা হয়। তাঁর সাহায্যেই কেন্দ্রে বা প্রজ্ঞানে যেতে হবে। বাড়ির একেবারে অন্দরমহলে যেতে হলে যেমন প্রহরীর, দারোয়ানের বা দ্বারীর সাহায্যে যেতে হয় তেমনই জ্ঞান না-হলে, জ্ঞানের সাহায্য না-পেলে প্রজ্ঞানে যাওয়া যায় না। জ্ঞানকে তাই বলা হয় দ্বারী বা প্রহরী। Inner Consciousness-এর সাহায্য না-নেওয়া হলে অজ্ঞান দখল করে নেবে। গুরুও অন্তরের জ্ঞান দেন প্রথমে। তার পরে তাঁর নয়নে নয়ন রেখে চলতে থাকলে দৃষ্টিভঙ্গিই সব পাল্টে যায়। তার পরে সেই জ্ঞান দিয়ে প্রজ্ঞানের সেবা করে প্রজ্ঞানের সঙ্গে মিশে যায়।

কোনও কিছু reject করার কথা কখনও যেন কারও মনে না-আসে, তা বস্তুই হোক বা ব্যক্তিই হোক। তার মধ্যে ঈশ্বরকে বসিয়ে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে তোমাদের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রভাব আসবে এবং তোমাদের সংস্পর্শে যে আসবে তার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রভাব আসবে। এই কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গের ক্রম ধরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক গুরুর আশ্রমে কয়েকজন আশ্রমিক থাকে। গুরু তাদের সবাইকে সমান ভাবে সুন্দর করে শিক্ষা দেন। তাদের মধ্যে একদিন একটি নূতন ছেলে এল—ভারী সুন্দর, নম্র ও ভদ্র। গুরু তাকে যখন যা বলেন খুব-শ্রদ্ধার সঙ্গে সে তা শোনে ও পালন করে। গুরুদেব সেই জন্য তাকে খুব স্নেহ করেন। নূতন ছেলেটিকে দেখে অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও মনে বেশ হিংসার ভাব এল। তাদের মনে হল—কোথা থেকে এক নূতন ছেলে এসে গুরুদেবের মনটা জয় করে নিল।

একদিন গুরুদেব বিশেষ একটি কাজের ভার দিয়ে পুরানো শিষ্যদের মধ্যে একজনকে পাশের গ্রামে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে বলে দিলেন যে, নূতন যে ছেলেটি কয়েকদিন আগে আশ্রমে এসেছে তার মাবাবা পাশের গ্রামেই থাকেন। কাজেই যাবার সময় সে যেন তার মাবাবাকে জানিয়ে যায় যে, তাদের ছেলে ভালই আছে, কোনও চিন্তা যেন তারা না-করেন।

পুরানো শিষ্যটি তো গুরুর দেওয়া কার্যভার নিয়ে চলে গেল। নূতন ছোট শিষ্যটির উপর তার খুব হিংসার ভাব ছিল। সে ভাবল, এবার একটি কৌশলে ওকে এবং ওর মাবাবাকে খুব জব্দ করবে। এই ভেবে পাশের গ্রামে গিয়ে নূতন ছেলেটির মাবাবার কাছে সে উপস্থিত হল এবং খুব বিষাদগ্রস্ত হবার ভান করে তাঁদের বলল যে, গুরুদেব তাকে পাঠিয়েছেন একটি দুঃসংবাদ দেবার জন্য। দুঃসংবাদটি হল, তাঁদের ছেলেটি সেদিন সকালেই হঠাৎ মারা গিয়েছে।

এই কথা বলামাত্র ছেলেটির মাবাবা হো হো করে হেসে উঠলেন এবং তাকে বললেন—বাবা, তুমি বোধহয় তোমার গুরুদেবের কথা শুনতে ভুল করেছ। আমরা এমন কোনও পাপ কাজ কখনও করিনি যে পাপের জন্য আমাদের সন্তানের এ রকম অকালমৃত্যু হতে পারে।

Right action-এর ফলে তারা কতখানি convinced হয়ে আছেন তা-ই বোঝা যায় ঘটনাটি থেকে। তাদের মনের এরূপ দৃঢ়তা দেখে শিষ্যটি অবাক হয়ে গেল। এদিকে গুরুদেবও সব কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। শিষ্যটি ফিরে এলে গুরুদেব তাকে বললেন—তুমি বড় ভাই এবং এই নূতন ছেলেটির থেকে বড়। তথাপি এই ছোট ছেলেটিকে তুমি এত হিংসা কর। এ বড় দুঃখেব কথা। এই ছোট ছেলেটির সদ্গুণগুলি দেখে তোমার আনন্দ হওয়া উচিত অথচ তার পরিবর্তে তোমার এমন জঘন্য মনোবৃত্তি কী করে হল? আশ্রমে থেকে এত সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করেও তোমার চরিত্রেব একটুও উন্নতি হল না। যাক, যা হবার হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কখনও এ বকম কাজ করতে যেও না।

গুরুদেব শিষ্যকে তার গর্হিত কর্মের জন্য তাড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করলেন না। তাকে ডেকে তার সংশোধনের জন্য তিনি অন্য রকম ব্যবস্থা করলেন। এতদিন ঠাকুরঘরের কাজের ভার তার উপর ছিল, কিন্তু এই গর্হিত কাজের জন্য তাকে আবার গোয়ালঘরের কাজে নিযুক্ত করলেন।

গল্পটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যথার্থ গুরু কখনও reject করেন না। তাঁরা বোধ দিয়েই বোধকে শুদ্ধ কবে নেন। Outer renunciation আসল ত্যাগ নয়। আসল ত্যাগ হল 'আমি আমার বোধ' ত্যাগ। এই 'আমি আমাব বোধ' সকলকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করে বেখেছে। জীবনে তিন প্রকার বোধের ব্যবহার দেখা যায়। কারও থাকে 'আমারবোধের' প্রাধান্য, কারও থাকে 'তোমারবোধের' প্রাধান্য, কারও বা থাকে 'আমিবোধের' প্রাধান্য।

'আমাববোধের' প্রাধান্য দূর করার জন্য 'তোমারবোধে' চলতে হয়, তারপর পূর্ণ 'আমিবোধের' প্রাধান্য। এ সব সদ্গুরুর মাধ্যমেই জানা যায়। তাই বলা হয় চলার পথে গুরুর বা মহতের আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। মহতের আশ্রয় পেলেই অসুরের chapter থেকে সুরেব chapter. শুরু হয়ে যায়। তারপর সব দায়িত্ব চলে যায় গুরুর কাছে। কোনও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে না-চললে বা নিয়ম মেনে না-চললে জীবনে কোনও পর্যায়েই উন্নতি লাভ হয় না। কারও সাহায্য ছাড়া জীবনে কখনও চলা যায় না।

১১। ৯। ৭০

১০৯

পরকালের গতি হয় ইহকালের কর্মের ফল অনুসারে। সেই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

একবার যমরাজ দূতকে পাঠালেন এক ভক্তকে নিয়ে আসার জন্য। তার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল। দূত যখন তাকে আনতে গেল তখন সে ভগবানের নাম করছিল। সেই অবস্থায় তাকে ছুঁতে পারবে না বলে দূতকে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হল।

ঈশ্বরের নাম করতে থাকলে মৃত্যু কারওকে স্পর্শ করতে পারে না—এই নিয়ম। নাম বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে যমদূত লোকটিকে নিয়ে যমরাজের কাছে এনে হাজির করল। চিত্রগুপ্তও এসে হাজির হল তার হিসাবের খাতা নিয়ে—কতটা পুণ্য বা পাপ জমা আছে লোকটির account-এ তা যমরাজকে দেখাতে হবে। যমরাজ লোকটিকে বললেন—তোমার পুণ্যের এবং পাপের ফল এই এই পরিমাণে জমা রয়েছে। তুমি কোনটা আগে ভোগ করতে চাও? লোকটি পুণ্যের ফল আগে ভোগ করতে চাইল এবং যমরাজ তাতেই রাজি হলেন। লোকটি সেই স্থানে থাকতে থাকতে যমদূত আরেকজন লোককে নিয়ে এলেন। চিত্রগুপ্তর হিসাবের খাতা মিলিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে কোনটা আগে ভোগ করতে চায়—পাপ না পুণ্য?

সেই লোকটি বলল—পুণ্য জমা থাক, আগে পাপের ফল ভোগ করে নিতে চাই। যমরাজ তার ইচ্ছা মঞ্জুর করলেন।

অবশেষে এই দু'জন লোকেরই আবার একই শহরে জন্ম হল। আগের লোকটি, যে পুণ্যের ফল আগে ভোগ করে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সে খুব ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করল ও শিশুকাল থেকেই সুখভোগ ও আরামের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে লাগল এবং দ্বিতীয় লোকটি খুব দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করল এবং নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। কোনও একসময় দু'জনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হল। একদিন নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতে দুঃখী লোকটি সুখী লোকটিকে বলল—তুমি গতজন্মে কত পুণ্যই যে করেছিলে সেই জন্য এত সুখভোগ করছ। আর আমি কত পাপ কাজই যে করে এসেছি যে আজ পর্যন্ত দুঃখভোগই কেবল করে যাচ্ছি। সুখী বন্ধুটি দুঃখী বন্ধুকে একটু সহানুভূতি জানাল। তাদের এই কথাবার্তা শুনে অলক্ষ্যে অন্তর্যামীপুরুষ শুধু হাসলেন।

কয়েকদিন পরেই তাদের দু'জনের জীবনের গতিই ফিরে গেল। যে দুঃখী ছিল তার পাপের ফলভোগ শেষ হয়ে যাওয়াতে তার পুণ্যের ভোগ শুরু হল। ফলে জীবনে এখন সুখশান্তি ও আনন্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং যে এতদিন সুখভোগ করছিল তার পুণ্যের ফলভোগ শেষ হওয়াতে এখন পাপের ফলভোগ শুরু হল। ফলে তার জীবনে দুঃখকষ্ট আরম্ভ হয়ে গেল।

এই জন্যই আমরা দেখি সংসারে অনেক খারাপ দুষ্ট লোক সুখভোগ করছে আর ভাল সৎ লোক দুঃখ ভোগ করছে। আমরা এর পিছনের রহস্যটি জানি না বলেই ভুল করি বিচারে।

একবার একজন লোককে যমরাজের কাছে নিয়ে আসা হল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—তুমি পুণ্যের ফল আগে ভোগ করবে না পাপের? তখন সে বলল—আমি পাপের ফলটাই আগে ভোগ করতে চাই শুধু, পুণ্যের ফলটা জমা থাকুক। যমরাজ তা-ই মঞ্জুর করলেন।

তারপর থেকে সে শুধু দুঃখকষ্ট ভোগ করেই যাচ্ছে এবং পুণ্যের ফল জমাই হয়ে রয়েছে। একবার সে এক সাধুর কাছে গেল। সাধু তাকে দেখেই সব বুঝতে পারলেন।

তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, লোকটির এত পুণ্য সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও কত কষ্টভোগ করে যাচ্ছে, পুণ্যের খরচের বেলায় কত কৃপণতা করছে। এত পুণ্য সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও দুঃখ ভোগ করে চলেছে লোকটি।

আরেকজন লোক সাধুর কাছে এল। সে সাধুর বেশ ধারণ করে এসেছিল। সাধুটি কিন্তু তাকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে, তার পুণ্য সঞ্চয় করা মোটেই নেই। লোকটি অসৎ কর্ম, পাপ কর্ম করেছে প্রচুর, তার কর্মফল জমা আছে। কোনও দিন হয়ত একটু পুণ্য কর্ম করেছিল তারই ফল এ জীবনে ভোগ করে যাচ্ছে। পুণ্যের কিছু না-থাকা সত্ত্বেও সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে এর রহস্য বুঝতে না-পেরে তাঁর ইষ্টদেবকে স্মরণ করলেন। ইষ্টদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন পরিষ্কার করে—যে যা জমাবে তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকবে। যারা সুখভোগ আগে করে দুঃখকে পরে ভোগ করবে বলে তাদের দুঃখ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। ফলে তা ভোগ করে শেষ করতে বহু জনম লাগে। আবার যে পুণ্যের ফল জমিয়ে রাখে এবং দুঃখ আগে ভোগ করে নেয় তারও পুণ্যের ফল চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যেতে থাকে।

সাধু তাঁর ইষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ রকম চাওয়াটা কী করে আসবে? ইষ্টদেব বললেন—চাওয়া আসে সঙ্গ থেকে। "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ।" সাধুসঙ্গ থেকে সাধু ভাবের কামনা জাগবে। অসৎসঙ্গ থেকে অসৎ ভাবের কামনা ও ভোগেচ্ছা জাগবে। এ-ই হল cause and effect-এব law। এই ভাবে জীবনবিজ্ঞানের দু'টি tendency রয়েছে। Destiny নির্ভর করছে কর্মের nature-এর উপরে।

১৩। ১১। ৭০

১১০

সৎসঙ্গের প্রভাবে জীবনে কী ভাবে পরিবর্তন আসে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

মদ হল মনের দমন। মা বলেন, সব কিছুকে গ্রহণ কর। মদ হল মনোদক্ষিণা। সব কিছু মাকে সমর্পণ কর। মন মাকে দিয়ে দিলে দুঃখকষ্ট আর থাকে না। মাকে কী করে মন দিতে হয় তা দেখতে হবে মাতালদের কাছে গিয়ে, যাঁদের জীবন মায়েতে লয় হয়ে গিয়েছে, নিত্য মায়ের কোলে বসে আছেন। এই মাতালরা বেতালে চলেন না কারণ মা নিজে হাত ধরে নিয়ে চলেন তাঁদের। ওখানে জ্ঞানবিচারের স্থান নেই। মা হাত ধরে নিয়ে গেলে কে তাঁদের আটকে রাখতে পারে?

তাই গুরুমাতা মাতাগুরুকে ধরতে হবে। তিনি ছাড়া কেউ ভববন্ধন, দেহবন্ধন কাটিয়ে দিতে পারেন না। তবে এই দেহবন্ধন যতদিন ভাল লাগে, উটের কাঁটাঘাস খাওয়ার মতো, ততদিন থাকবে এই বন্ধন। মা কোনও নারীমূর্তি নন। তাঁকে গুরু বলা হয় কারণ তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আর কিছু নেই। প্রথমে শোনবার পরেই মায়ের নেশা চট করে ধরে না। শুনতে শুনতে পরে নেশা ধরবে।

এক মহাপুরুষের কাছে অনেকে সৎপ্রসঙ্গ শুনতে যেত। অনেক দুষ্কৃতকারীও গা-ঢাকা দিয়ে সেখানে যেত। মহাপুরুষের কাছে এসে সকলেই কম-বেশি উপকার পেত। একদিন তিনি সবাইকে বললেন—যে কারণে তোমরা এখানে আসছ তা তোমরা নিজেদের মধ্যেই ইচ্ছা করলে পেতে পার। তাহলে আমার কাছে না-এলেও তোমাদের চলবে।

এ কথা শুনে আর কেউ কিছু বলল না। কিন্তু দুষ্ট একটি লোক জিজ্ঞাসা করল—কী করলে তা আমাদের নিজেদের মধ্যে পাওয়া যাবে?

মহাপুরুষ বললেন—তা শিখতে হবে। তুমি ভোর তিনটের সময় এখানে আসবে।

ভোর তিনটের সময় দুষ্ট লোকটি এসে হাজির হল মহাপুরুষের কাছে। সে এসে দেখতে পেল, মহাপুরুষ ধ্যানে ডুবে আছেন। লোকটি নিরুপায় হয়ে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মহাপুরুষকে দেখতে লাগল।

অনেক বেলায় মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হল। লোকটিকে দেখে তিনি বললেন—তুমি এসেছ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। লোকটি বলল—না আপনি ঘুমাননি, আমি দেখেছি। আপনি যেখানে গিয়েছিলেন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন?

মহাপুরুষ—হ্যাঁ, নিয়ে যাব। কাল তুমি এই সময়ে আবার এস।

লোকটি পর পর কয়েকদিন এল এবং প্রতিদিনই মহাপুরুষকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেত।

একদিন কথায় কথায় মহাপুরুষ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কতটা মাংস খেতে পার আর কতটুকুই বা মদ খেতে পার?

লোকটি বলল—মদ অনেক খেতে পারি এবং মাংসও অনেক খেতে পারি তবে আস্ত পাঁঠা পারি না।

মহাপুরুষ যোগী ছিলেন। তিনি নিজেও অনেক খেতে পারতেন। তিনি বললেন—তুমি ইচ্ছা করলে আমার মতন শক্তিমান হতে পার।

শক্তি পাবার লোভে লোকটি মহাপুরুষের কাছে অতি সকালে রোজই আসতে শুরু করল। কয়েকদিন নিয়মিত ভাবে সেখানে আসবার ফলে এবং মহাপুরুষের কাছে বসে থাকার ফলে তার মধ্যে একটি স্থিতি এসেছিল। স্থিতি আসবার ফলে মনেরও সংযম এসেছিল। সাধুকে রোজ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে দেখতে তারও লোভ হল ওই অবস্থা লাভ করার জন্য।

একদিন সে মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার মতো আমাকে তৈরি করে দিতে পারবেন?

মহাপুরুষ বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তোমারও এই অবস্থা হবে। দুষ্ট লোকটির মহাপুরুষের কাছে আসবার লোভ ক্রমশ বেড়ে গেল। সে প্রতিদিনই মহাপুরুষের কাছে যেতে লাগল। এই ভাবে তিন বছর পার হয়ে গেল।

একদিন মহাত্মা সেই লোকটিকে যোগের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। লোকটির আগ্রহ খুব বেড়ে গেল। তখন সে আরও অনেক শক্তির অধিকারী হল এবং শান্ত হয়ে গেল।

বারো বছর মহাপুরুষের সঙ্গ করার পরে সে একদিন তাঁকে বলল—এ পথ যে অনন্ত, কত যে শক্তি তারও তো কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। কত ভোগ করব?

মহাপুরুষ বললেন—তুমি তো ভোগ করতেই এসেছিলে, ভোগ কর না। মহাপুরুষ ক্রমে ক্রমে তার আগ্রহটি শুধু বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন এই ভাবে। শেষ পর্যন্ত মহাপুরুষের এত সঙ্গ করে সেই লোকটিও এক বিরাট মহাত্মাতে পরিণত হয়েছিল। জাগতিক ভোগবাসনার দিকে তার আর কোনও দৃষ্টিই ছিল না।

গল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এমন বিজ্ঞানও রয়েছে যা মহাপুরুষরা যদি ধরিয়ে দেন তবে বস্তুজগতের পিছনে মানুষ আর ছুটতে পারে না। তবে সেদিকে যাবার tendency থাকা চাই। এই গুরুগত বিজ্ঞানটি আয়ত্ত হলে মন সংযত হয়ে যায়। ভোগের দিকে, আধিপত্য লাভের দিকে আর যেতে চায় না তখন।

গুরুর বা মহাপুকুষের কর্তব্য হল শুধু শিষ্যের আগ্রহটি বাড়িয়ে দেওযা। ক্রমশ আগ্রহ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁরা পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। তা না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ছুটি নেই।

নিজবোধরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরিচয় পেলে নানাত্ব-বহুত্ব লোপ পায়। তখন সব একবোধে রূপান্তরিত হয়। এই হল অমৃতত্ব, অদ্বয়তত্ত্ব, আত্মা, গুরু, ইষ্ট বা মা।

৪। ১২। ৭০

১১১

সত্যের সঙ্গে কী ভাবে direct সম্বন্ধ হয় সেই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলছি শোন।

এক যোগীর কাছে একজন সাধক যোগশিক্ষা নিতে আসে। সে যোগশিক্ষা নিয়ে কিছু ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করে, কিন্তু কোনও রকম ফল পায় না। একদিন যোগীগুরু তাকে বললেন—তুমি তাঁর সঙ্গে যতখানি যুক্ত হবে, ততখানি তিনিও যুক্ত হবেন তোমার সঙ্গে।

শিষ্য—বাবা, চেষ্টা তো করছি কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছি না।

গুরু সেই দিন শিষ্যকে নিজের সামনে বসিয়ে ধ্যান অভ্যাস করালেন। সেই দিন শিষ্যটি অনেকক্ষণ ধ্যানে বসতে পেরেছিল। তার পরে একসময় গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ তুমি ধ্যানে বসে কী অনুভব করেছিলে?

শিষ্য—একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলাম। খুবই অন্ধকার, কোথাও কোনও আলোর চিহ্নমাত্র নেই, শুধুই অন্ধকার।

গুরু—অন্ধকারটা জানলে কী করে? আলো ছিল ভিতরে। সেই অন্তরের আলো দিয়ে তুমি দেখেছ অন্ধকার। এই হল বোধের আলো। যা দিয়ে অন্ধকার উপলব্ধি করলে তাকে কিন্তু বোধ করলে না। কিছু ছিল না, এটা তুমি বোধ করলে, কিন্তু যার দ্বারা

বোধ হল তা পরে অনুভব করবে। কিছু ছিল না, শুধুমাত্র অন্ধকার—এই বোধটি হল অব্যক্তের বোধ। এই অব্যক্তকেও যিনি প্রকাশ করলেন তাঁকে আপনবোধে জানতে হবে।

শিষ্যের এই বোধটি কিছুতেই আসছে না। বেশ কিছুদিন চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু হল না। আবার কিছুদিন নিচের স্তরের দর্শন প্রভৃতি হতে লাগল। এই ভাবে অগ্রসর হয়ে আবার কিছুদিন একভাবে কাটে। এই ভাবেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল।

তারপর গুরু আবার একদিন তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে ধ্যানে বসতে শুরু করলেন। তখনও শিষ্য অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল। ক্রমশ এই ভাবে ধ্যানে বসতে বসতে একদিন এমন হল যে, ধ্যানে বসামাত্রই সব রূপ ও শব্দ লয় হয়ে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—রূপ লয় হবার পরে শব্দ লয় হয়। শব্দ লয় হলে বুঝতে হবে খুবই ভাল অবস্থা। একেই অব্যক্ত অবস্থা বলে। যে এই অব্যক্ত অবস্থা অনুভব করেছে, সে বোধের বোধে পূর্ণ হয়েছে। সেখান থেকে নেমে এসে সে বলে, তা অপ্রকাশ্য, তাকে প্রকাশ করা যায় না। 'বোধ করছি' এই বোধের বৃত্তিটাও লয় হয়ে যায়। এই হল পরমাত্মার বোধ—সবার স্বরূপ।

২৪। ২। ৭১

১১২

সংসারী, যোগী, জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্তদের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়া হয়, যদিও এক সত্য লাভ করাই হল সকলের উদ্দেশ্য। লোকে সদুপদেশ নেয়, কিন্তু তা তার জন্য suitable কি না তা দেখে না। তার ফলে প্রতি পদে অসুবিধা হয়।

ধর্মজগতে কুলগুরুর প্রথা অনেকদিন যাবৎ চলে এসেছে। কিন্তু অনেক কারণে এই প্রথার প্রচলন কমে গিয়েছে বর্তমানে। যত প্রকার শিক্ষা জীবনে পাওয়া যায় সবগুলিই কিছু কিছু সাহায্য করে। কিন্তু সব একত্র করে মিলিয়ে নেবার শিক্ষা অনেকেই পায় না।

জ্ঞানের ব্যবহার যথার্থ ভাবে সবার হয় না। কী ভাবে ব্যবহার করলে অদ্বয়জ্ঞান বা বোধনয়ন খুলে যায় সেই শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা সবাই পায় না বলে জ্ঞানের রূপই ভ্রান্তিবশত শেষ পর্যন্ত অহংকার-অভিমানের রূপ নেয়। এই অহংকার-অভিমানকে ত্বংকারবোধের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। যে জ্ঞান ফুটে উঠছে মানুষের মধ্যে তা ঈশ্বরের সেবার জন্য ব্যবহার করলে অহংকার-অভিমানের গতি ভিন্ন দিকে যায়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর শিব-পার্বতীর একটি উপাখ্যান বললেন এই প্রসঙ্গে।

মর্তলোকের চার দিকে জীবের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়ে পার্বতী শিবকে একটি প্রশ্ন করলেন—জীবের এত দুঃখকষ্ট কেন?

শিব—যথার্থ প্রশ্নই তুমি করেছ। এর উত্তর তুমি খুব মন দিয়ে শোন। তন্ত্রের বিধান সর্বসাধারণের জন্য দেওয়া আছে। এখানে কোনও অধিকারীভেদ নেই। কারণ বৈদিক আচরণ সকলের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষ এই সহজ বিধানটি সহজ না-রেখে জটিল করে নিয়েছে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল সর্ববস্তুকেই ঈশ্বরবোধে গ্রহণ করতে, কিন্তু সেই বোধে গ্রহণ না-করে তারা বস্তুকে পৃথকবোধে

গ্রহণ করেছে। বস্তুর অন্তঃসত্তা যে চৈতন্যসত্তা, তাকেই বস্তুর মাধ্যমে পূজা করার বিধান দেওয়া ছিল। কিন্তু তা পালন না-করে তারা নানা রকম তর্ক করে ও শাস্ত্রের বিধান দেয়। কাজেই তাদের এত দুঃখকষ্ট।

পার্বতী—তাহলে এখন কী করা উচিত?

শিব—তারও উপায় আছে। মানুষ সহজ পথে যখন আসতে চায় না তখন তুমি সমর্থন করলে এরও একটি উপায় করা যায়।

পার্বতী—তোমার নির্দেশ সর্বোত্তম হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই এই বিষয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই।

শিব—বস্তু ব্যবহার করার সময় বস্তুর essence চৈতন্যসত্তাকে বাদ দিয়ে তা ব্যবহার করতে গেলে বিকার আসবে, তার ফলে আঘাতও আসবে। সেই আখাতের ফলে জীবের ভিতরে চৈতন্য জাগ্রত হবে।

পার্বতী—এ তো উত্তম কথা।

সেই বিশেষ মুহূর্তে নারদ এসে আড়াল থেকে শিব-পার্বতীর কথাটি শুনতে পেলেন। নারদ পার্বতীকে বললেন—মাগো, তুমি মা হয়ে সন্তানের আঘাতের ব্যবস্থাটি মেনে নিলে, এ কী রকম কথা?

পার্বতীর তখন হুঁশ হল। তিনি শিবকে গিয়ে বললেন—আঘাত দিয়ে তাদের চৈতন্যকে জাগাবার চাইতে অন্য কোনও সহজ ব্যবস্থা হয় না?

শিব—তোমার মাতৃহৃদয়ে বুঝি ঘা লাগল তাতে? আচ্ছা বেশ, এই আঘাত থেকে তারা অনেক অংশে রেহাই পাবে যদি তারা গুরুশক্তির বা সৎসঙ্গের এবং নামের আশ্রয় নেয়। ঈশ্বরের নাম কবা এবং তাঁর মহিমা গুণগান করা হল সহজতম উপায়। তুমি এখন যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না, আমি এখন ধ্যানে বসতে যাচ্ছি।

নারদ এ কথা শুনে ভারী খুশি হলেন। তিনি শিবকে বললেন—এ তো উত্তম ব্যবস্থা। তাহলে এবার থেকে আমি নাম প্রচার করতে যাব।

শিব বললেন—তথাস্তু।

তারপর নারদও ঘুরে ঘুরে নামমাহাত্ম্য প্রচার করতে চলে গেলেন। যত সত্যাশ্রয়ী গুরু আছেন জগতে, তাঁদের তিনি এই প্রেরণা দিতে লাগলেন যে, তাঁদের কাছে যে শিষ্যরা আসবে তাদের যেন নামমাহাত্ম্য ধরিয়ে দেওয়া হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কাজেই প্রত্যেক সৎসঙ্গে সর্বদা নারদ উপস্থিত থাকেন। যথার্থ সত্যাশ্রয়ী সৎসঙ্গে এসে নারদের দর্শন পাবেই। শুধু নারদ নয়, শুকদেব এবং অন্যান্য মুনিদের দর্শনও পাওয়া যায়।

আঘাত পাবার পরে সৎসঙ্গে যখন মানুষ আসে তখন সত্যাশ্রয়ী সাধকগণের কাছে তারা বস্তুর ব্যবহার এবং ভগবানের নামমাহাত্ম্যটি শোনে। তার ফলে তাদের চেতনা জাগ্রত হয় এবং এর থেকেই তাদের অন্তরে অভেদজ্ঞান এসে যায়।

১৭। ৩। ৭১

১১৩

আধ্যাত্মিক পথে ভুলভ্রান্তি বা পতন হলেও সম্যক্ নাশ কখনও হয় না। এক মহাত্মাকে একজন এসে বলল—সারাজীবন এত সাধনভজন আমি করেছি তা সত্ত্বেও আমার এ রকম পতন হল কেন?

মহাত্মা বললেন—নিচে একটি জিনিস ফেলে দিয়েছিলে, তা তুলে নিতে আবার নিচে এসেছ। অফিসে গিয়ে যখন দেখতে পেলে যে, দেরাজের চাবি বাড়িতে ভুল করে ফেলে এসেছ, তখন আবার ফিরে আসতে হয় শুধু চাবিটি নেবার জন্য। সেই রকমই তোমাদের অবস্থা। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে সাধকের ভুলভ্রান্তি ও পতন হতে পারে, কিন্তু তার সম্যক্ নাশ কখনও হয় না।

কী সুন্দর inspiration দিলেন তিনি! সদ্গুরুদের কথায় নিরুৎসাহিত হবার মতন কিছুই থাকে না। সর্বদাই তাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা দেন। সাধুসন্ত, মহাপুরুষদের কাছে এই জন্য সবাই গিয়ে শান্তি পায়। যেখানে সকলে discourage করে দেন সেখানে সাধুসন্ন্যাসীরা তাদের encourage করেন। সত্যের দৃষ্টি খুলে যাওয়াতে তাঁরা এই ভাবেই সত্যের কথা ধরিয়ে দিয়ে মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেন। সম্যক্ নাশ কখনও কারও হতে পারে না।

কয়েকবছর আগে একজনের সঙ্গে দেখা হল বহুদিন পরে। সে সারাজীবনই ভোগের পথে থেকেছে এবং বহু অন্যায় কাজ করে এসেছে। দেখা হতেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—কেমন আছ আজকাল?

লোকটি বলল—অন্যায়ের প্রতিও বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে। জীবনে বহু অন্যায় করেছি। এখন দেখলাম সে সবের মধ্যেও কিছু নেই।

একসময় তার পিছনে পুলিশও লেগেছিল। তাকে অনুসরণ করে করে 'এর' ঘরেও পুলিশ এসেছিল।

পুলিশ অফিসারকে বলেছিলাম—যত অন্যায়ই সে করুক শোধন করার সুযোগ কি তাকে একবারও দেবেন না?.আপনার সন্তান যতই ভুল করুক তাকে কি বর্জন করে দেন? এখানে মা তো সন্তানকে ক্ষমা করেই দেন।

লোকটির প্রতিভাও ছিল, কিন্তু তা প্রকাশের কোনও scope পায়নি। তন্ত্রে ও প্রবৃত্তি মার্গে কতদূর যাওয়া যায়? একদিন ফিরে আসতেই হবে। ভগবান নিজেই স্বয়ং পাথরে জড়ীভূত হয়ে থাকা সত্ত্বেও সেখানে থেকেই একটু একটু করে চেতনা বাড়িয়ে বিভিন্ন পরিবর্তন ও প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আবার স্বস্বরূপে মিশে যান। মাবাবার বোধটি সাধকের মধ্যেই পাওয়া যায়। স্নেহঘন মূর্তি তাঁদের। তাঁরা জানেন সবই, তবুও চেষ্টা করেন কোনও দিক দিয়ে ঠেলে যদি একটু তোলা যায়।

এই ভাবেই তাঁরা সেবা করেন সবাইকে। তাঁরা ভাবেন, এই ভাবে তাঁরা Divine-কেই সেবা করছেন। সদ্গুরু মহাপুরুষগণ প্রেমের দ্বারাই সব মানুষকে সৎপথে চালিত করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক সাধকের আশ্রমে রাতে অনেকেই থাকে। একবার এক criminal পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে গা-ঢাকা দেবার জন্য সেই আশ্রমে ঢুকে ভক্তদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল।

সাধু সবই বুঝতে পারলেন। খাওয়ার সময় তিনি স্নেহভরে লোকটিকে ডেকে বললেন—এস বাবা, খাবে এস। এত স্নেহপূর্ণ স্বরে খাবার জন্য তাকে কেউ তো কখনও আহ্বান করে না। খুনি লোকটি অবাক হল। তার চোখে প্রায় জল এসে গেল। বাড়িতে অতি আপনজনও তো কখনও এই ভাবে আদর করে ডাকেনি। খুনি লোকটি অভিভূত হয়ে পড়ল। সাধুর এক ভক্ত খুব ভাল সন্দেশ দিয়েছিল সেই দিন। সাধু তা না-খেয়ে রেখে দিয়েছিলেন। এখন তিনি খুনি লোকটিকে ডেকে নিজের হাতে সেই সন্দেশ খাওয়ালেন। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সর্বদাই সে তাড়া খেয়ে বেড়ায়। তাকে যে কেউ আদর করে সন্দেশ খাওয়াতে পারে এটা তার ধারণার অতীত।

প্রায়ই এ রকম হতে লাগল। রাত হলেই খুনি লোকটি আশ্রমে এসে পড়ে এবং সেখানেই থেকে যায়। ভক্তদের কানেও এ কথা গেল। তারা সাধুকে এসে সাবধান করে জানিয়ে দিল যে, এ রকম ভাবে সর্বদা খুনি লোকটি যদি আশ্রমে যাতায়াত করে তবে পুলিশের দৃষ্টি পড়বে। সাধু কিছু বললেন না। যেমন দিন চলছিল সে-ভাবেই চলতে লাগল।

একদিন শোনা গেল পুলিশ আসবে সেই আশ্রমে অনুসন্ধান করতে। সেই দিন রাতে লোকটি এল না। সাধুবাবা তাঁর খাবারটি যত্ন করে রেখে দিলেন। অনেক রাতে সাধুবাবা ঘুমিয়েছিলেন। এই সময় হঠাৎ খুট করে একটু শব্দ হওয়াতে ঘুমটা তাঁর ভেঙে যায়। সাধুবাবা দেখতে পেলেন, চুপিচুপি অত রাতে খুনি লোকটি ঘরে ঢুকছে। লোকটির আজকাল অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন মাঝে মাঝে সে সাধুকে প্রণামও করে।

সে ঘরে ঢুকতেই সাধুবাবা তাকে খেতে দিলেন। তারপর বললেন—তুমি সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছ। তুমি নারায়ণ, তোমার মধ্যেই নারায়ণ বাস করেন।

এই বলে সাধুবাবা তাঁর নিজের বিছানাতেই সেই লোকটিকে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর নিজের গেরুয়া চাদর দিয়ে তাকে ঢাকা দিয়ে দিলেন। তার পরে নিজে বারান্দায় বসে একতারাটি নিয়ে তিনি গান ধরলেন—"জীবনদেবতা তুঁহি নাবায়ণ....।"

এর মধ্যে হঠাৎ পুলিশ এসেছে আশ্রমে অনুসন্ধান করতে। সাধুবাবা বললেন—দেখুন ঘুরে ঘুরে আপনাদের ইচ্ছা মতন। পুলিশ তন্নতন্ন করে সব দেখল, তারপর ঘরে ঢুকে দেখবার জন্য অনুমতি চাইল।

সাধুবাবা বললেন—বেশ তো, ঘরের ভিতরে যান, তবে দেখবেন যেন গোলমাল না-হয়, কারণ আমার গুরুদেব ঘরে শুয়ে আছেন। তিনি ধ্যানে মগ্ন। তাঁর যেন কোনও অসুবিধা না-হয় সেদিকে একটু নজর রাখবেন। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখতে পেল—

সমাধিমগ্ন হয়ে আছেন একজন। অন্য কারওকে দেখতে না-পেয়ে পুলিশ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

এদিকে নারায়ণের ভজন শুনতে শুনতে সেই খুনি লোকটিও একসময় অন্তরের গভীরে ডুবে সমাধিমগ্ন হয়ে গিয়েছে। লোকটির বাহ্য জগতের কোনও হুঁশ নেই।

সাধু ঘরে ঢুকে লোকটিকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কী আনন্দ আজ তাঁর। সমাধি ভেঙে যাবার পরে লোকটি উঠে সাধুকে দেখে বলল—বাবা, আমি কোথায় গিয়েছিলাম? আমি এ সব কী দেখলাম?

সাধুর তো কত আনন্দ, তাঁর মতো আরেকটি মাতাল দেখে। এককালের সেই খুনি লোকটি পরবর্তী জীবনে অনুভূতির উচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিল। এমনকী সেই পুলিশ অফিসারটি পরবর্তী জীবনে তার কাছেই দীক্ষা নিয়েছিল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভিতরের কুণ্ডলিনীশক্তি অনেক কারণেই জাগ্রত হতে পারে। বিরাট আঘাত থেকে, accident থেকে, শোক থেকে, বড় রকম অসুখ থেকে, অতিরিক্ত আনন্দে—নানা কারণেই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয়। এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হলেই অসম্ভব প্রকাশ সব হতে থাকে।

পুলিশ শাস্তি দিতে জানে, কিন্তু ভালবাসতে জানে না। খুনির মধ্যেও ভগবান লুকিয়ে থাকেন। সেই ভগবানকে জাগিয়ে দিতে হয়।

১৮। ৫। ৭১

১১৪

অতিথি সৎকার ধর্মের একটি বিরাট অঙ্গ এবং এই প্রথা পুরাকালে প্রচলিত ছিল। অতিথি সেবার জন্য কী ভাবে দুঃখকষ্ট বরণ করেও অতিথি নারায়ণের সেবা করে সত্যনিষ্ঠ থাকা যায় সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মহাভারতে বর্ণিত একটি গল্পের উল্লেখ করলেন।

এক সংসারে এক গরিব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধূ—এই চারজন member ছিল। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ, তাদের তিন দিন খাওয়া হয়নি। চতুর্থ দিনে অনেক কষ্টে তারা একটু গম জোগাড় করল এবং তা দিয়ে যখন রুটি বানিয়ে সবে খেতে বসেছে চারজন, এমন সময় ছদ্মবেশে ধর্মরাজ তাদের পরীক্ষা করতে এলেন।

অতিথিকে দেখে ব্রাহ্মণ নিজের ভাগটা অতিথিকে দিল। অতিথির ক্ষুধা মিটল না, তিনি আরও কিছু খাবার চাইলেন। তখন ব্রাহ্মণী তার স্বামীর পন্থা অনুসরণ করে তার খাবারের ভাগ দিয়ে দিল। তবুও অতিথির ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্রও তার খাবারের ভাগটুকু অতিথিরূপী ধর্মরাজকে নিবেদন করল। এবারেও যখন ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না তখন পুত্রবধূও তার খাবারের ভাগটা তাঁকে দিয়ে দিল। এবারে অতিথি তৃপ্ত হলেন।

তারপর অতিথি তাঁর সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন—তোমরা বরাবরই খুব সত্যনিষ্ঠ জানি, তথাপি তোমাদের সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যই আমি এসেছিলাম। তোমরা যে সত্যকে অন্তিমকালেও ধরে রেখেছ তা দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি।

ধর্মরাজ আর নিজের পরিচয় চেপে রাখতে পারলেন না, তিনি বললেন—আমি ধর্ম, তোমরা সকলে সমবেত ভাবে ধর্মের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছ তা সত্যিই দুর্লভ। ধর্মরাজ তখন এই চারজনকে নিজের মধ্যেই মিলিয়ে নিলেন।

এই গল্পটির মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক কিছুই আছে। অতিথি সেবার জন্য নিজে অভুক্ত থেকে ব্রাহ্মণ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন কবল তা অতুলনীয়। স্বামীর ধর্মাচরণে স্ত্রীর সহগামী হওয়া এবং তা দেখে পুত্র ও পুত্রবধূর তদনুরূপ আচরণের এই মহান শিক্ষা উল্লেখযোগ্য। পিতামাতার আচরণ দেখে পুত্র ও পুত্রবধূর সেই শিক্ষা গ্রহণ করার আদর্শ সমাজজীবন ও ধর্মজীবনের নৈতিকবিজ্ঞানে সর্বযুগেই প্রযোজ্য। বৃহৎ বা মহৎ যা আচরণ করবে তা-ই লোকে অনুসরণ করবে। তারা যদি সদাচরণ করে অপরেও তা শিখবে, আবার পিতামাতা বা গুরুস্থানীয় কারওকে অন্যায় বা অসৎ আচরণ করতে দেখলে পরবর্তী অনুগামীরাও অন্যায় আচরণই শিখবে।

তাদের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন একটি নেউল এক কোণ থেকে সব শুনতে পেল। সে ভাবল, সবাই যখন স্বর্গে গেল আমারও তো স্বর্গে যেতে হবে এবং যেখানে এই সর্বসমর্পণ হয়ে গেল তা তো পুণ্যভূমি। এই ভেবে সে সেই পুণ্যভূমিতে গড়াগড়ি দিল। অল্প কয়েকটি অবশিষ্ট গমের দানা সেখানে পড়ে ছিল, তা অঙ্গে লেগে যাওয়াতে দেহেব সেই অংশ সোনার হয়ে গেল।

নেউলের অর্ধেক অঙ্গ সোনার হয়ে গেল, তার অপর অর্ধেক অঙ্গও যাতে সোনার হয়ে যায় সেই জন্য সে এই রকম পুণ্যভূমি খুঁজে বেড়াতে লাগল।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। নেউলেব কানেও কথাটি গেল। সে মনে করল, এই রকম বিরাট যজ্ঞভূমিতে গড়িয়ে নিলে তার দেহের বাকি অর্ধেক অংশও সোনার হয়ে যাবে। সে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে গিয়ে গড়াগড়ি দিল, কিন্তু তার অঙ্গ স্বর্ণময় হল না। তখন নেউল বিরক্ত হয়ে বলল—এটা যজ্ঞই নয়। নেউলের এই আচরণে যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে গেলেন। তিনি খুব তৃপ্ত ও গর্বিত ছিলেন এই যজ্ঞ করার পরে, কিন্তু যখন একটি সামান্য নেউল এসে বলে গেল যে, এটা আসল যজ্ঞ হয়নি, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—এর কারণ কী? শ্রীকৃষ্ণ তখন নেউলের সব ঘটনা খুলে বললেন।

যুধিষ্ঠির আবার শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই এতবড় রাজসূয় যজ্ঞ এত চেষ্টা ও যত্ন সহকারে করা সত্ত্বেও কেন ক্রটিপূর্ণ হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন—সমস্ত মনটা তুমি দাওনি, এটাই ধরা পড়েছে। যুদ্ধে জয়লাভ করেছ ঠিকই, কিন্তু যাঁর জন্য জয়লাভ হল তাঁকে সম্পূর্ণ মন দেওয়া হয়নি—এটাই ধরা পড়ে গেল।

গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষ সব সোনা করতে চাইছে, কিন্তু কোথায় সেই যোগাযোগ। সর্বসমর্পণ না-হলে All Divine হবে না।

প্রথমে একটু কষ্টকর মনে হবে, কিন্তু All Divine না-মানলেও তো কষ্ট করতে হচ্ছে। যতখানি কষ্ট করবে ততখানিই ফল লাভ হবে। পরমাত্মবোধের সাধন হল All acceptance। All Divine হল তাঁর সর্বোত্তম বাণী ও পরিচয় এবং তার ব্যবহার হল All acceptance। গল্পটির মধ্যে যেমন অতিথি সেবার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই সর্বসমর্পণের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যও তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

২। ৬। ৭১

১১৫

মানুষ সর্বদাই সসীম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়। তার জীবনের চাওয়া-পাওয়া, উদ্দেশ্য সব কিছুই ক্ষুদ্র ও সসীমকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে, ফলে তাকে দুর্ভোগও ভোগ করতে হয়। জীবনে মুক্তিশান্তি যে অনন্ত অসীমের সঙ্গে যুক্ত হলেই পাওয়া যায়, এই সত্যটি মানুষের ক্ষুদ্র ও সসীম বুদ্ধি বুঝতে পারে না। তাকে এই সত্যটি মহৎ বা বৃহৎ ধরিয়ে দিলেও সে নিতে পারে না। অনন্ত কামনাবাসনার আগুনে পুড়ে সে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

একদিন এক গাছতলাতে এক সাধক এসে বসল। সে দূর থেকে দেখল একখণ্ড পাথর। পাথরটিকে দেখামাত্র তার মনে বাসনা জাগল, গাছ হওয়া বেশ ভাল, বেশ বড় গাছ। সেই গাছে অনেক পাখি এসে বাসা বাঁধবে, অনেক লোক তার ছায়াতে এসে আশ্রয় পাবে।

ভগবান তাকে গাছ তৈরি করলেন। সে তখন অন্যান্য গাছের সঙ্গে বসবাস করে দেখল যে তাতেও সুখ নেই। একই জায়গায় রাতদিন একই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কত লোক এসে তার দেহ থেকে ডাল কেটে নিয়ে যায়। সে তখন ইচ্ছা করল, যদি পাখি হওয়া যায় তবে ভাল হয়, বেশ আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ানো যায়।

সে পরিণত হল পাখিতে। সে বেশ আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার অতৃপ্ত মন আবার বিদ্রোহ করল। সে তখন হতে চাইল পশু। সে ভাবল, পাখির চেয়ে পশু অনেক শক্তিমান।

আবার তার ইচ্ছানুযায়ী সে পরিণত হল পশুতে। কিছুদিন পরে ভাবল, পশু হয়েও তার শান্তি কোথায়? পশু তো মানুষের বধ্য। তখন সে মানুষের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য হতে চাইল মানুষ।

ভগবান তাকে বানালেন মানুষ। মানুষের দেহে এসে তার বাসনা আরও বেড়ে গেল। সে তখন আরও বেশি ক্ষমতা পেতে চাইল। সে দেখল এতেও শান্তি নেই কারণ তার ইচ্ছানুরূপ চলবার শক্তি কোথায়? তারপর সে হতে চাইল দেবতা। সে ভাবল, তাহলেই সে সব ক্ষমতার অধিকারী হবে।

তারপর সে transformed হল দেবতায়। সেখানে শুরু হল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং দেবত্বের অহংকার। সে দেখল সেখানেও শান্তি নেই। তাই সে চাইল, সব কিছুর যা উৎস তা-ই, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব। সে ভাবল, ওখানেই তার সব শেষ।

ভগবান দেখলেন ওখানে গিয়েও, অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে পৌঁছেও এর শেষ হবে না, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না, বেড়েই যাবে। তাই ভগবান তাকে বললেন—তুমি আবার পাথর হয়ে যাও।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন—আসলে মানুষের মনের গতি সসীমের দিকে। তার অনন্ত অসীমের ধারণাও হয় না এবং প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু বিপদ-আপদে পড়লে মনে হয় সসীমের ঝামেলা আর যেন ভাল লাগে না। তখন সসীমের থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী ভাবে সেই চেষ্টা চলে, অর্থাৎ অসীমের দিকে দৃষ্টি পড়ে।

জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন শুধু সসীমকে ঘিরে নয়, যদিও মন সসীমকে ঘিরে থাকতেই বেশি ভালবাসে, আবার প্রতিক্রিয়া হলে তখন সামলাতেও পারে না। সসীমের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকার ফলে সসীমের প্রতি আসক্তি আসে এবং তার ফলে struggle করতে হয়।

অসীমকে জানা নেই বলে অচেনা, অজানা বিষয় সম্বন্ধে মানুষের একটু ভয় থাকে। যাঁদের জানা আছে তাঁরা অসীমকে ভয়ের বস্তু বলে ধরিয়ে দেন না বরং সহজ ও আপনজন বলে তাঁর পরিচয় ধরিয়ে দেন। তাই তাঁরা তাঁর গুণগান করেন, তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

৪। ৬। ৭১

১১৬

Success ও failure হয় মানুষের বিচারে। মানুষের চাওয়ার পরিণামের এই ফল। যিনি সত্যিই ভগবানকে চান, তার ভগবানকে চাওয়াতে ও তার ফলে তিনি অবিচলিত থাকেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ বিচলিত হয়। ভগবান অর্থে স্ববোধ-আত্মাকেই বুঝতে হবে।

ব্যক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে পেতে হয়, অন্য উপায় নেই। Life-এর মধ্যে সব আছে—Knowledge, Bliss, Power । তিনি নিজেই সব হয়েছেন। সুতরাং অন্তরে-বাইরে যা-কিছু আছে সবই তিনি। তাঁর মতো হবার ইচ্ছা মানুষের আসে না, মানুষ তাঁকে নিজের মতো করে পেতে চায়। সেই রকম ভাবে পেয়েও পূর্ণতা আসে না, কারণ মানুষের চাওয়ার মধ্যে যে দোষত্রুটি থাকে তা হল সসীম। 'আমারবোধের' মধ্যে ভগবানকে বসাতে হয় অথবা 'তুমি তোমার বোধে' বসাতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক দুঃস্থ পরিবারের একটি ছেলে স্বপ্নে ভগবানকে বলছে—আমাকে এ ভাবে তুমি পাঠালে কেন ? এর চেয়ে ভাল ভাবে তুমি পাঠাতে পারতে না ?

ভগবান পরের জীবনে তাকে পাঠান America-তে কোনও এক ধনীর গৃহে। সেখানে সে অত্যন্ত সুখে লালিত পালিত হচ্ছে। বড় হয়ে দেশের আইন অনুযায়ী তাকে military-তে যোগ দিতে হল এবং military operation-এর সময় front-এ

যেতে হল। সেখান থেকে সে আহত ও পঙ্গু হয়ে ঘরে ফিরল। ঘরে ফিরে সে ভাবতে লাগল, কেন তার এমন হল!

Father-এর সঙ্গে একদিন church-এ তার দেখা হল। তাঁকে সে প্রশ্ন করল—কেন এমন হল ? Father-এর ছেলেটির এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক জানা না-থাকাতে তিনি বললেন—এই প্রশ্নের উত্তর পরে বলব।

Father বেরিয়ে পড়লেন উত্তরের সন্ধানে। রাস্তায় হঠাৎ এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা হল। সন্ন্যাসীটি উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বসেছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্বন্ধে Father-এর আগেই ধারণা ছিল। Father তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা অনেক কিছু জান, বলতে পার কেন এমন হয় ? এই বলে তিনি সেই পঙ্গু ছেলেটির গল্প করলেন। সন্ন্যাসী উত্তরে বললেন—সব নিজের বলে চাইলে এমন হয়।

Father সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এ ভাবে থাক কী করে? কী হলে এ ভাবে থাকা যায় ?

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—সব ঈশ্বরকে দিয়ে দিলে এ ভাবে থাকা যায়। 'আমার' বলে তো আমার আর কিছু নেই।

Father—তোমার কষ্ট হয় না?

সন্ন্যাসী তখন দেখতে পেলেন একজন খোঁড়া লোক যাচ্ছে লাঠিতে ভর দিয়ে। লোকটিকে দেখিয়ে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই লোকটি চলছে কী করে ?

Father—এটা ওর অভ্যাস।

সন্ন্যাসী—তুমি church-এ আছ কী করে ?

Father—তাতে আনন্দ আছে।

সন্ন্যাসী—আমারও এতে আনন্দ আছে।

Father—এই আনন্দ তুমি পেলে কোথায় ? তোমাদের ভগবান কি বলেছেন এই কথা ?

সন্ন্যাসী—কেন, তোমাদের ভগবান যিশুও তো বলেছেন এই কথা।

Father—যিশু তো ভগবান নন, তিনি তাঁর সন্তান।

সন্ন্যাসী—তাহলে তোমাদের ভগবানের আর ক'টি সন্তান আছে? একটিমাত্রই কি সন্তান ? এটা কী করে সম্ভব যে, আর কোনও সন্তান তাঁর হয়নি ? এই বলে সন্ন্যাসী একটি শিবমূর্তি তাঁর সামনে রেখে বললেন—ইনিই হলেন তোমাদের ভগবানের পিতা।

Father এই কথা শুনে যেন কী রকম হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—এ কী করে সম্ভব হয়?

সন্ন্যাসী—কেন, তোমাদের ভগবানের বাবা না-থাকলে তিনি এলেন কোথা থেকে? তোমাদের ভগবানের আবার একজন মা আছেন।

Father কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পরে তিনি বললেন—আচ্ছা তুমি আমাকে কী শেখাতে পার?

সন্ন্যাসী—যা শিখলে ভগবান হওয়া যায়, তোমাকে তা-ই শেখাতে পারি।

Father—সে কী? তাতে কি ভগবান হওয়া যায়? কী করে?

সন্ন্যাসী—হ্যাঁ, তবে তোমাকে যে-ভাবে বলব সে-ভাবেই চলতে হবে এবং যা করতে বলব তা-ই করতে হবে।

Father—কী করতে হবে?

সন্ন্যাসী—আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—এই কথা তোমাকে প্রতিমুহূর্তে মনে রাখতে হবে। তিন বছর তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

Father—সেটা কী করে সম্ভব?

সন্ন্যাসী—কেন, এখন তুমি যা করছ তা কি তোমার একদিনেই হয়েছে? তোমাকে বর্তমানের কাজ থেকে resign করে আসতে হবে।

Father শুরু করে দিলেন তাঁর সাধনা। ক্রমে তাঁর নেশা লেগে গেল। তিন বছর পরে আবার তাঁর দেখা হল সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

Father—আমার এক এক সময় মনে হয় যেন দেহেব কোনও existence নেই। এ রকম কেন হয?

সন্ন্যাসী—আবও অনেক বাকি আছে। এবার থেকে ভাবতে হবে দেহ আমি, মন আমি, বুদ্ধি আমি, সুখ আমি, দুঃখ আমি, খাবাপ আমি, ভাল আমি, মৃত্যু আমি, অমৃত আমি, পশু আমি, পাখি আমি, মানুষ আমি—এই কথা আরও তিন বছর প্রতিমুহূর্তে মনে রেখে চলবে।

এই ভাবে Father হয়ে গেলেন বিরাট একজন ভক্ত। তিনি তখন সেই পঙ্গু ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন—দেখ, তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমি সেই দিন দিতে পারিনি, কিন্তু এখন দিতে পারব। এই বলে Father ঈশ্বরস্বরূপ হয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটি তাকে বললেন। সেই ছেলেটিও Father-এর মুখে সব শুনে খুব বিস্মিত হয়েছিল। পরে সেই ছেলেটিও Father-এর নির্দেশ অনুযায়ী চলে ভবিষ্যতে বিরাট একজন স্বানুভবসিদ্ধ ভক্ত হয়েছিল।

৪। ৬। ৭১

১১৭

ঈশ্বর-আত্মাকে না-মেনে কারও কি উপায় আছে? যোগী শক্তি apply করতে করতে আর যখন পারেন না তখন অসহায়বোধে বলেন—তোমার কাজ তুমি কর বাবা। আবার জ্ঞানীও যখন জ্ঞানবিচার করতে করতে কোনও সমাধান পান না তখন বলেন—মায়াকা খেল হ্যায় সব। এর উদাহরণ তো তোতাপুরীর জীবনেই পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে পাগলাটা (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ছিল বলেই তো তিনি মাকে মানতে শিখেছিলেন।

পাগল কাকে বলে? পা যার গোল সে-ই পাগোল (পাগল)। পাগলের অর্থ হল 'গোল পা চুকা'। এঁরা সব কিছুকেই accept করে বসে থাকেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একসময় এক পাগল বিষ্ণুভক্ত ছিল। পাগলের উপর তুষ্ট হয়ে একদিন বিষ্ণু তাকে দর্শন দেবার জন্য তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পাগল তাঁকে দেখে বিশেষ করে অভ্যর্থনা করল না বা খুশি হবার ভাবও প্রকাশ করল না, এক রকম নির্বিকার ভাবেই রইল।

এই দেখে বিষ্ণু পাগলকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি তোমার কাছে এসেছি তোমাকে দর্শন দেবার জন্য, কিন্তু কই তুমি তো খুব উৎফুল্ল হয়েছ বলে মনে হচ্ছে না। কোনও আদর অভ্যর্থনাও তো আমায় করলে না।

পাগল—তুমি এসেছ এ কথা বললে কেন? তুমি তো সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ। চার দিকের প্রত্যেকটি প্রকাশের মধ্যেই তো তুমিই রয়েছ।

বিষ্ণু—এ তো উত্তম ভক্তের কথা। এ কথা তোমাকে কে শেখাল?

পাগল—কেন, তুমিই তো শিখিয়েছ। তুমি ছাড়া জগতে শেখাবার আর কে আছে? সর্বরূপে, সর্বনামে, সর্বভাবে, সর্ববোধে একমাত্র তুমিই তো রয়েছ। পাগলের এই কথা শোনামাত্র বিষ্ণু পাগলকে প্রেমালিঙ্গন করলেন। পাগল তাড়াতাড়ি বিষ্ণুর চরণে প্রণাম করল এবং বিষ্ণুও পাগলের চরণে প্রণাম করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—Infinite Consciousness-এর কতটা আর প্রকাশ হয়েছে? বাইবেলের মধ্যে কয়েকটিমাত্র কথা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের মুখ থেকে গুটিকয়েক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে, শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ থেকে কয়েকটি কথা—এই তো পাওয়া যায় গুটিকয়েক কথামাত্র।

সমষ্টিকে মানলে সব কিছুর মধ্যে এক-এরই প্রকাশ অনুভূত হয়। এর উপরে আর কোনও অনুভূতি হয় না। অনন্ত বেদভাণ্ডার, তার কতটুকুই বা প্রকাশ হয়েছে? মানুষের বিচার করার কিছুই থাকে না। সর্বভূতে যে আমাকে ভজনা করে সে নিত্য এক-এই রয়েছে। এই হল সর্বোত্তম অনুভূতি। এই অনুভূতি যাঁর হয় সে তখন হয়ে যায় দিব্যোন্মাদ বা বালকবৎ।

২৫। ৬। ৭১

১১৮

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে একটি গল্প দিয়েই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আজকের সৎপ্রসঙ্গ শুরু করলেন।

একসময় এক গুরু লক্ষ্য করলেন, তাঁর শিষ্যদের সাধনা ঠিক মতো হচ্ছে না। গুরু দেখলেন, তাঁর চারজন শিষ্য নিজেদের মধ্যে বৃথা আলোচনা ও তর্ক করেই অমূল্য সময় নষ্ট করে এবং তার ফলে তাদের আসল কাজগুলি আর হয় না। তাদের চিত্তবৃত্তি চঞ্চল হওয়াতে গুরুশক্তিও তাদের মধ্যে কাজ করতে পারছিল না।

গুরুদেব তাদের ঠিকপথে আনার জন্য সপ্তাহে ছয় দিন মৌন থাকার নির্দেশ দিলেন। তখন দেখা গেল, সপ্তম দিনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে তখনও নানা রকম অপ্রাসঙ্গিক বাজে আলোচনায় তারা সময় কাটাতে লাগল।

শিষ্যদের কোনও উন্নতি হচ্ছে না দেখে গুরুদেব ছয় দিনের পরিবর্তে চৌদ্দ দিন মৌন থাকতে আদেশ দিলেন। তাতেও কোনও ফল হল না। তখন গুরুদেব ক্রমশ এক মাস ও পরে তিন মাস মৌন থাকতে বললেন। তবুও তাদের আশানুরূপ পরিবর্তন হল না। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সুযোগ না-পেয়ে কেউ গাছের সঙ্গে, কেউ বা নদীর সঙ্গে একাকী গোপনে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল।

এদিকে গুরুর দেহরক্ষার সময় হয়ে এল। শিষ্যদের সে রকম উন্নতি হতে না-দেখে তিনি খুব চিন্তিত হলেন। দেহত্যাগেব পূর্বে তিনি শিষ্যদের কিছু দিয়ে যেতে চাইলেন। তখনও দেখা গেল যে, গুরুর বা ভগবানের কাছে কী চাইতে হয় তাও তিনজন শিষ্য একেবারেই জানে না। তাদের মধ্যে একজন শিষ্যই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথম তিনজন শিষ্য গুরুদেবের কাছে তিনটি বিভিন্ন বিভূতির জন্য প্রার্থনা করল। তিনটি প্রার্থনাই ক্ষমতার অপপ্রয়োগে মারাত্মক হতে পারে। প্রার্থনাগুলি হল, (১) যে কোনও টুকবো টুকরো জিনিসকে জোড়া দিয়ে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা; (২) প্রাণদানের ক্ষমতা এবং (৩) অভিসম্পাতের দ্বারা মৃত্যু ঘটাবাব ক্ষমতা।

গুরুদেব প্রমাদ গুণলেন। তবুও তিনি তিন শিষ্যের এই প্রার্থনাগুলি পূরণ কবলেন। তিনি তাদের বর দান করলেন, কিন্তু মাত্রা বেঁধে দিয়ে, অর্থাৎ তিনবাবের বেশি এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করা চলবে না।

চতুর্থ শিষ্য গুরুদেবের কাছে কিছুই চাইল না। সে গুরুকে বলল—আপনি নিজে খুশি হয়ে আমাকে যা দেবেন তা-ই আমি নেব।

শিষ্যের কথা শুনে গুরুদেব খুব খুশি হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই শিষ্যটির মধ্যে কিছু ভাল জিনিস আছে। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে শিষ্যকে বললেন—তোমাকে আমি এই বর দিয়ে যাচ্ছি যে, তুমি আমাকে যখনই ডাকবে তোমাব কাছে আমি তখনই প্রকাশ হব।

কয়েকদিন পরে গুরুদেব দেহরক্ষা করলেন। আর এদিকে তিন শিষ্য গুরুদত্ত শক্তির খেলা দেখিয়ে কিছু পসার ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা বিপদে পড়ল। গুরুদত্ত শক্তি, টাকাপয়সা, সুনাম সবই তাদের নষ্ট হয়ে গেল এবং তারা দুঃখকষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল।

চতুর্থ শিষ্য কিন্তু একবারও গুরুদত্ত বরটি কার্যকরী করার চেষ্টা করেনি। সে তার গুরুর নির্দেশ মতো অতি নিষ্ঠা সহকারে একাকী সাধন করে যেতে থাকে। তিন গুরুভাইয়ের দুরবস্থা ও আধ্যাত্মিক পথে পতন দেখে সে খুব মর্মাহত হল। গুরুভাইরাও তার কাছে এসে তাদের ভুলগুলি অকপটে স্বীকার করল এবং খুব অনুশোচনা করল। তাদের দুঃখকষ্টের আর সীমাপরিসীমা নেই। এই দুর্দিনে তাদের কে-ই বা আর পথ দেখাবে?

খুব বিমর্ষ হয়ে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে তারা চতুর্থ গুরুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল যে, সে গুরুর দেখা পেয়েছে কি না। তারা শুনেছিল গুরু তাকে বর দিয়েছিলেন যে, সে ডাকলেই তাঁর দর্শন পাবে।

চতুর্থজন গুরুভাইদের দুর্দশা দেখে এইবাব গুরুদেবকে স্মরণ করল। এই প্রার্থনাটিও তার নিজের জন্য নয়, শুধু গুরুভাইদের কল্যাণ কামনাতেই এই দর্শনের জন্য প্রার্থনা।

স্মরণমাত্রই গুরুদেব তার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। শিষ্য গুরুদেবকে সব বলল এবং গুরুভাইদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাল।

গুরুদেব চতুর্থ শিষ্যের ব্যবহারে খুব প্রীত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি চতুর্থ শিষ্যের অভিলাষ অনুযায়ী অন্য শিষ্যদের সাধনায় উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করলেন। চার শিষ্যই শেষ পর্যন্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—সাধনপথে বাক্‌সংযমের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে শেখানো হয়। তর্ক, যুক্তি, বৃথা আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা কী ভাবে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তাও এই গল্পটি হতে শিক্ষণীয়। ভগবানের নিকট কী ভাবে প্রার্থনা করতে হয়, কী ভাবে চাইতে হয় তাও লক্ষণীয়। চাইলে ভগবান দেন, কিন্তু ক্ষমতার বা বস্তুব অপব্যবহার করলে কী পরিণাম হয়—তাও এই গল্পে দেখানো হয়েছে। সৎসঙ্গের মহিমাও গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত। সৎসঙ্গের ফল ধীরে ধীরে হলেও একদিন তা কার্যকরী হয়, এটা নিশ্চিত। সৎসঙ্গ করা ছিল বলেই তিন শিষ্যের পুনবায় চতুর্থ শিষ্যের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং চতুর্থ গুরুভাইয়ের সাহায্যেই তারা আবার ঠিকপথে চালিত হয়েছিল।

গুরু সর্বদাই বর্তমান। শিষ্যদের কল্যাণের জন্য তাঁদের সতত চেষ্টা থাকে।

৩০। ৬। ৭১

১১৯

প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৃত্তির একনিষ্ঠতার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ inspire করলেন যুদ্ধ করতে কারণ তিনি জানতেন যে, প্রকৃতি তাঁর ক্ষত্রিয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে দেবে। শত্রুর দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে ক্ষত্রিয়ের যে তেজ তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তবে আগে থেকে জানতে পারলে প্রস্তুত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ধরিয়ে দিলেন, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করতেই হবে। ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। ক্ষত্রিয়ের মতো তার অস্ত্র ধরলে চলবে না। Sincerity থাকলে যার যার স্বভাবের বৃত্তি দিয়ে প্রত্যেকেই আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। Sincerity-র অভাব থাকার জন্য মানুষ goal-এ পৌঁছতে পারে না—তা মহাত্মারা ধরিয়ে দেন। প্রত্যেকটি কাজই Divine। সাধারণত মানুষ লাভ-লোকসানের দৃষ্টিতেই অপরের ও নিজের কাজের বিচার করে। কিন্তু দেখতে হবে কর্ম কী বোধে করা হচ্ছে এবং কতক্ষণ করা হচ্ছে। যদি কোনও খুনি বলে, I am appointed by the Divine, তবে সে কি পাপী?

উপরোক্ত প্রসঙ্গের উত্তর শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিম্নলিখিত গল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

কোনও এক খুনের case সম্বন্ধে এর আগে বলা হয়েছিল। কোর্টে জজ যখন রায় দেবেন সেই সময় কোনও এক খুনি বলেছিল—আমার কিছু বলার আছে। খুনের দায়ে যখন তার ফাঁসির হুকুম হবে, সেই সময় সে বলল—আপনারা তো অনেক বলেছেন, আমারও কিছু বক্তব্য আছে। I am not guilty কথাটি শুনে জজসাহেব অবাক হয়ে বললেন—তার মানে? সে বলল—আমি যত দোষ করেছি তার চেয়ে কোটি গুণ দোষ করেছেন আপনারা। আমি খুন করেছি সত্য, কিন্তু তার জন্য আমার ভিতরে ভয় বা অনুশোচনা নেই। কারণ আমি পূর্ণ সচেতন যে, এই খুনের জন্য I am appointed by the Divine। সেই জন্য আমার কোনও দুঃখকষ্ট নেই। I am fully conscious about myself। সে আরও বলল—দেখুন, আপনাদের বলা তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে, এবার আমাকে কিছু বলতে দিন। বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলরা তখন বাধা দিতে গেলে হাকিম বললেন—তার বক্তব্য শুনতে হবে। শুনলে বুঝবেন he is not a fool। হাকিম তার ভয়শূন্যতা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। খুনি যা বলল তা শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই দিন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গিয়েছিল বলে হাকিম সেদিনকার মতো case স্থগিত রাখলেন। খুনির বক্তব্য শোনার জন্য আরও তিন দিন time দেওয়া হল। তিন দিন সমানে সে বলে গেল। শোনার পর বোঝা গেল কী সাংঘাতিক তার চরিত্র। সে বলল—আমাকে একটি বিশেষ circumstance-এর মধ্যে খুন করতে হয়েছে। এর জন্য আমি repentant বা অনুতপ্ত নই, আমার কোনও দুঃখ নেই। I am now free কারণ আমি Divine-কে follow করছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিজের কাজ সম্বন্ধে সে fully conscious। Consciousness-এর সব কটি stage-এর সঙ্গে সে পরিচিত। সে বলল—আমি এ কথাও বলতে পারি যে, আপনারা আমার চেয়ে অনেক নিচু স্তর থেকে কথা বলছেন। শুনতে শুনতে হাকিম দেখল তার নিজের শৈশব থেকে প্রত্যেকটি stage-এর ব্যাপারের সঙ্গে খুনির জীবনের ঘটনা মিলে যাচ্ছে। কী কী অপরাধে তিনি নিজে অপরাধী তা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। বিচারকদের মধ্যেও চারজন ছিল, যারা ভ্রূণ হত্যার অপরাধে অপরাধী। সমস্ত কথা শোনার পর হাকিম নিজেকেই অপরাধী বলে feel করতে লাগলেন যার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি রায় লিখতে পারলেন না। Judge-এর post থেকে তিনি resign করলেন। যাবার সময় তিনি লিখে দিয়ে গেলেন যে, এর রায় দেবার মতো হাকিম আদৌ আছেন কি না সন্দেহ। এমনকী এ কথাও লিখে গেলেন, I am more guilty than the convict, তাকে রায় দেবার আগে তাহলে নিজের death sentence লিখতে হবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই যে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান হয়ে রাবণ বধ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে কুরুক্ষেত্রের অতবড় একটি ধ্বংসের কাজ করালেন—তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাম ও অর্জুনের পাপগুলি কার ঘাড়ে যাবে?

এ সব প্রশ্ন কারও মনে জাগে না। রাম কার জন্য পাপ করলেন ? লোকে বলবে সীতা উদ্ধারের জন্য। তাহলে সীতা উদ্ধারের থেকে আরও বড় cause-এর জন্য খুন করলে সে অপরাধী হতে পারে না। এ সব অসংগতিমূলক আচরণের কারণগুলি অনুভূতির মধ্যে সাধকরা ধরতে পেরেছেন এবং সেই জন্যই তাঁরা রামকে ভগবানরূপে মানেন। অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁরা বলেন না। রামের প্রতিটি action-এর মধ্যে ভাগ ভাগ করে দেখানো হয়েছে, তাঁর attachment কোন জায়গায় কতখানি আছে, সেই কর্মের মধ্যে তাঁর personal interest কতখানি আছে। দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে, যে level থেকে তাঁরা এই সব কাজ করেছেন সেই level-এ কেউ পৌঁছতেই পারেনি।

লোকে অনেক সময় যুক্তি দেখায় যে, বিনা দোষে বালীকে মারার অপরাধে রামচন্দ্রকে ভগবান বলে মানা যায় না, অর্থাৎ লোকে রামকে ভগবান বলে মানে আর পাঁচজনেরটা শুনে। রামকে যথার্থ ভগবান মানা হয় কল্যাণের জন্য। রাম কী কল্যাণ করলেন ? রাবণের বংশ ধ্বংস করলেন। রামকে ভগবান কী অর্থে নেওয়া হয়েছে বুঝতে চাইলে সূক্ষ্মবোধের জাগরণ দরকার। শ্রীকৃষ্ণের political ব্যাপারটা লোকে নেয়, কিন্তু রাম ও কৃষ্ণকে ভগবান বলার তাৎপর্য particular কতগুলি action-এর জন্য নয় বা শুধু তাঁদের কথার জন্য নয়। তাহলে কেন তাঁদের ভগবানরূপে নেওয়া হয়েছে তাঁর উত্তর বইয়ের মধ্যে নেই। আর বইয়ে যা আছে সেটুকু দিয়ে তাঁদের ভগবান বলা যায় না। তাঁদের Inner Consciousness-টা কী ভাবে work করছে এবং তাঁদের highest quality কী সে সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত নয়। তাঁদের যত দোষগুণ আছে সব যদি সাজানো যায় তবে দেখা যাবে তাঁরা selfless, interestless, অর্থাৎ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অতি সামান্য। রাম সীতার জন্য রাবণের বংশ ধ্বংস করলেন। কিন্তু এর পিছনে যে রহস্য আছে তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে একটি সাংঘাতিক কারণের জন্য করেছিলেন তা সাধারণ লোক বুঝবে না। বর্তমানে এই শহরের বুকে যে ধ্বংস চলছে তার পিছনে কল্যাণমূর্তি কোথায়, কতখানিই বা আছে—এ সব কেউ জানতে পারবে না। যে position থেকে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব clear হয়ে যায় সেখানে গিয়ে বোঝা যায় রাম ও কৃষ্ণের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ। তখনই ধরা পড়ে যে, সব রকম cause and effect is He Himself এবং সেই Self প্রত্যেকের ভিতরে নিত্যবিদ্যমান—তিনিই এ সব কার্য-কারণ সৃষ্টি করে চলেছেন।

•১৯। ৭। ৭১

১২০

একদিন সৎপ্রসঙ্গকালে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে আক্ষেপ করে বলেছিল—কলকাতা শহরে সেই রকম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো গুরু পাচ্ছি না তো।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন—বাবা, শুধু চেখে বেড়ালে কি হয়! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো গুরুকে চেনবার শক্তি থাকলে তো তোমার কিছুরই দরকার হত না। গুরুকে বাজিয়ে নেওয়া কি সবার পক্ষে সম্ভব ? একজন পেরেছিল বলে সবাই কি বিবেকানন্দ হতে পারে ? এই রকম ভাবে বিবেকানন্দ সেজে লাভ কী ? মহাত্মা মহাপুরুষদের কাছে আসল জিনিসের কথা শুনে তাঁদের নির্দেশ মতো জীবনে চলতে হয়, নয়ত তাঁদের কথা শুনে খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও একটু অনুমান করতে পারে শুধু, কিন্তু তা দিয়ে স্বানুভূতি লাভ হয় না। অনুভূতি ও স্বানুভূতির মধ্যে অনেক পার্থক্য।

অনুভূতি হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এক বহুরূপে প্রতিভাত হয়। ইন্দ্রিয়াতীতে গিয়ে স্বানুভূতি হয়। তখন এক-এর বা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

'বহুর মধ্যে এক-এর স্থিতি হল জ্ঞান। এক-এর প্রতি এক-এর আসক্তি হল ভক্তি এবং প্রীতি হল প্রেম।' এটাই জীবনে দরকার। এর জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্র থেকে এটুকু শুধু জানবে—সত্য এক। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই এক-কে অনুভব করে তদনুযায়ী জীবনে যেন আচরণ করা হয়। জ্ঞানের আলোচনাতে পাণ্ডিত্যের অভিমান শুধু বাড়ে। অভিমানশূন্য জ্ঞান হল স্বানুভূতি। অভিমান থাকলে অনুভূতি হলেও স্বানুভূতি হয় না।

নেমন্তন্ন বাড়িতে বহু রকম খাবার, ভাল-মন্দ সবই থাকে। কিন্তু নেমন্তন্ন খেয়েই যদি বমি হয়ে যায় তবে পুষ্টিলাভ আর হতে পারে না। সকল আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। সে রকম সাধনার পথেও আসল বস্তুটিকে প্রথমে গোপনে রাখতে হয়। ভাল ভাল কথা হৃদয়ে ধারণ করে তা জমে গেলে, ভিতরে গিয়ে একাত্মবোধে মিশে গেলে তবে বোধের প্রীতি ও সমতার প্রীতি হবে। তার আগে বমি হলে অর্থাৎ অপরকে বললে সারবস্তুটি সব বেরিয়ে যায়, জমে না।

সাধনার পথেও আসল বস্তুটি গোপন রাখতে হয়। তা পরে যখন বেড়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে তখন আপনিই প্রকাশ হবে। তুমি জোর করে প্রকাশ করতে পার না। ভগবান তোমার ভিতরে খেলবেন, তুমি কী করে খেলাবে ভগবানকে ? তিনি কখন কী ভাবে কার ভিতরে প্রকাশ হবেন, তা তিনিই জানেন।

ঋষিরা কত তপস্যা ও ধ্যানধারণা করে তবে বললেন—হে আবি! তুমি যদি প্রকাশ না-হও, কে তোমাকে প্রকাশ করবে ? তুমি স্বয়ংপ্রকাশ, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো কেউ নেই। তুমি যাঁকে বরণ করে নিয়ে প্রকাশিত হতে চাও, তাঁর মধ্যেই শুধু তোমার প্রকাশ হওয়া সম্ভব। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্মী সবার জীবনের একই উদ্দেশ্য—শুধু ঈশ্বর-আত্মার প্রকাশ হতে দেওয়া। কিন্তু লৌকিক অর্থে মেলানো বড় মুস্কিল, ফলে চলার পথে সকলের সঙ্গেই সকলের দ্বন্দ্ব থেকে যায়। সৎসঙ্গে এসে নিজের ভুলটি সংশোধন করে মিলটা খুঁজে তার পরে চলতে হয়। যখন সাধক দেখতে পায়, তার কোনও দ্বন্দ্ব ও সংশয় নেই তখন সে সর্বদা সব লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। তখন

সে দেখে যে, একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন design-pattern এবং ভিন্ন ভিন্ন style ও technique-এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে। সত্য এক, design-pattern-ই শুধু ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে এক সত্যই প্রকাশ হয়, কিন্তু থাকে শুধু ব্যবহারিক তারতম্য।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ দু'জনেই রাজা ছিলেন, আবার দু'জনেই অবতার ছিলেন, অথচ তাঁদের দু'জনের design-pattern-এর যেমন পার্থক্য ছিল, তাঁদের mission-এর মধ্যেও তেমন পার্থক্য ছিল অনেক। বুদ্ধদেব—তিনিও তো রাজার পুত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিব্যক্তি আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়েছিল। তাই তাঁদের দেহও তৈরি হয় সেই রকম ভাবে এবং ভাষার technique ও style-ও হয় ভিন্ন ভিন্ন রকম।

প্রয়োজন অনুসারে Divinity নেমে আসেন বিভিন্ন design নিয়ে। এগুলি বুঝতেও কত সময় লাগে। তাঁদের চলে যাবার বহু বহু যুগ পরে সকলে বুঝতে পারে। বুদ্ধিমান লোকেরা তো ভাগ ভাগ করেই সময় নষ্ট করে ফেলে। বুদ্ধিমান লোকেরা ভাগ আর বিয়োগই শুধু করে যায়। 'সত্যের মধ্যে ভাগ বা বিয়োগ করা চলে না, যোগ ও পূরণ করা চলে।' পূরণ—(১) পুর+ণ, অর্থাৎ বোধসত্তার অখণ্ড সমতা, অখণ্ড শান্তি, অখণ্ড আনন্দ ও ভূমা সুখকে indicate করছে 'ণ'। এই দিয়ে পূর্ণ কর। (২) পূরণ—'পুর' মানে দেহ, আধার এবং 'ণ' হল আনন্দ। দেহের কারণ আনন্দ, তার প্রকাশই কার্যরূপে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ঋষিদের মুখ হতে বেরিয়েছিল—আনন্দ হতেই সব জাত, আনন্দ দ্বারাই বিধৃত এবং আনন্দেই সব লয় হয়।

'আমিতত্ত্ব' হল প্রশান্ত মহাসাগরের মতো। তার তলদেশে এক রকম অবস্থা, মধ্যদেশে এক রকম অবস্থা এবং উপরিভাগে এক রকম অবস্থা। তলদেশে প্রীতি, মধ্যদেশে গতি, শক্তি বা current এবং উপরিভাগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি, অভিব্যক্তি, ফেনা, বুদ্‌বুদ্‌, তরঙ্গ, লহরী প্রভৃতি।

তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্‌ ও ফেনার মধ্যে যেটা বিরাট তরঙ্গ সেটা হল যেন মহাপুরুষ। এমন একটা অবস্থায় তাঁরা থাকেন, চলেন ও বলেন যে তাঁদের ধরতে বা চিনতে ভারী অসুবিধা হয়। তাঁরা সবাইকে নিত্য এক-এর কথা, অমৃত দিব্য পূর্ণস্বরূপের কথা বলেন এক বিশেষ ভঙ্গিমায়। এটাই হল অধ্যাত্মবিদ্যা, যা অনুশীলন করে অপরেও তদ্‌বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বর-আত্মার কথাই তাঁরা বলেন। এটা শুধু কথার কথা নয়, অনুমানের বিষয়ও নয়—এ হল প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির কথা।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আচার্য শঙ্কর প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন।

আচার্য শঙ্কর একবার কাশীধামে অবস্থানকালে তাঁর অনুগত শিষ্যদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখলেন এক চণ্ডাল কতগুলি কুকুর নিয়ে রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে। শঙ্কর চণ্ডালকে সরে যেতে বললেন। তার উত্তরে চণ্ডাল বলেছিল—দ্বিজবর, তুমি কী বলছ তা আবার বল। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি অন্নময় হতে অন্নময় দেহকে সরে যেতে বলছ, না জ্ঞানময় হতে চৈতন্যময়কে সরে যেতে বলছ?

আচার্য শঙ্কর চণ্ডালের মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলেন। সেই চণ্ডাল তখন তাঁকে আরও কয়েকটি কথা বলেছিল, তা হল—

(১) জড় কি কথা বলতে পারে, শুনতে পারে ও চলতে পারে? না কি চেতনই বলে, চেতনই শোনে?

(২) ব্রাহ্মণের বাড়িতে গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত যে সূর্য এবং চণ্ডালের বাড়িতে জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত যে সূর্য তাদের মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য আছে কি?

(৩) স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত গঙ্গাজল ও মৃৎপাত্রে রক্ষিত গঙ্গাজলের মধ্যে কোনও তারতম্য আছে কি?

(৪) গঙ্গাজলের বোতলে প্রতিবিম্বিত সূর্য ও মদের বোতলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

(৫) যে সম্বিৎ সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করছে, সেই বিশ্বের প্রকাশক আব্রহ্ম, পিপীলিকা ও স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত আধারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং আধার চণ্ডালের কি ব্রাহ্মণের তা সম্বিৎ-এর দৃষ্টিতে খেয়াল রাখা সম্ভব কি? আধারের দিকে দৃষ্টি যখন থাকে না তখন সম্বিৎ-এর দিকে দৃষ্টি পড়ে, আবার আধারের দিকে খেয়াল থাকলে সম্বিৎ-এর জ্ঞান আর হয় না।

(৬) যিনি সম্বিৎ-এর মধ্যে নিজের মনকে যুক্ত রাখেন তিনি দেহে চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ যা-ই হন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। তিনিই জগদ্‌গুরু, বিশ্বগুরু, তাঁকেই আমি প্রণাম জানাই।

(৭) একবোধার্থক সত্তাতে মন যুক্ত রেখে যিনি ত্রিকালকে একবোধে জেনে সেই বোধেই অবস্থান করছেন এবং দেহ আধার পোশাক পরিচ্ছদের মতো পরিবর্তনশীল— এই ধারণা যাঁর দৃঢ় হয়েছে, তিনিই অজ্ঞানমুক্ত হয়ে প্রারব্ধের হাতে দেহভার ছেড়ে সম্বিৎ-এর সমজ্ঞানে সমদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ। তিনিই জগদ্‌গুরু, তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

(৮) যিনি সর্বপ্রকাশের অন্তঃসত্তাকে নিত্য সমানবোধে গ্রহণ ও বরণ করেন এবং তাতে যুক্ত থেকে সব কিছুকে তদ্‌বোধে (আপনবোধে) 'মেনে, মানিয়ে চলেন' তিনি সূর্য দ্বারা প্রকাশিত মেঘাচ্ছন্নের মতো এই দেহ ধারণ করে সদা অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে দেহে বিরাজ করেন। তিনিই মুক্তপুরুষ। তিনি যথার্থ ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী। তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁর সমস্ত ধী ভূমানন্দে নিত্যসুখে বিগলিত হয়েছে। তিনি ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ। তিনি কেবল ব্রহ্মবিদ্‌ নন, স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞ হলেন ব্রহ্ম স্বয়ং এবং ব্রহ্মবিদ্‌ হলেন—যিনি ব্রহ্মকে দ্বৈতবোধে জ্ঞানের বিষয় করেছেন এবং সেই ভাবে জেনেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য হল—ব্রহ্মকে যিনি একবোধে, সমবোধে আপনস্বরূপ বলে জানেন। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না। তিনি যথার্থ সদ্‌গুরু। তাঁকে আমি প্রণাম জানাই।

চণ্ডালের মুখে অদ্বৈতবোধের সার কথা শুনে শঙ্করের ধারণা হয় যে, এই চণ্ডাল নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী শিব স্বয়ং এবং তাঁর এইরূপ বোধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চণ্ডালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে শিববোধে স্তব করেন। তখন স্বয়ং শিব তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে শঙ্করকে আশীর্বাদ করেন এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লেখার অনুমতি দেন।

আচার্যকে তাঁর গুরু আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, ভগবান শঙ্করের সাক্ষাৎ দর্শন পেলে এবং তাঁর আশীর্বাদ, নির্দেশ ও অনুমতি পেলে তবেই যেন তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লেখেন।

কাশীধামে অবস্থানকালে গুরুর আশীর্বাদ এই ভাবে আচার্য শঙ্করের কাছে সত্যরূপে প্রকাশ হয়। তার পরেই তিনি আপনাকে ধন্য মনে করে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তৈরি করার জন্য বদরিকাশ্রমে চলে যান।

গল্পটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—আচার্য শঙ্করের প্রসঙ্গ থেকে গুরু-ইষ্টের আশিস্, করুণা ও অনুগ্রহ কী ভাবে জীবনে সত্যরূপে রূপায়িত হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও উদাহরণ পাওয়া গেল। তা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। নতুবা অদ্বয়তত্ত্ব অনুভবগম্য হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের জীবনালেখ্য উল্লেখযোগ্য। প্রহ্লাদের উক্তির মধ্যে আছে—

"সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহমেব সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।।
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যং পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্।" (বিষ্ণুপুরাণ)

অদ্বয় অখণ্ড পূর্ণ অনন্ত ঈশ্বর-আত্মা সর্বব্যাপী সর্বধারী সর্বজ্ঞ। আমার আমিরূপে তিনিই স্বয়ং। সুতরাং তাঁর এই আমি হতেই সব, আমিই সব, আমাতেই সব, আমিই সনাতন। আমি অক্ষর নিত্য পরমাত্মা আত্মস্থিত। আমিই ব্রহ্ম, আদি-মধ্য-অন্তে ব্যাপ্ত, সর্বত্র নিত্য বিরাজমান।

ভগবান ও আমি পৃথক হলে ভগবানকেও জানা যায় না, নিজেকেও জানা যায় না। ব্রহ্মতত্ত্বে ভেদভাব নিষিদ্ধ।

জগন্মাতাকে আত্মসমর্পণকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"এই লও মা তোমার শুচি, এই লও মা তোমার অশুচি; এই লও মা তোমার ধর্ম, এই লও মা তোমার অধর্ম; এই লও মা তোমার পাপ, এই লও মা তোমার পুণ্য; এই লও মা তোমার ভাল, এই লও মা তোমার মন্দ; এই লও মা তোমার জ্ঞান, এই লও মা তোমার অজ্ঞান—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" কিন্তু 'এই লও মা তোমার সত্য, এই লও মা তোমার মিথ্যা' এ কথা তিনি বলতে পারলেন না (কারণ সত্যকে ভাগ করা যায় না)।

তিনি যে মাকে সত্য দিতে পারলেন না—এই কথার তাৎপর্য খুব সহজবোধ্য নয়। এর ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে অনেকেই নিজের খুশি মতো ব্যক্ত করেছেন। এর তাৎপর্য

দ্বৈতবোধেব প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে কখনওই জানা সম্ভব নয়। সত্যকে ভাগ করা যায় না, এর কারণ সত্য নিত্য অখণ্ড। তার মধ্যে ভেদকল্পনা করা অজ্ঞানের কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, দ্বৈতভাবের দৃষ্টিতে যা-কিছু অনুভূত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনের অনুভূতি ও তার ব্যবহারকে, নানাত্ব-বহুত্বের কারণ, বিধিগত পূজা ও মানসপূজার উপকরণ হিসাবে যা-কিছু—সবই ভবতারিণী মাকে নিবেদন করেছিলেন। এই ভাবে সব কিছু নিবেদন করার ফলে তাঁব স্ববোধ বা আপনবোধ সিদ্ধ হয। তা-ই হল ভক্তি ও জ্ঞানের অভিন্ন অনুভূতি। তাঁর মাতৃদর্শন ও অনুভূতির তাৎপর্য স্ববোধের বা আপনবোধের মাধ্যমে এ ভাবেই ফলপ্রদ ও সুসিদ্ধ হয়। ব্যবহারিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে এই সব নিবেদন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিত্যসত্য একতত্ত্বকে, অদ্বয় অখণ্ড ভূমা তত্ত্বস্বরূপ আত্মাকে নিবেদন করা সম্ভব হয় না, কারণ তা নিত্য অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভাজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই চরম উক্তির তাৎপর্য কেবল স্বানুভবসিদ্ধ মহাপুরুষগণই অবগত হতে পারেন, অপবে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আচরণ ও কথার মধ্যে যে সামঞ্জস্যের অভাব তা সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না এবং সাধারণের পক্ষে তার মর্ম অনুভব করাও সম্ভব নয়। যেমন তাঁর অন্ত্যপর্বে তিনি একদিন নরেনকে স্পর্শ করে বললেন—"তোকে সব দিয়ে আজ আমি ফতুর হলাম।" এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সাধাবণের পক্ষে সম্ভব নয। যিনি জগন্মাতাকে এক সত্য ছাড়া সব কিছু একসময় সঁপে দিয়েছিলেন, তিনি তো তখন নিজের বলে কিছুই আর রাখেননি, তবে নরেনকে তিনি—"তোকে সব দিয়ে আজ আমি ফতুর হলাম"—এ কথা কেন বললেন? তিনি কি তাহলে জগন্মাতাকে সব দেননি? কিছু কি নিজের জন্য রেখোছিলেন? এই প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে। তাহলে তো মনে সংশয় জাগে যে, মাকে তিনি সব কিছু সমর্পণ করেননি।

আবার সত্যবোধ, মাতৃবোধ ও আত্মবোধের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করার পরে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তিনি যখন পরিচিত হলেন, তাঁর ঈশ্বরীয় অনুভূতি, আত্মানুভূতি শেষ হয় কী করে? এটাও এক বিশেষ প্রশ্ন যার উত্তর বা সমাধান সহজলভ্য নয়। কেবলমাত্র সমবোধের বা আপনবোধের গভীরে অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে স্বানুভূতির দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের জবাব বা সমাধান মেলে। নতুবা অনেক প্রশ্নেরই সমাধান পাওয়া যায় না।

সমর্পণের মধ্যে কোনও ত্রুটি অর্থাৎ দেবার অবশিষ্ট কিছু থাকলে সেই সমর্পণ পূর্ণ ও সিদ্ধ হয় না। অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ভিত্তিতেই করে থাকেন। তাঁরা বলেন, নরেনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যবোধে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে তাঁর সাধনৈশ্বর্য ও সিদ্ধি ঢেলে দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, নিত্যমুক্ত নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং প্রবিষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে লোককল্যাণের বা জগৎহিতের কার্য অর্থাৎ জগৎকে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের কথা দিয়ে

গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ণস্বরূপ ভগবান। তাঁর সমালোচনা লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে করতে গেলে অনেক অবান্তর কথাই বলা হবে। তাতে বক্তা ও শ্রোতা কারও উপকার বিশেষ হয় না। স্বানুভবসিদ্ধ না-হলে ঈশ্বর-আত্মা-ভগবান প্রসঙ্গে আলোচনা কখনও শঙ্কাশূন্য হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগন্মাতার কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলেন, মাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কী ভাবে মায়ের দর্শন পাওয়া যায়—এ-ই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা এত তীব্র হয়েছিল যে, মায়ের সঙ্গে যে ব্যবধান বা পার্থক্য, তা কোনও মতেই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। পরিণামে উভয়ের মধ্যে যে অবিদ্যা-অজ্ঞানজাত ভেদ বা পার্থক্য তা সরে যায়। তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন মায়ের কৃপায়। তিনি মায়ের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর ও মায়ের আত্মসত্তা ও সত্য যে অভিন্ন, এই সত্যানুভূতি লাভ করে কৃতকৃত্য ও ধন্য হন। তাঁর অজ্ঞানজাত দ্বৈতভাবের অবসান হয়। এই হল স্বানুভূতিব লক্ষণ, অদ্বৈতবোধের লক্ষণ, সত্য আত্মবোধ ও ঈশ্বর-ব্রহ্মানুভূতির লক্ষণ এবং উদাহরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচরণ, কথা ও অনুভূতির মধ্যে এই সত্যানুভূতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। সেই জন্য তাঁর জীবন ও বাণী আপামর সবার কাছে সহজগ্রাহ্য ও পরম আদরের বস্তু।

সত্যানুভূতির, ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মানুভূতির প্রকাশলক্ষণ মানবীয় ভাষায় যথার্থ ভাবে ব্যক্ত করা যায় না সত্য, কিন্তু তা ইঙ্গিত বা নির্দেশ করা যায় বিশেষ বিশেষ শব্দের সম্যক্ ব্যবহার দ্বারা।

ধর্মজগতে একই সময়ে বামাক্ষেপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই সত্য ঈশ্বর-আত্মার অনুভূতি লাভ করে দিব্যজীবনের অধিকারী হয়েছিলেন, তা সর্বজনবিদিত। তথাপি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেবই অবতাররূপে গণ্য ও প্রচারিত হলেন, কিন্তু অপর দু'জনকে সে-ভাবে গ্রহণ করা হল না কেন ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দ্বৈতবোধে পাওয়া যায় না। অন্তরে দ্বৈতবোধের প্রভাবে অহংকার-অভিমান যতদিন থাকে ততদিনই ভেদদর্শন, পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবেই অনুভূত হয়। কিন্তু মন-বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির পরিণামে হৃদয়ে অদ্বয়তত্ত্ব, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত হলে সেখানে অহংকার-অভিমান থাকে না। সেখানে ফুটে ওঠে অহংদেব স্বানুভবদেব। তিনি নিত্য এক ভূমাস্বরূপ। সমজ্ঞান ও সমদৃষ্টি হল তাঁর স্বরূপ। দ্বৈতজ্ঞান ও বহুজ্ঞানের ব্যবহার হয় অহংকার দ্বারা। কিন্তু সমজ্ঞানের বা একজ্ঞানের ব্যবহার হয় অহংদেবের বা স্বানুভবদেবের মাধ্যমে।

স্বানুভবদেবের লক্ষণ হল—"নিত্যসম একোঽহং সর্বমিতি"। এই অহং হল সত্তার আমি, আত্মার আমি, সমবোধের, একবোধের, পূর্ণ অখণ্ড ভূমাবোধের আমি। তা সর্ব আমি-র উৎস, সত্তা ও নির্যাস। তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। অহংকার

প্রকৃতিজাত, আত্মবোধের আভাসে আভাসিত এবং জীবভাব তার দ্বারাই তৈরি। জীবভাবের লক্ষণ হল অহংকার-অভিমান। এই অহংকার ইষ্ট-গুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করে দিলে অহংদেবরূপ, স্বানুভবদেবরূপ ইষ্ট-গুরু অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবেই হয়।

অহংকারের ব্যবহার হল ব্যষ্টি জীবভাব। তার সম্যক্ transformation হয় অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে এবং গুরু-ইষ্টের সম্যক্ কৃপা ও আশীর্বাদের ফলে। গুরু-ইষ্টের কৃপায় অন্তরের মলাবরণ, অহংকার-অভিমান পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে আত্মবোধের স্ফূর্তি জাগে।

জীবনের বহিঃসত্তায় হল প্রকৃতির গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য। অন্তঃসত্তায় হল প্রজ্ঞানঘন ব্রাহ্মীস্থিতি ও দিব্যপ্রেমমাধুর্য। জীবনে প্রশান্ত জ্ঞানের স্থিতি আসে তীব্র ব্যাকুলতা, বিবেকবিচার, আত্মানুশীলন ও আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে। তার ফলে সমদৃষ্টি, সমদর্শন ও একাত্মবোধ জেগে ওঠে। তা প্রত্যেকের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ও পূর্ণরূপে নিহিত থাকে। চিত্তের মল দ্বারা তা আবৃত থাকে বলে সকলের কাছে অনুভবগম্য হয় না। কিন্তু চিত্তের মলাবরণ অপসারিত হলেই স্বস্বরূপের স্মৃতি জেগে ওঠে এবং আত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যষ্টি আমি হল জীবভাবের আমি, অহংকার-অভিমানের আমি। তা দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত বাহ্য প্রকৃতির গুণের সঙ্গে মিশ্রিত বলে সসীম, বিকারী ও পরিণামী। কিন্তু শুদ্ধবোধের আমি নৈর্ব্যক্তিক নির্গুণ নির্বিশেষ অনন্ত অসীম। তাঁর জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি নেই। এই শুদ্ধবোধের আমি "সর্বাত্মকোঽহম্", "সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠাম্যহম্", "সর্বস্যাধিষ্ঠানমদ্বয় স্বরূপোঽহম্"—এই হল প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপের বা আত্মস্বরূপের পরিচয়।

জীবনে এই আত্মবোধের আমি-র উপলব্ধি না-হওয়া পর্যন্ত জীবের জীবত্ব ঘুচবে না, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হতে সে মুক্ত হতে পারবে না। জীবন্মুক্তি লাভ ও নিজের সত্য আত্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, স্বাত্মজ্ঞানে স্বস্থ হবার জন্য ইষ্টের, গুরুর বা মায়ের শরণাগত হয়ে চলতে হয়। স্বাত্মবোধের আমি-ই হল স্বানুভবসিদ্ধের আমি। তাঁতে কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতাভাব নেই। স্বানুভবদেবের আমি নিত্যশুদ্ধ ও সাক্ষিদ্রষ্টা।

সত্য নিত্য অখণ্ড ভূমা এক। সত্যকে অবলম্বন করলে মিথ্যাকে ও বহুকে ছাড়তে হয়। আবার বহুকে ও মিথ্যাকে মানলে নিত্য এক সত্যকে মানা যায় না। 'বহুর মধ্যে বহুগতি, এক-এর মধ্যে নিত্যস্থিতি।' তাই শাস্ত্রবাণী হল—"চলে বাতে গতিঃ শক্তিঃ/নিশ্চল বাতে সত্তাস্থিতিঃ।" এর তাৎপর্য হল, প্রাণের শক্তি সর্বদাই গতিশীল ও সক্রিয়। আত্মাতে কোনও গতি ও ক্রিয়া নেই। তা নিত্য স্থির প্রশান্ত নিষ্ক্রিয়। গতি-শক্তির মধ্যে শান্তি পাওয়া যায় না। সমতা বা স্থিতি যেখানে, সেখানেই পূর্ণ জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দ। শুদ্ধ জ্ঞানেই প্রেম, প্রীতি, মুক্তি ও শান্তি।

ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি এলে বিভূতি নিয়ে মেতে থাকে লোকে, তখন ঈশ্বরে আসক্তি হয় না। ব্যাপারটি যেন ঠিক এই রকম হয়—জাঁকজমক করে যজ্ঞানুষ্ঠান করা

হল, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর এল কি না সেদিকে কারও খেয়াল নেই। শিবশূন্য যজ্ঞ বৃথাই গেল। আবার রান্নার আয়োজন করে রান্না করল, কিন্তু অতিথি এল না। নিজেরাই তা ভোগ করল। যাঁর জন্য সাধনা তাঁকে না-পেলে সাধনা বৃথা হয়। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা হল ঐশ্বর্যের সাধনা। ঐশ্বর্যের সাধনাই হল বিভূতির সাধনা। প্রেমমাধুর্যের সাধনা হল ঈশ্বরের সাধনা, আত্মসাধনা।

সেই জন্য যারা জাঁকজমক করে সাধনা করে মহাপুরুষরা তাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন—শক্তিবিভূতির দিকে নজর দিও না, এগিয়ে যাও। শক্তিবিভূতির দিকে নজর দিলে তা তোমাকে নানাত্ব-বহুত্বের দিকে নিয়ে যাবে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আগে লক্ষ্যতে পৌঁছাও। পরে দেখবে, যাদের কৃপা পাবার জন্য তুমি আগে লালায়িত হয়েছিলে তারাই গোলাম হয়ে তোমার সেবা করছে।

প্রত্যেকে বলে ইষ্টনিষ্ঠার কথা। কিন্তু তারা তার তাৎপর্য জানে না। 'ইষ্টনিষ্ঠা হল এক-এতে অবস্থান করা, এক-কে সমবোধে সেবা করা, এক-কে ধারণ করা, এক-কে গ্রহণ করা ও এক-এর মধ্যে বিচরণ করা।' এ-ই হল বিচার। বাইরে গতি-শক্তি নানা রকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং দেহ ও মনের মধ্যে বিকার এনে দেয়। দেহ হতে শুরু করে বুদ্ধি পর্যন্ত গতি-শক্তি প্রকৃতির অধীন।

তৃতীয়নয়ন বা জ্ঞাননয়ন খোলার আগে পর্যন্ত প্রতি পদে মহাপুরুষদের নির্দেশগুলি মানতে হয়, তা না-হলে গতি-শক্তির তরঙ্গ মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে উপরিভাগে নানাত্ব-বহুত্বের জটিলতার মধ্যে। যতদিন স্থূল দেহে মহাপুরুষরা থাকেন ততদিন তাঁরা শিষ্যকে সজাগ দৃষ্টি মেলে guard দিয়ে চলেন। দেহান্তেও তাঁরা আবার কাজ করেন অন্য মহাত্মাগণের মাধ্যমে এবং তাঁদের সাহায্যে।

কলেজে প্রফেসরের কাছে ছাত্র পড়ে, আবার পরীক্ষার আগে অপর কলেজের প্রফেসরের কাছে প্রাইভেট coaching-ও নেয়। তাঁর কাছে নূতন করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। তাঁরা কি অন্য কোনও ভুল course অনুযায়ী পড়ান তাদের? তা নয়। কলেজের প্রফেসররা যেটা পড়ান সেই course অনুযায়ীই শিক্ষা দেন প্রাইভেট প্রফেসরগণ।

যেখানে এক-এর মহিমা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিবেষিত হয় সেখানে সমস্ত মতপথের সাধকরা নিশ্চিন্ত মনে, নিঃসংশয়ে যেতে পারে। সেখানে এক-এরই আলোচনা হয়। যেখানে এক তত্ত্ব, সেখানে এক গুরু, এক ইষ্ট, এক সত্য, এক ব্রহ্মের কথাই নিত্য যথার্থ ভাবে পরিবেষিত হয়। সেখানে গিয়ে প্রত্যেকেরই মনের মলাবরণ, ভ্রান্তি ও ত্রুটিগুলি শোধিত হয়। এ-ই হল ঈশ্বরের highest grace। এই শোধনটি যখন হয়ে যাবে, তার আচরণেই তখন তা প্রকাশ পাবে।

প্রত্যেকের গুরু ও ইষ্ট এখানে আছেন, কারণ এক-এতে সবাই যুক্ত। ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বাইরে কেউ নেই। Totality of Oneness হলেন তিনি। যারা গুরু-ইষ্টকে

বোঝে না তারা ঈশ্বরকে separate ভাবে, গুরু-ইষ্টকে অভেদ ভাবতে পারে না। সর্বগুরু ও সর্ব ইষ্টের মধ্যে সচ্চিদানন্দঘন এক আত্মগুরুই বিরাজ করেন। তাঁর স্বরূপ মহিমার কথাই ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী গুরুর মুখে অনুশাসিত হয়।

সকলে গুরুস্তব করে—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদংদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

মানুষ এই স্তব করলেও নেবার বেলায় খণ্ড খণ্ড করে খণ্ডবোধে গুরুকে নেয়। তারা গুরুকে individual oneness হিসাবে নেয়। আসলে গুরুকে নিতে হবে সর্বভূতে, সমবোধে ও সমদৃষ্টিতে ।

'মোর দেবতা সবার মাঝে
সত্তা শক্তি সেজে আছে।'

এক যদি ইষ্ট না-হয়, তাহলে কোনও অবস্থাতেই মন স্থির হতে পারে না। সৎসঙ্গ অর্থাৎ এক-এর সঙ্গ যেখানে হয় সেখানে গেলেই ইষ্টকে সর্বব্যাপী, সর্বধারী, সর্বতগো ও মহান বলে ভাবতে বা ধারণা করতে সুবিধা হয়। তখন তদ্‌বোধে, তদ্‌ভাবে তন্ময় ও তদ্‌গত হতে পারা যায়। এক ইষ্ট বা গুরু সর্বত্রই রয়েছেন। যেখানেই যাবে সেখানে তাঁকে পাবে। প্রকৃতির highest শক্তিই হল গুরুশক্তি।

২৬। ৭। ৭১

১২১

অধ্যাত্মবিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে ধীরে ধীরে একটি একটি করে স্তর অতিক্রম করতে হয় এবং তার ফলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। মহতের কৃপা ও সাহায্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক পথে চলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই বিভিন্ন স্তরগুলি অতিক্রম করার সময় সেই স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধিকারী পুরুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তাঁর কৃপায় জিজ্ঞাসু ভক্ত ধীরে ধীরে পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। কাজেই এই অভিজ্ঞতা আধ্যাত্মিক পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও একমাত্র পাথেয়। এইগুলির সঙ্গে যথার্থ পরিচিতি না-ঘটলে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরীয়বোধে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য দ্বারপালের প্রয়োজন।

একজন লোকের প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল। লোকটি দেনা শোধ করতে না-পেরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সে কিছুতেই পাওনাদারদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। তখন সে ভাবল, যদি রাজবাড়ির কাছে থাকা যায় তাহলে ওখানে গিয়ে কেউ হামলা করতে সাহস পাবে না। এই ভেবে সে রাজবাড়ির বাইরে দারোয়ানরা যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করল। দারোয়ানরা তাকে দেখে ভাবল, কত লোক কত রকম মতলব নিয়ে তো এখানে আসে, সে রকম হয়ত এই লোকটিরও কোনও মতলব আছে। কিছুদিন পরে তারা লক্ষ্য করল লোকটি কোনও কিছু চায় না,

উপরন্তু সকলের এটা-ওটা অনেক রকম কাজকর্ম করে দেয়। এই ভাবে কিছুদিন থাকার পর দারোয়ানদের উপরওয়ালা অর্থাৎ হাবিলদারের লোকটির উপর নজর পড়ল।

হাবিলদার বলল—লোকটিকে তো তোমরা বেশ পেয়েছ, আমাকে দিয়ে দাও। এ ভাবে হাবিলদারের কাছে কিছুদিন থাকার পরে তার উপরওয়ালা জমাদারের তার উপর দৃষ্টি পড়ল। জমাদার ভাবল, বেশ কাজের লোক, মাইনেও চায় না। সে লোকটিকে নিয়ে নিল নিজের কাছে। এই ভাবে ক্রমশ উপরওয়ালাদের দৃষ্টি পড়তে লাগল তার প্রতি। নানা হাত ঘুরে সে গেল সেনাপতির কাছে, তারপর সেখান থেকে গেল মন্ত্রীর কাছে। লোকটি মন্ত্রীর কাছে থাকাকালীন রাজার নজরে পড়ল। রাজা মন্ত্রীকে বললেন—এ তো দেখছি বেশ সৎ আর কাজের লোক। এ রকম একজন লোক আমার দরকার। তারপর লোকটি রাজার কাছে থাকতে লাগল। এদিকে রাজবাড়িতে ঢোকার পর পাওনাদারেরা আর সুবিধা করতে পারছিল না।

একদিন কোনও কারণে লোকটি বেরিয়েছিল। এই সুযোগে পাওনাদারেরা তাকে একা পেয়ে খুব মারল। লোকটি রাজার কাছে এসে নালিশ জানিয়ে বলল—আমাকে ওরা মেরেছে কারণ ওদের কাছে আমার দেনা ছিল।

রাজা সব শুনে বললেন—তুমি মাইনে নাও না?

লোকটি বলল—আমার তো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই দিন থেকে রাজা তার মাইনে ঠিক করে দিলেন। তারপর তিনি ডেকে পাঠালেন পাওনাদারদের। তারা রাজার কাছে এসে সব কাগজপত্র দেখাতে লাগল। রাজামশাই মন্ত্রীকে সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। পাওনাদাররা নিরুপায় হয়ে চুপ করে বসে রইল। তারা রাজার সামনে প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছিল না, সরে পড়তে পারলে যেন বাঁচে।

শেষ পর্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে রাজা তাদের বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের পাওনা তোমরা পেয়ে যাবে।

রাজামশাই সেই লোকটির মাইনে ঠিক করে দিলেন আর তাকে পাওনাদারদের ঋণ শোধ করে দিতে বললেন।

গল্প শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পরমাত্মবোধে এলে ঋণ তিনি শেষ করে দেন। মাঝখানের চরিত্রগুলি হল divine agents, পথ হচ্ছে এদের মাধ্যম দিয়ে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম করলে আপনিই টেনে নেন উপরওয়ালা। This is the universal central law. M.A. একদিনে পাশ করা যায় না। কিছুই করব না তা কখনও হয় না, আগে তাঁকে মানতে হবে।

১৯। ৯। ৭১

১২২

কর্ম দুই রকম ভাবেই হয়—জ্ঞানে হয় আবার অজ্ঞানেও হয়। জ্ঞানের কর্ম দ্বারা ভগবানের সেবা হয়, ভগবানের ভোগ হয়, আবার অজ্ঞানের কর্মে নিজের সেবা বা নিজের ভোগ হয়। ভগবানকে ভোগ দিলে নিজের ভোগ আর থাকে না।

অনেকে ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। তা-ই যদি হয় তবে জনক রাজা অতবড় ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও রাজ্যশাসন করে গেলেন কেমন করে? শ্রীকৃষ্ণও তো জগতের জন্য কত কর্ম করে গেলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর জনক রাজা সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন।

একবার রাজর্ষি জনক বিরাট সভা ডাকলেন। সভার মণ্ডপে একটি অতি মূল্যবান আসন তৈরি করে রেখে তিনি বললেন—যিনি একটিমাত্র কথা দ্বারা তাঁকে এমন জ্ঞান দিতে পারবেন যার ফলে তাঁর মনে আর কোনও জিজ্ঞাসা জাগবে না, কোনও সংশয় থাকবে না, তিনিই তাঁর গুরু হবেন এবং সেই মূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ আসনে বসবার অধিকার পাবেন।

সভায় উপস্থিত সকলে এই কথা শুনে ঐ আসনে বসতে সাহস পেলেন না। একটিমাত্র সার কথায় এমন জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। কত বড় বড় মুনি, ঋষি এমনকী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন অথচ কেউ সেই আসনে বসলেন না।

এমন সময় অষ্টাবক্র মুনি সেই সভায় এলেন। অষ্টাবক্র মুনির দেহ বিকৃত ছিল। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তাঁর পিতা শাস্ত্রপাঠ করে শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি এত বড় জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে এসেছিলেন যে, পিতা যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করতেন তখন যেখানে যেখানে তিনি ভুল করতেন মাতৃগর্ভে থেকেও তিনি পিতাকে বাধা দিতেন। পিতা ঐ ভাবে আটবার শাস্ত্রপাঠে বাধা পেয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে অভিশাপ দেন যে, তাঁর দেহের আটটি স্থান বক্র হবে।

পুত্র জন্মাবার পর সত্যিই দেখা গেল পিতার অভিশাপের ফল। তাঁর দেহের আটটি স্থান বক্র ছিল বলে তাঁর নামও ছিল অষ্টাবক্র। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত।

এই অষ্টাবক্র মুনি জনক রাজার সেই বিশেষ মূল্যবান আসন যা গুরুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই আসনে গিয়ে বসলেন। সভায় উপস্থিত সকল মুনি, ঋষি তা দেখে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, এত বড় বড় মুনি, ঋষি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এখানে কেউ বসতে সাহস পেলেন না অথচ এই বিকলাঙ্গ যুবক কোন সাহসে সেই আসনে বসল!

মুনি, ঋষিদের উচ্চহাস্য করতে দেখে অষ্টাবক্র তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন—তোমরা সব চামার ও কসাই।

অষ্টাবক্রের এই কর্কশবাক্য শুনে সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—এই রকম কর্কশবাক্য কেন আপনি বলছেন?

তখন অষ্টাবক্র মুনি বললেন—তোমাদের চামার ও কসাই বলছি এই জন্য যে, তোমরা শুধু চামারের মতো আমার দেহের চামড়া এবং কসাইয়ের মতো আমার

দেহের মাংসের প্রতিই দৃষ্টি দিয়েছ। দেহ অতিরিক্ত যে আর কোনও সত্য বস্তু থাকতে পারে সেই কথা তোমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছ।

অষ্টাবক্র মুনির এই কথাতে সভায় উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। অষ্টাবক্র মুনি আসনে বসে জনক রাজাকে বললেন—তোমার নিজের যা আপন বস্তু আছে তা-ই আমাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দাও।

জনক রাজা দেখলেন এই মুনি সংক্ষেপে এক কথায় সার জ্ঞানই দিয়েছেন, সত্য কথাই বলেছেন। এই বিশাল রাজত্ব, ধনৈশ্বর্য, মূল্যবান বস্তু, দেহ, মন, প্রাণ কিছুই তো তাঁর নিজের নয়। জনক রাজা মৌন হয়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন, সত্যি মুনি তো ঠিক কথাই বলেছেন, সংসারে 'আমার' বলে তো কোনও বস্তুই নেই। তখন তিনি অষ্টাবক্র মুনির কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তাঁকেই গুরু বলে সর্বসমক্ষে মেনে নিলেন।

৪। ১০। ৭১

১২৩

জীব হল মধ্যম অবস্থা—জীবের একপাশে জড়, আরেকপাশে ঈশ্বর। অতএব জীব যদি জড় অংশের দিকে তাকায় তবে সে সেখানে ভোগ্য সব কিছু পাবে, কিন্তু ঈশ্বর-আত্মাকে পাবে না অর্থাৎ material world-এর সব কিছুই তার মধ্যে প্রতিফলিত হবে। এই অবস্থায় জীব যদি material world-এর দিকে তাকায় তবে সেখান থেকে তার যেমন সাময়িক সুখ আসবে তেমন দুঃখও আসবে। মানুষ নিজের আমি, অর্থাৎ কাঁচা আমিকে বা অহংকারকে ছাড়তে চায় না। জীবের আমিত্ব অর্থাৎ দেহসর্বস্ব কাঁচা আমি বজায় থাকে, ফলে এই আমিত্বের মধ্যে জীবকে নানা রকম অশান্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু জীব যদি তার হৃদয়স্থ ঈশ্বর-আত্মার বা পাকা আমি-র দিকে যায় তবে যদিও তার সুখ-দুঃখ আসে তবুও সে তাতে অভিভূত বা বিচলিত হয় না। কারণ সে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে 'তুমিবোধে' মানার ফলে তার বিকারাদি ধীরে ধীরে সরে যায়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পথে সে নিজের অধিকারকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে surrender করে। তার ফলে মানুষ সংসারে থাকলেও সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ কোনও কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন পদ্মপাতা কোনও মতেই জল দ্বারা সিক্ত হয় না—এও ঠিক সেই রকমই অবস্থা।

একবারও যদি কারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, কোনও গুণগত সংস্কারই তাকে অভিভূত করতে পারে না। তখনই সে বলে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সন্ন্যাসী সারাদিন ভগবানের নামে পড়ে থাকতেন এবং যা পেতেন তা-ই খেতেন। তিনি ঘুরে ঘুরেই বেড়াতেন। একদিন তিনি ঘুরতে ঘুরতে এক অচেনা রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। সেই রাজ্যের চতুর্দিক প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। সারাদিন

দ্বার খোলা থাকার পর দ্বাররক্ষী এসে রাতে দ্বার বন্ধ করে দিত। এদিকে সন্ন্যাসী ঘুরতে ঘুরতে সেই রাজ্যের দ্বারের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় দ্বাররক্ষী দ্বার বন্ধ করে দিল। এর ফলে সন্ন্যাসীকে সারারাত দ্বারের বাইরে কাটাতে হল। তিনি ভাবলেন, পরের দিন প্রত্যুষে সকলের পূর্বে ঐ দ্বার দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করবেন।

এদিকে আরেক ঘটনা ঘটল। সেই রাজ্যের রাজা সহসা মারা যাওয়াতে রাজ্যের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যসচিব, অন্যান্য মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই চিন্তিত হয়ে রানিকে বলল—হে মহারানি! রাজাশূন্য অবস্থায় রাজ্য তো আর চলে না, এখন উপায় কী ? রানিও খুব চিন্তিত হলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন। পণ্ডিত যথাসময়ে রানির নির্দেশে তার সামনে উপস্থিত হলেন। রানির কাছে সব কথা শুনে তিনি পঞ্জিকা দেখে গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি ইত্যাদি বিচার করে বললেন—হ্যাঁ একটি উপায় আছে যার দ্বারা একমাত্র সেই ব্যক্তিকেই এই রাজ্যের যথোপযুক্ত রাজা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

পণ্ডিতমশাইয়ের কথা শুনে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কী উপায়, বলুন পণ্ডিতমশাই ?

পণ্ডিতমশাই বললেন—আগামীকাল প্রত্যুষে রাজ্যের দ্বার খুলে যে ব্যক্তিকে প্রথমে দেখতে পাওয়া যাবে সে-ই হবে এই রাজ্যের রাজা। সকলেই এই প্রস্তাবে রাজি হল এবং সেই দিন রাতে যথারীতি সকলে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে পরের দিন প্রভাত হতে-না-হতেই সন্ন্যাসী তাঁর প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান ইত্যাদি সমাপ্ত করে দ্বারের কাছে রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। পরনে তাঁর একটি কৌপীন, হাতে একটি ঝুলি এবং সর্বাঙ্গে ছাই মাখা ছিল।

সকাল হতে-না-হতে দ্বার খুলে সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে সবাই বলে উঠল—তুমি আমাদের রাজা, তুমি আমাদের রাজা। এই বলে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। তাদের আচরণে সন্ন্যাসী প্রথমে একটু হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন যে, এ বোধহয় তাঁর প্রারব্ধ কর্মের ফল। অতএব তিনি সাদরে তা গ্রহণ করলেন এবং রাজপোশাক পরে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাজ্যসচিব সকলকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমাদের রাজা জীবিত থাকাকালীন তোমরা যে-ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে ঠিক সে-ভাবেই নিজ নিজ কর্তব্য অনুসারে প্রত্যেকে কাজ কর। আমি নূতন করে কোনও বিধান দেব না। সকলেই এই প্রস্তাবে খুশি হল, কারণ প্রত্যেকেই নিজেদের অধিকারে একটি বিশেষ স্বাধীনতা পেল। এদিকে সন্ন্যাসী রাজপোশাক পরে কেবলমাত্র ভগবানের নাম ছাড়া আর অন্য কোনও কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। রাজ্য পরিচালনা এই ভাবেই চলতে লাগল।

এদিকে আরেক ঘটনা ঘটল। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজার কানে সব কথা গেল। সেই রাজা ভাবল, এই তো একটা বড় সুযোগ, এই সময় ঐ রাজ্য আক্রমণ করা একান্ত

দরকার! সে ভাবল, সন্ন্যাসী রাজা রাজনৈতিক হালচালও বুঝবেন না এবং যুদ্ধও করতে পারবেন না। এই মনে করে সে রাজ্য আক্রমণ করল।

রাজ্য আক্রমণের কথা জানতে পেরে সেই সন্ন্যাসীকে রাজ্যবাসী জানাল—প্রভু, যুদ্ধ যে আসন্ন, কারণ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে।

সন্ন্যাসী সব শুনে বললেন—তাই না কি, বেশ যুদ্ধ কর।

সকলে বলল—আপনি তো রাজা, আপনাকেই তো যুদ্ধ করতে হবে।

সন্ন্যাসী বললেন—তাই না কি, বেশ আমার সেই পুঁটলিটা নিয়ে এস।

তাঁর নির্দেশ অনুসারে পুঁটলিটা এনে দেওয়া হল। সন্ন্যাসী এবার তাঁর রাজপোশাক ছেড়ে পুঁটলি থেকে কৌপীনটি বার করে পরে নিলেন ও গায়ে ছাই মেখে বললেন—তুমলোগ যুদ্ধ করো, হাম চলতে হ্যায়। কৌন রাজা, কৌন ভিখারি হ্যায়? "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই কথা বলে তিনি পূর্ববৎ অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—সংস্কারবহুল জীবন সংস্কারের প্রাধান্য অনুসারে চলে অভ্যস্ত। অভ্যাসের মাধ্যমে সংস্কার জীবনে কার্যকরী হয়। গুণভেদে সংস্কার এবং অভ্যাস তৈরি হয়। অজ্ঞানের সংস্কার নিয়ে জ্ঞানের সংস্কারের অধিকারী হওয়া যায় না, কিন্তু জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে অজ্ঞানের সংস্কারের অভিনয় করা যায়। সংসারের প্রয়োজনে সংসারী মানুষ তাদের সংস্কার দিয়ে সাধন করার চেষ্টা করে, কিন্তু জ্ঞানীর মধ্যে সংসারের সংস্কার থাকে না বলে তাঁর পক্ষে সংসারী হওয়াও সম্ভব হয় না। তাঁর বিবেকবিচারপ্রধান সংস্কার তাঁকে অবিবেকী ভোগসুখের প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

অতীতের সংস্কার ভাগ্যরূপে সক্রিয় হয়। বর্তমানের সংস্কার তার মোকাবিলা করে। কেউ কেউ সুখের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তার সন্ধান পায় না, ফলে দুর্ভোগই ভোগ করতে হয়। দুঃখ কেউ চায় না সত্য, তথাপি স্বকৃত কর্মের ফল দুঃখরূপে যখন আসে, তখন তাকে তা ভোগ করতেই হয়। ব্যষ্টিজীবনের সুখ-দুঃখের পরিমাপ করা যায়, কিন্তু সমষ্টিজীবনের সুখ-দুঃখের পরিমাপ করা যায় না। ভোগের জীবন ও ত্যাগের জীবনের মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য উভয় জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য ভিন্ন। সংস্কার অনুসারে ভোগীর স্থান সংসারে এবং ত্যাগীর স্থান সংসারের বাইরে সন্ন্যাসজীবনে। ভোগী ত্যাগের ভান করে সংসারে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতে পারে, আবার ত্যাগী সন্ন্যাসীও ভোগের ভান করে ভোগীদের মতো সংসারজীবন যাপন করতে পারেন। ভাববোধের আদর্শ অনুসারে যে জীবন গড়ে ওঠে তা আদর্শগত অভ্যাসের দ্বারাই পরিচালিত হয়। তার অন্যথা হতে দেখা যায় না। সাময়িক ভাবেও পরস্পর-বিরোধী ভাবাদর্শের জীবন স্ব স্ব ক্ষেত্র ছেড়ে বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু তা স্থায়ী ও ফলপ্রদ হয় না। তাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ঘটনাক্রমে সাময়িক ভাবে রাজা হলেও তাঁর সংস্কার অনুসারে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে গেলেন। ত্যাগ হতেই আসে

শান্তি। ভোগই হল জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ও দুঃখাদি ভোগের কারণ। ভোগীর কাছে রাজ্যভোগ সুখ হল চরম আদর্শ ও প্রেয়, কিন্তু ত্যাগীর কাছে ত্যাগ আদর্শই শ্রেয়, আর সব কিছু হেয়। সন্ন্যাসী ত্যাগের পথের পথিক। তাঁর শান্তি নিত্যকালের অমৃত মুক্তি শান্তি।

৫। ১০। ৭১

১২৪

সাধারণ লোক সংসারকে দুঃখময় বলে। দার্শনিকরাও বলেন, অনিত্য ও দুঃখময় এই সংসার।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি সুন্দর গল্প বললেন।

এক রাজা তার রাজ্যে শত্রুরা প্রায়ই আক্রমণ করাতে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তার এক বিচক্ষণ মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করা যায়? মন্ত্রী ছিল খুব ভক্ত।

মন্ত্রী হঠাৎ এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলল—কী আর করবেন মহারাজ, খুব আনন্দ করুন। রাজা অবাক হয়ে ভাবলেন, এ আবার কী রকম কথা!

রাজা সেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—মন্ত্রী তুমি এ-রকম উত্তর দিলে কেন?

মন্ত্রী বলল—কী করব, আমার মনে হল সেই জন্যই বললাম। মনে যখন দুঃখ হয় তখন খুব আনন্দ করবেন, এ ছাড়া অন্য কোনও কথা মনে হল না।

রাজা আরও একদিন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এবারেও মন্ত্রী একই উত্তর দিল—ধুমধাম করে আনন্দ করুন। রাজা মন্ত্রীর উত্তরে বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি জ্বলে মরছি আর তুমি এ রকম কেন বলছ? কথাটি রাজার মনঃপূত হল না।

রাজা মন্ত্রীকে জব্দ করার জন্য একটি কৌটোর মধ্যে কিছু ধনরত্ন রেখে seal করে মন্ত্রীকে দিয়ে বললেন—এটা রেখে দাও। আমার প্রয়োজন হলে তুমি দেবে। সতর্ক থেকে যেন এটা কখনও না-হারায়। মন্ত্রী বুঝতে পারল, তাকে পরীক্ষা করার জন্য রাজা হয়ত কোনও কৌশল করছেন। মন্ত্রী রাজার নির্দেশ অনুযায়ী কৌটোটি নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিল।

এদিকে রাজা বহু নারী গুপ্তচর রাখলেন। তিনি তাদের আদেশ করলেন, তার একটি কৌটো একজন নিয়েছে, তা খুব গোপনে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। যে এই কাজ করতে পারবে তাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সবাই রাজাকে জানাল যে, তারা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করবে।

একজন যুবতী বলল যে, এক বছর সময় দরকার হবে, নয়ত তার বিদ্যা ফলবতী করতে পারবে না। যুবতীর কথা শুনে রাজা তাকেই উপযুক্ত মনে করে তাকে এই কাজের ভার দিলেন। রাজা তাকে বললেন—মন্ত্রীর কাছে ঐ কৌটো আছে, খুব গোপনে তা উদ্ধার করে আনতে হবে।

এক সপ্তাহ পরে মেয়েটি মন্ত্রীর বাড়ির সামনে আলুথালু বেশে কাঁদতে লাগল। মন্ত্রী রাজবাড়িতে যাচ্ছিল। মেয়েটিকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—তোমার কী হয়েছে?

যুবতী জানাল—আমার একটিমাত্র পুত্র জলে ডুবে মারা গিয়েছে, সইতে পারছি না। মন্ত্রী সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল।

যুবতী মন্ত্রীর বাড়ি গিয়ে জলও স্পর্শ করল না, শুধু কাঁদতে লাগল। মন্ত্রী ও তার স্ত্রী দু'জনেই যুবতীর acting ধরতে না-পেরে তাকে নিজের বাড়িতে স্থান দিল। যুবতী একটু একটু খাওয়াদাওয়া শুরু করল এবং কিছুটা শান্ত হল। এই ভাবে এক মাস কেটে গেল।

মন্ত্রী একদিন তাকে বলল—তুমি কোথায় আর যাবে, এখানেই থাক।

যুবতী বলল—আমি যদি একটু একটু করে কাজ করতে পারি তাহলে হয়ত শোকটা ভুলে থাকতে পারব।

যুবতীর কথাতে মন্ত্রী ও তার পত্নী দু'জনেই রাজি হল।

যুবতী কাজ করতে করতে এমনভাবে সকলের বিশ্বাসভাজন হল যে, মন্ত্রীপত্নী তাকে ভাঁড়ারঘরের চাবিও দিয়ে দিল। এই সুযোগ পেয়ে যুবতী সর্বদাই গোপনে কৌটোর সন্ধান করতে লাগল। যুবতী লক্ষ্য করতে লাগল, মন্ত্রী কোন স্থানের উপরে সজাগ দৃষ্টি রাখে। যুবতী মন্ত্রীর চলাফেরার উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করল।

একদিন যুবতী লক্ষ্য করল, মন্ত্রীর শয়নকক্ষে দেওয়ালের কিছুটা অংশে যেন আলগা ভাবে plaster করা আছে। আসলে মন্ত্রী ওই দেওয়ালের মধ্যেই সেই কৌটোটি সযত্নে রেখেছিল যাতে কেউ টের না-পায়। যুবতী আরও লক্ষ্য করে দেখল, রোজ রাতে মন্ত্রী সেই বিশেষ জায়গাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। যুবতী তখন বুঝতে পারল যে, সেই কৌটোটি ওখানেই আছে।

একদিন সুযোগ মতো মন্ত্রী যখন বেশ কিছুদিনের জন্য কার্যোপলক্ষ্যে বাইরে গেল তখন যুবতী দেওয়ালের plaster সরিয়ে সেই কৌটোটি উদ্ধার করে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা কৌটোটি পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হলেন।

যুবতী রাজাকে বলল—আমাকে আপনার বাড়িতে এমনভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে কেউ টের না-পায়।

এদিকে মন্ত্রী রাতে বাড়ি ফিরে কৌটো না-পেয়ে সব বুঝতে পারল। রাজাও বুঝতে পারলেন যে, মন্ত্রী যে রকম চালাক সে হয়ত ওই কৌটো উদ্ধারের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করবে। কাজেই কারওকে কিছু না-বলে তিনি লুকিয়ে সেই কৌটোটি নদীর মধ্যে ফেলে দিলেন।

মন্ত্রী একটি বিশেষ ব্রত উপলক্ষ্যে সাত দিনের জন্য খুব দান করতে শুরু করল। মন্ত্রীকে রাজা ডেকে পাঠালেন। রাজা ডাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী এল না। মন্ত্রী জানাল যে, এখন সে ব্রত করছে কাজেই তা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আসতে পারবে না। ক্রমশ মন্ত্রীর দানের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল।

এদিকে এক জেলে নদীতে জাল ফেলে একটি বড় মাছ ধরল। জেলেটি মাছ কাটতে গিয়ে দেখল মাছের ভিতরে রাজার নামাঙ্কিত একটি seal করা কৌটো।

জেলেটি মন্ত্রীর দানের বহর দেখে ভাবল, রাজার কাছে কৌটোটি ফিরিয়ে দিলে রাজা পুরস্কার দেবেন ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রী যে রকম দানধ্যান শুরু করেছে—কাজেই মন্ত্রীকে কৌটো দিলে মন্ত্রী আরও বেশি পুরস্কার দেবেন। জেলেটি মন্ত্রীর কাছে গিযে কৌটোটি ফিরিয়ে দিল। মন্ত্রী কৌটোটি দেখেই চিনতে পাবল।

রাজার হুকুম সত্ত্বেও মন্ত্রী না-যাওয়াতে বাজা মন্ত্রীকে arrest করার আদেশ দিলেন। মন্ত্রীকে ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওযা হল। মন্ত্রী যাবার সময় ঐ কৌটোটি লুকিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মন্ত্রী ভাবল, রাজা হয়ত তাকে জব্দ করার জন্য কৌটোটি চেয়ে বসবেন।

রাজার কাছে মন্ত্রী উপস্থিত হলে রাজা কৌটোটি চেয়ে বসলেন। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে কৌটোটি রাজাকে ফিরিয়ে দিল।

বাজা তখন অবাক হয়ে ভাবলেন, আমি যে কৌটোটি নদীতে ফেলে দিয়েছি তা তো কেউ জানে না, কিন্তু মন্ত্রী তা পেল কী করে!

মন্ত্রী বলল—আমি জানি ঐ একটিমাত্র কৌশল—দুঃখের সময় আনন্দ করতে হয়। আনন্দই আমাকে সব কিছু এনে দেয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটি শেষ কবে বললেন—এই গল্পটির মধ্যেই আছে entire philosophy এবং perfection-এ পৌঁছবার সমস্ত তত্ত্বটি। যোগসিদ্ধির নিয়ম হল, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন অর্থাৎ দুঃখেব সময উদ্বিগ্ন না-হওয়া এবং সুখের সময বিগতস্পৃহ হয়ে উল্লাস না-করা। মন্ত্রী তাব স্বভাবসুলভ যোগেব পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে, তাতে সে সফল হয়েছে। রাজাও বুদ্ধিব কৌশল করেছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীর মতো যোগীদের নীতি অবলম্বন কবেননি। সেই জন্য তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাধান বিচারপূর্বক বিরুদ্ধভাব দিয়েই নির্মূল করতে হয়। তা সম্ভব হয় অনাসক্তিযোগে, সমত্বযোগে, অসঙ্গযোগে অথবা বিপরীত ধর্ম অভ্যাসের দ্বারা। মন্ত্রী বিপরীত ধর্ম অভ্যাস করেছিল এবং সে-ভাবেই রাজাকে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজা তা নিতে পারেননি, তিনি কেবল বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কৌটোটি নদীতে ফেলে দিলেও সেই ত্যাগ বিচারপূর্বক হয়নি বলে তিনি সিদ্ধ হননি। রাজার বুদ্ধিযোগ ছিল না, কিন্তু মন্ত্রীর বুদ্ধিযোগ ছিল। বুদ্ধিযোগের উৎকর্ষ গল্পটির মধ্যে সম্যক্ ভাবে দৃষ্ট হয়।

১৫। ১০। ৭১

১২৫

ঋষিযুগে বিজ্ঞানশিক্ষার পদ্ধতি যে কী সুন্দর ছিল সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ছান্দোগ্য উপনিষদের গল্প বললেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো অনেক শিখেছ, কিন্তু সে সব নির্ভর করছে কিসের উপর? পিতার প্রশ্নের উত্তর না-জানায় পুত্র চুপ করে রইল। তখন পিতা নিজেই বললেন—অন্নব্রহ্মের উপর। পুত্র কিছুতেই অন্নকে ব্রহ্ম

হিসাবে মানতে রাজি নয়। পিতা বললেন—পনেরো দিন যদি না-খাও মানসিক অবস্থা এমন হবে যে, জ্ঞান (মন) কার্য করবে না। পুত্র বলল—পরীক্ষা করব। পনেরো দিন না-খেয়ে পুত্র এল কোনও রকমে টলতে টলতে। পিতা বললেন—ঋগ্বেদের ঐ অংশটি বল। পুত্র মনে করতে পারছে না। তখন পিতা বললেন—এবার পনেরো দিন খাওয়াদাওয়া করে এস। পড়াশুনা কিছু করতে হবে না। পনেরো দিন বাদে পুত্র দেখল আপনিই সব মনে এসে যাচ্ছে। কাজেই স্মৃতির function-এর সঙ্গে অন্নের যোগাযোগ রয়েছে, অন্নাভাবে স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। স্মৃতিকে বল দিচ্ছে অন্নব্রহ্ম।

পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মের সন্ধান কোথায় পাব? পিতা বললেন—একটি পাত্রে নুন নিয়ে এস। পাঁচ হাজার বছর আগে chemistry-র development হয়নি—তখনকারদিনে শিক্ষাপদ্ধতি এরূপই ছিল। পিতা পুত্রকে একগ্লাস জলে নুন রাখতে বললেন। সকালে উঠে পুত্র দেখে নুন নেই। পিতা বললেন—তুমি তো নিজের হাতেই নুন ঢেলে রেখেছিলে। পুত্র অবিশ্বাসও করতে পারছে না। পিতা বললেন—তুমি নিজের হাতে নুন রেখে দিয়েছিলে, কিন্তু তোমার চোখে তা ধরা পড়ছে না। চোখে না-দেখলে কি নেই? এতেই তোমার সন্দেহ তো? এবার আস্বাদন করে দেখ। পুত্র জলের উপরিভাগ, মধ্যভাগ এবং নিম্নভাগ থেকে আস্বাদন করে দেখল সব অংশই নোনতা। পুত্র বলল—পৃথক করে নুন কোথায়? নুনই তো সব। পিতা বললেন—কী দিয়ে বলছ? পুত্র বলল—মন দিয়ে। চোখ দিয়ে যখন দেখেছিলে তখনও মন দিয়েই বলেছ। আবার জিভে দিয়ে যখন বলছ তখন মন দিয়েই বলছ। তাহলে চোখের যেখানে গতি নেই, জিভ তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দিল।

বৃহতের থেকে বিচ্যুত হলে ক্ষুদ্রের নাশ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরেকটি উদাহরণ দিলেন—পিতা পুত্রকে বট গাছের একটি ডাল কেটে নিয়ে আসতে বললেন। দেখা গেল ডালটি কয়েকদিন পরে শুকিয়ে গেল। পিতা পুত্রকে বললেন—ডালটা মরল কেন জান? বৃহতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে। পুত্র বলল—তাহলে আমি যদি বৃহতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমিও তো থাকব না। নদী যদি সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে তা শুকিয়ে যাবে। বৃহতের সঙ্গে যে সংযোগ তা পিতা এই ভাবে পুত্রকে ধরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন—আরও ডাল কেটে নিয়ে এস। ডাল কাটতে কাটতে গাছ ন্যাড়া হয়ে গেল, কিন্তু মরল না। কারণ মূল রয়েছে মাটিতে। মূলকে তৈরি করতে পারবে না।

অব্যক্তের মধ্যেই বীজাকারে সব সুপ্ত রয়েছে—এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরেকটি গল্প বললেন।

পিতা পুত্রকে বটফল নিয়ে ভাঙতে বললেন। এর দানা হল সরষের মতো। পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—এগুলি টুকরো টুকরো করে কী দেখছ? পুত্র বলল—শাঁস। পিতা বললেন—আরও টুকরো কর, এবার কী দেখছ?

পুত্র—কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

পিতা—তাহলে এর পরে অব্যক্ত। সেই রকম বীজের মধ্যে গাছ অব্যক্ত। ফলের মধ্যে বীজ রয়েছে, বীজের মধ্যে গাছ আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। গাছ এর মধ্যে কী ভাবে আছে জান? পুত্র নিরুত্তর রইল।

পিতা পুত্রকে তখন বললেন—ধ্যান লাগাও। প্রথমে মনকে ইন্দ্রিয়তে লাগাও, তারপর মনে লাগাও। তারপর মনকে বুদ্ধিতে লাগাও। তার পরে মনকে বুদ্ধির থেকে সমষ্টি বুদ্ধিতে লাগাও। যে কোনও নক্ষত্রের উপরে ধ্যান কর। আবার তার থেকে দূরের একটি নক্ষত্রের উপর ধ্যান কর। তারপর পুত্রকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এবার কী দেখছ? তুমি কি তোমার দেহকে দেখতে পাচ্ছ? (Can you see your body?) পুত্র বলল—পিতা আমার দেহ নেই। পিতা পুত্র দু'জনেই ধ্যান করছে এবং কথা বলছে ধ্যানে। পিতা বললেন—যা-কিছু অনুভব করবে তা বলবে। পুত্র বলল—ওখান থেকে নেমে এলাম, দেহ জড়বৎ। কোথা দিয়ে প্রবেশ করব? রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। পিতা বলে দিলেন কী ভাবে প্রবেশ করতে হবে। পিতা পুত্রকে আরও বললেন—কোন অবস্থায় এলে সেই স্মৃতি থাকে? তুমি যে দেহ থেকে পৃথক, Infinite তা বুঝেছ? এবার এই যে 'আমি, আমি' বলছ 'আমিবোধে' মনকে concentrate কর। এখানে মন লাগিয়ে যা-কিছু অনুভব করবে তা বলবে। পুত্র বলতে লাগল—'আমি' বড় হতে আরম্ভ করল এবং ধীরে ধীরে পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে গেল। পিতার তো সব অবস্থাই জানা আছে।

পুত্র বলল—পৃথিবীটা যেন একটি বিন্দুর মতো।

পিতা—তারপর?

এর পরের অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পুত্র সমাধিস্থ হয়ে গেল। ছয় ঘণ্টা পরে তার সমাধিভঙ্গ হল।

কিছুক্ষণ পরে পিতা পুত্রকে বললেন—এবার ভূমা সম্বন্ধে তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে কি?

পুত্র—না। শুধু ভূমা সম্বন্ধে কেন, আর কোনও জিজ্ঞাসার বৃত্তিও নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সেই যুগে শিক্ষার কী সুন্দর পদ্ধতিই না ছিল। ঋষিযুগে পিতা পুত্রকে কী ভাবে ধ্যানশিক্ষা দিয়ে তার স্বরূপের বোধটা জাগ্রত করতেন আমরা সেই সম্বন্ধে অবগত হলাম।

এখন তো গুরুরা নাম দিয়েই ছেড়ে দেন। যে শিক্ষার মাধ্যমে ক্রমবিকাশ হয় সেই ধরনের শিক্ষার একান্ত অভাব। বস্তুজগতের শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রয়োজন আছে।

২। ১১। ৭১

১২৬

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সৎপ্রসঙ্গকালে ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন—এখানকার শোনা কথাগুলি মুখস্থ না-করে তোমাদের নিজের ভিতর থেকে প্রকাশ হতে দাও, ego বা

intellect দিয়ে plan করে কিছু বলতে যেও না। নিজেকে Divine-এর কাছে ছেড়ে দাও, ঠিক যে-ভাবে খেলবার তিনি খেলবেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

সন্তদাসবাবা নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে গুরুর উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গুরু কাঠিয়াবাবা কত কঠোরতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে তৈরি করেছিলেন। গুরুসেবা করতে গিয়ে তিনি নিজের কথা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যেতেন, খাওয়াদাওয়ার কথাও তাঁর স্মরণে থাকত না।

একবার এক উৎসবের সময় সন্তদাসবাবা তিন দিন ধরে সমানে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। সকলের সেবায় তিনি এমনভাবে নিযুক্ত ছিলেন যে, জলস্পর্শ করার সময় পর্যন্ত পাননি। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে তিনি সন্ধের পর একটু শুয়েছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণ ও বলরাম ছদ্মবেশে তাঁর গুরু কাঠিয়াবাবার কাছে এসে একগ্লাস শরবত দিয়ে বললেন—তোমার আশ্রমে একজন উপবাসী রয়েছে, তাঁর জন্য এনেছি। তাঁকে এটা দিও।

কাঠিয়াবাবা তো সবই বুঝতে পারলেন। তিনি সন্তদাসবাবাকে ডেকে সেই শরবত গ্রহণ করতে বললেন। তিনি সন্তদাসবাবাকে আরও বললেন—এই আশ্রমের ইষ্টদেবতা স্বয়ং তোমার জন্য দিয়ে গিয়েছেন।

সন্তদাসবাবা বললেন—প্রভু, আমি তো আপনার প্রসাদ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করি না, আগে আপনি গ্রহণ করুন পরে আমি গ্রহণ করব।

সন্তদাসবাবার গুরুভক্তি দেখে কাঠিয়াবাবা খুব প্রীত হলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। কাঠিয়াবাবা আগে সেই প্রসাদ থেকে কিছুটা গ্রহণ করলেন এবং তার পরে অবশিষ্ট প্রসাদ সন্তদাসবাবাকে দিলেন।

আরেকবার সন্তদাসবাবা রুটি সেঁকবার সময় রুটিতে ছিটেফোঁটা পোড়া দাগ পড়ে যায়। সেই সামান্য ত্রুটিতে কাঠিয়াবাবা ক্রুদ্ধ হয়ে সন্তদাসবাবাকে খড়ম দিয়ে আঘাত করেন।

সন্তদাসবাবা গুরুর পায়ে পড়ে সজলনয়নে বলেছিলেন—প্রভু, এই দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি সবই তোমার। যদি এই দেহ দ্বারা তোমার সেবা না-হয় বা তুমি অনুপযুক্ত মনে কর তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে এই দেহ নষ্ট করে দিতে পার, আমার বলবার কিছুই নেই।

সন্তদাসবাবার এই কথা শুনে কাঠিয়াবাবা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি যথার্থ উপযুক্ত হয়েছ, এই আশ্রমের ভার আমি তোমার উপরেই দিলাম।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে দিতে হয় গুরুর কাছে। শিষ্যকে তৈরি করার জন্য গুরু তিন রকম ভাবে পরীক্ষা করেন। শ্রবণেন্দ্রিয় কতটা balanced হয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য গুরু অশ্রাব্য গালাগালি ও কুবাক্য দ্বারা তৈরি করেন। কখনও বা সর্বদা কাজে খুঁত ধরে মার্জন করেন আবার

তাড়ন, পীড়ন, বর্জন বা উপেক্ষাও করেন। এগুলির মাধ্যমে গুরুশক্তি অর্থাৎ অখণ্ডবোধের সমতা শিষ্যের মধ্যে তৈরি করে গুরুবোধে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন অধ্যাত্মবাদের গুরুগণ। যে-সকল আত্মাভিমানী, বিদ্যাভিমানী ও অহংকারী শিষ্য গুরুর অনুশাসন মেনে চলতে অপ্রস্তুত থাকে, তারা গুরুকৃপা লাভে বঞ্চিত হয়, ফলে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না।

আশ্রিত শিক্ষার্থীর কতটা ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস হয়েছে তা গুরু পরীক্ষা করেন অহেতুক নানা রকম কাজের মাধ্যমে।

যথার্থ গুরু হবেন তিনি-ই যিনি সবার ভার নিতে পারেন—শাসন করে নয়, যথার্থ ভালবেসে।

৩। ১১। ৭১

১২৭

সংসারে থেকেও ভগবানের উপলব্ধি যে কোনও অবস্থায় হতে পারে। প্রত্যেক action, condition ও life-কে Divine মানতে পারলে অন্তরায় থাকে না।

একবার এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ খুব গরিব, কিন্তু ধার্মিক। তার একমাত্র কন্যা সেও ধার্মিক। শৈশব থেকেই সে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে আসছে। সেও পূজাপাঠ নিয়ে থাকে। গরিব ব্রাহ্মণ কিন্তু কুলীন। কন্যার বিবাহের চেষ্টা করছে কিন্তু গরিব বলে সুবিধা করতে পারছে না, ভারী মুস্কিল। কন্যা পিতার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল—বাবা আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে। আমার বিবাহের জন্য চেষ্টা করো না, আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এই কথা শুনে পিতা আঁতকে উঠলেন। তিনি ভাবলেন, মেয়ে হয়ত কোনও কুকীর্তি করেছে। কন্যা বলল—আমি আমার সব কিছু ইষ্টদেবের কাছে সমর্পণ করেছি। অন্যের কাছে এ জীবন কী করে দেব? পিতা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—এটা কী করলি! একবার জিজ্ঞাসা করলি না? কন্যা বলল—কেন বাবা, তুমিই তো এই পথে যেতে শিখিয়েছ। মানুষের জীবন রোগ, শোক ও দুঃখে ভরা, সেখানে কেন নিজের জীবন দিতে যাব? জগন্নাথস্বামীর পায়ে বিনা শর্তে সব সমর্পণ করেছি, অর্থাৎ আত্মদান করে দিয়েছি। আমি কি ভুল করেছি? পিতার ইষ্টও জগন্নাথস্বামী। তাই তিনি বিরোধিতা করতে পারলেন না। মন তবুও মানতে চায় না। পিতা বললেন—সমাজে তো একটি কর্তব্য আছে।

কন্যা—তুমি তো সবচেয়ে বড় ধর্ম পালন করেছ। সন্তানকে লালন পালন করে ধর্মে মতি এনে দিয়েছ।

কন্যার কথায় পিতা আশ্বস্ত হলেও অন্যরা নানা রকম কথা বলল। অথচ কারওকে এই কথা তিনি বোঝাতেও পারেন না। একদিন রাতে কন্যা বলল—ওরা তোমাকে এত কথা শোনাচ্ছে, চল আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাই।

পিতা—চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবি? এখানে তবু তো নির্বিঘ্নে বাস করছি, অন্য কোথাও গেলে সেটাও থাকবে না।

কন্যা ইষ্টের কাছে প্রার্থনা জানাল—তোমার কাছে তো আমার সব দেওয়া আছে। এরা এ সব বুঝবে না। অবশ্য আমিও যে খুব একটা বুঝি তাও নয়। তবুও প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমাকে তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও তোমার কাছে। তাহলে বাবাকে কষ্ট পেতে হবে না। সন্তানরা বাবামাকে যেমন কষ্ট দেয় তেমন কষ্ট লাঘবও করে দেয়। কিছুদিন পরে মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। দরিদ্রতার দরুন পিতার পক্ষে ওষুধ কেনাও সম্ভব নয়। অনেক কষ্টে তিনি কবিরাজকে ডাকলেন। কবিরাজ এসে পিতাকে বললেন—মেয়ের বিয়ে না-দিলে রোগ তো হবেই। কথাটি মেয়ের কানে গেল। বাইরে থেকে বুঝতে পারছে না কেউ মেয়ের অবস্থাটা। ভগবৎ চিন্তা করতে করতে সে শুকিয়ে যাচ্ছে, তার উপর ভগবানকে বলছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কবিরাজমশাই অনেক উপদেশ দিয়ে গেলেন। কন্যা ইষ্টদেবকে বলল—তোমার মহিমা কিছু বুঝতে পারব না, তুমিই দয়া করে বুঝিয়ে দাও। জীবনে তো সাধ-আহ্লাদ কিছুই করিনি, তাহলে কি আমার জীবনটা বৃথা গেল? ওটাই কি সত্য? এই ভাবনা করতে করতে কিছুদিন পর সে ইষ্টের কাছে চলে গেল।

এক জন্মের ভাবনা অনুযায়ী পরের জন্মে তদনুরূপ জীবন ধারণ করতে হয়। এর পরে এক রাজার ঘরে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করল। পূর্বজন্মের সংস্কার থাকার জন্য শৈশব থেকেই সে খুব ধর্মকর্ম করে। রাজকন্যা বড় হল। রাজা এবার কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা ভাবলেন। এদিকে রাজকন্যা কিছুতেই বিয়ে করবে না। রাজা মুস্কিলে পড়ে গেলেন। তবুও মাঝে মাঝে রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নানা রাজ্যে পাত্রের খোঁজখবর করতে লাগলেন। রাজকন্যা পিতাকে জানিয়ে দিল, বিবাহের ব্যবস্থা করলে সে দেহত্যাগ করবে। রাজা কী আর করবেন—কিছুদিন চুপ করে রইলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজকন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এক কবিরাজ এল, সে যুবক। রাজকন্যা পুরুষের স্পর্শ কোনও দিন পায়নি। কবিরাজ তার দেহ নানা ভাবে পরীক্ষা করল। এতে কন্যার মনে বিকার সৃষ্টি হল। সে ভাবতে লাগল, এই দেহকে নিয়ে মানুষ কী ভাবনা করে? কী আছে এই দেহে? যুবকের মনোবৃত্তি সে টের পেল। Thought reading তার জানা ছিল। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে তার খুব দুঃখ হল। এই ভাবে রাজকন্যার দেহ নষ্ট হয়ে গেল।

তার পরের বার কন্যাটির জন্ম হল এক বারবনিতার ঘরে। শৈশব থেকে কন্যা জাতিস্মর। সে ভাবছে, এখানে আমার জন্ম হল, দেহ বিক্রি করে জীবন চালাতে হবে। এখানে তো সাধনভজন করতে পারব না। ভগবানকে সে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—বারেবারে আমাকে কেন মানুষের কাছে পাঠাচ্ছ? তুমি আমাকে নিতে পার না? এই জীবন থেকে রেহাই পাবার জন্য সে পাগলের বেশ ধরল। গায়ে মাটি মেখে ছেঁড়া কাপড় পরে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যৌবনে পাগলি হয়ে গেলে মানুষ খুব ভয় পায়। আসলে মেয়েটি পাগল নয়, স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। সাধনভজনের

ফলে তার বাক্‌সিদ্ধিটা এসে গিয়েছিল। বাক্‌সিদ্ধির পরিচয় আশেপাশের লোকেদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ফলে পাগলির কথা মিলে গেলে লোকেরা তাকে খাবার দিত।

গঙ্গার পারে তপস্যা করতেন এক সাধু। পাগলি সাধুর কাছ দিয়ে যেত আর বলত—তপস্যার গুণ নষ্ট হয়ে যায়, যদি কামনার বা চিন্তার প্রভাব তার উপর পড়ে। সাধু পাগলির কথার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাধুর কাছে আসতেন। তাদের মধ্যে এক মুচি ভক্তও ছিল। মুচি একদিন ভাবল, সবাই কত কিছু দেয় সাধুকে আর আমি কিছুই দিতে পারি না। একদিন একটি সুন্দর জুতো বানিয়ে মুচি সাধুকে দিল। জুতো পেয়ে সাধু তো ভারী খুশি। সাধু কোনও দিনও জুতো ব্যবহার করেননি। তাই ভক্তের দেওয়া জিনিস প্রণাম করে তুলে রাখলেন। সাধু সাধনভজন করেন আর মাঝে মাঝে জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পাগলি আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় আর ভাবে, সাধু কত উচ্চ স্তরে উঠেছে তা পরীক্ষা করব! সাধুর নজর যে জুতো জোড়ার উপরে ছিল তা পাগলি জানত। মৃত্যুর সময়ও সাধু জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, একদিনও পায়ে দেওয়া হল না!

মৃত্যুকালে যে যা ভাবনা করে পরবর্তীকালে সেই ভাবেই সে জন্ম নেয়। সাধু জন্ম নিলেন এক মুচির ঘরে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে পাগলি ভাবত, সাধু কোথায় জন্ম নেয় দেখব। শিশুর জন্ম হলে সে প্রতিটি বাড়িতে দেখতে যেত। মুচির ঘরে জন্ম নিয়ে শিশু মাতৃস্তন্য মুখে দেয় না। সাধু জাতিস্মর। মুচির ঘরে জন্মেছেন দেখে সাধু ভাবলেন, এই ঘরে আমার সাধনভজন কিছু হবে না। অতএব এক্ষুনি অনশন করে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়। পাড়ার লোকেরা পাগলিকে জিজ্ঞাসা করল—শিশু কেন স্তন্য পান করে না বলতে পারিস? পাগলি বলল—হ্যাঁ পারি। আগে বল আমার কোলে শিশুকে দেবে, তাহলে সে ঠিক খাবে। সবাই তাতে রাজি। পাগলি শিশুকে কোলে নিয়ে কানে কানে বলল—সাধু তুমি মুচির ঘরে জন্ম নিয়েছ, এবার কী কর দেখব। তখন তো আমার কথায় কান দাওনি। তখন বলেছিলাম—

'তপঃশক্তি ক্ষয় পায়
যদি মন ধায় কামচিন্তায়।'

শিশু কানে কানে ঐ কথা শুনে সব বুঝতে পারল। পাগলি বলল—এবার বুঝতে পারছ? তাহলে এবার বল দুধ খাচ্ছ না কেন?

সাধু—এই দেহে কী সাধনভজন করব?

পাগলি—মরণকালে জুতো জোড়ার চিন্তা না-করলে কি হত না? আজ তাহলে মুচির ঘরে জন্ম নিতে না। আমি যখন কথা দিয়েছি তখন দুধ তোমাকে খেতেই হবে, দেহত্যাগ করতে পারবে না। আমি তিন জন্ম ঘুরছি। দুধ খেতেই হবে, তা না-হলে আমার কথা মিথ্যা হয়ে যাবে।

সাধু—এখন উপায়?

পাগলি—এত ভাবছ কেন? এর মধ্যেই তুমি সাধনভজন করতে পারবে। ভগবানকে ডাকার জন্য স্থান-কাল-পাত্রের দরকার নেই।

এই শিশুই হল রুহিদাস, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি সাধনভজন করে গাছতলায় বসে জুতো সেলাই করতেন আর রাম নাম করতেন। রুহিদাসের পাশে একটি চৌকি ছিল। শ্রীরামচন্দ্র এসে একদিন রুহিদাসকে বললেন—এখানে একটু বসব? নামে তিনি এতই মশগুল ছিলেন যে, খেয়ালই করলেন না কে এসেছে। নাম করতে করতে না-তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ বস। রুহিদাস যে গাছতলায় বসে সাধনভজন করতেন সেখান থেকে কিছু দূরে এক সাধু বসে জপতপ করতেন। দূর থেকে সেই সাধু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ছুটে এলেন এবং রুহিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—একটু আগে যিনি বসেছিলেন তিনি কোথায় গেলেন বলতে পার? তিনি উত্তর দিলেন—জানি না। সাধু তখন বললেন—কে বসেছিলেন দেখেছ কি? উত্তর—না। সাধুটি বললেন—শ্রীরামচন্দ্র এসে চলে গেলেন আর তাকালি না? হতভাগা! সাধে কি তোদের মুচি বলে।

শ্রীরামচন্দ্র এখানে এসে বসে চলে গিয়েছেন শুনে তিনি ভারী দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন, রাম তুমি এলে অথচ তোমাকে দেখলাম না, এমন অপদার্থ আমি। এই বলে এক লাফ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে যাবে, এমন সময় শ্রীরামচন্দ্র এসে তাঁকে ধরে ফেললেন। তিনি মুক্তি লাভ করলেন। পাগলি নাচতে নাচতে এল। তিনি মুক্তি লাভ করেছেন দেখে সেও আনন্দিত। ইষ্ট নাম জপ করতে করতে পাগলিরও দেহনাশ হল।

৫। ১১। ৭১

১২৮

একটি কাগজে পাঁচ লক্ষ টাকা লেখা আছে, সেই কাগজ কারওকে দেখালে কেউ টাকা দেবে কি? সে রকমই শুধু শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ বা মুখস্থ করলে অনুভূতির কথা বলা হয় না। লোকের কাছে হৃদয়ের অনুভূতির কথা বলতে হবে।

আসল শাস্ত্র আছে প্রাণের মধ্যে। তা ignore করে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি কত কিছু নিয়ে সবাই মাথা ঘামায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক পণ্ডিত সারাদিন শাস্ত্রচর্চা করত, কিন্তু তার স্ত্রী ছিল আকাট মূর্খ। পণ্ডিত শুধু স্ত্রীকে বলে—তুমি সংস্কৃত জান না, শাস্ত্রও পড়লে না, জীবনটা বৃথা গেল।

স্ত্রী তার স্বামীর কথা শুনে বলত—শাস্ত্র না-জানলে কী ক্ষতি? আমার ঘরসংসার সামলাতে হয়, রান্নাবান্না করতে হয়, শাস্ত্র পড়ে আমার কী লাভ? স্ত্রীর এই কথা শুনে পণ্ডিত তবুও তাকে মাঝে মধ্যে খোঁটা দেয়।

একদিন স্ত্রী স্বামীকে জব্দ করার জন্য উনুনে ভাত বসিয়ে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গাস্নানে যাবার আগে পণ্ডিতকে বলে গেল—আমি স্নানে যাচ্ছি তুমি ভাতটা সময় মতো নামিয়ে নিও। মনে মনে পণ্ডিতের স্ত্রী ভাবল, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান এবার ভাতের হাঁড়িতে

নিয়ে আসব। এরই মধ্যে ভাত পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল। পণ্ডিত শাস্ত্র নিয়ে এমন মশগুল হয়েছিল যে, তার কোনও দিকেই খেয়াল ছিল না। যখন পণ্ডিতের খেয়াল হল তখন দেখল ভাত পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় স্ত্রী গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে এসে সব কাণ্ড দেখে বলল—এবার তোমার শাস্ত্র তোমাকে এই পোড়া ছাইগুলি খাওয়াবে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী আবার রান্না করে পণ্ডিত স্বামীকে খেতে দিল।

পরের দিন স্ত্রী অসুখের ভান করে পড়ে রইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই অবস্থায় নিজে রান্না করে খেতে হবে বলে তো রেগে আগুন। পণ্ডিত তার স্ত্রীর উপর রাগ করতে লাগল, কেন তার অসুখ হল এই জন্য। বারবার স্ত্রীকে অনুযোগ করে শেষ পর্যন্ত আধাসিদ্ধ ভাত রান্না করে কোনও রকমে খাওয়া শেষ করল।

স্ত্রী তাকে বলল—সারাজীবন শাস্ত্রচর্চা করে যাচ্ছ, কিন্তু তাতে কি প্রাণটা বাঁচবে? আমি যে শাস্ত্র পড়েছি তা দিয়ে অন্তত তোমার প্রাণটা বাঁচবে।

স্বামীকে জব্দ করার জন্য পণ্ডিতের স্ত্রী অবশেষে বাপের বাড়ি চলে গেল। পণ্ডিতের মহা অসুবিধা হতে লাগল। অবশেষে পণ্ডিত বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে শ্বশুরবাড়ি রওয়ানা হল।

শ্বশুরবাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত খেয়াঘাটে গেল। পণ্ডিত খেয়াঘাটের মাঝিকেও মাঝে মাঝে বলত তার কাছে শাস্ত্রকথা শুনতে যাবার জন্য। মাঝি বলত—আপনারা বড় পণ্ডিতবংশের লোক, শাস্ত্রচর্চা করে দিন কাটান। আমি গরিবের ছেলে, খেয়াঘাটে লোক পার করে পেট চালাই, আমাদের কি শাস্ত্রপাঠ করার বা শোনার সময় হয় কখনও?

এদিকে পণ্ডিতকে যখন মাঝি নদী পার করছিল তখন পণ্ডিত আবার তাকে বলল—তোমাকে কতবার বলেছি শাস্ত্র পড়তে, কিন্তু তুমি শাস্ত্রটাস্ত্র কিছুই পড়লে না। শাস্ত্র না-জানলে এ নদী পার হতে পারলেও ভবনদী তো পার হতে পারবে না।

এমন সময় নৌকা যখন মাঝদরিয়ায় গেল তখন খুব ঝড় উঠল, নৌকা প্রায় ডোবে এমন অবস্থা।

পণ্ডিত ভয় পেয়ে বলল—যেমন করে হোক আমাকে তুমি বাঁচাও।

মাঝি বলল—আপনি ভবনদী পার হতে পারবেন আর এই সামান্য ছোট একটি নদী পার হতে পারবেন না?

পণ্ডিত—এবার আমার প্রাণটা বাঁচাও।

মাঝি—প্রাণ বাঁচাবার ক্ষমতা তো আমার নেই।

পণ্ডিত প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভয়ে অস্থির হয়ে মাঝিকে খুব অনুনয় বিনয় করতে লাগল। অনেক কষ্টে সেবার পণ্ডিতের প্রাণ বাঁচল।

পণ্ডিত তারপর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছাল। স্ত্রী অন্দরমহলেই রইল, স্বামীর সঙ্গে দেখা করল না। শ্বশুর এসে জামাইকে আদর আপ্যায়ন করল ও বাইরের একটি ঘরে শোবার ব্যবস্থা করল।

জামাইকে খাবার পরিবেশণ করল দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসিশাশুড়ি, কাজেই খাওয়ার সময় তার কোনও আনন্দ বা তৃপ্তি হল না। সেই দিন রাতে পণ্ডিতের খুব অসুখ করল। জামাইয়ের শরীর খারাপ দেখে শ্বশুর পাঁচজন কবিরাজ নিয়ে এল। তারাও রোগীকে দেখে এক সিদ্ধান্তে আসতে পারল না—আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র থেকে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করে যার যার মতের উপর জোর দিতে লাগল। পণ্ডিত তখন জোরে জোরে বলল—তোমাদের শাস্ত্র এখন রাখ, আমার প্রাণটা আগে বাঁচাও।

পণ্ডিতের স্ত্রী পাশের ঘর থেকে সব শুনছিল। তখন সে পণ্ডিতকে বলল—কেন শাস্ত্র তো আছে, তুমি মরবে কেন? এবার দেখ, পণ্ডিত যে সে প্রাণ বাঁচায় না মূর্খ প্রাণ বাঁচায়।

তার পরে স্ত্রীর সেবাযত্নে পণ্ডিত সুস্থ হয়ে উঠল। পণ্ডিত সুস্থ হয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়ি ফিরে পণ্ডিত তার টোল বন্ধ করে দিল, এমনকী শাস্ত্র আলোচনা, শাস্ত্রপাঠও বন্ধ করে দিল। শেষ পর্যন্ত যখন পণ্ডিতের স্ত্রী রান্না করতে যেত তখন পণ্ডিত মশলা বেটে দিত। স্ত্রীর কাছে পণ্ডিত ঘর মোছা শিখে নিল এবং কখনও কখনও ঘর মুছেও দিত। স্ত্রী যদি কখনও আপত্তি করত সে বলত—আমি এখন practical শাস্ত্র পাঠ নিচ্ছি তোমার কাছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—'তুমিবোধে' এই সব গোলমাল থাকে না। এই যুগ শুধু পুঁথিপুস্তককে বড় করেছে, কলি যুগে এটাই হয়। জীবনে চলতে গেলে practical training-এর প্রয়োজন হয় সর্বক্ষেত্রেই।

৭। ১১। ৭১

১২৯

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আজ একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে এক অতি নিগূঢ় শিক্ষণীয় বিষয় ব্যক্ত করলেন।

Silent state of mind-এ সব reveal করে। সচ্চিদানন্দময়ী মাকে সর্বদা সর্বত্র মানতে মানতে নিজে একেবারে free channel হয়ে যাবে। স্বয়ং মা-ই তখন তোমার মধ্যে দিয়ে সব কিছু প্রকাশ করবেন। তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন হল, দেহ থেকে শুরু করে সব কিছুকে মা, আত্মা, গুরু বা ইষ্ট বলে মানা।

Physical গুরু বললে particular person-কেই শুধু বোঝায় না। 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) কাছে whole universe-টাই হল গুরু। Conventional way-তে particular কোনও body-কে গুরু ধরা 'এর' স্বভাবে আসেনি। সকলেই 'এর' গুরু। বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে জগতের সকল বস্তু ও প্রাণীর থেকেই 'এ' শিক্ষালাভ করেছে। এখানে বসেও প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকের কাছ থেকেই নূতন নূতন বোধের বৃত্তিই প্রকাশ পাচ্ছে। বোধের নয়নে আর কোনও barrier নেই। বোধের নয়নটা খুলে গিয়েছে, মনে হয় ভিতরে একেবারে শূন্যময় অবস্থা। ভিতরের

existence যেন নেই মনে হয়। Body-টা যেন transparent হয়ে গিয়েছে। কখনও হয়ত বহু দূরে একটি wave উঠতে দেখা যায়, আবার নিজের ভিতরেই তা দেখা যায়।

গুরুপ্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

একজন ভদ্রলোকের অনেক টাকাপয়সা। তাঁর একটিমাত্র ছেলে। ছেলে ভাবল, সে-ই তো সব কিছুর অধিকারী সুতরাং মহানন্দে বন্ধুবান্ধব নিয়ে সব টাকাপয়সা ওড়াতে লাগল। তার বাবা ভয়ানক চিন্তিত হলেন। তিনি নানা রকম ভাবে ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হল না।

তারপর তিনি তাঁর ছেলেকে খুব শাসন করতে শুরু করলেন। তার ফলে দেখা গেল ছেলের বন্ধুরা এসে তার বাবাকে শাসাচ্ছে—আপনি আমাদের বন্ধুকে কেন শাসন করেন? তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কেন করেন?

বাবা তখন বাধ্য হয়ে ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন—মাবাবার চাইতে বন্ধুরাই যদি আপন হয় বেশি, তবে বন্ধুরাই তোমাকে দেখুক।

ছেলে তখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বন্ধুরা বুঝতে পারল যে, আর ছেলের বাবার কাছ থেকে কোনও টাকাপয়সা পাওয়া যাবে না। এদিকে বন্ধুকেও তারা আব খাওযাতে পারে না। তখন তারা পরামর্শ করে স্থির করল, এবার তারা তাদের বন্ধুর বাবাকে মেরেই ফেলবে।

বাবার কানেও কথাটি গেল। তিনি তাঁর বাড়ি, টাকাপয়সা, সম্পত্তি সব দান করে একটি উইল করে গেলেন এবং নিজে দেশ ছেড়ে একেবারে দূরে চলে গেলেন।

বাবা চলে যাবার পরেই বন্ধুরা সবাই একত্র হয়ে বাড়ি দখল করতে এল। আবার এদিকে যাকে টাকাপয়সা, সম্পত্তি ও বাড়ি দান করে গিয়েছিলেন সেও লোকজন নিয়ে বাড়ি দখল করতে এল। দুই দলে মারামারি হল। শেষ পর্যন্ত ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল হাজতে। ছেলের পক্ষ থেকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নেবারও কেউ নেই। ছেলের জেল হয়ে গেল, জেলে সে খুব কষ্ট পেতে লাগল।

একদিন জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাকে বললেন—তুমি কার ছেলে অথচ আজ তুমি কোথায় নেমে এসেছ! এ কথা শুনে তখনও ছেলে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। তার উদ্ধত স্বভাব তখনও যায়নি।

তার বাবা মনের দুঃখে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নির্দিষ্ট সময়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটি দেখল তার বাবা সমস্ত দানপত্র করে দিয়ে তীর্থ পর্যটনে বেড়িয়েছেন। এ সব দেখে ছেলের খুব কষ্ট হতে লাগল।

গুরুজনদের অসম্মান ও অবজ্ঞা করে অনভিজ্ঞদের কাছে উপদেশ নিয়ে যারা চলে তাদের দুঃখকষ্টের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

দুঃখকষ্টে পড়ে ছেলের জীবনে পরিবর্তন এল। একজন তাকে পরামর্শ দিয়ে বলল —তুমি তোমার বাবার উপার্জিত ধন না-ই বা পেলে, এ সব তোমার বাবা নিজে কষ্ট

করে উপার্জন করেছিলেন, আবার নিজেই দান করে গিয়েছেন। তুমিও নিজে উপার্জন করতে শেখ।

সেই দিন থেকে ছেলে চেষ্টা-যত্ন করে নিজেও কিছু কিছু উপার্জন করতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত তার ধর্মেও মতি এল। সে বাবার খোঁজ করতে লাগল। খোঁজ করতে গিয়ে জানল যে, তিনি ইতিমধ্যে সন্ন্যাসধর্ম নিয়ে ফেলেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাবার সঙ্গে তার দেখা হল। সে বাবার কাছে সন্ন্যাস নিতে চাইল।

বাবা তাকে বললেন—তোমাকে সন্ন্যাস দেবার মতো উপযুক্ত আমি হইনি। তুমি অন্য কারও কাছ থেকে সন্ন্যাস নাও।

বাবা তাকে সন্ন্যাস দিলেন না এই জন্য যে, তিনি সন্ন্যাস দিলে সে তার কাছে আবার undue advantage নিতে চাইবে। সেই জন্য তিনি এত strict হয়ে রইলেন। ছেলে পরে অপর একজনের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে জীবনে উন্নতি করেছিল।

এই কাহিনির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল—সঙ্গের গুরুত্ব, যোগ্যতার গুরুত্ব, ন্যায়-অন্যায় বিচারের গুরুত্ব এবং সত্যনিষ্ঠার তাৎপর্য সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু স্বানুভূতির দৃষ্টিতে কাহিনিটি ব্যক্ত হয়েছে আত্মবোধের তাৎপর্যার্থে। দিব্য আত্মানুভূতি ও সত্যানুভূতির অনুশাসন কত সহজবোধ্য ভাবে, হৃদয়গ্রাহীরূপে অভিনব ভাবে প্রকাশ করা যায়, গল্পটির মধ্যে দিয়ে তা-ই ব্যক্ত করেছেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

স্বভাবের মধ্যে অজ্ঞানের প্রভাব বেশি হলে উদ্ধত ভোগী জীবন হয়। সেই জীবন শ্রেষ্ঠ ও মহতের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারে না। ভোগী জীবনের সাধ অধিক, সাধ্য কম। শ্রেষ্ঠ বা মহান যারা, তাদের সাধ্য অধিক, সাধ কম। তাদের কোনও দাবি থাকে না, তারা যোগ্যতার অপব্যবহার করে না এবং কোনও অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দেয় না। তারা ত্যাগের মর্ম বুঝে সেই অনুসারে জীবনকে তৈরি করে নেয়। তাদের মোহ-আসক্তি থাকে না, বিবেক-বিচারের যথার্থ ব্যবহার তারা জানে বলে পরিণামে দিব্যজীবনের অধিকারী হয়। অবিবেকীদের বহু দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নিজ বুদ্ধিদোষে। দুর্ভোগান্তে তাদের চিত্ত সংস্কৃত ও মার্জিত হয় এবং উন্নত মহান জীবন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়।

৯। ১১। ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৩০

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একইদিনে গুরুপ্রসঙ্গে আরও একটি গল্প বললেন।

রাজা ভর্তৃহরি ছিলেন পরম ভোগী, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও ভক্তিমতী। ভক্তিমতী রানির গুরুদেব মাঝে মাঝে আসতেন রাজবাড়িতে। একদিন গুরুদেব এসেছেন, রাজা বিদ্রুপের ভঙ্গিমায় তাঁকে বললেন—এ রাজবাড়ির অন্ন তো আপনার চলবে না।

গুরুদেব বললেন—আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করার জন্য আসি না, ভক্তিমতী রানির জন্যই শুধু এসেছি।

আবার একদিন রাজা গুরুদেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ভোগ তোমাদের ত্যাগের চাইতে অনেক বড়।

গুরুদেব তখন বললেন—তোমার মুখ দিয়েই এর বিপরীত কথা আবার বেরোবে।

দিন যায়, ভক্তিমতী রানি হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। রাজা ভর্তৃহরি আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। এই স্ত্রী ছিল অত্যন্ত কুটিলা। সে তার ভাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দিল। রাজা আর কী করেন, মনের কষ্টে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। আহার, নিদ্রা নেই—কষ্টের যেন আর শেষ নেই। দুঃখকষ্ট যখন চরমে উঠেছে তখন একদিন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে অসুস্থ অবস্থায় তিনি পড়ে রইলেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে। তৃষ্ণায় ছটফট করছেন অথচ মুখে জল দেবার মতনও কেউ কাছে নেই। অবশেষে করুণ কণ্ঠে তিনি আর্তনাদ করে বললেন—কে কোথায় আছ, আমাকে একটু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। এই করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন তাঁর প্রথম রানির গুরুদেব। তিনি সেই জঙ্গলের কাছেই ছিলেন। আর্তনাদ শুনে তিনি জল নিয়ে রাজার কাছে এলেন। বাজা তাঁকে দেখেই চিনতে পারলেন। গুরুদেব তাঁকে জল খাওয়ালেন। রাজা তখন সুস্থ হলেন। রাজা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এখানে কী ভাবে এলেন এবং কেনই বা এই গভীর জঙ্গলে এসেছেন?

গুরুদেব—তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই এসেছি। তোমার বাড়ির জল এই ত্যাগী গ্রহণ করেনি, কিন্তু এই ত্যাগীর হাতের জল তুমি ভোগী গ্রহণ করেছ।

শেষ পর্যন্ত রাজা ভর্তৃহরির জীবনে পরিবর্তন এল দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়েই। তিনি রানির গুরুদেবের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলেন। তাঁর শিক্ষায় রাজার খুব আধ্যাত্মিক উন্নতি হল।

একদিন গুরুদেব বললেন—আমাকে তো তুমি গুরুদক্ষিণা দাওনি।

রাজা—কী দিতে হবে, আদেশ করুন।

গুরুদেব—যে মুখ দিয়ে একদিন তুমি বলেছিলে ত্যাগের চাইতে ভোগ শ্রেষ্ঠ, সেই মুখ দিয়েই তোমাকে ত্যাগের মহিমা প্রচার করতে হবে নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে। রাজা তাতেই রাজি হলেন। নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে ত্যাগের মহিমা প্রচার করতে শুরু করলেন। আগে রাজা যাদের ধর্মচর্চা করতে দেখলে বিদ্রুপাত্মক কথা বলতেন, তারাই এখন রাজার এই পরিবর্তন দেখে তাঁকে বিদ্রুপ করে।

ভর্তৃহরি অপরকে খুব কঠোরতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ভোগের পরিণামে যে কী হয় সেই অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের জীবনে ছিল বলেই তিনি অপরকে এক বিন্দুও ভোগের পথে যেতে দিতেন না।

রাজা ভর্তৃহরি বলতেন—আমাকে গুরুদেব গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে যে কঠোরতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তা-ই সকলের প্রয়োজন আত্মোপলব্ধির জন্য। আত্মোপলব্ধি হলেই গুরু হবে।

রাজা এত strict ছিলেন যে, কারওকে গাছ থেকে একটি ফলও পাড়তে দিতেন না। যতদিন না সুপক্ক হয়ে গাছ থেকে ফলটি আপনা থেকেই ঝরে পড়বে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এই ছিল তাঁর নির্দেশ।

একবার তাঁর এক শিষ্য গাছ থেকে একটি ফল পাড়তে যায়। রাজা তাকে নিষেধ করে বললেন—যতদিন ফলটি আপনা থেকে মাটিতে না-পড়বে ততদিন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

শিষ্য কী আর করবে? গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে পারে না। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করে রইল। অবশেষে চব্বিশ দিন পরে সুপক্ক হয়ে ফলটি গাছ থেকে তলায় পড়ে।

রাজা বললেন—এবার তুমি ফলটি গ্রহণ করতে পার।

শিষ্য—আমার আর সাধ নেই ফল গ্রহণ করার।

রাজা তখন খুশি হয়ে বললেন—এবার তুমি ঠিক ঠিক সাধু হয়েছ। সাধকে যিনি জয় করতে পেরেছেন অর্থাৎ সাধ যাঁর উড়ে গিয়েছে, তাঁর সাধ্য এসে গিয়েছে। তিনি যথার্থ সাধু।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সাধুদের সাধ নেই, আছে সাধ্য। ভোগীদের সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই।

৯। ১১। ৭১

১৩১

'তোমারবোধে' জ্ঞান, 'আমারবোধে' অজ্ঞান। 'তোমারবোধে' এক-কে ধরলে জ্ঞান মার্গ এসে যায়। 'তোমারবোধে' মন যুক্ত হলে হয় যোগ মার্গ। 'তোমারবোধে' সেবা হলে ভক্তি এসে যায়। এক-এর সহজতম বিধান দেওয়া হল। এই ভাবে চললে জ্ঞানী, যোগী, কর্মী ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। জ্ঞানরূপে তিনি, ভক্তিরূপেও তিনি, আবার যোগযুক্তরূপেও তিনিই স্বয়ংপ্রকাশ।

তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই তো ব্যবহার করতে পারা যায় না। যা দিয়ে ব্যবহার করবে সেই বোধটি তাঁরই sanction করা।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন।

এক ব্রাহ্মণকে যমদূত যমপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের বিচার হবে।

যম ব্রাহ্মণকে বললেন—তুমি এই এই কর্ম কবেছ, কোনটা আগে ভোগ করবে?

যমের কাছে খানিকক্ষণ বসে থাকার ফলে ব্রাহ্মণের কিছুটা চৈতন্য হয়েছে। ব্রাহ্মণ ভাবল, এই জন্মে ভারী ভুল করে ফেলেছি, এর পরের বার যদি ভাল একটি দেহ পাই, উপযুক্ত আধার পাই তবে একটু সাধনভজন করে নেব। বারবার এই কথা সে ভাবছে ও মনে মনে একই কথা বিড়বিড় করে বলছে।

যম ব্রাহ্মণের হাবভাব লক্ষ্য করে বললেন—তুমি নিজের মনে মনে কী ভাবছ আর কী-ই বা বলছ?

ব্রাহ্মণ বলল—ভাবছিলাম এর পরের বার যদি একটি ভাল দেহ নিয়ে সৎ বংশে জন্মগ্রহণ করতে পারি তবে একটু সাধনভজন করে নেব।

যমরাজ চিত্রগুপ্তকে হিসাবের খাতা নিয়ে আসতে বললেন। তিনি চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা কবলেন—দেখ তো এই ব্রাহ্মণকে ভাল ঘরে সুন্দর একটি দেহে পাঠানো চলবে কি না?

চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বললেন—মহারাজ, এবার সে রকম কিছুই সম্ভব নয়। ভাল দেহ পেতে হলে বেশ কয়েকজন্ম অপেক্ষা করতে হবে।

যমরাজ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে কৃপা করে সৎ ব্রাহ্মণেব ঘরে সুস্থ দেহেই পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তার আগে খাতায় নাম সই করিয়ে একেবারে চুক্তি করে নিলেন যে, পরের বার ব্রাহ্মণ সাধনভজন করবে ও ঈশ্বরের নাম নেবে।

এক ব্রাহ্মণের ঘরে শেষ পর্যন্ত সে জন্মগ্রহণ করল। ব্রাহ্মণ সুন্দর ও সুস্থ দেহ নিয়েই এল। সুখের মধ্যে সে প্রতিপালিত হতে লাগল। ক্রমে যৌবন আসার পরে ভাল স্বাস্থ্য পেয়ে ও বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নানা রকম অসৎ প্রবৃত্তি তার মধ্যে হতে থাকে। ঈশ্বরের কথাও তার মনে পড়ত না। সাধনভজন করা, ঈশ্বরের নাম করা সব কিছু বাদ দিয়ে একেবারে ভোগৈশ্বর্যে মত্ত হয়ে রইল। ক্রমে সে ভয়ানক উদ্ধত ও দাম্ভিক হয়ে উঠল।

চিত্রগুপ্ত একদিন যমরাজকে ব্রাহ্মণের অবস্থার কথা সব জানাল। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বলল—তাকে একটি notice পাঠাও। ব্রাহ্মণের তখন চোখটা খারাপ হল। কিন্তু ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করে চশমা নিয়ে ব্রাহ্মণ আবার পূর্বের মতো যেমন খুশি তেমন ভাবে চলতে লাগল। ভগবানের কথা তখনও তার মনে এল না।

যমরাজ আবার চিত্রগুপ্তকে নির্দেশ দিয়ে বললেন—আরেকটি notice পাঠাও। তখন ব্রাহ্মণের দাঁত খারাপ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে

নিল। ব্রাহ্মণ তখনও যুবক, কিন্তু তবুও ভগবানের নাম করে না। এরপর যমরাজ তাকে তৃতীয় notice পাঠালেন, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হল না। এবারে যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বললেন—দাও একেবারে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ তখন মোক্তারের সাহায্যে মুক্ত হল। এখনও তার ভগবানের কথা মনে পড়ে না। এরপর যমরাজ ব্রাহ্মণের সন্তানকে ধরে টান দিলেন, কিন্তু তবু ব্রাহ্মণের চৈতন্য হল না। একে একে ব্রাহ্মণের সব ক'টি সন্তানের মৃত্যু হল, তার স্ত্রীরও মৃত্যু হল।

ক্রমশ ব্রাহ্মণের দেহ অচল হয়ে গেল, পাগুলিও অসাড় হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট শুরু হল এবং মৃত্যুসময়ও ঘনিয়ে এল। শ্বাসকষ্টের জন্য তাকে oxygen দিতে হল। তখনও ব্রাহ্মণ ভুলেও ভগবানকে স্মরণ করছে না। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন খুব কষ্ট পেয়ে ভুগে সে মারা গেল।

ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর যমদূতরা তাকে যমরাজের কাছে নিয়ে গেল।

যমরাজ তাকে দেখে বললেন—তুমি তো অনেক অন্যায় করেছ।

ব্রাহ্মণ—কোনও অন্যায়ই তো আমি করিনি, যা করেছি আমার প্রয়োজনেই তো করেছি।

ব্রাহ্মণ তখন যমরাজের কাছে নিজেকে justify করতে শুরু করে দিল। তখন চিত্রগুপ্তর কাছ থেকে খাতা এনে তার সইটা তাকে দেখানো হল।

যমরাজ বললেন—তুমি নিজ হাতে চুক্তিপত্রে সই করে বলেছিলে, নূতন জন্ম পেয়ে ঈশ্বরের ভজনা করবে, কিন্তু তুমি কি তা একদিনও করেছ?

নিজের নাম সইটা দেখে ব্রাহ্মণের সব কথা স্মরণ হল এবং আবার ক্ষমাভিক্ষা করতে শুরু করে দিল। কিন্তু যমরাজ এবার ব্রাহ্মণের কোনও কথাই শুনলেন না এবং যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষও যে কী সই করে এসেছে, তা কারও মনে নেই। সবাই 'আমি আমার' করে চালাচ্ছে। জীবনে যে suffering-গুলি আসে তা হল তাঁদের notice।

১৬। ১১। ৭১

১৩২

Natural evolution-এর মধ্যে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বহু জন্ম বাদেও summit-এ যাওয়া যায়। আবার বৃহতের বা মহতের touch-এও তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। পাহাড়ের উপর যেতে হলে পাকদণ্ডী যেমন আছে, আবার ঘুরে ঘুরেও কেউ যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক গ্রামে বন্যা, মহামারী হওয়াতে ভীষণ দুরবস্থা হল। Relief দেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে লোক আসতে লাগল। এই লোকগুলি কিন্তু বন্যা দ্বারা affected ছিল না।

বন্যাদুর্গত লোকেরা relief worker-দের বলল—আমাদের তোমরা তোমাদের গ্রামে নিয়ে চল। কিন্তু সকলেই ভাবতে লাগল, কী করে তারা অন্য গ্রামে যাবে। একদল বলল—নৌকা করে চল। আবার কেউ কেউ ভেলার ব্যবহার করতে বলল।

তারা সকলেই এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে ও নিজস্ব মতামত দিচ্ছে, কিন্তু ভগবানের উপর কেউ নির্ভব কবছে না।

একদল বলল—টেলিগ্রাফের তার ধরে ঝুলে ঝুলে যেতে পার, কিন্তু তাহলে কোনও জিনিস সঙ্গে নেওয়া চলবে না ও নিচের দিকেও তাকাতে পারবে না।

যে যেমন সুবিধা পেল সেই মতো পার হতে লাগল। কেউ কেউ নৌকার বা ভেলার সাহায্যে পার হতে লাগল, আবার কেউ বা টেলিগ্রাফের তার ধরে ঝুলে ঝুলে পার হতে লাগল। পার হবার সময় যখন নিচে বিরাট জলরাশি দেখল ভয়ে অনেকেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

সব শেষে একজন লোকই শুধু পার হতে পেরেছিল। সে সব ছেড়েছুড়ে শক্ত করে তার ধরে ঝুলতে ঝুলতে রওয়ানা হয়েছিল। তার দৃষ্টি ছিল শুধু সামনের তারের দিকে, আর কোনও দিকেই সে দৃষ্টিপাত করেনি। এই ভাবে অনেক কষ্টে সে পার হয়ে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পরপারে কী ভাবে যেতে হয় সেই শিক্ষাটিই পাওয়া যায় এই গল্পের মাধ্যমে। তোমার নিজের বলে যা-কিছু আছে, সে সব ছেড়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি না-রেখে অন্তরের দিকে দৃষ্টি রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

২১। ১১। ৭১

১৩৩

সকলের কাছে একমাত্র নির্দেশ হল, প্রতিটি জীবনই তাঁর প্রকাশ এবং প্রত্যেক জীবনের মধ্যে দিয়ে ভগবান তাঁর ইচ্ছা ও লীলা প্রকাশ করে নিজেই খেলছেন—এখানে কারও কোনও পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা নেই। যেখানে যে-ভাবেই জীবন চলুক যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় তবে সেই জীবনের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ হবে।

ঈশ্বরবোধে মানা গেলে যে কোনও কর্ম দ্বারা ভগবানের সেবা হয়। ঈশ্বরবোধে না-মানলে বড় কর্মেরও মূল্য নেই। অফিসে একজন director-এর কত বড় কাজ, কত দায়িত্ব, কিন্তু জমাদার যদি তার পায়খানা পরিষ্কার না-করে তবে director-বাবার প্রাণান্ত অবস্থা হয়।

এক সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদম্পতি যজমানি করত ও ভগবানের নামে জীবনযাপন করত। সেই গ্রামে একবার মহামারী লাগাতে বহু লোক মারা যায় এবং গ্রামের সব উজাড় হয়ে যায়। এরপর গ্রামে দুর্ভিক্ষ শুরু হল, খাবার নেই, সব যেন ছারখার হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরের নাম করতে করতে কতগুলি গ্রাম পেরিয়ে সেই ব্রাহ্মণদম্পতি একটি শহরে এসে পৌঁছাল। সারাদিন অভুক্ত থাকার ফলে তারা শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ল।

ব্রাহ্মণী তার স্বামীকে বলল—বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল দিয়ে আমাকে বাঁচাও। আমি আর পারছি না।

ব্রাহ্মণ বলল—কোথায় জল পাব, তা-ই ভাবছি। আজ তো নারায়ণকেও জল দেওয়া হয়নি।

ব্রাহ্মণী—আগে প্রাণটা তো বাঁচাও, তারপর বেঁচে থাকলে নারায়ণকে জল দেবে।

ব্রাহ্মণ জল খুঁজতে খুঁজতে এক গ্রামে এসে হাজির হল। সেই গ্রামে জমাদারদেরই বসতি ছিল শুধু। ব্রাহ্মণ এক জমাদারকে বলল—আমি অনাহারে আছি বহু দিন, আমাকে কিছু খাদ্য দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

জমাদার সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ জমাদারকে চিনতে পারেনি। জমাদার তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে তার উচ্ছিষ্ট অন্ন দিল, কারণ তার ঘরে অন্ন প্রস্তুত ছিল না। ব্রাহ্মণ প্রাণ বাঁচাবার জন্য অন্য কোনও উপায় না-দেখে বাধ্য হয়ে জমাদারের উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করল।

ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হলে জমাদার যখন তাকে জল দিতে গেল, তখন ব্রাহ্মণ চটে গেল। জমাদারের উচ্ছিষ্ট জল ব্রাহ্মণ হয়ে সে কী করে গ্রহণ করবে! ব্রাহ্মণ জমাদারকে জানাল যে, তার পক্ষে সেই জল গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

জমাদার তখন বলল—উচ্ছিষ্ট অন্ন যখন খেয়েছ তখন জাত যায়নি আর এখন জল খাবার বেলায় জাত যাবে তোমার? কেমন জাত তোমাদের? এ তোমাদের কেমন বিচার?

ব্রাহ্মণ বলল—তোমার উচ্ছিষ্ট জল ছাড়াও চলবে। জল হয়ত অন্য জায়গায় পাওয়া যাবে। অন্নটা খেলাম কারণ অন্ন তো আর কোথাও পাব না। অন্ন না-পেলে তো মরেই যেতাম।

এই কথা বলে ব্রাহ্মণ ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার খেয়াল হল যে, ব্রাহ্মণীর জন্য সে জল নেবে বলে এসেছিল, কিন্তু তার জন্য তো জল নেওয়া হল না।

ব্রাহ্মণ আবার জমাদারপাড়ায় এসে জমাদারকে বলল—আমার ব্রাহ্মণীর জন্য একটু জল দাও, সে জলের জন্য মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে।

জমাদার বলল—আমি তো জলটা খেয়ে ফেলেছি, তুমি ঘরে গিয়ে দেখ।

ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়ে দেখল মেথরানি খাওয়াদাওয়ার পরে জল খাচ্ছিল। মেথরানি তার গ্লাসের বাকি জলটা ব্রাহ্মণকে দিতে রাজি হল। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হয়ে সেই মেথরানির উচ্ছিষ্ট জলটাই ব্রাহ্মণীর জন্য নিয়ে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ জল নিয়ে গিয়ে দেখল ব্রাহ্মণী ইতিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। ব্রাহ্মণ দুঃখিত হয়ে ভাবল, জাতও খোয়ালাম ব্রাহ্মণীকেও হারালাম, এ আমি কী করলাম!

এদিকে ব্রাহ্মণীর সৎকার করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ খুব অসুবিধায় পড়ল। ডোমপাড়ায় যে জমাদারের ঘরে সে অন্নগ্রহণ করেছিল সেই জমাদার তখন সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ জমাদারের সাহায্য চাইল। জমাদার তখন আরও পাঁচজনকে ডেকে

কাঠ কেটে ব্রাহ্মণীর সৎকারের ব্যবস্থা করল। গ্রামবাসীদের মধ্যে সবাই ডোম ছিল, কারণ ওই পাড়াটা ডোমপাড়া ছিল। ব্রাহ্মণ তখন ভাবতে লাগল—শেষকালে এদের হাতে ব্রাহ্মণীর সৎকার করাতে হল, তাহলে সারাজীবন আমি ভগবানকে কী ডাকলাম!

তখন ব্রাহ্মণের জ্ঞান *ঠেলে* বেরোতে লাগল। ক্ষমতা নেই অথচ তার মানটুকু আছে।

জমাদার ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুর, এখনও দাঁত শক্ত আছে? আচ্ছা থাকুক, কে আসবে এই রাতে? তুমি যদি বল তবে আমরাই সৎকারের ব্যবস্থা করি, তুমি না-হয় মুখে আগুনটা দিও।

ব্রাহ্মণীর সৎকার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে জমাদার ব্রাহ্মণকে বলল—এতদিন তুমি কী ধর্ম করলে ঠাকুর? জগতে কোন বস্তুটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যা না-থাকলে কিছুই থাকে না? প্রাণকে অবহেলা কর কেন? প্রাণই সবচেয়ে প্রধান। প্রাণের কি কোনও জাত আছে? তোমরা কী ধর্ম কর? এখানে যদি ভাত না-খেতে তবে কি আজ তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারতে?

এই জমাদার সারাজীবন ময়লা ঘেঁটেও তার মুখ থেকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ বেরোল।

ব্রাহ্মণের প্রথম জীবনের একটি ঘটনা ছিল যেটা জমাদার জানত। ঘটনাটি হল—এক নমশূদ্র বিধবাকে মুসলমানেরা জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। সেই বিধবাকে তখন কেউ সমাজে স্থান দেয়নি। এই ব্রাহ্মণটিই তখন বিধবাকে মেবে ফেলবার বিধান দিয়েছিল এবং সেই রকমই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনা ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিয়ে জমাদার বলল—একটা প্রাণ বাঁচাতে পার না আর প্রাণকে নাশ কর কী করে? ঠাকুর, মনে পড়ে সেই ঘটনা। সেই বিধবা মহিলা সেদিন এক ফোঁটা জলের জন্য মরে গেল। আমি তো ভগবানের খেলা দেখছি এখন। আপনারা ভাবেন আপনাদের মধ্যেই ভগবান। আমাদের মধ্যে কি ভগবান নেই? আগে প্রাণ তার পরে সব নিয়মকানুন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আপদকালে কোনও ধর্ম নেই, শুধু প্রাণ বাঁচানই আমাদের ধর্ম। তাই আপদকালে কোনও নীতি নেই। প্রাণ চায় বাঁচতে।

একটু থেমে তিনি আরও বললেন—ধর্মে গোঁড়ামির স্থান নেই। যেখানে গোঁড়ামি সেখানে ধর্ম আবৃত।

৩০। ১১। ৭১

১৩৪

মনে করতে হয় যে, আমার কিছুই থাকবে না, সব ঈশ্বরের থাকবে। ঈশ্বরের থাকলে মানুষই পাবে, কারণ মানুষ তাঁর মধ্যেই আছে। বাবার সম্পত্তি বাবার কাছে থাকলে ছেলেই পাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি দোঁহা বললেন—

'পুরি গয়ি থোড়ি রহি
আভি থোড়ি যায়ে তাল ভঙ্গ না পায়ে।'

এই দোঁহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি গল্প বললেন।

এক রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। রাজা ভাল হলেও খুব কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও তিনি খরচ করতে রাজি ছিলেন না। পুত্র বড় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তাকে সিংহাসনে বসান না ও কন্যা বিবাহযোগ্যা হওয়া সত্ত্বেও কন্যার বিবাহ দেন না। এই কারণে পুত্র ও কন্যা দু'জনেই পিতার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। পুত্র মনে মনে ভাবল, পিতাকে হত্যা করে সে পালিয়ে যাবে। কন্যাও ভাবল, পিতাকে কিছু না-জানিয়ে মন্ত্রীর পুত্রকে বিবাহ করবে।

একবার এক নটনটী রাজার রাজসভায় নাচ-গান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল, কিন্তু রাজা সহজে রাজি হলেন না, কারণ তাতে তার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। অথচ রাজা নিজের সম্মানার্থে নটনটীকে ফিরিয়ে দিতেও পারলেন না। রাজপুরীতেই নটনটীর থাকার ব্যবস্থা হল। এই ভাবে এক মাস কেটে গেল, কিন্তু রাজা নাচ-গানের ব্যাপারে কোনও কথাই বলছেন না—এই ভেবে নটনটী ভারী বিরক্ত হল।

নটনটী মন্ত্রীকে এসে বলল—রাজা তো নাচ-গানের কোনও ব্যবস্থাই করছেন না। এবার তাহলে আমাদের বিদায় দিন।

তখন মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বলল—আপনার টাকা খরচ করতে হবে না, আপনি শুধু নাচ-গানের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিন। প্রজাদের কাছ থেকেই সব টাকাপয়সা উঠে যাবে। তবে ওখানে আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, নয়ত দুর্নাম হবে।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা সম্মতি দিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে নাচ-গানের ব্যবস্থা হল। রাতভোর নাচ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনও পয়সা দেয় না—রাজাও দেয় না, প্রজারাও কেউ কিছু দেয় না। নট ঢোলক বাজিয়ে যাচ্ছে, নটীও নেচে যাচ্ছে। এদিকে বাত ভোর হয়ে গেল। নটী নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং কোমর ব্যথাও হতে লাগল। নটী নাচতে নাচতে নটকে ইঙ্গিতে গানের সুরে বলল যে, সে আর নাচতে পারছে না। তা দেখে নটও তাকে জবাব দিল—'পুরি গয়ি থোড়ি রহি। আভি থোড়ি যায়ে তাল ভঙ্গ না পায়ে।'

এক সাধু ওই রাজ্যে থাকতেন। সেই সাধুও নাচ-গানের আসরে উপস্থিত ছিলেন। সাধু তার কম্বলখানা নটনটীকে দিয়ে দিলেন। সাধুর এই আচরণ দেখে রাজপুত্রও তার দামি পোশাক নটনটীকে দিয়ে দিল। সেই দেখে রাজকন্যাও তার কণ্ঠের হার খুলে নটীকে দিয়ে দিল। রাজা এই সব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রাজাও আপন মান বাঁচানোর জন্য নটনটীকে সামান্য কিছু দিতে বাধ্য হলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে রাজা সাধুকে ডেকে বললেন—তোমার একমাত্র সম্বল এই কম্বল তুমি কেন দিয়ে দিলে?

সাধু বললেন—আমি বহুদিন যাবৎ সাধনভজন করেছি, কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। আমি ভাবছিলাম যে, ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু নটের এই উক্তিতে আমার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল যে, বেশির ভাগ সময়ই তো কেটে গিয়েছে আর অল্প সময়ের জন্য অধৈর্য

হলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। নটের এই কথায় আমি সম্বিৎ ফিবে পেয়েছি, তাই আমি গুরুদক্ষিণা হিসেবে গায়ের কম্বলখানা নটীকে দিয়েছি।

রাজা এবার রাজপুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তোমার মূল্যবান পোশাকটা কী ভেবে নটনটীকে দান করলে?

রাজপুত্র বলল—তুমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সিংহাসনে বসাওনি। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে হত্যা কবে রাজত্ব নেব। কিন্তু ওই নটের উক্তি দ্বারা আমি জ্ঞান লাভ করলাম যে, সময় তো শেষ হয়ে গিয়েছে, অল্প সময়ের জন্য অধৈর্য হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। এই শিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধে আমি আমার এই পোশাক নটনটীকে দিয়েছি।

এরপর রাজা রাজকন্যাকে ডেকে একই প্রশ্ন করলেন। বাজকন্যা বলল—বড় লজ্জার কথা, স্বীকার করতেও লজ্জা করছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা যখন করলে তখন তো বলতেই হবে। তুমি আমার বিবাহ দিচ্ছিলে না দেখে আমি মনে মনে স্থির কবেছিলাম লুকিয়ে মন্ত্রীর পুত্রকে বিবাহ করে তোমাকে হত্যা করে পালিয়ে যাব। কিন্তু নটের ওই উক্তিতে আমার শুভবুদ্ধি জাগল যে, দিন তো শেষ হয়েই এসেছে, শেষ মুহূর্তে অধৈর্য হয়ে উঠে লাভ নেই বরং তাতে মুস্কিল হবে। এই মূল্যবান শিক্ষাব জন্যই আমি দক্ষিণাস্বরূপ আমার কণ্ঠের হারটি নটীকে দিয়েছি।

রাজা পবের দিনই নটনটীকে ডেকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন।

নটীকে নট বলল—দেখ, তাল ভঙ্গ যদি করে ফেলতে তাহলে কিন্তু এত সব মূল্যবান জিনিস পাওয়া যেত না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—End should be best, শুধু starting best হলেই হয় না। প্রথমে আরাম পরে ব্যারাম—এই হল রাজসিক সুখ। তামসিক সুখ হল আগে সুখভোগ। তার ফলে মানুষ ভ্রান্তি, ভীতি, শোক, মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে না। সাত্ত্বিক সুখ হল, প্রথমেই কষ্ট কিন্তু পরিণামে সুখ। এটা কেউ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। অল্প একটুর জন্য মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, ভাবে কিছুই হল না, জীবন তো গেল। কষ্ট করলে পরিণামে সুখ আসবেই, কেউ ঠেকাতে পারে না।

সংসারে যে কোনও লোকের কাছ থেকে সামান্য একটি কথাতেও মানুষের চৈতন্য হতে পারে। ধোপার মেয়ের কাছে "বেলা গেল, বাসনায় আগুন দিতে হবে"—এই কথা শুনে লালাবাবুর চৈতন্য হল যে, জীবন তো শেষ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি লালাবাবু সব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হলেন। প্রত্যেক কথার তিন রকম অর্থ আছে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি যে কোনও কথার সাত্ত্বিক অর্থই নেয়, তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তি বিপরীত অর্থ নেয়।

বারবার সৎপ্রসঙ্গ শুনতে হয়। কোন্ কথা যে কখন কার মনে লেগে যাবে তা প্রথমে বোঝা যায় না।

১৯। ১২। ৭১

১৩৫

এক-এর স্থান, প্রীতিকর স্থান হল কেন্দ্রসত্তা হৃদয়। বাইরে ইন্দ্রিয়-মনের কিছুক্ষণ ব্যবহার হয়, কিন্তু বিশ্রামের স্থান হল হৃদয়। আবার বাইরে আসে খেলবার জন্য, বাইরেটা সেই জন্য বাদ দিলে চলে না। তাই চতুর্বর্গ সাধনার অর্থাৎ চৈতন্যের বিজ্ঞান দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও কেন্দ্রে যে বিশুদ্ধ চৈতন্য সব নিয়ে হয়। দেহ ছাড়া চৈতন্য, চৈতন্য ছাড়া দেহ ভাবাও যায় না। ভগবানকে কামময়পুরুষ বলা হয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন।

এক পাগল ভগবানকে বলেছিল—তোমার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন ছিল? এ সব না-হলে কি তোমার চলত না? একটা বানালেই তো হত।

নারদও ভগবানকে একই কথা বলেছিলেন। নারদের প্রশ্নের উত্তরে সেই মুহূর্তে ভগবান কোনও উত্তর দিলেন না। ভগবান নারদকে নিয়ে তাঁর এক ভক্তের বাড়িতে গেলেন। ভক্ত ভগবানের জন্য নানা রকম ব্যঞ্জনাদি বানিয়ে তাঁকে আহারে বসিয়েছে। নারদ তো ভগবানের প্রসাদ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করবেন না। কাজেই ভগবান যখন আহারে বসেছেন, নারদ তখন অপেক্ষা করে বসে রইলেন।

ভগবান সুস্বাদু সব ভাল ভাল খাবারগুলি গম্ভীর ভাবে খেলেন। আহারান্তে তিনি সব পদ বাদ দিয়ে একটিমাত্র পদ নারদকে দিলেন। নারদ খেতে বসে একটিমাত্র পদ দেখে দুঃখিত হলেন, কারণ তিনি আশা করেছিলেন ভাল ভাল প্রসাদ পাবেন।

নারদ ভগবানকে বললেন—প্রভু, এই একটিমাত্র পদ আমায় কেন দিলেন?

ভগবান বললেন—কেন, তুমিই তো বলেছিলে যে, একটা সৃষ্টি করলেই তো হয়, বহু বানাবার কী প্রয়োজন ছিল। বহুত্বের প্রয়োজন হয়—এটা বোঝা যাবে যদি বেশ কিছুদিন একই রকম খাবার খেতে থাকা যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—একঘেয়েমিটা কারওরই ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির প্রিয়-অপ্রিয়বোধ সবই ভিন্ন ভিন্ন রকম। খেটেখুটে বাড়ি ফেরার পর গিন্নি যদি বলে এটা প্রয়োজন ওটা প্রয়োজন, কিনে নিয়ে এস, তাহলে অনেকেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, কারণ দেহ খুব ক্লান্ত থাকে। অথচ মন বলে—এটা-ওটার প্রয়োজন সত্যিই আছে, কিন্তু দেহ তখন আর চলছে না। প্রাণ চাইছে একটি জিনিস করতে, মন আবার তাতে সায় দিচ্ছে না। কোনও কাজ করতে করতে দেহের একটি part allow করে, অথচ আরেকটি part allow করে না। জীবনে অনুভূতির বেলায়ও ঠিক একই রকম।

বই পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু কার্যকরী করতে গেলে দেখা যায় দেহ, মন, প্রাণের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। কাজেই সবই tune করে নিতে হবে। সমতার বা এক-এর ঘরে কোনও সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির জন্য মূল সত্তার সঙ্গে গুণভাবের মিশ্রণ দরকার হয়। মূল সত্তাই হল চিৎসত্তা বোধসত্তা প্রজ্ঞান। তার সঙ্গে তিন গুণ বা ভাব যুক্ত হয়ে বৈচিত্র্যরূপে প্রকাশ পায়। স্ববোধের বক্ষে স্বভাবের বিলাসই হল জীবলীলা। স্বভাবশূন্য

স্ববোধ নিত্য নির্গুণ অখণ্ড পূর্ণ। স্ববোধ নিত্য নির্বিকার নিরাকার, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। তার বক্ষে স্বভাবের বিলাস হয় নানা ভঙ্গিমায় সগুণযোগে। আবার বিলাস অন্তে স্বভাব স্ববোধে মিশে যায়। উভয়ের মধ্যে এক প্রজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবের দৃষ্টিতে স্ববোধকে পূর্ণরূপে জানা যায় না, কিন্তু স্ববোধের দৃষ্টিতে সব কিছু পূর্ণ আপনবোধে অনুভূত হয়। এই পূর্ণ একবোধকে বা আপনবোধকে সমবোধ বলা হয়। একবোধের বা সমবোধের অভাবে সব কিছুর সমাধান পাওয়া যায় না।

২৬। ১২। ৭১

১৩৬

অভ্যাসের দ্বারা সব কিছু সম্ভব হয়—এই প্রসঙ্গকে সুবোধ্য কবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ছোট গল্প বললেন।

এক ভদ্রলোকের কর্কশ গলা ছিল, কিন্তু গান গাইবার বেজায় সখ। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে সে গলা সাধত। তার কর্কশ গলার চিৎকার শুনে শুনে পাড়ার লোক অস্থির হয়ে যেত। পাড়ার কেউ তাকে দেখতেও পারত না। অবশেষে কুড়ি/বাইশ বছর পরে সে ভাল গায়ক হয়েছিল। তিন/চার বছর গলা সাধার পরে, যে-সব লোক তাকে দেখতে পারত না, তারাই আবার তাকে কোনও কোনও আনন্দ উৎসবের সময় গাইবার জন্য ধরে নিয়ে যেত।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অভ্যাস যে মানুষকে তার জীবনলক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং তার পবমসিদ্ধির কারণ হয়, তা অনেকেব মধ্যেই দেখা যায়। আলোচ্য প্রসঙ্গটি তারই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

৩। ১। ৭২

১৩৭

ভক্ত বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আজ একটি গল্প বললেন।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাচ্ছিলেন—ঝোপঝাড়, কাঁটাবন কোনও দিকেই কোনও হুঁশ নেই। ভক্তের আকুতি দেখে শ্রীকৃষ্ণ বালকবেশে বিল্বমঙ্গলের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হাত ধরার একটু পরেই বিল্বমঙ্গল বুঝতে পারলেন যে, তার ইষ্টদেবই এসে হাত ধরেছেন। বৃন্দাবনের কাছাকাছি এসে ইষ্টদেবকে চিনতে পেরে যেই মুহূর্তে বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত এগিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণ হাত ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বিল্বমঙ্গল তখন বললেন—তুমি হাত ছাড়িয়ে চলে গেলে সত্য, কিন্তু যাও দেখি আমার মনের বাইরে, দেখি কেমন করে তুমি তা পার। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—বিল্বমঙ্গলের মতো আত্মসমর্পণ না-করলে হবে না। ভগবান বাইরে চোখের আড়ালে যেতে পারেন, কিন্তু মনের আড়ালে কী করে যাবেন? মন তো বোধসত্তার বুকে ওঠে, ভাসে ও খেলে বেড়ায়।

মনের মূলেই তো বোধ। বোধের ঘরেই তো ইষ্টের বাস, অর্থাৎ বোধস্বরূপই হল ঈশ্বর-আত্মা-ভগবান।

এই বোধস্বরূপই জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে আত্মা, ভক্তের কাছে ভগবান ও কর্মীর কাছে গুরু। এক বোধস্বরূপেরই অভিনব পরিচয় জীবনের মধ্যে অনুভূত হয় কত ভাবে। এ সবই তাঁর আপন পরিচয়, শুধু স্বানুভূতির মাধ্যমেই অনুভূত হয়, আন্দাজ ও অনুমানের মাধ্যমে নয়। বিষয়ভোগের সঙ্গে যুক্ত থেকে মন হয় অশুদ্ধ, চঞ্চল ও বিকৃত। অশুদ্ধ, অশান্ত ও চঞ্চল মনে শুদ্ধবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার কাছে ঈশ্বর-আত্মা অজ্ঞাত। শুদ্ধ চিত্তের কাছেই ঈশ্বর-আত্মা প্রত্যক্ষ ও অনুভূতির গোচর হয়। সবই তাঁর মহিমার অন্তর্ভুক্ত। যার হৃদয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন তার হৃদয়েই নিজের স্বরূপকে তিনি ব্যক্ত করেন। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত ও কর্মীর মুখোশ পরে নিজের দিব্যস্বরূপকে প্রকাশ করে স্বমহিমা নিজেই আস্বাদন ও অনুভব করেন। এই পরম সত্যবোধের যথার্থ অধিকারীরূপেও তিনি স্বয়ং, আবার সাধারণ মানুষরূপেও তিনি স্বয়ং। তাদের হৃদয়ে তিনি নিত্যবিদ্যমান থেকেও স্বেচ্ছায় অনুভবগম্য হন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি স্বয়ং ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, আবার অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত। নির্গুণগুণী তিনি স্বয়ং, অস্তি-নাস্তি বিভূতি তাঁর, তাঁর মধ্যে তিনিই আছেন, তদতিরিক্ত কেউ নেই।

৪। ১। ৭২

১৩৮

পশুদের মধ্যেও প্রেম দেখা যায়। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ছোট গল্প উল্লেখ করলেন।

একটি ষাঁড় লাল শাড়ি পরা মহিলাকে দেখে এমন ভয় পেয়েছিল যে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছিল। চার দিকের লোকজনও সব ভয় পেয়ে যে যেখানে পারছিল ছুটে পালাচ্ছিল। সেই সময় এক মা তার শিশুপুত্রকে হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল। ভয় পেয়ে মা ও সন্তানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—মা এক দিকে আর শিশুপুত্র আরেক দিকে এবং ষাঁড় মাঝখানে। মা ষাঁড়টিকে ডিঙিয়ে শিশুপুত্রের কাছে ভয়ে যেতে পারছিল না। শিশুটিও ভয়ে চিৎকার করে কাঁদছিল। ষাঁড়টি শিশুর কাছে এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর শিশুটিকে কয়েকবার শুঁকে কিছু ক্ষতি না-করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এত হিংস্র হয়েও ষাঁড়টি কিন্তু শিশুকে মারল না। অথচ দেখা যায় মানুষ এত উন্নত হয়েও শিশুকে মারতে দ্বিধা করে না। মানুষ হলেই যে তার সমস্ত বৃত্তিগুলি পশুবৃত্তির চেয়ে সর্বদাই শ্রেষ্ঠতর হবে এমন নয়। কুকুরের মধ্যে যে রকম প্রভুভক্তি দেখা যায়, সে রকম মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

হিংস্র জন্তুজানোয়ার, যথা—বাঘ, সিংহ প্রভৃতি তাদের সন্তানদের সঙ্গে কী রকম আনন্দে খেলা করে, তাদের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখে—এ সব দেখে বোঝা যায় সর্বপ্রাণীর মধ্যেই প্রেমের প্রকাশ বিশেষ ভাবে হয়ে থাকে।

৫। ১। ৭২

১৩৯

প্রত্যেকের অন্তরে একমাত্র তিনিই বিরাজমান, বুদ্ধিদোষে ভেদদর্শন হয়।

মানুষকে বাইরে থেকে মালিক বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সে মালিক নয়। মালিক ভিতরে বসে আছেন। তাঁকে বাইরে থেকে দেখা যায় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সার্কাস পার্টি বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র পশু নিয়ে খেলা দেখাত। কিছুদিন পরে বাঘ এবং আরও কয়েকটি পশু মরে গেল। বাঘটির জায়গায় নূতন বাঘ replace করা হল। নূতন বাঘকেও অন্যান্য জানোয়ারদের সঙ্গে training দেওয়া হল।

বাঘের সঙ্গে ভালুকের খেলা দেখাতে যাবার সময় ভালুক ও বাঘকে খাঁচা থেকে যখন ছেড়ে দেওয়া হল—ভালুকও কাঁপছে, বাঘও কাঁপছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখে প্রথমে ভয়ে যেন কেঁপে উঠল। তারপর একটু পরে ভালুকটি বাঘের কাছে এসে চুপিচুপি বলল—তোর ভয়ের কোনও কারণ নেই, আমিও মানুষ। যে বাঘ হয়েছে সে জানে না যে, ভালুকের মুখোশ পরে মানুষই খেলতে এসেছে। কাজেই ভালুকটিকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

পরে যখন দু'জন দু'জনের পরিচয় জানতে পারল তখন খেলা জমে উঠল। একবার বাঘ ভালুকের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আবার ভালুক বাঘের গায়ে লাফিয়ে পড়ে।

তারপর তারা দু'জনে ভাবল, অন্যান্য যে-সব জানোয়ার আছে তারাও মানুষই হবে। এটা পরীক্ষা করার জন্য লাঠি নিয়ে সিংহের খাঁচার কাছে গিয়ে তারা সিংহকে খোঁচাতে লাগল। খোঁচা খেতে খেতে হঠাৎ সিংহের খাঁচা থেকে একসময় মানুষের মতোই যেন আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তখন তারা বুঝতে পারল সার্কাস পার্টির জানোয়ারগুলি মুখোশের আড়ালে প্রায় সবই মানুষ।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—আত্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, তত্ত্ববোধের দৃষ্টিতে জানা যায় সৃষ্ট জীবজগতে সবার মধ্যে এক চৈতন্যই আছে ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপের মুখোশ পরে। নাম-রূপ হল বহিঃপ্রকৃতি। আত্মলীলায় জীবের পোশাকের আড়ালে চৈতন্য আবৃত থাকে। সেই জন্য বাইরের থেকে যথার্থ ভাবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা জানা যায় না।

৯। ১। ৭২

১৪০

বোধের খেলা ও তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক ভক্ত ভোগরাগ দিয়ে ভগবানকে পূজা করল, পরের মুহূর্তেই আরেকজনকে লাথি মারল। ভগবান তখন ভক্তকে বললেন—তুমি যে আমাকে এত নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করলে, কিন্তু আমি তো তা খেতে পারছি না, কারণ তুমি বাইরে বেরিয়ে যাকে লাথি মারলে তার মধ্যেও আমিই আছি।

তখন ভক্ত বলল—পূজাও দিয়েছ তুমি এবং লাথিও আমার মধ্যে বসে তুমিই দিয়েছ ঠাকুর।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবানের স্বরূপ এই ভক্তের কাছে ঠিক ঠিক ভাবে ধরা পড়েছে। যেখানে জিতল সেখানেও তিনি, যেখানে হারল সেখানেও তিনি। এই ভাবে নিজেই balance-এ এসে গেল। তাঁর অঙ্গ, ক্রিয়া, নাম সবই তো বোধের। এই হল বোধের খেলা। বোধের খেলায় সবই বোধের ব্যাপার—তা জানা হয়ে গেলে খেলা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তা জানা সবার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। বোধস্বরূপের ইচ্ছাতেই সব হয়।

১২। ১। ৭২

১৪১

'তুমিবোধ' নিয়ে জীবনে অগ্রসর হও, তোমার লীলার আস্বাদন করবে তুমি নিজেই।

ঈশ্বরের লীলার তাৎপর্য প্রসঙ্গে আজ একটি কাহিনি বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

নারদ কৃষ্ণকে বললেন—লীলার তাৎপর্য আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও। কৃষ্ণ নারদকে এক স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে বন্য এক জাতি পাখি শিকার করে আনন্দে খাবার আয়োজন করছে। গাছের গোড়াতে মাটি দিয়ে উঁচু ঢিবির মতো করে চার দিকে তারা নৃত্য করছে। তারা খাবারটা ঢিবির উপরেই রেখেছে।

উঁচু ঢিবি প্রসঙ্গে নারদ প্রশ্ন করাতে, তার উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—ওটা আনন্দের কেন্দ্র, যাকে ধরে বা অবলম্বন করে আনন্দ করবে, সেই জিনিস।

এরপর কৃষ্ণ নারদকে আরেক স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে নারদ দেখতে পেলেন এক বন্য জাতি মাংস ঝলসে খাবার জোগাড় করছে এবং আনন্দে নৃত্য করছে।

নারদকে কৃষ্ণ আরেক স্থানে নিয়ে গেলেন। এক পাহাড়ের গায়ে একজন লোক কী যেন লিখে দিচ্ছে—আর সবাই হাত জোড় করে আনন্দ করছে এবং নমস্কার করছে।

কারণটা হল আনন্দ। আনন্দের উপকরণ, অবলম্বন, পদ্ধতি, আয়োজন ও তার ব্যবস্থা চাই। তা না-হলে আনন্দ হয় না।

নারদ এক পাহাড়ের গহ্বরে একজনকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। অন্য আরেক স্থানে দেখলেন কয়েকজন বসে বেদ পাঠ করছেন।

কেউ অন্তরের উপকরণ নেয়, কেউ বাইরের উপকরণ নেয়। লীলায় বাইরের দিক ও অন্তরের দিক দু'টিই আছে, যথা—বহিঃলীলা ও অন্তরলীলা।

শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বললেন—নারদ, তুমি ঘাবড়িও না, অপরে যখন তোমাকে দেখবে তারাও তো দেখবে যে তুমি লীলা করে চলেছ। তুমি তো বিশ্বভুবনে আমার নামকীর্তন করে বেড়াচ্ছ—এটাও তো লীলারই অঙ্গ। তোমার ভিতরে বসে আমিই তো নাম করে চলেছি।

এই ভাবে অনুরাগ সৃষ্টি করে ঈশ্বর নিজেকে নিয়ে নিজে খেলে চলেছেন। কত রকম খেলার রূপ তা তিনি নারদকে দেখাতে লাগলেন। প্রথমে তাঁকে নরকে নিয়ে গেলেন। তার

পরে সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে গিয়ে দেহ তৈরি কী ভাবে হয় প্রকৃতির অন্তরে, তা দেখালেন। তারপর এক অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থানে গেলেন। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন department-এ গেলেন।

এর পরে নারদকে মাতৃগর্ভে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে কৃষ্ণ নিজেও গেলেন। দু'জনেই মাতৃগর্ভে গিয়ে একসঙ্গে যমজ ভাই হয়ে বড় হতে লাগলেন। সর্বব্যাপক যিনি তাঁর বোধ আবৃত হয়নি, কিন্তু নারদের বোধ আবৃত হয়েছিল তখন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এ-ই হল সর্বোত্তম বিজ্ঞান। তিনি সমস্ত বিজ্ঞানের সার নিয়ে মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বীজ দেন। এই তত্ত্বকেই তিনি গীতায় এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন—"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌।"

প্রত্যেকের মধ্যে চৈতন্যসত্তা ও শক্তি রূপে আমিই আছি। এই আমিতত্ত্বের বিজ্ঞান ও অনুভূতি হল ঈশ্বরীয় বিদ্যার সর্বোত্তম পরিচয়।

১২। ১। ৭২

১৪২

সমর্পণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আজ একটি গল্প বললেন।

ঈশ্বরের নামে যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বক্ষণ থাকে না। তাই বারবার প্রার্থনা করতে হয়—তুমি স্বপ্রকাশ হয়ে নিবন্তর অন্তরেব মধ্যে জাগ্রত হয়ে থাক। আমার শক্তিসামর্থ্য নেই। আমি তোমাকে স্মরণ করতেও ভুলে যাই। তুমি কৃপা করে নিজেই স্বমহিমায় প্রকাশ হও। আমার দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি সবই তোমার। তুমি এসে তোমার জিনিস গ্রহণ কর, নয়ত আমাব দেবার সাধ্যও নেই। এই ভাবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কবতে হয়। একেই বলে সমর্পণ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এক গুরু শিষ্যের বাড়িতে গিয়েছেন। শিষ্য সাধ্য মতো তাঁর সেবাযত্ন করে। সেখানে নানা উপচার নিয়ে অনেক শিষ্যভক্তও আসে। একজন লোক দূর থেকেই তাঁকে দেখে এবং চুপ করে বসে থাকে, কাছে আসতে সাহস পায় না। লোকটি খুবই গরিব। সে গুরুর সেবার জন্য কিছু দিতে পারে না, কাজেই দূর থেকে শুধু নিঃশব্দে প্রণাম করেই চলে যায়।

একদিন দূরে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, অন্যান্য শিষ্যদের মতো সেও যদি গুরুর কাছে গিয়ে একটু সেবা করতে পারত তবে কী ভালই যে হত! কিন্তু সুযোগ আর আসে না। তারপর হঠাৎ একদিন গুরুদেবের চোখ পড়ল লোকটির উপর। তিনি তাকে কাছে ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বললেন। তখন গরিব লোকটি তার মনের বাসনা ব্যক্ত করে বলল, গুরুজি যদি তার কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেন তবে তা খুবই ভাগ্যের কথা হবে। গুরুজি তাতে রাজি হলেন।

একদিন অন্যান্য শিষ্যের বাড়িতে ঘুরে আসবার পথে তিনি সেই গরিব লোকটির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গরিব লোকটি তাঁর চরণ ধুয়ে খুব শ্রদ্ধা সহকারে বসতে দিল। পরে গুরুদেবের পোঁটলাপুঁটলি খুলে সেখান থেকে ময়দা, ঘি, তরিতরকারি নিয়ে লুচি ভেজে এবং আরও কয়েক রকম ব্যঞ্জন রান্না করে তাঁকে পরিবেষণ করল।

এত সুন্দর আয়োজন দেখে গুরুদেব খুশি হয়ে বললেন—তুমি নিজে এত গরিব, তোমার নিজেরই খাওয়া জোটেনা যেখানে, এত আয়োজন করতে গেলে কেন? গরিব লোকটি বলল—আমার তো কিছুই নেই, সবই তো আপনার। আপনার জিনিস দিয়েই আপনার জন্য এই সামান্য আয়োজনটুকু করেছি।

ভক্তের এই বিনীত ব্যবহারে গুরু অত্যন্ত খুশি হলেন। আহারে বসেও বারবার বলতে লাগলেন যে, আহারের এত প্রাচুর্য না-করলেই হত। এত কষ্ট করার কী প্রয়োজন ছিল ইত্যাদি।

গরিব ভক্তটিও বিনীত ভাবে হাত জোড় করে বলল—আমার তো কিছুই নেই, সবই তো আপনার। আমার বলতে শুধু এই হাত দু'খানি। আপনার জিনিস দিয়েই আপনার সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গুরু তার বিনয়নম্র বচনে আরও খুশি হলেন। তিনি ভাবলেন, আরও কত ধনী শিষ্য আছে, কিন্তু এত নম্র ও বিনীত তো কেউ নয়। তিনি গরিব লোকটিকে বারবার মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

আহারের পরে বিশ্রামান্তে তিনি যখন গৃহে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তখন পোঁটলাটি নিতে গিয়ে দেখেন পোঁটলা শূন্য। শিষ্যদের বাড়ি থেকে যে-সব ভেট ও প্রণামী পেয়েছিলেন সবই খরচ করে ফেলেছে লোকটি। গুরু তখন রেগে আগুন হলেন। তিনি লোকটিকে বললেন—তুমি এ কী করেছ? কেন তুমি সব জিনিস নিয়েছ এখান থেকে? শিষ্য—আমি তো বারবারই বলেছি যে, আমার বলতে কিছুই নেই, আপনার জিনিস দিয়েই আপনার সেবা করেছি। গুরু কিন্তু কিছুতেই শান্ত হলেন না। তিনি রেগে গিয়ে লোকটিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে অভিশাপ দিতে লাগলেন।

গুরুর অন্যান্য শিষ্যভক্ত যারা উপস্থিত ছিল সেখানে, ভয়ে তারাও কেউ কিছু প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। কিন্তু সেখানে এক নাস্তিক পণ্ডিত উপস্থিত ছিল। সে গুরুর কথার প্রতিবাদ করে বলল—তুমি এ কী রকম ব্যবহার করছ? একটু আগেই এত আশীর্বাদ করলে, আবার এই মুহূর্তেই এ রকম ভাবে অভিশাপ দিচ্ছ। তুমি কী রকম গুরুদেব? তোমাকে তো লোকটি গোড়া থেকেই বারবার বলছে যে, তার কিছু নেই, তোমার জিনিস দিয়েই সে তোমার সেবা করছে।

ভক্তটি এবার কেঁদে ফেলল। সে গুরুকে বলল—আমার যে কিছুই নেই সে তো আপনি নিজেই জানেন। আর আমি গরিব জেনেও আপনি তবে গুরু হলেন কেন?

তখন গুরু তার পূর্বের আচরণগুলি একে একে স্মরণ করতে লাগলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুব অনুতপ্ত হলেন। শিষ্যের কথা শুনে সত্য সম্বন্ধে তাঁর হুঁশ হল। তিনি শিষ্যের চরণে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন এই বলে যে, যথার্থ গুরু না-হওয়া পর্যন্ত তিনি আর ফিরবেন না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পটির মধ্যে দেখা গেল যে, শিষ্যটি গরিব এবং তার কাজ গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও সে মিথ্যা কথা একবারও বলেনি।

জাগতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে দোষ দেখা যায় সত্য, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে শিষ্যের কোনও দোষ নেই।

শিষ্যের জন্য গুরুরও চৈতন্য হল। শিষ্যই গুরুকে সত্য আচরণ করে বৈরাগ্যের শিক্ষা দিল। পয়সাওয়ালা ধনী শিষ্য অনেক আছে, কিন্তু তারা তো এ রকম সত্য আচরণ করতে পারে না। দরিদ্র বলে শিষ্যকে অভিশাপ দেওয়াতে খুব অনুতপ্ত হয়েছিলেন গুরুদেব। সেই জন্য দানধ্যান করে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ভুলে গিয়ে সমবোধে সবাইকে আসতে হবে।

তাঁর জিনিস দিয়েই তাঁর পূজা করতে হয়। বাহ্যিক পূজা না-করতে পারলেও অন্তরে তাঁর চিন্তা করতে হয়। রান্না করার সময়, ঘর ঝাঁট দেবার সময় ভাবতে হয়, গুরু তোমার জন্যই এই সকল আয়োজন। ঠাকুরঘরে বসে পূজা করার সময় না-পেলেও এইরূপ ভাবনাতে ধ্যানের ফল পাওয়া যায়। শ্রীনাম যখন যেখানে হয় জানবে সেই স্থান পবিত্র হয়ে গিয়েছে। অফিসে, বাড়িতে, রাস্তাঘাটে, চলার পথে, কাজকর্মে তাঁর কথা ভাবলে সর্বত্র গুরুর রূপই ভেসে ওঠে। স্মরণ ও ধ্যানে একই ফল পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, এ জীবনে যা-কিছু আছে সবই তাঁর জন্য। গুরু দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণ দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। ভাবতে হয়, গুরু আমার অন্তরে-বাইরে সর্বদা বিরাজিত। সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুর অভিব্যক্তি হল আমার জীবন এবং আমার পূর্ণরূপ হল তাঁর জীবন। তা সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

১৭। ১। ৭২

১৪৩

নামের আকর্ষণ দুর্বার। তাই নামের সাধকদের দেখা যায় বাইরে যত বিপদই হোক না কেন, মন বাইরের দিকে কিছুতেই যায় না। মন কখনও তাঁদের চঞ্চল হয় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মহাপ্রভুর জীবনের একটি গল্প উল্লেখ করলেন।

চৈতন্যদেবের ভাবটা কেউ বিশেষ পছন্দ করত না। সেই জন্য শ্রীবাসের বাড়িতে গোপনে কীর্তন হত। একদিন শ্রীবাসের পুত্র গুরুতর অসুস্থ হয়েছিল। শ্রীবাসের আঙিনায় নামকীর্তন হচ্ছিল। যখন নামকীর্তন হচ্ছিল তখন শ্রীবাসের পুত্র দেহরক্ষা করল, কিন্তু সকলে নামে এত বিভোর ছিল যে, সেই কথা কেউ জানতেও পারেনি। শ্রীবাস সেই সময় মহাপ্রভুর সঙ্গে নাম করে যাচ্ছিল।

এমন সময় একজন শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর খবরটা মহাপ্রভুর কাছে শুনিয়ে যায়। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জড়িয়ে ধরলেন ও নামের কাছেই নিবেদন করে বললেন—নাম তোমার প্রিয় সন্তানকে তুমি দেখ। যে তোমায় ডাকছে সে তোমার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখবে।

শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু দেখতে এলেন এবং তার মাথায় হাত রেখে তিনি কিছু উচ্চারণ করলেন। তার ফলে শ্রীবাসের মৃত পুত্রের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং মহাপ্রভুর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁর কাছে তার আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করে বালক পুনরায় দেহত্যাগ করে। তখন তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আজকালকার লোক এ সব বিশ্বাস করতে চাইবে না। যেখানে সংশয়ের উৎপত্তি হয় সেখানে সত্য আবৃত হয়ে যায়। আমরা নামকে ভালবেসে বেশিক্ষণ রাখতে পারছি না।

নামের মাহাত্ম্য নামভক্তের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। নাম ও নামী যে অভিন্ন, তা জানা যায় নামভক্তের সঙ্গে নামের অভ্যাস করলে। শ্রীনামের জোরে ভবসাগর তরে গেল কত মহাজন। গোলাম হয়ে মন সংসারে থেকে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। নামের ভেলায় চড়ে সে অনায়াসে পার হতে পারে ভবসাগর। সাধুর কাছে শ্রীনাম হল অমৃত মধুর দিব্য সম্পদ। এই ধনে ধনী তিনি। সংসারের অন্য ধন সবই তাঁর কাছে অসার। যে টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তির ধনে ধনী সে দুঃখী। তার দুশ্চিন্তাভরা চিত্ত ধনক্ষয়ে ভীত। অপরপক্ষে শ্রীনামে সদাযুক্ত চিত্ত দিব্যানন্দে নির্ভয়ে নির্ভাবনায় দিন কাটায়। ধন্য ও কৃতকৃত্য সে।

২৬।১। ৭২

১৪৪

মায়া দ্বারা সৃষ্ট মানুষ মায়াধীন। মায়াপতি স্রষ্টা ঈশ্বর সৃষ্টির প্রভু ও নিয়ন্তা। ঈশ্বর সবার মধ্যেই বর্তমান, তাঁর শক্তি সবার মধ্যেই খেলে চলেছে। মানুষ ঈশ্বরীয় ভাবটা দেখতে বা বুঝতে পারে না, কারণ তারা সত্যি সত্যি ঈশ্বরকে চায় না। তারা মনকে বহির্জগতের বিষয়বস্তুর দিকে ব্যবহার করতে চায় বেশি। কাজেই মন কিছুটা অন্তর্মুখী হয়ে যাবার পরেও বাইরের আকর্ষণে আবার যখন বহির্মুখী হয় তখন তাকে মায়া বলে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

প্রসঙ্গকে সুবোধ্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সাধুর কাছে একজন এই রকম মায়ার দোহাই দিয়ে অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল। সাধু চুপচাপ শুধু শুনেই যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটি গাছ দেখিয়ে সেই ভক্তকে বললেন—গাছের থেকে কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে এস তো। দেখবে যেন ফল মাটিতে না-পড়ে যায়।

ভক্ত কৃপা পাবার জন্য গাছে উঠে গেল। সে কয়েকটা ফল সংগ্রহ করল। ইতিমধ্যে সাধু মইটা সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ভক্ত গাছ থেকে নামতে না-পেরে সাধুর কাছে বারবার মইটা চাইল। সাধুও কিছুতেই মইটা দিলেন না। তিনি বললেন—মইটা দেওয়া সত্ত্বেও গাছে উঠবার সময় তা ব্যবহার করলে না, যে-ভাবে উঠেছিলে গাছে সে-ভাবেই নেমে এস। তোমার মায়াটাও ঠিক এই রকম। নিজেই সৃষ্টি করে এখন আবার নিজেই তাকে মায়া বলছ।

মায়া মানুষের নিজের সৃষ্টি। ব্যবহারদোষ পুঞ্জীভূত হয়ে যে রূপ নিয়েছে তাকে মানুষ control করতে পারে না, আবার তাকেই মায়া বলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে।

ভক্ত বলল—নামতে তো পারছি না। লাফিয়ে নামতে গেলে তো মরে যাব।

সাধু বললেন—তাহলে মরেই যাও। আর মরে যাবেই বা কোথায়? মরেও তো তাঁর বক্ষেই থাকবে। এত ভয় পাচ্ছ কেন মরতে?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—জীবনে গতাগতির তো একটাই অস্তিত্বসত্তা। সত্তার বাইরে কিছু নেই।

২৮। ১। ৭২

১৪৫

সব নামই সমান। যে যা নাম পায় সে সেই নামই ব্যবহার করতে পারে এবং যে নাম পায়নি সে নিজের মাবাবাকে স্মরণ করলেও একই ফল পাবে। বিদ্যাসাগরমশাই নিজের মাবাবাকে স্মরণ করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর মাবাবাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন। মাবাবা বিশ্বনাথকে পূজা করছিলেন। তাঁদের পূজার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদ্যাসাগর মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

কয়েকজন পান্ডা এসে তাঁকে বলল ভিতরে গিয়ে পূজা করবার জন্য। তখন তিনি তাদের বলেছিলেন—এখানে পূজা করবার আমার প্রয়োজন নেই। জ্যান্ত শিব ও অন্নপূর্ণা হলেন আমার বাবা ও মা। আমি তাঁদেরই পূজা করি।

এই কথাতে পান্ডারা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এটাও সত্য যে, তিনি তাঁর মাবাবাকে পূজা করেই সিদ্ধ হয়েছিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—নিজের মাবাবাকে বা যে কোনও একটি নাম ধরে সম্বন্ধ পাতিয়ে চললে নামই তাকে সাহায্য করবে।

২৮। ১। ৭২

১৪৬

মনের প্রাধান্য কম হয় যদি বোধের প্রাধান্য বাড়ে। মন expect করে, এটা তার স্বভাব, বোধের কোনও expectation নেই। মন শুধু পেতে চায়। তার ফলে সংশয়, ভয় ও দুঃখকষ্টের কারণ হয়। অনুভবসিদ্ধগণ তাই মনের সংশোধন করতে বলেন। তাঁরা মনের চাওয়া-পাওয়াটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যান। মানুষের সসীমের দিকেই লক্ষ্য থাকে। তাঁরা অসীমকে চাইতে বলেন অর্থাৎ ভূমা অনন্ত অসীমের বা পূর্ণতার যে চাওয়া। সসীমকে চাইতে গেলে মন সসীমেই বদ্ধ থাকে। অসীমকে পাওয়া ও সসীমকে পাওয়া এক কথা নয়। বোধের সেবা করলে অনন্ত অসীমকে পাওয়া যায়।

অগস্ত্য মুনি ও বিন্ধ্যপর্বত প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গল্প আছে। আসলে বিন্ধ্য পর্বত নয়, একজন সাধকের নাম। বিন্ধ্য বলে একজন সাধক ছিলেন। খুব অহমিকা ছিল তাঁর, মস্ত বড় সাধক সেই জন্য। ষড়ৈশ্বর্যের বিভূতি লাভ করে তিনি ভাবলেন, ভগবান হয়ে গিয়েছেন। ঈশিত্ব লাভ যাঁরা করেন প্রায় ভগবানের কাছাকাছি থাকেন তাঁরা এবং অসম্ভব শক্তিলাভ করেন। কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের ভার ভগবান নিজের হাতে রেখে

দেন শুধু। ঈশিত্ব লাভ হলে finer qualities এসে যায় অনেক। তাঁরা তখন ইচ্ছা করলে অনেক অসাধ্য সাধনও করতে পারেন। অবশ্য আটটি বিভূতি লাভ হলেও ঈশ্বরানুভূতি নাও হতে পারে।

সাধক বিন্ধ্য অহংকারে মত্ত হয়ে উঠলেন এবং অনেক সাধকের অসুবিধা করতে লাগলেন। অগস্ত্য, যিনি অস্ত যান না, নিত্যসমান, সমবোধে যিনি এসে গিয়েছেন, তিনি দেখেন বিন্ধ্য বড় অসুবিধা করছে সকলের।

একদিন অগস্ত্য মুনি কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে বিন্ধ্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সমানবোধে যে-সব সাধক প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সকলেই মান দেয়। অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা হতে বিন্ধ্যও মাথা নত করলেন। অগস্ত্য তাঁকে বললেন—তুমি এই ভাবেই মাথা নত করে থাক যতদিন না আমি ফিরে আসি।

অগস্ত্য মুনি আর ফিরে আসেননি। এই ভাবে অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যের দর্প, অহংকার চূর্ণ করে দিলেন।

ভাদ্র মাসেব পয়লা তারিখে অগস্ত্যের সঙ্গে বিন্ধ্যের এই ঘটনাটি ঘটে, সেই থেকেই 'অগস্ত্যযাত্রা' কথাটি চলে এসেছে।

বিন্ধ্য নত হয়ে রইলেন বলে ঔদ্ধত্য আর করতে পারলেন না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মনের ও বোধের প্রাধান্যের ফলে কী হয়, তা দেখাবার জন্যই এই গল্পটি রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

২। ২। ৭২

১৪৭

ভিতরে কামনাবাসনা না-থাকলে বাইরে কামনাবাসনার মধ্যে লিপ্ত হলেও ক্ষতি নেই। তাই বলা হয়—ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। 'তুমি তোমার বোধে' যিনি established হয়ে গিয়েছেন তাঁকে কেউ বাঁধতে পারে না।

হনুমানকে রামচন্দ্রের অকালবোধনের সময় নীলপদ্ম আনার জন্য পাঠানো হল। হনুমান রামের আদেশ পেয়ে সানন্দে 'জয় রাম' বলে চলে গেলেন।

যেখানে নীলপদ্ম ছিল সেখানে পাহারা দিচ্ছিল মায়ের এক শক্তি দৈত্যরূপে। হনুমান দৈত্যকে গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি নির্ভীক ভাবে পদ্মবনে ঢুকে নীলপদ্ম সংগ্রহ করতে লাগলেন। দৈত্য রুখে দাঁড়িয়ে বলল—তুমি কে হে! নীলপদ্ম তুলছ কেন?

হনুমান—আমি আমার কাজ করছি না, প্রভুর কাজ করছি। তুমি কাজের সময় এসে বাধা সৃষ্টি করছ কেন?

দৈত্য—কে তোমার প্রভু? হনুমান তাকে পরোয়াই করলেন না, আপনমনে তিনি নীলপদ্ম তুলতে লাগলেন। তখন দৈত্য এসে আক্রমণ করল এবং বাধা দিল যাতে তিনি ফুল না-নিয়ে যেতে পারেন।

দৈত্য—আমাকে পরাজিত না-করে তুমি ফুল নিয়ে যেতে পারবে না।

হনুমান—তুমি তো গোলাম, এত আস্ফালন কেন করছ?

হনুমান 'জয় রাম' বলে দৈত্যকে তুলে এক আছাড় দিয়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। দৈত্যও মায়ের ভক্ত কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল মায়ের কথা সেই সময়। সে গর্বে ও অহংকারে মত্ত হয়েছিল, কাজেই হনুমানের কাছে হেরে গেল। হনুমান প্রভুর হয়ে কাজ করছিলেন বলে তাঁকে দৈত্য কিছুই করতে পারল না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভক্তের মহিমার শেষ নেই। হনুমান 'জয় রাম' বলে পার হয়ে গেলেন সমুদ্র আর রাম নিজে ভগবান হয়েও সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যাবার জন্য সেতু তৈরি করতে হয়েছিল।

২। ২। ৭২

১৪৮

সৎপ্রসঙ্গ শোনার ফলে বোধের স্মৃতিগুলির জাগরণ হয়। তখন জীবন সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে যায়। তখনই হয় সত্য শিব সুন্দরের সঙ্গে মিলন।

এক পাগল বলেছিল—আমি সুন্দরের পূজা করি।

এই কথা শুনে একজন লোক বলল—সে আবার কী?

পাগল—বস তাহলে। এই বলে সে তাকে কতগুলি ফুল দিল।

লোকটি বলল—ভারী সুন্দর তো ফুলগুলি!

পাগল তারপর তাকে প্রসাদ দিল। লোকটি প্রসাদ খেয়ে খুব খুশি হল। সে বলল—ভারী সুন্দর প্রসাদ তো!

পাগল তখনও কিছু বলল না। একটু পরে পাগল খুব সুন্দর সুর করে একটি স্তব গাইতে লাগল। স্তবটি হয়ে যেতে লোকটি আবার মুগ্ধ হয়ে বলল—ভারী সুন্দর তো স্তবটি!

এবার পাগল তাকে বলল—একটু আগেই না বললে, সুন্দর কী বস্তু। এখন দেখছি তুমি নিজে বারবার বলছ 'সুন্দর, সুন্দর'।

লোকটি হেসে বলল—তুমি তো ভারী চতুর!

পাগল—তুমিও চতুর হবে যদি সুন্দরের পূজা কর। মনকে সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত রাখলে তবে সুন্দর হবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সুন্দর ফুল লোকে ব্যবহার করে পূজা সুন্দর হবার জন্যই। যাঁর থেকে সমগ্র প্রাকৃত সৌন্দর্য নেমে এসেছে, তাঁর সন্ধান যে পেয়েছে তাকে কি জগতের সৌন্দর্য আকর্ষণ করতে পারে? সেখানে শুধুই সমতা, অসমান কিছু নেই।

২। ২। ৭২

১৪৯

মানার ফলে শক্তি আসে—এটাই ভক্তের শক্তি, কারণ ভক্তের মধ্যে তখন ভগবান প্রবেশ করেন। তাই দেখা গেল মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে রামচন্দ্র প্রভু হলেন এবং হনুমান তাঁর ভক্ত হলেন। এটা মানা ছাড়া আর কোনও উপায়েই সম্ভব নয়।

বনবাসের সময় রাম-লক্ষ্মণ সীতাহরণের পরে মনের দুঃখে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে যখন বালীর রাজ্যের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় সুগ্রীব ও হনুমান বালী দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বনের মধ্যে ঘুরছিলেন। হনুমান নরবেশধারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখে ভাবলেন, তাঁদের দ্বারা বালীবধের কোনও সাহায্য পেতে পারেন। এই ভেবে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানার জন্য হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সেখানে যাবার সংকল্প করলেন।

এদিকে রাম সুগ্রীব ও হনুমানকে দেখে মনে মনে ভাবলেন, এদের দ্বারা রাবণবধের সহায়তা পেতে পারেন। লক্ষ্মণ কিন্তু রামকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন, রাক্ষসরা তাঁদের জব্দ করার জন্য হয়ত বানরের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে হনুমান এক ব্রাহ্মণের বেশে রামচন্দ্রের কাছে এসে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। রামও হনুমানের সঙ্গে কথা বলে সংশয়মুক্ত হলেন। রামের সঙ্গে হনুমানের মিত্রতা হয়ে গেল। এই চুক্তিও তাঁদের মধ্যে হল যে, সীতা উদ্ধার ও রাবণবধের জন্য হনুমান রামকে সাহায্য করবেন এবং রামচন্দ্রও বালীবধের ব্যাপারে হনুমানকে সহায়তা করবেন।

লক্ষ্মণ কিন্তু তখনও সংশয়যুক্ত মন নিয়ে হনুমানকে বিশ্বাস করতে পারেননি। রাম লক্ষ্মণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—লক্ষ্মণ, তোমার সংশয়ের কারণ নেই। এই ব্রাহ্মণটিকে তুমি যে ছদ্মবেশী বলছ সেটা ঠিকই, তবে এ রাক্ষস নয়।

হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এসেছেন। এই হনুমান তো ভগবানেরই অংশ। তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনেই রামচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটি বিশেষ অবস্থায় না-গেলে এ রকম কথা কারও মুখ দিয়ে বার হওয়া সম্ভব নয়। এ ভক্ত, এর দ্বারাই হবে সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবান ভক্তকে দেখেই চিনেছিলেন। ভক্তও ভগবানকে চিনে ফেললেন কত সামান্য সময়েই। ভক্ত ও ভগবানের মিলন জীবননাট্যের অন্তিমপর্বে এক অভিনব ঘটনা। সত্যই তার মূল। সত্যভিত্তিক ঘটনাবলী, জীবনকাহিনি, উপাখ্যানাদি সবই লোকশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। অতি সহজেই তা মানুষের মনকে অভিভূত করে দেয় এবং বিকারমুক্ত হতে সাহায্য করে। উপদেশমূলক কথার দ্বারা যা সহজে ব্যক্ত করা যায় না, গল্প, কাহিনি ও উপাখ্যানের মাধ্যমে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তা প্রকাশ করা যায়।

৪। ২। ৭২

১৫০

যথার্থ ভক্তের কাছে দু-চারটি কথাই হল বেদশাস্ত্রের essence।

তুলসীদাস ঘর ছেড়ে চলে গেলেন—সামান্য একটি কথার থেকেই তাঁর চৈতন্য হল। তুলসীদাসের স্ত্রী একদিন তাঁকে বলেছিল—আমার দেহের প্রতি তোমার এত আসক্তি,

এর চাইতে যদি রাম নাম করতে তবে উদ্ধার হয়ে যেতে এতদিনে। এই কথাতেই তাঁর হুঁশ হল। তিনি সংসার ছেড়ে চলে গেলেন ভগবানের খোঁজে। অবশেষে তিনি একটি গাছের তলায় ঠাঁই পাতলেন। সেখানে বসে একাগ্র চিত্তে তিনি রাম নাম জপে যেতে লাগলেন। সেই গাছের উপরে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করত। (যে-সব ব্রাহ্মণ সাধন করতে করতে দেহত্যাগ করে তারা কিছুদিন ব্রহ্মদৈত্যের অবস্থায় থাকে। তার পরে অন্য গতি প্রাপ্ত হয়)।

ব্রহ্মদৈত্য তুলসীদাসের রাম নাম শুনে ভারী খুশি হল। একদিন তুলসীদাসের কাছে আবির্ভূত হয়ে সে বলল—তুলসীদাস, তোমার রাম নামে আমি ভারী খুশি হয়েছি এবং তুমি যে এখানে এসে তোমার ঘটির জলটা গাছের গোড়ায় ঢেলে দাও সেই জলটি পেয়ে আমি খুব তৃপ্ত হই, কেন না আমি এই গাছেই বাস করি।

তুলসীদাস বলল—আমি রামকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতে পার কি যাতে তাঁর দর্শন পাই?

ব্রহ্মদৈত্য—রামের দর্শন তাঁর ভক্তের কৃপা ও সাহায্য ছাড়া পাবে না। হনুমান হলেন রামের ভক্ত। তাঁর সাহায্য নিতে পারলে তুমি ভগবানের দর্শন পাবে। তুলসীদাস তখন জানতে চাইলেন কোথায় হনুমানের দর্শন পাবেন। ব্রহ্মদৈত্য তাঁকে বলে দিলেন যে, কাশীতে হনুমানের দর্শন মিলবে। এক জায়গায় রামায়ণ পাঠ হয়। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে হনুমান পাঠ শুনতে যান। অনেক লোকই সেখানে পাঠ শুনতে যায়, তবে হনুমানকে চিনবার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে সকলের আগে পাঠের স্থানে যান এবং পাঠের শেষে সবাই চলে যাবার পরে তবে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। হনুমানকে চিনবাব এই বিশেষ লক্ষণটি ব্রহ্মদৈত্য তুলসীদাসকে বলে দিলেন।

তুলসীদাস কাশীতে চলে গেলেন। কোথায় রামায়ণপাঠ হয় তা তিনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন। অবশেষে পাঠ শুরু হবার বেশ আগেই তিনি সেখানে গেলেন। প্রথম দিন তিনি চিনতে পারলেন না। তিনি সেখানে যাবার আগেই আরও তিন-চাবজন উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থা। সেখানে যাবার আগেই কয়েকজন লোক গিয়ে হাজির হন। তৃতীয় দিন তুলসীদাস সকাল থেকেই সেখানে বসে রইলেন। অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন পাঠ শুরু হবার বেশ অনেক আগেই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে পিছনের দিকে এক কোণে শান্ত হয়ে বসে রইলেন। পাঠের সময় তিনি তন্ময় হয়ে পাঠ শুনছিলেন এবং পাঠ শেষ হয়ে যাবার পরেও তিনি গেলেন না। একে একে সমস্ত লোক যখন চলে গেল তখন ব্রাহ্মণটি ধীরে ধীরে উঠে রওয়ানা হলেন।

তখন তুলসীদাস বুঝতে পারলেন যে, এই ব্রাহ্মণটিই হনুমান। তিনি প্রথম দিনই হনুমানের কাছে গেলেন না। পর পর তিন দিন লক্ষ্য করে দেখলেন। চতুর্থ দিন সবাই

চলে গেলে তিনি ব্রাহ্মণবেশী হনুমানের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—প্রভু, আমি রামচন্দ্রের দর্শনের জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছি, কিন্তু আপনার কৃপা ছাড়া তো তা সম্ভব নয়। হনুমান তাড়াতাড়ি নিজের পা সরিয়ে নিয়ে তাঁকে বললেন—আমি অতি সাধারণ লোক, আমি কী করে তা পারব? কিন্তু তুলসীদাস তাঁর চরণ কিছুতেই ছাড়েন না। তিনি বললেন—প্রভু, আপনাকে আমি চিনেছি। আপনিই একমাত্র আমাকে রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়ে দিতে পারেন। হনুমান অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, তুলসীদাস তাঁকে চিনতে পারলেন কী করে! শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন যে, এ নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মদৈত্যের কাজ। হনুমান যখন তুলসীদাসকে কিছুতেই তাঁর সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না, তখন তুলসীদাসকে তিনি বললেন—তুমি রামায়ণ লিখতে শুরু কর তাহলেই তাঁর দর্শন পাবে।

পরের দিন থেকেই তুলসীদাস রামায়ণ লিখতে আরম্ভ করলেন। সুন্দর সুন্দর দোঁহা বেরোতে লাগল তুলসীদাসের হাত দিয়ে। রোজই তুলসীদাস এ রকম ভাবে রামায়ণ লিখতেন এবং পরে তা নিজেই আবার পাঠ করতেন। রামায়ণ পাঠ শেষ হয়ে গেলে তা লালশালুর কাপড়ে অতি যত্ন সহকারে বেঁধে রেখে দিতেন।

এক চোর তুলসীদাসের লালশালু দিয়ে জড়ানো বস্তুটি যে রামায়ণ তা বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল, হয়ত কোনও মূল্যবান বস্তু রয়েছে তার মধ্যে। তা চুরি করার জন্য চোরটি রাতে তুলসীদাসের কুটিরে গেল। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল কুটিরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে তিরধনুক হাতে নিয়ে দু'টি লোক পাহারা দিচ্ছে। তা দেখে চোরের আরও দৃঢ় ধারণা হল যে, নিশ্চয় খুবই মূল্যবান জিনিস আছে তুলসীদাসের ঘরে।

পরের দিন চোর আবার গেল। সেই দিনও তিরধনুক হাতে লোক দু'টিকে সে দেখতে পেল। তার ফলে চুরি করতে পারল না। পরপর কয়েকদিন এই রকম চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই চুরি করা সম্ভব হল না তখন দিনের বেলাতেই সে তুলসীদাসের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হল।

কথায় কথায় চোরটি তুলসীদাসকে বলল—তোমার ঘরটি রোজই দু'জন লোক তিরধনুক নিয়ে পাহারা দেয়। নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান বস্তু তোমার ঘরে আছে।

তুলসীদাস বললেন—আমি তো গরিব, আমার কিছুই নেই, তুমি ঘরে এসে খুঁজে দেখ। আমার একমাত্র সম্বল হল লালশালুতে জড়ানো এই রামায়ণ। চোরের কাছ থেকে তুলসীদাস রাতে যাঁরা পাহারা দেয় তাঁদের রূপের বর্ণনা শুনেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা রাম ও লক্ষ্মণ স্বয়ং।

তুলসীদাস তখন চোরের পা জড়িয়ে ধরে প্রণাম করে বললেন—তুমি কী ভাগ্যবান! তুমি রামের দর্শন পেয়েছ। আমি এত ব্যাকুল হয়ে কান্নাকাটি করছি তবুও তাঁর দর্শন পাচ্ছি না।

তুলসীদাস হনুমানের কাছে গিয়ে বললেন—প্রভু, রামের দর্শন তো আজ অবধি পেলাম না।

হনুমানজি বললেন—আরও বেশি করে নাম কর তাহলে তাঁর দর্শন পাবে এবং ভজন করার সময় খুব সচেতন হয়ে থাকতে হবে। খুব সচেতন হয়ে ভজন করবে তাহলেই তাঁর দর্শন পাবে।

তুলসীদাস কুটিরে গিয়ে একমনে রাম নাম করতে থাকেন। এমন সময় এক বেদে ও বেদেনি বাঁদরনাচ দেখাবার জন্য ডুগডুগি বাজিয়ে এল। তারা ঐ কুটিরের সামনে বেশি করে ডুগডুগি বাজাতে লাগল। তুলসীদাস সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না, কারণ তখন তিনি রাম নাম জপ করছিলেন। বেদেটি বাঁদরনাচ না-দেখাতে পেরে চলে গেল। এ ভাবে খুব নিষ্ঠা সহকারে কিছুদিন জপ করে আবার তুলসীদাস হনুমানের কাছে গেলেন। তিনি হনুমানকে বললেন—এখনও তো তাঁর দর্শন পেলাম না।

হনুমান বললেন—ভজন করার সময় খুব সচেতন হয়ে থাকার কথা বলে দিয়েছিলাম বারবার। তা তো তুমি করনি। কার ভজন করছ সে বিষয়ে সচেতন হবার কথাটি বলেছিলাম। সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার ভজন হয়নি। তিনি তো গিয়েছিলেন তোমার কাছে, শুধু তিনি নন, সীতামাই এবং লক্ষ্মণজিও সঙ্গে ছিলেন। তিনিও যে সঙ্গে ছিলেন সেটা শুধু তুলসীদাসকে বললেন না।

তখন তুলসীদাস বুঝতে পারলেন যে, বাঁদরনাচ দেখাবার ছল করে রাম-সীতা বেদে ও বেদেনির বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছিলেন।

তুলসীদাস বললেন—প্রভু ছলনা করে গেলেন কেন?

হনুমান—তিনি ছলনা করেননি। তোমার দরজার কাছে এসে তাঁরা ফিরে গেলেন আর তুমি তাঁদের চিনতে পারলে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন হওয়া—এটা সহজে হয় না। তুমি আবার রাম নাম করতে থাক, দর্শন পাবেই।

তার পরে তুলসীদাস আবার কঠোর ভাবে রাম নাম জপে নিমগ্ন হলেন। তিনি শুধু রাম নাম করতেন ও রামায়ণটি পাঠ করতেন।

এই ভাবে রাম নাম করতে করতে তিনি একদিন অজ্ঞান হয়ে গেলেন। হনুমান তখন রামচন্দ্রকে বললেন—প্রভু একে একটু কৃপা করুন।

রামচন্দ্র বললেন—হনুমান তুমি যাকে আশীর্বাদ করেছ তাকে কৃপা না-করে আমি পারি না। তার পরে সংজ্ঞা ফিরে পাবার পরে তুলসীদাস দেখলেন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। হনুমান তুলসীদাসকে তাঁর রচিত রামায়ণ পাঠ করতে বললেন। তাঁর রামস্তুতি শুনে হনুমান আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি নিত্যকাল অমর হয়ে থাকবে। তুমি রামের মধ্যেই বাস করবে অর্থাৎ মৃত্যুলোক অতিক্রম করে অমৃতের মধ্যেই থাকবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবান ভক্ত ছাড়া কখনও থাকেন না। যেখানে প্রাণ সেখানেই রাম। রামই হলেন আত্মারাম। সবার মধ্যেই আত্মারাম রয়েছেন। ভগবান ভক্তের হৃদয়ে এসে খেলা করে যান। এটা বুঝতে পারে শুধু ভক্ত। জ্ঞানীর কাছে উঁকিঝুঁকি দেন কারণ তিনি কিছু গ্রহণ করেন এবং কিছু বাদ দেন। ভক্ত

সর্ববস্তুতেই বাসুদেবকে দেখে। তার কাছে যেখানে রাম সেখানেই আত্মারাম। এই হল ব্রহ্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন বা আত্মদর্শন। সে-ই যথার্থ জ্ঞানী, ভক্ত ও নিষ্কাম কর্মী।

৮। ২। ৭২

১৫১

ভগবান ইচ্ছা করলে সব পারেন। ফুটো হাঁড়িতে জল আনা—এটা একমাত্র তাঁর কৃপাতেই সম্ভব।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

হরিবৈদ্য নন্দের বাড়িতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন। নন্দের বাড়িতে রোগীকে দেখে বললেন—বড় জটিল রোগ, এ তো সারবার নয়। তখন নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপীরা সকলে মিলে বলল, যে-ভাবে হোক কৃষ্ণকে ভাল করে দিতেই হবে। কৃষ্ণকে সুস্থ করে তুলতে পারলে তাদের সর্বস্ব তারা বৈদ্যকে দিয়ে দেবেন। তাদের কান্নাকাটি, ব্যাকুলতা দেখে হরিবৈদ্য অনেক ছক কাটাকুটি ইত্যাদি করে বললেন—বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক। তারপর যা যা দরকার সেই সব আনতে বললেন সবাইকে। সবচেয়ে পুরানো বট গাছের মূল ও জট দরকার হবে। নূতন মাটির হাঁড়ি ও লোহার পেরেকও আনা হল। নূতন হাঁড়িতে হাজার হাজার ফুটো করা হল। তারপর বটের শিকড় দিয়ে বিড়ে বানিয়ে তার উপরে হাঁড়িটি রাখা হল। তার পরে তিনি বললেন যে, একজন সতী নারীকে এই হাঁড়ি করে জল আনতে হবে। সেই জল কৃষ্ণের গায়ে ছিটিয়ে দিলে রোগ নিরাময় হবে।

প্রথমে জটিলা এল। ফুটো হাঁড়ি করে জল আনতে গেল, কিন্তু সব জল পড়ে গেল। এই ভাবে জটিলা, কুটিলা সবাই অসতী প্রতিপন্ন হল।

অনেকেই এল, কেউ পারল না। প্রতিবারই জল পড়ে গেল। অবশেষে মা যশোদা যেতে চাইলেন। হরিবৈদ্য বললেন—মা গেলে চলবে না।

এদিকে আর কেউ জল আনতে রাজি হল না বদনামের জন্য। তখন হরিবৈদ্য আবার ছক কেটে গণনা করে বললেন—'র' আদ্যাক্ষর এমন নামের একজন সতী নারী আছে, তার দ্বারাই হবে। 'র' আদ্যাক্ষর এমন আটজন নারী খুঁজে পাওয়া গেল। পাছে কলঙ্ক লাগে ও অসতী বলে সেই ভয়ে কেউই রাজি হল না।

বৃন্দা গিয়ে রাধাকে বলার পর অনেক পরে রাধা রাজি হলেন। রাধা হাঁড়ি নিয়ে জল আনতে যাচ্ছেন দেখে জটিলা, কুটিলা আরও রেগে গেল। রাধা শেষ পর্যন্ত হাঁড়ি নিয়ে জল ভরতে গিয়ে মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করে বললেন—হরি আমাকে এ যাত্রায় তুমি রক্ষা কর। আমার নামে চার দিকে কলঙ্ক রটে আছে, এবার যদি জল আনতে গিয়ে অসতী বলে প্রতিপন্ন হই তাহলে দাঁড়াবার ঠাঁইও থাকবে না।

রাধা মনে মনে অনবরত কৃষ্ণ নাম জপ করছিলেন। যখন হাঁড়িটি জলে ডুবিয়ে জল ভরতে যাবেন এমন সময় জলের মধ্যে কৃষ্ণের রূপ ভেসে উঠল। কৃষ্ণ রাধাকে অভয় দিয়ে বললেন—ভয় নেই, সব ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়ে যাবে।

রাধা হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে এলেন, এক ফোঁটাও জল পড়ল না। সেই জল ছিটিয়ে দেওয়া হল কৃষ্ণের গায়ে। তারপর কৃষ্ণ রোগমুক্ত হলেন। সকলেই খুব খুশি হলেন। আয়ান ঘোষ সব চাইতে বেশি খুশি হলেন কারণ রাধার নামে এত কলঙ্ক রটেছিল—এখন সেই কলঙ্ক ভঞ্জন হল। রাধা সতী নারী বলে পরিচিত হলেন।

৮। ২। ৭২

১৫২

রাবণের গুরু হলেন শিব। শিবের গুরু হলেন রাম। শিব বড় না রাম বড়—এ নিযে একসময় অনেক তর্ক ও মীমাংসা হযেছে। চৈতন্যঘন অমৃততত্ত্বের দু'টি ব্যবহারিক রূপ হল শিব এবং রাম। শিব রাম নাম জপেন এবং রাম শিব নাম জপেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন:

শিবকে লঙ্কায় রাবণের দ্বারী হয়ে থাকতে হয়েছে। রাবণ যে শিবের কতটা জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন এই থেকেই বোঝা যায়। শক্তিকে রাবণ লঙ্কাতে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু রাম যখন অকালবোধন করলেন তখন শক্তি লঙ্কা ছেড়ে আসতে চাননি।

শিবকে শক্তি বললেন—আমার পুত্রকে ছেড়ে কী করে যাব?

উত্তরে শিব বলেছিলেন—আমার গুরুপত্নীকে যে হরণ করেছে তার কাছে তুমি থাকবে কেন? তোমার অংশকে তুমি বিকৃত করতে চাইছ? সীতা কি তোমার আরেক মূর্তি নয়?

মা এখানে ছল করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মা আর লঙ্কায় থাকতে পারলেন না। শিব লঙ্কা ছাড়ামাত্র মাও লঙ্কা ছেড়ে চলে গেলেন।

রাবণের অহংকার এসেছিল বলে শিব লঙ্কা ছেড়ে চলে গেলেন। অহংকারের মাত্রা বাড়াতে শক্তিও চলে গেলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—রাম সর্বসমর্পণ করেছিলেন, কিন্তু রাবণ সর্বসমর্পণ করেননি। জ্ঞানে সর্বসমর্পণ হয় না। জ্ঞানের পরে যে ভক্তি সেখানে হয় সর্বসমর্পণ। সর্বসমর্পণ যেখানে হয় সেখানে কোনও দৈবীশক্তি আর অপ্রকাশিত থাকে না।

১৪। ২। ৭২

১৫৩

আদির আদি তুমি—এই ভাবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেছিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ঠকে গিয়েই এ ভাবে স্তব করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণরূপধারী ভগবানকেও তখনকারদিনে অনেকেই চিনতে পারেনি। ভগবান যখন অবতারলীলায় আসেন তখন দেবদেবী, সাধুসন্ত কেউ তাঁকে ধরতে পারেন না, অন্তত দেহে থাকা পর্যন্ত তো নয়ই। ব্রহ্মাও তাঁকে চিনতে পারেননি।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

ব্রহ্মা একদিন শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার সংকল্প করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা পরীক্ষা করবার জন্য গোষ্ঠে বিহারকালে ধেনু ও রাখাল বালকদের অপহরণ করে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ সব টের পেলেন, কিন্তু কারওকে কিছু বুঝতে দিলেন না।

সন্ধের সময় তিনি ভাবলেন যে, রাখাল বালকেরা যদি গোধন নিয়ে ঘরে ফিরে না-যায় তবে তাদের মাতাপিতারা খুব উৎকণ্ঠিত হবেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে ঠিক সেই রকম রাখাল বালক ও গোধন তৈরি করে যথাসময়ে যার যার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

ব্রহ্মা অবাক হয়ে ভাবলেন, যে রাখাল বালক ও গোধন তিনি চুরি করে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা কী করে যে যার স্থানে উপস্থিত হয়েছে! সেই সময় দৈববাণী হল। ব্রহ্মা তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভাগবতে সবচেয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর স্তব ওটিই। এমন কোনও সুন্দর বিশেষণ নেই যা এই স্তবে পাওয়া যায় না। স্তবের মধ্যে ব্রহ্মা বলেছিলেন—তোমার কৃপা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। আমার চাইতে যে বড় কেউ ছিল তা আমার জানা ছিল না। আজ তা ধরা পড়ল।

এবার গল্পের শেষাংশটি তিনি বললেন—ব্রহ্মা ভাবলেন, আমার সৃষ্টিকে যে replace করতে পারে সে তাহলে আমাকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—বৃহতের কাছে গিয়ে ক্ষুদ্রের যখন অহংকার-অভিমান থাকে না তখনই ক্ষুদ্র মহৎকে স্তবস্তুতি করে। যিনি বৃহৎ তিনি তখন ক্ষুদ্রকে বলেন, অহংকার-অভিমান করো না।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ভারী humble। তিনি কখনও কোনও অহংকারের বাক্য উচ্চারণ করেছেন—এ রকম শোনা যায় না। রামচন্দ্রের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তিনিও অতি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। ভগবান যে কত নম্র ও বিনয়ী হন তা এঁদের দেখলেই বোঝা যায়। তাই চৈতন্যদেবও নিজে নত হয়ে সবাইকে মান দিয়ে গিয়েছেন।

২১। ২। ৭২

সপ্তম অধ্যায়

১৫৪

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনেকে মানতে রাজি হয় না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এত জীবন নাশ হয়েছে বলে। মুখে মানা ও বোধে মানার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মন যথার্থ ভাবে মানতে পারে না।

গান্ধারী শুধু নয়, অনেকেই accuse করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ বন্ধ না-করার জন্য।

এমনকী এতবড় ভক্ত অম্বরীষ পর্যন্ত ব্যাসদেবকে accuse করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আপনার মতো বিরাট মহামুনি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এ রকম লোকহত্যা কেন হল ? আপনি কেন হস্তক্ষেপ করেননি? কৃষ্ণ কি ইচ্ছা করলে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতেন না ? ব্যাসদেব এই কথার সোজাসুজি উত্তর না-দিয়ে indirectly বললেন—মহারাজ কাল সকালে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে একটি সুন্দর রথ যাবে, কিন্তু সাবধান তার মধ্যে আপনি যেন উঠবেন না। যদি ওঠেন তাহলে বেশি দূর যাবেন না, বেশি দূর যদি যান তবে বনের মধ্যে যে অট্টালিকা আছে তার মধ্যে প্রবেশ করবেন না। যদি প্রবেশ করেন, সেখানে এক রাজকন্যা আছে তার সঙ্গে ভাব করবেন না। যদি বা ভাব করেন, তাকে কিন্তু বিবাহ করবেন না। যদি বিয়ে করেন, তাকে রাজ্যে নিয়ে আসবেন না। যদি বা রাজ্যে নিয়ে আসেন তাকে পাটরানি করবেন না। যদি পাটরানি করেন তাহলে আপনার সর্বনাশ হবে, আপনাকে সে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবে। এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

পরদিন সত্যি সত্যিই এক সুন্দর রথ রাজবাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল। অম্বরীষ আগের দিনের কথা মানতে পারলেন না। তিনি রথে আরোহণ করে দূরে গেলেন এবং যতগুলি নিষেধ ব্যাসদেব করেছিলেন কোনওটিই মানলেন না। ব্যাসদেবের প্রত্যেকটি নিষেধ অমান্য করে গভীর অরণ্যে সেই অট্টালিকা থেকে রাজকন্যাকে বিবাহ করে রাজ্যে ফিরে এলেন। তাকেই পাটরানি করলেন। কিছুদিন যাবার পরে সেই পাটরানি সমস্ত ঐশ্বর্য, ধনদৌলত নিজের আয়ত্তে নিয়ে অবশেষে রাজাকে বিতাড়িত করলেন।

অম্বরীষ দুঃখকষ্টে, অনাহারে, অনিদ্রায় বনের মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে দেহরক্ষার আগে একদিন ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁকে দেখে অম্বরীষ বললেন—মহামুনি আপনাকে যে প্রশ্ন আমি করেছিলাম তার উত্তর পেয়ে গিয়েছি। আপনি এতগুলি নিষেধবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন অথচ তার কোনওটিই আমি শুনিনি। সবগুলি অমান্য করার ফলে আজ আমার এই দুর্দশা। আপনি দুর্যোধনকেও এ রকম অনেক নিষেধবাক্য বলেছিলেন, কিন্তু সে তা অমান্য করেছিল। ফলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং তার এই পরিণতি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—শ্রীকৃষ্ণ practical man বলে বহু বুঝিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত করতে পারেননি।

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকেও কটু কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—আপনি দুর্যোধনকে নিরস্ত করুন, অন্তত পাঁচখানা গ্রাম দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলুন, নয়ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরিণাম খুবই সাংঘাতিক হবে, বহু লোকক্ষয় হবে।

শ্রীকৃষ্ণের কোনও কথাই কেউ গ্রহণ করেননি। নিষেধ তো ছোটবেলা থেকে সকলেই কত শোনে কিন্তু একটিও মানে না। Reaction যখন আসে তখন সামলাতে পারে না।

মানুষ 'আমারবোধে' কিছুদিন চলে—এ ভাবে তাকে কতগুলি দেহ পাল্টাতে হয়। যে কারণে দেহ পাল্টাতে হয়, মানার বিজ্ঞান অভ্যাসের মাধ্যমে তার কারণ সহজেই নিরসন হয়ে যায়। মহাপুরুষরা 'আমি'-র মহিমার সঙ্গে যুক্ত থেকে লীলার রস আস্বাদন করেন, কিন্তু মানুষ 'আমিকে' ভুলে 'আমার' নিয়েই মগ্ন থাকে, ফলে দুঃখকষ্ট পায়।

মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ সে নিজে স্বয়ং। সে 'আমারবোধে' মেতে 'আমিবোধের' মহিমা ভুলে যায় এবং 'আমারবোধের' প্রলোভনে জীবন কাটায়। 'আমারবোধের' মোহজালে জড়িয়ে কতগুলি বিকারের কারণ সৃষ্টি করে এবং সেই কারণের যখন কার্য আরম্ভ হয় তখন তাকে সেগুলি ভোগ করতে হয়। এই ভাবে সে ভোগের কুফল জন্ম জন্মান্তর ভোগ করে যায়। এই ভোগচক্র থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন।

২৮। ২। ৭২

১৫৫

মনের সাহায্যে সমতাকে ধরে রাখা যায় না। বোধের সাহায্য নিলে এমন কোনও শক্তি নেই যে সমতাকে কেড়ে নিতে পারে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অনুশাসন হল—বোধকে ধরে চলতে হবে। তাহলে বাইরের কোনও প্রভাব কাবু করতে পারবে না। দেহ তো সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে, কাজেই দেহের প্রতি importance না-দিয়ে বোধের প্রতি importance দিয়ে সংসারে চলতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক শেঠজির কন্যা খুব ধর্মপ্রাণা ছিল। রোজ স্নান করে বিষ্ণুর আরাধনা ও ভজন করে দশজন ব্রাহ্মণের বা অতিথির সেবা করত।

বিয়ের সময় বাবাকে সে বলল—বাবা, তুমি তো বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছ, কিন্তু প্রতিদিন দশজন অতিথির সেবা যাতে করতে পারি সেই রকম ঘরেই বিবাহের ব্যবস্থা কর, নয়ত আমি অতিথি সেবা না-করে আহারগ্রহণ করতে পারব না।

শেঠজি অবস্থাপন্ন ঘর দেখলেন যাতে তার কন্যা অতিথি সেবা করতে পারে। এই রকম কথাবার্তা বলে একজন ধনী শেঠের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন।

শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রোজ যথারীতি বিষ্ণুর পূজা করে দশজন অতিথি সেবা করার পর সে অন্নগ্রহণ করত।

কিছুদিন পরে এত খরচ করাটা আর তার স্বামী পছন্দ করছিল না। সে ছিল ভারী কৃপণ। সে ভাবল, এই ভাবে খরচ হতে থাকলে তো ধনসম্পদ সবই শেষ হয়ে যাবে। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল—এত অপচয় হওয়া ঠিক নয়, তুমি কাল পর্যন্ত অতিথি সেবা কর, তারপর আর এ সব চলবে না।

স্ত্রী ভাবল, অতিথি সেবা না-হলে সেও আর অন্নগ্রহণ করবে না। অতিথি সেবা বন্ধ হয়ে যাবে বলে স্ত্রীর ভয়ানক মন খাবাপ। পরের দিন অতিথি সেবার সময় নয়জনের আহার হয়ে গেল, কিন্তু দশমজন আর কেউ আসছে না দেখে সে খুব উদ্বিগ্ন হল।

অনেক পরে দশম ব্যক্তি—একজন সাধু এসে উপস্থিত হলেন। শেঠের পত্নী সেই সাধুকে সমাদর করে খাওয়াতে বসালেন। কিন্তু তার মন বিষণ্ণ দেখে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—মা, তোমার মন খারাপ কেন? তোমার মুখে এমন একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে আছে, নিশ্চয়ই তোমার কোনও দুঃখকষ্ট আছে, আমাকে খুলে বল।

শেঠপত্নী প্রথমে কিছুতেই বলতে চায়নি, অবশেষে সাধুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তার দুঃখের কারণটা তাঁকে জানাল।

সব কথা শুনে সাধু তাকে বললেন—মা, তুমি এত ভাবছ কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে যা করেছ তার তো ফল কিছু পাবেই, তার দ্বারাই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আর চিন্তা করো না।

সাধুজি এই ভাবে তাকে আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। সাধুজি সেখান থেকে গিয়ে বড় রাস্তার উপরেই আসন পেতে বসে রইলেন।

পরদিন কৃপণ শেঠ কর্মস্থল থেকে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তাকে ডেকে সাধু কাছে বসালেন। ইচ্ছা না-থাকা সত্ত্বেও সাধুর আদেশ অমান্য করতে পারল না। শেঠ তার সামনে বসতেই সাধু বললেন—তুমি তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। তোমাব যাবার সময় হয়েছে, তুমি যদি আমার একটি কাজ করে দাও তবে ভারী উপকার হয়। আমার এক ভাই দর্জি ছিল। সে একটি সুচ ফেলে গিয়েছে এবং এখন সে যমপুরীতে আছে। তুমি যদি সুচটা সঙ্গে করে নিয়ে যাও এবং তা আমার ভাইকে দাও তবে বড় উপকার হয়। সে এখন যমরাজের জামাকাপড় সেলাই করে। সুচটা যদি তার হাতে দিতে পার তবে তার recommendation-এ তোমারও কিছু সুবিধা হবে যমপুরীতে।

সেই শেঠ রাজি হয়ে গেল এবং সুচটা সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

বাড়ি যাবার পথে সে ভাবতে লাগল, সুচটা কী করে নেব? কাপড়ে বিঁধিয়ে নিলেও তো হবে না, অন্য কেউ কাপড়টা খুলে নেবে। গায়েও তো ফুটিয়ে নেওয়া যাবে না, কারণ দেহ তো জ্বালিয়ে দেবে। কী করে নেবে এটা বুঝতে না-পেরে সে শেষ পর্যন্ত সুচটি কী ভাবে নেওয়া যায় সেই কৌশল শিখতে সাধুর কাছে গেল।

সাধু বললেন—তুমি এত জান আর এটা পারবে না? তুমি এত টাকা জমিয়েছ। সব নিয়ে যেতে পারবে অথচ একটি সুচ সেই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না?

সাধুর এই কথা শুনে তার খেয়াল হল, সত্যিই তো এত টাকাপয়সা, ধনসম্পত্তি সবই তো পড়ে থাকবে, এগুলি তো নিয়ে যেতে পারব না! তখন সে সাধুকে বলল—এ সব তো তাহলে কিছুই নিয়ে যাওয়া যাবে না!

সাধুজি তখন শেঠকে বললেন—অর্থ তুমি নিয়ে আসনি, মাঝখানে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছ আবাব শেষ সময়ে এ সব ফেলেই যেতে হবে।

শেঠ—তাহলে কী উপায় হবে?

সাধু—যদি সৎ কর্ম কর তবে সৎ কর্মের ফল তোমার সঙ্গে যাবে। কী ভাবে সৎ কর্মের ফল তৈরি হবে তা আগে জানতে হবে। অসৎ কর্মের ফল নিয়ে গেলে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। সৎ কর্মের ফল নিয়ে গেলে সুখশান্তি পাবে।

শেঠ—কী ভাবে সৎ কর্মের ফল তৈরি হবে আমাকে বলে দিন।

সাধু—তোমার যা অর্থ আছে সব ভগবৎ সেবায় ব্যয় করলে যে শুভ কর্মের ফল হবে, সেই কর্মফলের সংস্কার তুমি নিয়ে যেতে পারবে সঙ্গে। সেই অনুযায়ী তোমার সুখসমৃদ্ধি হবে। সাধুর সব কথা শুনে শেঠ বাড়ি গেল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি সাধুসেবা বন্ধ করলে কেন?

শেঠের স্ত্রী বলল—তুমিই তো নিষেধ করেছ সাধুসেবা করতে, সেই জন্য আজ সাধুসেবা হয়নি।

তখন শেঠ বলল—তোমার ঐ দশজন অতিথি সেবার মধ্যে আরও দশজনকে জুড়ে নাও। দৈনন্দিন কুড়িজনকে তুমি সেবা কর আজ থেকে। শেঠজির স্ত্রী খুব খুশি মনে আবার যথারীতি সাধুসেবা আরম্ভ করে দিল। কিন্তু সেই সাধু আর এলেন না। তাঁর যতটুকু কাজ ছিল ততটুকু করে তিনি চলে গেলেন।

গদিতে বসে প্রথম প্রথম শেঠজির খুব মন খারাপ করত, কিন্তু পরে সে যথারীতি কাজ শুরু করে দিল। শেঠজিকে এত টাকাপয়সা খরচ করতে দেখে আগে যারা তাকে কৃপণ বলে নিন্দা করত তারা এসে আস্তে আস্তে শেঠকে স্তবস্তুতি করতে শুরু করে দিল।

সৎ কর্মের ফলে দানধর্মও বাড়ল এবং মনের প্রসন্নতাও বাড়ল। ক্রমশ তার সৎ কর্ম ও দানধ্যান বাড়তে লাগল। অনেকদিন পরে দেহরক্ষার আগে সাধুর সঙ্গে তার আরেকবার দেখা হয়েছিল।

সাধু তখন তাকে বলেছিলেন—তোমার এই সৎ কর্মের ফলে তোমার ভাল ব্যবস্থাই হবে।

শেষ মুহূর্তে শেঠের দেহরক্ষার সময় দিব্যকান্তি একজন এসে তাকে যমরাজের কাছে নিয়ে গেল। চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে এল। খাতা দেখে কর্মফল অনুযায়ী ভোগের ব্যবস্থা করা হবে।

চিত্রগুপ্ত—মহারাজ, এই শেঠ শেষ জীবনে অনেক সৎ কাজ করেছে। সৎ কর্মের ফল প্রচুর জমেছে, কিন্তু প্রথম জীবনে সে বড় কৃপণ ছিল। প্রথম জীবনের কর্ম অনুসারে তার দুর্ভোগও কিছু পেতে হবে। আগে কোনটা ভোগের ব্যবস্থা হবে? যমরাজ শেঠকে

জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে আগে কোনটা ভোগ করতে চায়। শেঠ নিজে বুঝতে না-পেরে মনে মনে সেই সাধুকে স্মরণ করল। সে ভিতর থেকেই উত্তর পেল যে, যমরাজকেই জিজ্ঞাসা কর। শেঠ যমরাজকেই জিজ্ঞাসা করল—আপনিই বলে দিন কোনটা ভাল হবে। যমরাজ এ রকম উত্তর দিতে অভ্যস্ত নন। তিনি তাড়াতাড়ি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বিষ্ণু বললেন—শেঠ যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছে তখন তুমিই যথাযথ ব্যবস্থা কর। মহতের আশ্রয় নিলে মহতের যা কর্তব্য তা তাঁকে করতে হয়। যমরাজ মুস্কিলে পড়ে বিষ্ণুর কাছ থেকে শিবের কাছে গেলেন। শিবের কাছে গিয়ে সব বললেন।

শিবও সেই রকম ভাবে বললেন—শেঠ যখন তোমাকে গুরুবোধে গ্রহণ করেছে তখন তোমারই উচিত তার ব্যবস্থা করা।

যমরাজ বিপদে পড়ে গেলেন। তার পরে উপায় না-দেখে নরদেহ ধারণ করে সেই গুরুর কাছে গেলেন বিধান নেবার জন্য।

গুরু বললেন—তুমি যদি বিধান না-দিতে পার, আমি মানুষ হয়ে কী করে দেব? যা করবার তুমিই কর।

যম কোনও decision নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত শেঠজি 'ন সৎ-এ ন অসৎ-এ' থেকে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

গল্পটি শেষ কবে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মহতের কৃপায় এ রকম ফাউও আসে জীবনে। মহাত্মার সামান্য কৃপাতে শেঠজির জীবনে আমূল পরিবর্তন এল এবং কত সৎ কর্মের ফল সঞ্চয় করে পুণ্যলোকে বাস করবার সৌভাগ্য হল।

সবাই সৎ-এর আশ্রয় নেয় না। যদি নেয় তবে তাঁরা কখনও ধোঁকা দেন না। সৎ দুঃখকষ্ট দূর কবে দিতে পারে না, কিন্তু সৎ-এর প্রভাব এমনই যে তার দ্বারা অসৎ-এর প্রভাব সরে যায়। Surrender করলে মহৎও অনেক সময় বিপদে পড়ে যান, decision নিতে পারেন না।

যমরাজের মতো লোকও কম বিপদে পড়েননি। যমরাজ গেলেন বিষ্ণু ও শিবের কাছে—তাঁরাও সকলে surrender করে দিল যমরাজের কাছেই। ফলে তার পাপের ফল বা পুণ্যের ফল আর ভোগ করতে হল না।

এই গল্পটির বিশেষ এক তাৎপর্য আছে। শেঠের কন্যার সৎ কর্মের ফল জমার ফলে সাধুসেবার অসুবিধা হল না। সৎ কর্ম এবং সৎ-এর প্রভাবে সংসারে কুবৃত্তির প্রভাব touch করে না। সুবৃত্তির প্রভাবে কুবৃত্তি সরে যায়।

মন যা গ্রহণ করে তা-ই shape নেয়। মনের প্রভাবে সৎ ও অসৎ আসে। বোধের প্রভাবে সৎ বা অসৎ কোনওটিই থাকে না—সমতা আসে তখন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণুরাই surrender করে গিয়েছেন। তাঁরা চট করে decision নেননি। চট করে decision নেয় তারাই যারা মনের প্রভাবে চলে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। বোধের সাহায্যে যারা চলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

২৮। ২। ৭২

১৫৬

মন যখন বাইরে থাকে তখন বাইরের প্রভাব থেকে যায়। অন্তরের দিকে গেলে স্ববোধের কর্মধারায় বাইরের প্রভাব একটু একটু করে পাল্টে যায়। পরে দেখতে পাওয়া যায় অভাব সব ভিতরে আছে। যা দিয়ে অভাব পূর্ণ করা যায় তাও ভিতরে, চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রও ভিতরে এবং হওয়াও ভিতরে।

ইষ্টের সাধনা প্রথমে বাইরে হয়, তার পরে অন্তরে হয়। বাইরে ইষ্টদেবের সাধনা না-করলে অহংকার-অভিমান বাড়ে। তখন অপরকেও মনে হয় অসৎ ও অধার্মিক। হৃদয়বোধকে ধরে সাধনা করলে সদসৎ-এর বিচার এ ভাবে আসে না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মীরাবাইয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন।

মীরাবাই ছিলেন রানা কুম্ভের পত্নী। রানি হয়ে কিছুরই অভাব তাঁর ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের টান যখন এল তখন রাজপুরীতে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনের মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে শুরু করলেন। ভগবানের জন্য তিনি সেখানে গিয়ে কাঁদতেন। রানা কুম্ভ প্রথম প্রথম বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মীরাকে তিনি ফেরাতে পারলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, মীরার স্বভাব যেন একটু ক্ষ্যাপাটে হয়ে গিয়েছে। মীরা রাতেও ঘরে থাকতেন না। তিনি সেই সময় মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহকে সাজাতেন, গান গাইতেন অথবা বিগ্রহকে জীবন্ত মানুষের মতো করে আদর করতেন।

কুম্ভ একদিন সারারাত দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন মীরা কী ভাবে পূজা করেন। মীরা একবার ফুল দিয়ে বিগ্রহকে সাজাচ্ছেন, আবার আদর করছেন। কখনও বা বিগ্রহকে খাওয়াচ্ছেন আবার কখনও বা গান শোনাচ্ছেন। সারারাত এই ভাবেই কেটে গেল। ভোররাতে তাঁর খেয়াল হল যে, রানা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

মীরা রানা কুম্ভকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখানে কেন?

রানা—তুমি এখানে কেন?

মীরা—কৃষ্ণের টানে এখানে এসেছি।

রানা—আমিও তোমার টানে এখানে এসেছি।

মীরা—এই দেহের প্রতি এত আকর্ষণ কেন?

রানা—তোমার এই পাথরের প্রতি এত আকর্ষণ কেন?

মীরা—এই মূর্তি জীবন্ত, পাথর নয়।

রানা—কিন্তু তুমিও তো জীবন্ত। পাথর তো তোমার মতো জীবন্ত নয়।

মীরা—এই দেহের প্রতি আসক্তি ছেড়ে দিন মহারাজ। প্রয়োজন হলে আপনি আবার বিবাহ করে রানির স্থান দিন অন্য কারওকে।

রানা—তুমি তবে তোমার ঐ পাথরের বিগ্রহকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে এই রানাকে ভগবান বলে মনে কর না কেন?

মীরা—আপনি তো মানুষ, কিন্তু এঁ তো দেবতা।

রানা—তোমার হয়ত এঁকে দেবতা ভাবতে খুব ভাল লাগে কিন্তু আমিও তো আমার বাস্তব দেবী হিসাবে তোমাকেই পূজা করছি। তুমি তোমার কল্পনার পূজা করছ আর আমি জীবন্ত বিগ্রহকে পূজা করছি।

রানার বাস্তব পূজা দেখতে পেয়ে মীরা বিস্মিত হলেন। রানা মীরাকে তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে প্রণাম করলেন, মীরাও রানাকে প্রণাম করলেন।

শেষ পর্যন্ত মীরা জেনে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পতি হিসাবে স্বয়ং ভগবানই এসেছিলেন। রানা সর্বদা মীরার সমস্ত কিছুকেই সমর্থন করতেন। রানা কুম্ভের দেহরক্ষার পরে দেবরের অত্যাচারে ভিখারিনির বেশে মীরা ভগবানকে খুঁজতে বৃন্দাবনের দিকে ছুটলেন। রাস্তায় কত বিপদ-আপদ, কিন্তু মীরা অবিচলিত থেকে শুধু মদনমোহনকে ডাকতে ডাকতে চলতে লাগলেন। আহার, নিদ্রা নেই, শুধু বৃন্দাবনের পথে পথে গান গেয়ে চলেছেন। রাস্তায় মীরার সঙ্গে গান গাইতে গাইতে আরও কত সাধক চলতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে গিয়ে মীরা আদেশ পেলেন যে, রাধারানির পরিচয় ও তাঁর ভাব নিয়ে সাধনা করতে হবে। এও তিনি জানলেন যে, একমাত্র সনাতন গোস্বামীই শুধু জানেন রাধারানির পরিচয়।

সনাতন গোস্বামী ছোট্ট কুটিরে থেকে সাধনভজন করতেন। মীরা সেখানে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় আঘাত করলেন।

সনাতন গোস্বামী নারীর কণ্ঠস্বর শুনে বললেন—আমি নারীর মুখ দর্শন করি না।

মীরা—তুমি তাহলে কী?

সনাতন গোস্বামী—আমি পুরুষ।

মীরা—তুমি আবার কোন পুরুষ এলে? আমি তো জানি বৃন্দাবনে একজনই পুরুষ আছেন, আর সব তো প্রকৃতি।

মীরার এই কথা শুনে সনাতন গোস্বামী ভাবলেন, এ তো সাধারণ মানুষের কথা নয়!

সনাতন গোস্বামী তখন বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি মীরাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

মীরা বললেন—আমি কৃষ্ণের মীরা।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—নিজের পরিচয়ে কারওর পরিচয় হয় না, ভগবানের পরিচয়েই প্রত্যেকের পরিচয় হয়।

এই পর্যন্ত বলে তিনি আবার গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন।

সনাতন গোস্বামী—তোমার এখানে আগমনের কারণ কী?

মীরা—আমি আদিষ্ট হয়ে এসেছি তোমাকে গুরুরূপে বরণ করবার জন্য।

সনাতন গোস্বামী—আমি তো নারীকে দীক্ষা দিই না।

মীরা—তুমি আবার এই ভুল করছ? সাবধান! তুমি নারী-পুরুষ ভেদ করছ কী দিয়ে? লিঙ্গ দিয়ে তুমি ভেদ করতে চাইছ। ভক্ত হয়ে তোমার কামভাব এখনও

যায়নি ? আমাকে দেখে তোমার বিকার হচ্ছে অথচ হাতের আঙুল দেখে তো বিকার হচ্ছে না।

মীরার এই ভর্ৎসনাতে সনাতন গোস্বামীর চৈতন্য হল। সেই থেকে তিনি মীরার শিক্ষাগুরু হলেন। সনাতন গোস্বামীর ছোট্ট কুটিরে একখানা মাত্র চৌকি পাতার স্থান ছিল। সেখানে মীরাকে রাখবার স্থান নেই। তখন চৌকির নিচে মীরার শয্যার স্থান নির্দিষ্ট করা হল। দিনের পর দিন মীরা এই ভাবে থেকে সনাতন গোস্বামীর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলেন। আট বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানির পরিচয়, লক্ষণ এবং ব্যবহার শিখলেন।

রূপ ও অণু হতে শুরু করে সমস্ত লোকের রূপ, নাম, ভাব, বোধের পরিচয় এবং তার অন্তর্গত শক্তি ও বোধের পরিচয়—সর্বদিক দিয়েই মীরাকে সনাতন গোস্বামী তৈরি করলেন।

মীরা শিক্ষান্তে বললেন—আমি তো কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—ঠিক যেন ধ্রুবর মতো অবস্থা হয়ে গেল মীরার। মানুষের কৃত্রিমতা থাকে 'আমি আমার বোধে'। 'তুমি তোমার বোধের' ব্যবহার দ্বারা শুদ্ধ হতে থাকলে কৃত্রিমতা থাকে না। তখন শত্রুকে আর শত্রু বলে মনে হয় না। এই হল সত্যের আরেকটি রূপ, ঈশ্বরের আরেকটি রূপ।

কৃষ্ণের মীরা—এই বোধে ছিলেন বলেই দেবর ও ননদের দেওয়া এত দুঃখকষ্ট সইতে পেরেছিলেন মীরা। মীরার সুন্দর রূপলাবণ্যের আকর্ষণে কত দুষ্ট লোক আসত, কিন্তু সবার কাছ থেকেই তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। ভগবানের নামে যদি মানুষ চলে তবে তার ভিতরে এ রকমই হয়।

১। ৩। ৭২

১৫৭

ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই হবে, কিন্তু জানবে সব একই সত্তার প্রকাশ। আগুন ও জল দু'টিই বোধ, শুধু ব্যবহারের তারতম্য। বোধের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করলেই হয় যথার্থ ব্যবহার।

যথার্থ ব্যবহারবিজ্ঞান না-জেনে কোনও কিছু ব্যবহার করার ফলে যে কী হতে পারে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দু'টি গল্প বললেন।

(ক) কোনও এক বিজ্ঞানের প্রফেসর তাঁর এক ছাত্রকে কয়েকটি জিনিস বুঝিয়ে দিয়ে তাকে experiment করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্রটি বোধের দিকে দৃষ্টি না-রেখে ব্যবহার করতে গিয়ে যে অনর্থ ঘটিয়েছিল সেই প্রসঙ্গে বলছি শোন—সেই বিজ্ঞানের ছাত্রটি প্রফেসরের নির্দেশ মতো যখন experiment করতে গিয়েছিল তখন হঠাৎ তার মাথায় অন্য রকম experiment করার খেয়াল এল। সেই নূতন experiment-টা করতে গিয়ে একটা accident হয়। এর ফলে তার সহকর্মীরা কেউ কেউ মারা যায় এবং সেই ছাত্রটিরও আর বাঁচার আশা রইল না।

ছাত্রটির মৃত্যুর আগে বিজ্ঞানের প্রফেসর যখন তাকে দেখতে এসেছিলেন তখন সে তার ভুল স্বীকার করে প্রফেসরকে জানায়—আমার একটু বোঝার ভুলের জন্য এ রকম গোলমাল হয়েছে। Experience সঞ্চয় না-করে মনের প্রাধান্যে চলতে গিয়ে আমার এই বিপদ হল।

প্রফেসর সব কথা শুনে বললেন—আমরাও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পেলাম যে, মনের নির্দেশে কোনও কাজ করতে নেই। বোধের সাহায্য নিয়েই সব কিছু করতে হবে, তাহলে আর এ রকম ঘটনা ঘটবে না। তোমার এই ঘটনা থেকে আজ একটি মস্ত বড় শিক্ষা পেলাম।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রথম গল্পটি শেষ করে দ্বিতীয় গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন।

(খ) একবার এক foreman কোনও এক রাবার factory-তে, যেখানে কালো tyre তৈরি হচ্ছিল সেখানে লাল রঙের tyre করা সম্ভব হয় কি না তা পরীক্ষা করতে গিয়েছিল। তার এই experiment-এর ফলে সেখানেও ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হল। যন্ত্রপাতির গোলমালে সমস্ত factory-ব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা এ রকম কাজ বন্ধ ছিল। তার পরে কোনও রকমে তা শুধরে নেওয়া হল।

গল্প দু'টি শেষ করে তিনি গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—ভুল হয় মনেরই, বোধেব ভুল হয় না। যদি ছাত্রটি experience-এর সাহায্য নিয়ে experiment করত তবে এ রকম ভুল হত না। Experiment করতে হলে নিজেব জিনিসের উপর করতে হয়, ছোটখাট জিনিসের উপরে experiment করতে হয়। যে জিনিস নিজের নয় তার উপরে experiment করতে নেই এবং কোনও experiment করতে গেলে mass scale-এ করতে নেই। মন দিযে যে ভুল হয় তা বোধ দিয়েই শোধন করতে হয়। বোধটা হল experience।

আধ্যাত্মিক পথে যাঁরা direct experience অর্জন করেছেন তাঁরা theoretical information শুধু দেন না—direct experience-ই দেন।

ভগবানকে যদি জীবনের সঙ্গে যুক্ত না-রাখতে পারা যায় তবে শুধু theoretical জ্ঞান দিয়ে কোনও লাভ হয় না।

৩। ৩। ৭২

১৫৮

সহজ সরল মনে বিশ্বাস করলে কী হয় তারই উদাহরণ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন।

এক মহাপণ্ডিতের ঘরে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি নিত্য তাঁর সেবাপূজা করতেন। মাঝে মাঝে তাকে শিষ্যবাড়িতেও যেতে হত। একবার শিষ্যবাড়িতে যাবার সময় পুত্রের উপর শালগ্রামশিলার সেবাপূজার ভার দিয়ে গেলেন। যাবার সময় পণ্ডিত তার পুত্রকে বলে গেলেন—বিগ্রহপূজায় কোনও ত্রুটি যেন না-হয়। যদি কোনও রকম ত্রুটি হয় তবে ফিরে এসে তার যথোচিত ব্যবস্থা তিনি করবেন—এই ভয় দেখিয়ে গেলেন।

ছেলেটি ছিল খুবই বোকা ও সহজ সরল। বাবা চলে যাবার পর ছেলে পূজা করতে বসে। ঠাকুরকে যখন ভোগ নিবেদন করে তখন সে দেখতে পায় ঠাকুর কিছুই গ্রহণ করছেন না, যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনই পড়ে আছে। সে অনুনয় বিনয় করে ঠাকুরকে বারবার ভোগ গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু তবুও ঠাকুর খাচ্ছেন না দেখে ছেলেটি কেঁদে তাঁকে বলল—ঠাকুর, তুমি যদি না-খাও বাবা আমাকে এসে মারবে। তুমি খেয়ে নাও। আমি তো কোনও অপরাধ করিনি, তুমি মিছিমিছি আমাকে মার খাওয়াবে? ছেলেটি নিজেও সারাদিন অভুক্ত রইল। মূর্খ যখন burst করে ভগবানও তখন তার মধ্যে burst করেন। ছেলেটি যখন দেখতে পেল ভগবান কিছুই খাচ্ছেন না, এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে, তখন লাঠি নিয়ে সে বিগ্রহকে মারতে এল। সে বিগ্রহকে বলল—তুমি যদি না-খাও তাহলে পিটিয়ে তোমাকে শেষ করব। ঠিক সেই মুহূর্তে বিগ্রহ থেকে ভগবান বেরিয়ে এলেন।

ছেলেটি বলল—তুমি আমাকে মূর্খ বল অথচ তুমি কেন এ রকম করলে? সারাদিন বসে রইলাম, তুমি এত দেরিতে এলে কেন? আমি তো তোমাকে মেরেই ঠান্ডা করতে যাচ্ছিলাম এখন। তুমি সব খেয়ে যাও, নয়ত বাবা এসে আমাকে মারবেন। তুমি কি আমাকে বাবার হাতে মার খাওয়াতে চাও?

ভগবান তখন ভোগ গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে যতদিন বাবা ফিরে আসেননি তার মূর্খ ছেলেই ভোগ নিবেদন করত এবং ভগবানও সানন্দে তা গ্রহণ করতেন।

বাবা ফিরে আসবার আগের দিন শেষবারের মতো মূর্খ ছেলের হাত থেকে নৈবেদ্য গ্রহণ করাব পরে ছেলেটি ভগবানের কাছে কথা আদায় করে নিল—বাবা এলে যেন তাঁর হাতে মার না-খাই—সেটা খেয়াল রেখ।

পরের দিন পণ্ডিত ফিরে আসবার পর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভোগ, পূজা, সেবা ঠিক মতো সব হয়েছে কি না। ছেলে আনন্দের সঙ্গে জানাল—ভোগ, পূজা সব ঠিক মতোই হয়েছে এবং ভগবান রোজই খেয়ে গিয়েছেন। ভগবান খেয়ে গিয়েছেন, এই কথাটি শুনে তার বাবা অবাক হলেন। ছেলের কথা বিশ্বাস করলেন না। ছেলে যতই বলে ভগবান স্বয়ং এসে সব গ্রহণ করেছেন, ততই বাবা রেগে যান। শেষ পর্যন্ত বাবা ছেলেকে মারলেন। ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেল। ছেলের জ্ঞান ফিরতে বাবা ছেলেকে বললেন—চল দেখি ঠাকুরঘরে তুই কেমন করে পূজা করিস তা দেখব। ছেলে তখন বাবাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে গেল। অন্যদিনের মতো নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে বলল—খাও এবার তুমি। কিন্তু ভগবান তো আর খাচ্ছেন না। সেই দেখে পণ্ডিত আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, ছেলে তার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করছে।

ছেলে তখন বারবার ভগবানকে অনুরোধ করতে লাগল—ঠাকুর তুমি খাও, নয়ত বাবা আমাকে মারবে। তুমি না বলেছিলে আমি যাতে মার না-খাই সেই ব্যবস্থা করবে। এখন কেন চুপ করে আছ?

তখন ভগবান বললেন—তোমার বাবার চিত্ত এত অশুদ্ধ যে, তার সামনে আমি বেরোতে পারছি না। তোমরা দু'জনেই বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—তারপরে আমি খাব। সেই কথা শুনে ছেলে বাবাকে নিয়ে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং অনেকক্ষণ পরে বাবাকে নিয়ে ঘরে গেল। ঘরে ঢুকে বাবা বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং দেখলেন নৈবেদ্যর থালা খালি পড়ে আছে। ভগবান স্বয়ং যে খেয়ে গিয়েছেন এবার তা তিনি বুঝতে পারলেন। ছেলে তখন বাবাকে বলল—নারায়ণ দেহ ধরে এসে আমার কাছে খেয়ে গেল আর তোমার এত অশুদ্ধ চিত্ত যে, তোমার কাছে সে আসতে পারল না। বাবা তখন নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন। নূপুরের ধ্বনি শুনিয়ে ভগবান জানিয়ে গেলেন যে, সত্যিই তিনি এসেছিলেন এবং সব নৈবেদ্য গ্রহণ করে চলে যাচ্ছেন এখন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সহজ সরলের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সর্বকালেই হয়। বিগ্রহকে জীবন্তরূপে পূজা না-করলে বিগ্রহ মৃত হয়ে যায়।

১০। ৩। ৭২

১৫৯

মনের চিন্তা দিয়েই destiny তৈরি হয়—এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সাধু গাছতলায় বসে সাধনা করতেন। তার কাছেই এক বারবনিতার বাড়িতে সেজেগুজে অনেক লোক আসত। এই সব দেখে সাধু খুবই কষ্ট পেতেন এই ভেবে যে, আহা লোকগুলি কী বোকা, এ রকম ভাবে জীবন নষ্ট করছে! এ সব লোকের কী করে ধর্মে মতি হবে, কী ভাবে উদ্ধার পাবে—রোজই তিনি এই ভাবনা করতেন। সন্ধে হলেই সাধুর মনে হত, লোকগুলি নরকে যাবে, এরা কী করে উদ্ধার পাবে—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বারবনিতা আবার রোজ রাতে সেই সাধুকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখে ভাবত, সাধু কত আনন্দে আছে, সাধুর কাছে কত লোক আসে, তারাও আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু আমার কী দুর্বিষহ জীবন! কবে যে এই জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাব, কবে সাধুর কাছে গিয়ে একটু সেবা করতে পারব! এই সব ভাবতে ভাবতে সে রোজ ঘুমিয়ে পড়ত।

অবশেষে একসময় দু'জনেই দেহরক্ষা করল। মৃত্যুর পরে বারবনিতা গেল স্বর্গে আর সাধু গেলেন নরকে। সাধু যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—যমরাজ এ তোমার কেমন বিচার? এক ঘৃণ্য জীবনযাপন করে বারবনিতা গেল স্বর্গে এবং আমি সারাজীবন সাধু হয়ে রইলাম আর আমাকে নিয়ে এলে নরকে !

যমরাজ—তুমি বাইরে সাধু ছিলে ঠিকই। কিন্তু সাধু হয়ে তুমি শুধু বারবনিতার চিন্তাই করেছ। তোমার মনের মধ্যে ভগবানের স্থান ছিল না। আর বারবনিতার মনে শুধু ভগবানই ছিল। সারাজীবন তার অন্তরে শুধু ভগবানের জন্যই ছিল ব্যাকুলতা। তাই তার স্থান হয়েছে স্বর্গে। মনের চিন্তা দিয়েই destiny তৈরি হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মন দিয়ে যা করা হয় তা-ই ঘুরে আসে জীবনে। Action হয় মন দিয়ে। মন দিয়ে যে রকম কর্ম হয়, সেই কর্মের ফলই আসে জীবনে ভোগরূপে। সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, নিষ্কাম কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

১৯। ৩। ৭২

১৬০

(পূর্বের গল্পটির অনুরূপ বিদেশি একটি গল্প আছে। গল্পটি নিম্নে ব্যক্ত করা হল।)

মানুষ যে কোনও অবস্থাতে বা পরিবেশে থাকুক সেখানে থেকেই নিজেকে শোধন করে মনের চিন্তা ও গতির পরিবর্তন ভাল দিকে করতে পারে।

এক সাধু (saint) church-এ বসে ঈশ্বরের চিন্তা করতেন। কাছেই এক সুন্দরী বারবনিতা এসে বসবাস করতে লাগল। অনেক লোকজন সেখানে আসে। তাই দেখে সাধুর মনে ভয়ানক ঘৃণা ও বিরক্তি হল। সন্ধে হলেই ভগবানের কথা তার আর মনে হত না, সাধারণ বারবনিতার উপরে ঘৃণা ও রাগের ভাব আসত। আবার এদিকে রাতে গির্জার ঘণ্টা শুনে বারবনিতার মন চলে যেত গির্জায়। সে ভাবত, কী সুন্দর শান্ত পরিবেশ! সেখানে গিয়ে যদি আমি একটু ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারতাম! কবে আমার সেই সৌভাগ্য হবে যে, আমি ঈশ্বরের একটু সেবা করতে পারব ইত্যাদি, ইত্যাদি। সাধুর বারবনিতার চিন্তা এতবেশি হতে লাগল যে, ক্রমশ ঈশ্বরের চিন্তা তিনি ভুলেই গেলেন। সাধু তখন underground-এ একটি cell ছিল, সেখানে গিয়ে লুকালেন। সেখানে একটি মমি ছিল, সেটাও নারীমূর্তি। তা দেখে সাধুর বিরক্তি হল। সুন্দরী বারবনিতা ও মমির মূর্তি সারাক্ষণই তার অন্তরে ফুটে উঠত আর ঘৃণায় তিনি শিউরে উঠতেন।

এদিকে সুন্দরী মেয়েটি ভাবত, ভগবান কবে তোমার কথা আমিও স্মরণ করতে পারব, কবে আমি তোমার একটু সেবা করতে পারব!

তাদের মৃত্যুর পরে দুই রকম ভাবনার ফলে দুই রকম গতি হল দু'জনের। সাধু গেলেন নরকে আর বারবনিতা গেল স্বর্গে। সাধু যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার এ রকম পরিণতি হল কেন? তখন যমরাজ তাকে বললেন—তুমি কী ভাল সংস্কার করেছ বল? নিজের বোধের বৃত্তিকে যেখানে সংযত করতে পারলে না সেখানে তুমি বারবনিতার কার্য বিচার করতে গেলে কী রকম করে? তোমার মনের চিন্তাধারা অশুদ্ধ ছিল এবং বারবনিতার ঈশ্বরীয় চিন্তার মধ্যে শুদ্ধ মনের বৃত্তি ছিল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বাইরে শাস্ত্র পড়ে ভিতরে বিকার থাকলে ওই রকমই হবে। বাইরের পরিবেশ change করা যায় না। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক সেখানে থেকেই নিজের মনের বৃত্তিকে শোধন করতে পারে। এটাই এই গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়। তাই মনীষীরা বলে থাকেন—আগে নিজেকে শোধন কর।

২৫। ৩। ৭২

১৬১

আধার তৈরি না-করে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দান ফলপ্রসূ হয় না। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

পিতা ব্যাসদেবের কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞান অবগত হয়ে শুকদেব আধারের কথা বিবেচনা না-করে অর্থাৎ অধিকারী ও যোগ্যতার মান বিবেচনা না-করে আনন্দে সবাইকে তা বিতরণ করতে থাকেন। এই দেখে পিতা তাঁকে নিষেধ করেন। তিনি বলেন যে, আধার তৈরি না-করে অর্থাৎ জমি তৈরি না-করে এবং যোগ্যতার মান বিবেচনা না-করে পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মতত্ত্ব নির্বিচারে সকলকে দিতে নেই। তাহলে এর অপব্যবহার হবে এবং পরিণামে তা লুপ্ত হবে। সুতরাং মুক্তির বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান লাভের বিজ্ঞান, ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মতত্ত্বের বিজ্ঞান সবার জন্য নয়। যিনি সেই বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনি প্রথমে যোগ্য অধিকারী তৈরি করে তার পরে তা তাকে প্রদান করবেন। এ-ই হল বিধান। যোগ্য অধিকারী তৈরি করা খুব কঠিন। অধিকারী ভিন্ন মুক্তির বিজ্ঞান, পরমতত্ত্বের বিজ্ঞান অপরের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কখনওই সম্ভব নয়। অনধিকারীর কাছে তা বিতরণ করা অতি গর্হিত, নীতিবিরুদ্ধ এবং অপরাধও বটে।

পিতার মুখে এই কথা শুনে শুকদেব বুঝতে পারেন যে, আধার তৈরি করার কৌশল তাঁর জানা নেই। আধার তৈরি করার কাজটি তিনি পিতাকেই নিতে বলেন আর বীজ বপনের কাজটি নিজের অধীনে রাখার কথা বলেন।

তার উত্তরে পিতা তাঁকে বললেন—তোমার মতো যোগ্য আধার তৈরি করতে আমাকে তপস্যা বা সাধনা করতে হয়েছে। বিনা তপস্যায় বা সাধনায় তোমার মতো আধার তৈরি হয় না। তোমাকে তৈরি করে তার পরে আমি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রদান করেছি। তুমি যদি এই পরমতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্যক্ অবগত হয়ে থাক তাহলে তা পরিবেষণ করার জন্য যোগ্য অধিকারী তৈরি করার কাজটিও তোমাকেই করতে হবে। অপরের দ্বারা তা হবার নয়।

পিতার এই কথাতে শুকদেব নিজের ত্রুটি হৃদয়ঙ্গম করে এই বিষয়ে বিচারপূর্বক অনুশীলন করেছিলেন। এই বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হয়েই তিনি পরে পিতার নির্দেশ অনুসারে আত্মবিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞানের অনুশাসন করতেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—আধার তৈরি করা থেকে শুরু করে বীজ বপন ও তার যথার্থ পরিচর্যা সদ্‌গুরুর দিব্যদৃষ্টির প্রভাবেই নিষ্পন্ন হয়। তা খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়। বাহ্যদৃষ্টিতে তা বোঝাও যায় না এবং জানাও যায় না।

আধার তৈরির অর্থ হল দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের পরিশোধন, গুরুশক্তি ধারণ ও বহনের যোগ্যতা লাভ এবং সামগ্রিক ভাবে সামঞ্জস্য বিকাশ সাধন। এটা নিজের

খেয়ালখুশি মতো হয় না এবং রাতারাতিও হয় না। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলেই দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব হয়। সত্ত্বগুণের প্রকাশবিকাশ দ্বারাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন সম্ভব হয়।

জীবনে সত্ত্বগুণের বিকাশ জন্ম জন্মান্তরের শুভ সংস্কার ও সৎ কর্মের ফলেই হয়ে থাকে। সত্ত্বগুণের অধিকারী সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অধিক ভাবে। সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণ দ্বারাই জীবের স্বভাবপ্রকৃতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। যে গুণের প্রাধান্য যার মধ্যে অধিক থাকে সেই গুণ অনুরূপ হয় তার স্বভাবপ্রকৃতি। যথার্থ ধর্মজীবন ও অধ্যাত্মসাধনার সংস্কারাদি সত্ত্বগুণের প্রভাবেই ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পায়। গুণের প্রকাশকেই ভাব বলে। যার যে রকম ভাব, তার সে রকম লাভ।

সদ্‌গুরুর কাজ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই সাধিত হয়। অধিকারী ভেদে যোগ্যতার মানের তারতম্য হয় এবং যোগ্যতা অনুসারে আত্মজ্ঞানের সাধনা ও সিদ্ধিলাভ হয়। উত্তম অধিকারীর পক্ষে দ্রুত সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়। সুতীব্র ব্যাকুলতাই হল সিদ্ধি লাভের কারণ। উত্তম অধিকারীর মধ্যে তা-ই পরিদৃষ্ট হয়। সদ্‌গুরুমাত্রই সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত তীব্র ব্যাকুলতার উপব গুরুত্ব দেন বেশি। এই তীব্র ব্যাকুলতাই হল স্বভাবের সম্যক্ সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তির কারণ।

দীক্ষা অনেক রকম আছে। শব্দের বা নামের দীক্ষাও আছে, আবার বোধের দীক্ষাও আছে। বোধের দীক্ষায় সব নাম সমান। শব্দের বা নামের দীক্ষা সমান নয়। কাজেই যারা হরি নাম পেয়েছেন তারা কালী নামে আঁতকে ওঠেন। বোধে সব সমান, মনে অসমান। বোধে সব থাকবে, কিন্তু কোনও ভেদ থাকবে না।

২৬। ৩। ৭২

১৬২

কেন্দ্রে গিয়ে না-মিলতে পারার কারণ বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প উল্লেখ করলেন।

একবার একজন লোক একটি আলমারি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে গেল। আলমারিটি দরজার কাছেই ছিল। আলমারির মালিক তা টানাটানি করছে দেখে একজন লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাকে সাহায্য করতে এল। দু'জনে মিলে সমানে আলমারি টানছে, কিন্তু কিছুতেই তা সরছে না। আগে কতবার সে একলাই আলমারি এখান থেকে ওখানে সরিয়েছে অথচ এখন কেন সরানো যাচ্ছে না—এই ভেবে মালিক খুব অবাক হল। তখন আবার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দু'জনেই নূতন উদ্যমে আলমারি সরাতে লাগল। পরে দেখা গেল যে, দু'জন দুই দিকে আলমারি টানাটানি করছে। যে মালিক সে ভাবছে, ঘরের এক দিক থেকে আরেক দিকে আলমারি নিয়ে যাবে এবং নবাগত লোকটি ভাবছে, ঘরের বাইরে আলমারি নিয়ে যেতে হবে। দু'জন দুই দিকে আলমারি টানছে ফলে তা সরানো সম্ভব হচ্ছে না।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—দু'জনের ইচ্ছাই যদি একমুখী হত তবে আলমারি সরানো সম্ভব হত, understanding দু'জনের এক নয় বলে আলমারি সরানো সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাপারও ঠিক এই রকম—aspirant যে, সে চায় এক রকম আর যাঁর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা নিচ্ছে তিনি চান আরেক রকম। একটি হল বহির্মুখী গতি, আরেকটি হল কেন্দ্রাভিমুখী গতি। দু'জন দুই দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে কাজেই কাজ সফল হচ্ছে না। জীবনসাধনার দু'টি দিক—একটি হল দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসাপেক্ষ এবং অপরটি দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিনিরপেক্ষ, কেবল বিশুদ্ধবোধের ব্যাপার। তা দুঃসাধ্য হলেও সম্ভবপর হয় যোগ্য উত্তম অধিকারীর পক্ষে। শুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা সফল হয় আপনবোধে সব মানার অভ্যাস দ্বারা। আপনবোধে সব মানা পূর্ণ হলে সত্য ঈশ্বরদর্শন হয়। আপনবোধে সব মানাই হল উত্তম সাধনা।

২৯। ৩। ৭২

১৬৩

বিশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বরদর্শন হয়। Absolute faith-এর দৃষ্টান্ত হলেন হনুমান, প্রহ্লাদ প্রভৃতি। প্রত্যেকের constitution-এ এই faith আছে, কিন্তু তা আবৃত। ভক্তের সঙ্গ করলে তা আবার জেগে ওঠে।

সৎপ্রসঙ্গকালে সৎ-এর প্রভাবে জীবনে কী ভাবে আমূল পরিবর্তন আসে তা বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

হরিদাস এত অত্যাচারিত হয়েও হরি নাম ছাড়তে পারলেন না। কাজি তাঁকে যত মারই দেয় তবুও তাঁর মুখ থেকে আল্লা নাম না-বেরিয়ে নিরন্তর হরি নামই বেরোতে থাকে। এত মেরেও যখন হরিদাসের মুখ থেকে আল্লা নাম বার করাতে পারল না তখন কাজি অবাক হয়ে গেল।

হরিদাস কাজিকে বললেন—আমি তো সারাক্ষণই আল্লা নাম করি, কিন্তু এখন আল্লা নাম করতে যাওয়ামাত্র হরি নামই বেরিয়ে আসছে। কাজেই তুমি হরি নাম কর তবে দেখতে পাবে যে, তোমার মুখ থেকে আল্লা নামটিই বেরিয়ে আসবে।

এই ভাবে হরিদাস কাজির মুখ দিয়ে হরি নাম বার করিয়ে ছাড়লেন।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—সঙ্গের মাধ্যমে কোন ফাঁকে যে তাঁর কৃপা ভিতরে ঢুকে যায় তা জানতেও পারা যায় না। ভগবানের বিজ্ঞান প্রকাশ হয় একটি medium-এর মাধ্যমে।

২০। ৪। ৭২

১৬৪

প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ছোট একটি গল্প বললেন।

এক সাধকের কাছে ব্রহ্মচারী, সাধক, বিজ্ঞানী, গৃহী, যুবক, গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেকেই আসত। এত লোক সেখানে যেতেন বলেই পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই দ্বন্দ্ব-

বিবাদ লেগেই থাকত। সকলেই নিজের মতটা support করার জন্য যার যত ক্ষমতা সেই মতো যুক্তিবিচার করত। একদিন মহাত্মা এ সব দেখে বললেন—নিজেকে কে কতটা justify করতে পারে দেখা যাক। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি একদিন যুক্তিতর্কের লড়াই শুরু হয়ে গেল। সকলেই যে যার মতো যুক্তি দেখাতে লাগল। অবশেষে সকলেই ক্লান্ত হয়ে চুপ হয়ে গেল। এক কোণে বসেছিল একটি ছেলে। সে বসে শুধু মজা দেখছিল। সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন সে কলসি থেকে জল এনে সকলকে জল খেতে দিল। জল খেয়ে তারা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতেই আবার যুক্তিতর্ক শুরু হয়ে গেল। এই ভাবে প্রতিদিনই একটা সময় এ রকম যুক্তিতর্কের লড়াই চলত এবং ছেলেটি সকলের শ্রান্তিক্লান্তি দূর করার জন্য জল খাইয়ে তাদের সেবা করত। এক মাস পরে মহাত্মা ছেলেটিকে বললেন—সকলেই এখানে নিজের পক্ষ সমর্থন করে বলছে, কিন্তু তুমি তো কিছু বললে না। ছেলেটি উত্তর দিল—আমার হয়ে যা বলবার তা তো আপনিই বলছেন। এই উত্তরটি শুনে মহাত্মা ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি ঠিক জ্ঞানীর মতো কথা বলেছ। এখানে যতজন আছে সব অজ্ঞানী, একজনই একমাত্র জ্ঞানী, সে তুমি। জ্ঞানের ভান করে সবাই মার খায়।

এই গল্পের মাধ্যমে বোঝা গেল আসল জ্ঞানী কে। জানাজানি, পারাপারি, বোঝাবুঝি এ সব অজ্ঞানের লক্ষণ। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি জানাজানি, বোঝাবুঝি এ সব নিয়ে থাকেন না। দেখা, শোনা, বোঝা, জানার পরে শ্রান্তক্লান্ত হলে শান্ত হবার জন্য যিনি সহায়তা করেন তিনিই জ্ঞানী।

২৩। ৪। ৭২

১৬৫

প্রথমে মনে হয় জীবন প্রকৃতির ইচ্ছায় চলে, আসলে তা নয়। জীবন চলে স্বভাবের ইচ্ছায়। বাইরেব অংশকে প্রকৃতি বলে এবং ভিতরের অংশকে স্বভাব বলে। প্রত্যেককেই এই স্বভাবে গিয়ে পৌঁছতে হবে, তাহলেই স্ববোধের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হবে। স্বভাববোধে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা প্রকৃতির প্রভাবে চলেন না, স্ববোধের প্রভাবে চলেন। তাঁদেরই সদ্‌গুরু বলে। সদ্‌গুরু দ্বার খুলে না-দিলে এই দ্বার খোলা যায় না। চাবি থাকে স্ববোধের কাছে। স্বভাবের বিজ্ঞান সকলের মধ্যেই সমান। সদ্‌গুরুই তা ধরিয়ে দেন এবং যিনি তা ধরতে পারেন, তিনি সদ্‌গুরুতে পরিণত হন। সদ্‌গুরুর সাহায্যেই মানুষ সদ্‌গুরুতে পরিণত হয়। আগে যত সদ্‌গুরু এসেছিলেন তাঁরা, তারও আগে যাঁরা সদ্‌গুরু ছিলেন তাঁদের সাহায্যেই সদ্‌গুরুতে পরিণত হয়েছিলেন। আবার এখন যাঁরা সদ্‌গুরু আছেন, তাঁদের সাহায্যে অন্য লোকও সদ্‌গুরুতে পরিণত হবে। এই হল স্বভাবের বিজ্ঞান।

স্বভাবের দেহ আছে এবং প্রকৃতিরও দেহ আছে। স্বভাবের দেহ ঠিক মতো ধরা পড়লে প্রকৃতির দেহ স্বভাবের দেহকে সেবা করতে বাধ্য হয়। ধরা না-পড়া পর্যন্ত মানুষের দেহগত বুদ্ধি থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক ভক্ত বহুদিনযাবৎ সাধনভজন করে, কিন্তু গুরুর আর দেখা পায় না। একজন তাকে বলল—তুমি তোমার গুরুকে পাচ্ছ না, তাতে অসুবিধা কিছু নেই। জগতে সদ্‌গুরু বহু আছেন, তাঁদের মধ্যে তোমার গুরুকেই দেখ। তাঁদের তুমি আপন গুরুরূপেই মেনে নিয়ে তাঁদের সঙ্গ কর। তাহলেই তোমার গুরুসঙ্গ হবে এবং সব কিছু পাবে, কারণ এক অখণ্ড গুরুশক্তিই ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গুরুর মাধ্যমে কাজ করে।

বহুদিন যায়, ভক্তটি একই ভাবে সাধনভজন করে যাচ্ছে। সংসারে অভাব-অনটন এবং দুঃখকষ্ট আছে। তবুও সে কিছুই চায় না। তার জেদ চেপে গেল। কিছু না-চেয়ে এই ভাবেই সে জীবনটা কাটিয়ে দেবে এবং না-চেয়ে কতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়—এটাই তার দেখার ইচ্ছে ছিল। অবশেষে অভাব-অনটন এত চরমে উঠল যে, কোনও কোনও দিন শুধুমাত্র জল ও তুলসীপাতা খেয়েই তাকে দিন কাটাতে হত। সে যথারীতি অর্থ উপার্জনের চেষ্টাও করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই কোনও সুরাহা হচ্ছিল না। এদিকে সংসারের এই অবস্থা পরিবারের অন্যান্য লোকজনও মেনে নিতে পাবছিল না।

সকলের তাগাদায় সে তখন সদ্‌গুরুর কাছে যেতে শুরু করে। সদ্‌গুরুব কাছে সে নিয়মিত যায়, কিন্তু নিজের দুঃখকষ্টের কথা তাঁকে কিছুই বলে না। সদ্‌গুরু তার অবস্থা সবই বুঝতে পেরেও তাকে কিছু বলেন না। কিছুদিন পরে একদিন সদ্‌গুরু তাকে বললেন—তোর তো খুবই কষ্ট এবং অর্থের অনটনও খুব চলছে। আমার ইষ্ট এসে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, তোর জন্য কিছু ধনের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তবে এর জন্য তোকে যে-ভাবে নির্দেশ দেওয়া হবে সে-ভাবেই কাজ করতে হবে। এটা তোকে আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ভক্তটি গুরুর নির্দেশ মতোই চলবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাতে সদ্‌গুরু তাকে বললেন—কাল সকালে তোর দবজার কাছে একজন চরমতম অভাবগ্রস্ত এক ভিখারি মূর্তি আসবে। প্রতিজ্ঞা কর যে, এই লাঠিটি নিয়ে তুই কাল সকালে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি এবং ভিখারিটি আসামাত্র এই লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করবি। তখনই সেই ভিখারি স্বর্ণমূর্তিতে পরিণত হবে। তাহলেই তোর সকল দুঃখ ঘুচবে।

এই কথা শুনে ভক্ত প্রথমে চমকে উঠল। মাথায় আঘাত কবতে হবে ভেবে শিউরে উঠল। অথচ সদ্‌গুরুর নির্দেশে প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছে আগেই। কাজেই নিরুপায় হয়ে ভক্তটি এই কাজ করতে স্বীকৃত হল।

সদ্‌গুরু বললেন—তুই তো নিজের ইচ্ছায় কিছু করছিস না। কত অভাব-অনটন, দুঃখকষ্ট সহ্য করেও মুখ ফুটে তুই কখনও কিছু চাসনি। তাই তোব জন্য ইষ্টের এই ব্যবস্থা। তোর ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। তোর সমস্ত ভার গুরুই বহন করবেন। তোর কোনও চিন্তাভাবনা নেই। সদ্‌গুরুর মূর্তিই ভগবানের পোশাক। সব সদ্‌গুরুর মধ্যে বসে এক ভগবানই কাজ করেন।

সদ্‌গুরুর আশ্বাস পেয়ে ভক্তটি যথারীতি বাড়িতে গিয়ে দরজার পাশে লাঠিটি রেখে দিল।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে ভিখারিটি যখন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে ভক্তটি 'জয়গুরু' বলে লাঠি দিয়ে এক আঘাত দিতেই ভিখারির মুখ দিয়ে ভক্তের ইষ্ট নামটি বেরিয়ে এল এবং সে মাটিতে পড়ে এক স্বর্ণমূর্তিতে পরিণত হল।

আশেপাশের অনেকেই ঘটনাটি দেখতে পেয়েছিল। ভক্ত তাড়াতাড়ি গুরুর নির্দেশ মতো মূর্তিটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করল। সে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবল, গুরু আমি না-বুঝে তোমার কেরামতি দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু কেরামতি দেখতে চাওয়ার ফলে তুমি যা করলে তার ঋণ শোধ করতে আমার কত জনম যাবে! এ তুমি কী করলে!

গুরু তার অলক্ষ্যে থেকে এই স্বর্ণমূর্তির মাধ্যমে তাকে আশ্বাস দিলেন—তোর কোনও ভয় নেই। সারাজীবন দুঃখকষ্ট পেয়েও কোনও দিন তুই কোনও কিছু চাসনি বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভক্তটির অভাব-অনটন, দুঃখকষ্ট শেষ হয়ে গেল। এদিকে অন্যান্য লোকেরা যারা ঘটনাটি দেখেছিল, তারা ভাবল যে, সকালে দরজা খুলে ভিখারি দেখলে তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলেই স্বর্ণমূর্তি বেরিয়ে পড়বে। সেই জন্য অনেকেই ভিখারির মাথায় আঘাত করতে লাগল। কিন্তু স্বর্ণমূর্তির প্রকাশ তো হলই না বরং একের পর এক ভিখারি মারা যেতে লাগল। এই ভাবে কথাটি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। ভিখারির মাথায় আঘাত দেবার ব্যাপারটি এত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, অবশেষে পুলিশের কাছে এই সংবাদ গেল।

এদিকে গুরুকৃপায় সেই ভক্তের বাড়িতে মনুষ্যপ্রমাণ সেই বড় স্বর্ণমূর্তিখানি ক্রমশ ছোট হতে লাগল। ছোট হতে হতে ক্রমশ তা ছোট একটি স্বর্ণমূর্তির আকারে পরিণত হল। একদিন সকালে তার বাড়িতে পুলিশ এল ধনরত্ন ও মনুষ্যপ্রমাণ স্বর্ণমূর্তির সন্ধানে। ভক্তটি পুলিশকে তার সোনার ছোট্ট বিগ্রহখানা দেখিয়ে দিল। পুলিশ মনুষ্যপ্রমাণ কোনও মূর্তির সন্ধান না-পেয়ে চলে গেল।

যে সত্যিকারের ভক্ত, সে গুরুর নির্দেশেই সব কিছু করে এবং সেই জন্য গুরু তাকে সব সময় রক্ষা করেন। গুরুর নির্দেশিত পথে না-চলে, গুরুর কাছে শিক্ষাদীক্ষা না-পেয়ে শুধু খামখেয়ালি ভাবে স্বার্থের জন্য নিজের খুশি মতো সাধুর বা গুরুর বাহ্যিক পোশাক, চালচলন ও আচরণ দেখে তার অনুকরণ বা নকল করলে যে ফল পাওয়া যায় এবং গুরুর নির্দেশ মতো সাধনা করে যে ফল পাওয়া যায় তার মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই গল্পটির মাধ্যমে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় বিশেষ ভাবে। ভক্ত হওয়া বড় কঠিন। ভক্ত লাখ লাখ মেলে না।

২৩। ৫। ৭২

১৬৬

সৎপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে লোকে ভাবে এ সব imaginary talks —এ সব দিয়ে জগতের কী উপকার হবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

প্রথম যিনি ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেন তাকেও সবাই পাগল বলেছিল। তিনি একদিন একটি তামার তার দিয়ে মরা ব্যাঙ স্পর্শ করাতে গিয়ে দেখলেন মরা ব্যাঙটি তামার তারে স্পর্শ করাবার সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন কেঁপে উঠল। এটা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন এবং অপরকেও তিনি এর demonstration দিতে লাগলেন।

একদিন এক lord family-র মহিলা তার নাতিনাতনি নিয়ে খেলা দেখতে এলেন। বিজ্ঞানী তাকেও তামার তার দিযে মবা ব্যাঙ নাচিয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন। নাতি-নাতনি নিয়ে খুব আগ্রহ সহকারে তিনি খেলা দেখলেন। তার পরে হঠাৎ মহিলাটি সেই বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করে বসল—সাধারণ মানুষের কী হবে এই খেলা দেখে?

বিজ্ঞানী মহিলাটির নাতিনাতনিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এরা আপনার কে?

মহিলা—এরা আমার নাতিনাতনি।

বিজ্ঞানী—আপনার নাতিনাতনির ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করেছেন কি?

মহিলা—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করেছি।

বিজ্ঞানী—আপনার নাতিনাতনি বড় হয়ে কেমন হবে তা আপনি কিছুই জানেন না, তবুও তাদের জন্য আপনি ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে রকমই এটা দিয়ে যে কী হবে তা আমি এখনই বলতে পারছি না, তবে কিছু যে একটা হবে এটা ঠিক। আমি এমন একটি জিনিস রেখে দিয়ে যাব, বিশ বছর পরে টিমটিমে গ্যাসের আলো বর্তমানে যে-সব রাস্তায় জ্বলছে সেই সব রাস্তা আলোতে একেবারে ঝলমল করে উঠবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীর কথা ফলেছিল। প্রায় পনেরো বছর পরে সমস্ত রাস্তাঘাট ইলেকট্রিকের আলোতে ঝলমল করে উঠেছিল। বিজ্ঞানী বেঁচে থাকতেই তার এই আবিষ্কারের কথা চার দিকে প্রকাশ হয়ে পড়ে। যে জিনিস আবৃত ও অজ্ঞাত ছিল তা তিনি প্রকাশ করে দিয়ে গেলেন। সেই প্রকাশের বিরাট অভিব্যক্তি শিগগিরই জগতে নেমে আসছে, নয়ত সেই অজ্ঞাত রাজ্যের খবর কী করে পাওয়া যাবে।

৩০। ৫। ৭২

১৬৭

ইন্দ্রিয় হল প্রাণের অংশ, তা দুর্বল হতে পারে না। ইন্দ্রিয় দুর্বল হবার কারণ হল, যাঁর কৃপায় মানুষ সব পাচ্ছে তাঁর দিকে কারও কোনও খেয়াল নেই। সেই জন্য বিবেক আছে। সে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের সেবা করার জন্য সচেতন করে দেয়। বহুকাল প্রাণের সেবা না-করাতে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটু রাস্তা block করে দেয়, তারপর সে নিজে খেলতে শুরু করে। বার্ধক্যেও মহাপুরুষদের ইন্দ্রিয় দুর্বল হয় না, সবল থাকে।

প্রসঙ্গের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী খুবই বৃদ্ধ বয়সে একবার কোর্টে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন। হাকিম সাহেব লোকনাথবাবাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি অত দূরের ঘটনা কী করে দেখলেন?

লোকনাথবাবা বললেন—আমি তো চোখের অপপ্রয়োগ করিনি কাজেই আমার চোখ নষ্ট হয়নি। আমি সবই দেখতে পাই। তিনি আরও বললেন—আধ মাইল দূরে যে গাছটি আছে তার গোড়ায় তিন সারি পিঁপড়ে আছে, তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

হাকিম সাহেব লোকনাথবাবার কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেখেছিলেন পর্যন্ত।

একজন লোক হাকিমকে বলল—সাহেব, আপনি এঁর মহিমা জানেন না। এঁর সঙ্গে লড়তে যাবেন না। তিনি তো আপনার ভিতরের গলদগুলি পর্যন্ত দেখতে পান। শুধু এই জন্মের কেন, বহু জন্ম আগের সব ঘটনাও তিনি দেখতে পান।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বিচার করতে বসেছ কার শক্তিতে? তিনি তো ইচ্ছা করলে গদি থেকে এখনই নামাতে পারেন, তাহলে কি আর গদিতে উঠতে পারবে কোনও দিন? মানুষ একবারও ভাবে না কার শক্তিতে সে সব করছে—একটুখানি spring-এর মতো চাবি দেওয়া আছে, সেই ফুটানিতেই মানুষ অস্থির।

৫। ৬। ৭২

১৬৮

প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

রাজা অত্যাচারী ও প্রজাবৎসল সব রকমই হয়ে থাকে। এক প্রজাবৎসল রাজা প্রজাদের জন্য খুবই চিন্তা করতেন। কী ভাবে তাদের কল্যাণ বা সুখ হবে সারাক্ষণ রাজার এই চিন্তা। বাবামা যেমন সন্তানের কথা ভাবেন সেই রকম সত্যিকারের রাজাও সন্তানতুল্য প্রজাদের কথাই সব সময় ভাবেন। একবার রাজা ঢোল পিটিয়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যে কোনও রাতে তার খুশি মতো যে কোনও লোকের বাড়িতে উপস্থিত হবেন। সেখানে গিয়ে বাড়ির মালিককে জাগ্রত না-দেখলে তিনি ফিরে যাবেন। আর যদি জাগ্রত দেখেন তবে তাকে তিনি প্রচুর অর্থ দেবেন। এই জন্য সারারাত প্রত্যেকের বাড়িতে আলো জ্বেলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। তেলের যাতে অভাব না-হয় সেই ব্যবস্থাও তিনি করলেন। সকলেই খুব সজাগ হয়ে রইল কখন রাজা আসবেন। রাতে সবাই জেগে রইল বাতি জ্বালিয়ে। এ রকম ভাবে দু-তিন দিন চলে যাবার পরে সকলের উৎসাহ কমে আসতে লাগল। রোজই সবাই জেগে থাকে, কিন্তু রাজা আর আসেন না। শহরের গণ্যমান্য লোক যাঁরা, তাঁরা ভাবলেন, কী আর হবে মিছিমিছি রাত জেগে, ঘুমিয়ে পড়া যাক। এ রকম ভাবে একে একে সবাই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

শহরের একপ্রান্তে এক বুড়ি তেলের প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করে বসে রইল—যদি রাজা আসেন। তার কিছুই নেই। সে নিজের সামান্য খাবারটুকু না-খেয়ে রাজার জন্য রেখে দিত।

রাজা কিন্তু ছদ্মবেশে রোজই সমস্ত শহর ঘুরে ঘুরে দেখতেন। কিছুদিন চলে যাবার পরে রাজা দেখতে পেলেন একে একে সব বাড়ির আলোই নেভানো, কিন্তু একটি কুটিরে রোজ রাতে আলো জ্বালা থাকত।

শেষরাতে এক রাখাল বালকের বেশে রাজা ঐ বুড়ির কুটিরে হাজির হতেন এবং তাকে বলতেন—বুড়ি, তুমি বাতি জ্বালিয়ে বসে কেন? ভোর হয়ে গেল, এখনও ঘুমাওনি তুমি? বুড়ি চমকে উঠে বলত—ভোর হয়ে এসেছে বুঝি? তাহলে আজ আর এলেন না রাজা। এই বলে রাজার জন্য যে খাবারটা সে রেখে দিত সেটা রাখালকে খাইয়ে দিত। রাখাল বলত—বুড়ি তুমি খাও। বুড়ি বলত—আমি রাজার উদ্দেশ্যে রেখেছি, ওটা কি আর আমি খেতে পারি? তুমি খেয়ে কাজে যাও তাহলেই খুশি হব আমি। এই ভাবে পর পর বারো দিন কেটে গেল। বারো দিনই বুড়ি অভুক্ত রইল। বারো দিনই রাজা রাখালবেশে এসে বুড়ির বাড়ি হাজির হত আর বলত—তুমি কেন মিছিমিছি বসে থাক? কত বড় বড় লোক আছেন তাদের বাড়ি না-গিয়ে রাজা তোমার বাড়িতে আসবেন কেন? তুমি বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

বুড়ি রাখাল বালকের কথা শুনত না। একদিন বাখাল বালক বুড়িকে বলল—তুমি রাজাকে এত ভালবাস কেন? বুড়ি—এমন রাজা কি আর আছে! যিনি এতজনের কথা ভাবছেন, আমি একা তার কথা কেন ভাবতে পারব না? সারাজীবন তো আমার চলে গেল কারওর জন্য কিছু না-ভেবে, কারওর জন্য কিছু না-করে, এখন না-হয় রাজার কথা একটু ভাবি। এই বলে বুড়ি যে ফলটি নিজে না-খেয়ে রাজার জন্য রেখেছিল সেটা রাখালের হাতে দিল। ফলটি তেমন ভাল ছিল না। একটু পচাই ছিল। তবু রাখালবেশী রাজা সেটা খেয়ে ফেললেন। তারপর বেলার দিকে দেখা গেল রাজার রথ লোকজন নিয়ে ছুটছে বুড়িকে নিয়ে যাবার জন্য। রাস্তায় লোকজনও ছুটোছুটি করে এল—কার বাড়িতে রাজা যান দেখবার জন্য। অবশেষে দেখা গেল সেই বুড়ির বাড়িতে রাজা এসে তাকে বললেন—তুমি চলে এস আমার সঙ্গে রাজবাড়িতে। তুমি আমার রাজপ্রাসাদে হবে আমার আরাধ্যা দেবী। আমি তোমার পূজা করব। বুড়ি তো প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত রাজা বুড়িকে জোর করে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। সেখানে রাজা তার সেবা করতেন। বুড়ি তো কিছুতেই তার সেবা নিতে চাইত না। কিন্তু রাজা তার কোনও কথাই শুনতেন না। নিজের হাতে তার সেবা করতেন, খাওয়াতেন ও আদর করতেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভক্তের জন্যও ভগবান এই রকম কাঁদেন, কিন্তু ভগবানের জন্য ভক্ত কতটা কাঁদে? ভগবান ভক্তকে কতটা উচ্চ আসনে বসিয়ে দেন, আমির ওমরাহ, গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা পর্যন্ত এই স্থান পান না।

২৩। ৬। ৭২

১৬৯

ভগবান এলেও কেউ পরোয়া করে না, গ্রহণ করতে পারে না—তারই উদাহরণমূলক একটি গল্প শোন।

এক গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এত গরিব যে, নারায়ণশিলাকে গঙ্গাজল ও তুলসী দেবার ক্ষমতাও তার রোজ থাকে না। একসময় প্রখর রোদের উত্তাপে তুলসীপাতাও শুকিয়ে গেল, গঙ্গাজলও নেই।

স্বামী ভিক্ষায় বেরিয়েছেন এবং রুগ্ণা স্ত্রী রোগে বিছানায় শুয়ে আছে। স্ত্রী ভয়ে ভয়ে ভাবছে, নারায়ণসেবা কী করে হবে? এদিকে স্বামী ভিক্ষায় বেরোবার আগে স্ত্রীকে বারবার নারায়ণসেবায় যাতে ত্রুটি না-হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলে গেলেন।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণকে বললেন—তোমার ভক্তের এত কষ্ট, কিছু ব্যবস্থা কর। ভক্তের দুঃখে বিচলিত হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভক্তের বাড়িতে একঝুড়ি বোঝাই চাল, ডাল, তরকারি, ফলমূল নিয়ে একসঙ্গে এলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ির দরজার কাছাকাছি এসে তাঁরা ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন—কে আছ বাড়িতে? এগুলি নাও, ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ব্রাহ্মণী উঠতে পারছিল না, সে বলল—এগুলি দরজার কাছে রেখে দাও, ব্রাহ্মণ একটু পরেই আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ দরজাব বাইরে ঝুড়িটি রেখে ব্রাহ্মণীর কাছে এসে বললেন—আমরা অপেক্ষা করতে পারছি না। ব্রাহ্মণী বলল—আমি অসুস্থ, গঙ্গাজল ও তুলসীর অভাবে নারায়ণসেবাও আজ করা হয়নি। খাবার তো কিছুই নেই। তোমরা এসে বস, স্বামী ফিরে এলে তার পরে যেও তোমরা, নয়ত সে কষ্ট পাবে। তোমাদের কী দিয়েই বা সেবা করব। তখন তাঁরা ঘরের এক কোণায় যে জল, তুলসীপাতা ছিল তা দিয়েই সেবা করতে বললেন। ব্রাহ্মণী বলল—ঘরের এক কোণায় যে তুলসীপাতা ও গঙ্গাজল আছে সেগুলি অনেকদিনের পুরানো। পচে গন্ধ বেরোচ্ছে, কাজেই নারায়ণসেবায় সে সব দেওয়া যাবে না। ছদ্মবেশী লক্ষ্মী-নারায়ণ বললেন—ঐ জলই তুমি নারায়ণের মাথায় ছিটিয়ে দাও, তা দিয়েই পূজা হবে। দুর্গন্ধযুক্ত জল বলে ব্রাহ্মণী প্রথমে রাজি হল না। পরে ছদ্মবেশী লক্ষ্মী-নারায়ণের বারবার অনুরোধে ঐ জল দিয়েই ব্রাহ্মণী নারায়ণশিলার সেবা করল। নারায়ণশিলা আনন্দে একেবারে নেচে উঠল। শিলাকে এই ভাবে আনন্দে নেচে উঠতে দেখে ব্রাহ্মণী অবাক হয়ে গেল। তার গোড়া থেকেই সেই দম্পতিকে সাধারণ মানুষ নয় বলে একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল। এইবার তাঁদের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণী বলল—তোমরা কে? পরিচয় দাও। তখন তাঁরা তাঁদের দিব্যজ্যোতির্ময় মূর্তিতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিলেন।

ব্রাহ্মণী অবাক হয়ে বলল—যে তোমার পূজা করে তাকে দর্শন না-দিয়ে আমাকে কেন দর্শন দিলে?

ব্রাহ্মণীকে দর্শন দেবার পরে ছদ্মবেশী লক্ষ্মী-নারায়ণ অন্তর্ধান হলেন।

ব্রাহ্মণ আসতেই ব্রাহ্মণী সব কথা খুলে বলল এবং এও বলল যে, আজ লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বয়ং একঝুড়ি চাল, ডাল, তরকারি নিয়ে এসেছিলেন। ব্রাহ্মণীর কথা তো ব্রাহ্মণ কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। তারপর ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ক'দিন তুমি নারায়ণসেবা কী ভাবে করেছিলে? ব্রাহ্মণী বলল—ঘরের কোণে যে দুর্গন্ধযুক্ত জল ও তুলসী ছিল তা দিয়েই নারায়ণসেবা করেছি। ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি এই পচাজল দিয়ে নারায়ণসেবা করলে? ব্রাহ্মণী বলল—হ্যাঁ, কিন্তু এই সেবাতেই

নারায়ণ কত খুশি হয়েছেন, আনন্দে একেবারে নেচে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মণী যতই তাকে সে সব কথা বলে ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তখন ব্রাহ্মণী নারায়ণকে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—তুমি আমাকে যে রকম দর্শন দিয়েছিলে ঠিক সে রকম ভাবে আমার স্বামীকেও দর্শন দাও। এই বলে ঘট থেকে সেই জল ও তুলসীপাতা সবটা বিগ্রহের গায়ে ঢেলে দিতেই দিব্যজ্যোতিতে ঘরটা ভরে গেল এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বয়ং জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেই দৃশ্য ব্রাহ্মণ সহ্য করতে পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবানকে ষোলো আনা আত্মসমর্পণ না-করলে, ষোলো আনা মানা না-হলে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন মেলে না। তবে তিনি যাকে কৃপা করে দর্শন দিতে চান তাকে তিনি দর্শন দেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এক অদ্ভুত লীলাখেলা হয়। তা ভক্তই শুধু বোঝে, অন্যের কাছে তা অনুমান ও আন্দাজের ব্যাপার, তাই তাদের সেই সত্য অনুভূত হয় না। এও ঈশ্বরের এক বিশেষ মহিমা। জীবনভর জানা না-জানার এক অদ্ভুত দোলায় মানুষকে চলতে হয়। এই দোটানা জীবনের মধ্যে কখনও কারও কারও জীবন তলিয়ে যায় এক মহা আনন্দের সাগরে।

২৭। ৬। ৭২

১৭০

'এক চাওয়াতেই যেন সব চাওয়া শেষ হয়ে যায়'—এটাও গুরুর কাছে শিখে নিতে হয়। চাওয়া যদি গুরু শিখিয়ে না-দেন তবে আর হয় না। মানুষ চায় এমনভাবে যে, একটা চাইলে দশটা বাড়ে। পরে আর সে make-up দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

একজন লোকের তিনটি বড় দোষ ছিল। প্রথম দোষ হল সে অন্ধ, দ্বিতীয় দোষ হল তার কর্মক্ষমতা নেই ও স্বল্প আয়ু এবং তৃতীয় দোষ হল সে দরিদ্র। এই ত্রিদোষ নিয়ে সংসারে কী ভাবে সে শান্তি পেতে পারে? বেশির ভাগ মানুষেরই এই অবস্থা।

সংসারে বেশির ভাগ লোকই এই ভাবে অশান্তি ভোগ করে। এই লোকটি এক মহাত্মার কাছে শুনল, সৎসঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনলে ও ঈশ্বরকে ডাকলে উপকার পাওয়া যায়, তখন তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। ঈশ্বর ব্যবস্থা করে দেবেন, এই আশায় সে তাঁকে ডাকতে শুরু করল। রাতদিন কেঁদে কেঁদে ডাকতে ডাকতে ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন তার কাছে।

ভগবান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাও তুমি? একটিমাত্র বর দিতে পারব। সে খুব মুস্কিলে পড়ল। একটিমাত্র বর চাইতে হবে অথচ দোষ তিন রকমের।

সে ভাবল, ভগবানের কাছে এমন একটা কিছু বর প্রার্থনা করতে হবে যার দ্বারা তিনটি অভাবই পূরণ হয়। কী ভাবে প্রার্থনা করবে তা বুঝতে না-পেরে লোকটি শুধু মহাত্মার কথা স্মরণ করছে আর ভাবছে, তুমি যখন বলেছিলে তখন বুঝতে পারিনি

যে, সত্যি সত্যি তিনি আসবেন। কিন্তু এখন কী করে চাইব এমন একটি বর যার দ্বারা আমার তিনটি দোষ নষ্ট হয়ে যায়। মহাত্মার কথা ভাবতে ভাবতে ভিতর থেকে মহাত্মার নির্দেশ যেন ফুটে উঠল। সেই নির্দেশ পেয়ে লোকটি ভগবানকে বলল—সোনার বাটিতে করে দুধ খাচ্ছে এমন নাতির মুখ যেন আমি দেখে যেতে পারি। এই একটি প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি বর পূরণ হয়ে যাবে। সোনার বাটিতে দুধ খেতে হলে ধনী হতে হবে। নাতির মুখ দেখতে গেলে চোখ লাগবে এবং অনেকদিন পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতেও হবে। এই ভাবে তার সবগুলি চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেল।

৩০। ৬। ৭২

১৭১

শরণাগতি হল সহজতম পথ যার সাহায্যে আনন্দের মধ্যে মানুষ থাকতে পারে। এ ছাড়া আর কোনও কিছুর দ্বারা আনন্দে থাকতে পারবে না। জ্ঞানবিচার দিয়ে সব আটকে যাবে, কারণ এর পরে আর কোনও প্রশ্নই চলবে না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে একটি গল্প বললেন।

অষ্টাবক্র মুনির জন্মের পরে দেখা গেল তাঁর দেহে আটটি বক্র অথচ বুদ্ধি, জ্ঞান সব কিছুই ঠিক আছে। তাঁর দেহের এই রকম অদ্ভুত প্রকাশ কেন হল সেই সম্বন্ধে যাকেই জিজ্ঞাসা করা হয় কেউ কোনও উত্তর দিতে পারে না। তার পরে তাঁর মনে হল, আমি তো নিজেকে সৃষ্টি করিনি। সৃষ্টিকর্তা বানিয়েছেন আমাকে। কিন্তু কেন এ রকম বানিয়েছেন? দেহ বক্র অথচ বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ করে দিয়েছেন—কেন? দু'টিই unbalanced। তিনি এক মহাত্মার কাছ থেকে সাধনপদ্ধতি জেনে নিত্য সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মা আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

ব্রহ্মা—আমি ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা।

অষ্টাবক্র—আমার এই দেহ এত বিকৃত করে কেন সৃষ্টি করেছ?

ব্রহ্মা—যেমন তোমার প্রারব্ধ ছিল সেই রকম করেই সৃষ্টি করেছি। তিনফুট জিনিস তৈরি করতে গেলে তিনফুটের উপকরণ দরকার, একফুটের উপকরণ হলে হবে না। তোমার যা প্রারব্ধ ছিল সেই অনুযায়ী বানিয়েছি।

অষ্টাবক্র—প্রারব্ধ এ রকম হল কেন?

ব্রহ্মা—প্রথমে সৃষ্টির পরে চাওয়া শুরু হয়, তার ফলে চাওয়ার বিকার আসে। এটা বহু জনম ধরেই চলে। বিকৃত হতে হতে বহু ভাগে বিভক্ত হয়। তার পরে বহু জনম পরে আবার নির্বিকার চাওয়া হয়।

অষ্টাবক্র—কে এই সব চাওয়া সৃষ্টি করেছে? কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে?

ব্রহ্মা—আমার দ্বারা।

অষ্টাবক্র—তবে আমার কেন এ রকম হল?

ব্রহ্মা—তুমি আবার আলাদা কে? 'আমার, আমার' বলছ কেন?

অষ্টাবক্র—আমি সৃষ্টিকর্তা নই তবুও 'আমার, আমার' করছি কেন? তুমি আমার এই ভুলটা বুঝিয়ে দেবে কি?

ব্রহ্মা—বোধটা এমনই বস্তু যে 'আমার' বললে আমার shape নেবে আর 'তোমার' বললে তোমার shape নেবে।

অষ্টাবক্র এই কথা শুনে অতবড় জ্ঞানী হয়েও মুস্কিলে পড়লেন। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রহ্মা—এবার কী বলবে বল।

অষ্টাবক্র—কী বলব বুঝতে পারছি না। তুমি সামনে আসতে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আবার যখন মনে পড়বে তখন ডাকব। একবারে সবটা মনে আসছে না।

ব্রহ্মা—তাহলে দেখ আমিই আবার চাওয়াটা সৃষ্টি করে ডাকবার কারণ তৈরি করব, তবেই চাইতে পারবে।

অষ্টাবক্র—তুমি সব গোলমাল সৃষ্টি করে রেখেছ।

ব্রহ্মা—আমার কাজ হল সৃষ্টি করে দেওয়া, তার পরের কাজ বিষ্ণুর department।

তখন অষ্টাবক্র বিষ্ণুকে ডাকতে শুরু কবলেন। বিষ্ণু এলে অষ্টাবক্র তাঁরে বললেন—তুমি এ কী করেছ, এ রকম ভাবে আমাকে রেখেছ কেন?

বিষ্ণু—আমি ঠিকই করেছি, ঠিক ভাবেই পালন করছি। প্রাণরূপে আমিই পালন করছি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু দু'জনেই এই ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তখন অষ্টাবক্র বললেন—তোমার জিনিসকে তাহলে 'আমার, আমার' করছি কেন?

বিষ্ণু বললেন—কেন এ রকম করছ? এটা শিবের কাজ, শিবকে জিজ্ঞাসা কর।

অষ্টাবক্র শিবকে স্মরণ করতে শিব এসে বললেন—জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞানও থাকবে। আমি ভূতনাথ। অজ্ঞানের ঈশ্বর আমি এবং জ্ঞানেরও। তুমি কে যে কষ্ট পাচ্ছ—এ সবই তো আমার।

অষ্টাবক্র—সবই তো বুঝলাম, তবুও তো এগুলি যাচ্ছে না। শুধু 'আমার, আমার' এসে যাচ্ছে।

শিব—'আমার' সৃষ্টি হয়েছে 'তোমার' সেবার জন্য, শরণাগত হবার জন্য। শরণাগতি হলে যত দোষ সব অন্য রূপ নেবে। শরণাগতকে বা আশ্রিতকে কিছু touch করে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—জলে খুব স্রোত, মস্ত বড় হাতিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু দুর্বল মাছ জলের আশ্রিত বলে জলের উল্টোদিকেও চলতে পারে। আশ্রিতের সেই সুযোগ আছে, সমস্ত দোষের মধ্যেও সে কাটিয়ে যেতে পারে। শরণাগতি হল সহজ পথ। আনন্দের মধ্যে সে থাকতে পারে। শিবের ভজন যে করে

তাকে অজ্ঞানভূত কিছু করতে পারে না। চৈতন্যের যে শরণ নিয়েছে তাকে মায়া বা অবিদ্যা কিছু করতে পারে না।

৩০। ৬। ৭২

১৭২

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অষ্টাবক্র মুনির সম্বন্ধে উপরোক্ত গল্পটি বলা হয়েছিল ভক্তির দিক থেকে। জ্ঞানের দিক থেকেও গল্পটি এই ভাবে বলা হয়ে থাকে।

জন্মাবধি অষ্টাবক্রের দেহে আটটি বক্র ছিল। তাঁর জিজ্ঞাসা একটিই ছিল যে, কেন এ রকম ভাবে তাঁর দেহ তৈরি হয়েছে। গুরুর কাছে তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে গুরু বললেন—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কেন এ রকম করেছেন তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর। গুরুর কাছ থেকে সাধনপদ্ধতি জেনে তিনি ব্রহ্মার ধ্যানে বসলেন। বারো বছর সাধনার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রকম দেহ কেন তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ব্রহ্মা—তোমার প্রারব্ধ এই রকম ছিল, সেই জন্য তোমার এই রকম বক্র দেহ তৈরি হয়েছে।

অষ্টাবক্র—আমারই যদি প্রারব্ধ তাহলে আমিই গঠনকর্তা, আমিই স্রষ্টা, তোমাকে আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

অষ্টাবক্র গুরুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পালন করে কে?

গুরু বললেন—বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা।

অষ্টাবক্র ভাবলেন, ভালই হল এবার তাহলে বিষ্ণুকেই বলব। তিনি গুরুর কাছ থেকে বিষ্ণুমন্ত্র নিয়ে তপস্যা শুরু করে দিলেন। এবার বারো বছর সাধনার পরে বিষ্ণু এসে তাঁকে দর্শন দিলেন। অষ্টাবক্র তাঁর পরিচয় এবং তিনি কী করেন তা জানতে চাইলে বিষ্ণু বললেন—আমিই এই সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

অষ্টাবক্র—আমাকে এ ভাবে পালন করছেন কেন? আমি পেটভরে আহার পাই না, দু-তিন দিন কখনও কখনও উপবাসে পর্যন্ত কাটাতে হয়।

বিষ্ণু—তোমার যেমন প্রারব্ধ সেই অনুযায়ী তুমি পাবে।

অষ্টাবক্র—তাহলে আমিই প্রারব্ধ তৈরি করছি এবং অদৃষ্টও তৈরি করছি আমি। কাজেই আর আপনাকে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। অষ্টবক্র এবার গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, মহেশ্বর বা শঙ্কর হলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্তা। তখন শিবের মন্ত্র নিয়ে তিনি শিবের ধ্যানে বসলেন। এবার ষোলো বছর সাধনা করার পর শিব তাঁর সামনে এলেন।

শিব আসতে অষ্টাবক্র তাঁকে বললেন—এই দেহ এবার নাশ কর।

শঙ্কর—এখন নাশ করার কোনও উপায় নেই। তোমার প্রারব্ধ অনুযায়ী আরও আয়ু আছে। এখন কী করে নাশ করব?

অষ্টাবক্র—তবে আপনি সংহারকর্তা কী ভাবে হলেন ? আমার প্রারব্ধই হল আমার সংহারকর্তা। আমার তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কারওকেই প্রয়োজন নেই।

এই চল্লিশ বছরের সাধনা তাঁর ব্যর্থ হয়নি। এই সাধনার ফলে তাঁর চিত্ত শোধন হয়ে গেল। অষ্টাবক্র ভাবতে লাগলেন, তাহলে আমিই সৃষ্টি করি, পালন করি এবং সংহার করি।

অষ্টাবক্র গুরুদেবকে বললেন—এই আমিকে জানতে হবে। কী করে এই আমি-র পরিচয় বা আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় আপনি আমাকে সেই উপদেশ দিন।

গুরু তখন তাঁকে আমিতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। অষ্টাবক্র তখন আমিতত্ত্বের পরিচয় লাভের জন্য আত্মধ্যানে রত হলেন। 'কোঽহম্' এই জিজ্ঞাসা নিয়ে সাধন করতে করতে চব্বিশ বছর পরে ধরা পড়ল—আমিই সব। আমি দেহ, ইন্দ্রিয় সব। তখন তাঁর দেহের বিকারের জন্য আর কোনও ক্ষোভ রইল না। মহাতপস্যার ফলে তাঁর সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা নষ্ট হয়ে গেল। যথাকালে তিনি অষ্টাবক্র মুনি নামে চার দিকে বিদিত হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই কাহিনি থেকে শিক্ষালাভ হল যে, আমিতত্ত্বের উপদেশ প্রথমেই দেওয়া চলে না। প্রথমেই আমিতত্ত্ব দিলে সুবিধা হত না। কাজেই গুরুদেব আরও দীর্ঘকাল তপস্যা কবিয়ে নিলেন অষ্টাবক্রকে দিয়ে। তারপর আমিতত্ত্বের উপদেশ দিলেন।

ব্রহ্মার জন্য বারো বছর, বিষ্ণুব জন্য বারো বছর এবং শিবের জন্য ষোলো বছর তিনি তপস্যা করেছিলেন। এই চল্লিশ বছর সাধনার বা তপস্যার পরে আরও চব্বিশ বছর আমি-র পরিচয় লাভের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। চৌষট্টি বছর তপস্যার পরে আমিতত্ত্বের result পেলেন।

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সেই আমি-র পরিচয় প্রথমে দিলে মানুষ ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না—শুধু কাঁচা আমি-র সঙ্গে ভুল করবে।

৪। ৭। ৭২

১৭৩

ঈশ্বরের শরণ যে নেয় তিনি তাকে রক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কৌরবসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে যখন তাঁকে অপমান করা হচ্ছিল এবং তিনি একহাতে কাপড় সামলাতে সামলাতে হরিকে স্মরণ করছিলেন তখনও হরি কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে আসেননি। শেষ পর্যন্ত দু'হাত তুলে যখন হরির শরণাপন্না হলেন তখনই হরি এলেন এবং তাঁর মান রক্ষা করলেন।

ভাগবতে বস্ত্রহরণ কাহিনির মধ্যেও এই কথাটি আছে। গোপীরা স্নান করবার জন্য যখন জলে নামল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের বস্ত্রহরণ করে গাছে উঠে বসে রইলেন। গোপীরা

স্নানের পরে যথাস্থানে নিজেদের বস্ত্র না-দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল যে, এ সবই কৃষ্ণের কাজ। তারা মধুসূদনকে সকলে মিলে তোযাজ করতে লাগল বস্ত্র ফিরিয়ে দেবার জন্য। কৃষ্ণ অবশেষে বললেন—ফিবিয়ে দিতে পারি, কিন্তু দিব্রাকরের কাছে স্তব করতে হবে তোমাদের। গোপীরা জলে দাঁড়িয়েই দিবাকরের স্তব করতে শুরু করল।

কৃষ্ণ তাদের বললেন—জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ভাবে হবে না, তীরে উঠে ডাঙায় দাঁড়িয়ে স্তব করতে হবে।

গোপীরা বলল—এ ভাবে উলঙ্গ অবস্থায় কী করে করব?

কৃষ্ণ—তা আমি জানি না। স্তব না-করলে বস্ত্র ফিরিয়ে দেব না। তখন গোপীরা বাধ্য হয়ে তীরে উঠে হাত দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করে সূর্যকে স্তব করতে লাগল।

কৃষ্ণ তখন তাদের বললেন—এ ভাবে স্তব করলে হবে না, ফাঁকি দিলে চলবে না। জোড়হাতে দিবাকরকে স্তব করতে হবে। সমস্ত মন যদি দেহে থাকে তাহলে কৃষ্ণকে আর দেবে কী?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই বিষয়বস্তু ভদ্রলোকদের কাছে slang বলে মনে হবে, কিন্তু এর ভিতরের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই এক-এতে মন আছে কি না এই ঘটনার মাধ্যমে পরীক্ষায় ধবা পড়ে। যদি লজ্জাতে মন থাকে, দেহে মন থাকে, ঘৃণায় মন থাকে তাহলে বুঝতে হবে এক-এ মন নেই। তাহলে হরিকে কী করে পাওয়া যাবে? সূর্যনারায়ণকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে স্তব করতে হবে।

গোপীরা যখন দুই হাত জোড় করে স্তবস্তুতি ও প্রণাম করল দিবাকরকে তখনই ঠিক ঠিক স্তবস্তুতি করা হল দেহাত্মবুদ্ধি ভুলে গিয়ে। এই ভাবেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয় লজ্জা, মান, ভয় সব কিছু ভুলে গিয়ে। তবেই এক-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। এক-এ যখন পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত হবে তখনই হয় শুদ্ধ প্রেম।

৪। ৭। ৭২

১৭৪

ভগবান সবার হৃদয়েই লুকিয়ে আছেন। তাঁকে আদর করে চাষ করে বার করতে হয়। শিষ্য যদি ঠিক ঠিক মেলে তবে তাকেই যথার্থ গুরুতে পরিণত করা সম্ভব হয়। গুরু পক্ষপাতিত্ব করেন না। তবে যার ভাল সংস্কার নেই তার তৈরি হতে সময় লাগে।

এক গুরুর পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সবাই ভাবে, সে-ই একমাত্র বড় ভক্ত।

গুরু একদিন পরীক্ষা করার জন্য নূতন একটি হাঁড়ি ও পাঁচটি টাকা দিয়ে একজন শিষ্যকে বললেন—আমার জন্য একহাঁড়ি ঘি নিয়ে এস, কিন্তু খেয়াল রেখ যেন হাঁড়িটি পরিপূর্ণ ভাবে ভরা থাকে, একটু কম থাকলে কোনও কাজে লাগবে না।

শিষ্যটি টাকা ও নূতন হাঁড়ি নিয়ে দোকানে গেল। সে দোকানিকে বলল—হাঁড়িটিতে এমনভাবে ঘি ভরে দাও যাতে একটুও কমে না-যায়। কানায় কানায় ভরা থাকা চাই, নয়ত চলবে না।

সবাই বলল—তা কী ভাবে সম্ভব হবে? তুমি যতই ওজন করে নিয়ে যাও, নূতন হাঁড়ি কিছুটা ঘি শুষে নেবেই। শিষ্যটি দেখল যে কানায় কানায় ঘি ভরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তখন সে অপারগ হয়ে গুরুর কাছে ফিরে গেল। গুরু একে একে দ্বিতীয, তৃতীয় ও চতুর্থ শিষ্যকেও ডেকে একই রকম নির্দেশ দিয়ে ঘি আনতে পাঠালেন, কিন্তু সকলেই ফিরে এসে একই কথা বলল।

এবার গুরুদেব পঞ্চম শিষ্যকে নূতন হাঁড়ি আর টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পঞ্চম শিষ্য এক ঘিয়ের দোকানে গিয়ে বলল—আমার গুরুদেব যজ্ঞ করবেন, খুব ভাল খাঁটি ঘি থাকলে হাঁড়ি পূর্ণ করে দাও।

দোকানি হাঁড়ি পূর্ণ করে দিতেই সে ঘিয়ের মূল্য দিয়ে হাঁড়িটি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যটি আবার হাঁড়ি নিয়ে ফিরে এসে খুব রাগারাগি করে দোকানিকে বলতে লাগল—তুমি কী রকম লোক হে! আমার গুরুদেব যজ্ঞ করবেন, আর তুমি কটু ঘি দিয়েছ? তোমার দোকানে ভাল ঘি না-থাকলে বললেই পাবতে, তাহলে আমি অন্য দোকান থেকে ভাল ঘি নিয়ে নিতাম।

এই কথা শুনে দোকানি খুব ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, যজ্ঞের জন্য আরও ভাল ঘি হয়ত প্রয়োজন। সে সবটা ঘি ফেরত নিয়ে টাকা দিয়ে দিল।

পঞ্চম শিষ্যটি তখন অন্য এক দোকানে গিয়ে ভাল ঘি কিনে কানায় কানায় ভর্তি করে পূর্ণ হাঁড়িটি গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেল। এবারে ঘি শুষবার আর উপায় ছিল না। প্রথম দোকানে যে ঘি সে কিনেছিল সেই ঘি হাঁড়িতে শুষে নিয়েছিল কিছুটা। গুরু হাঁড়ি ভর্তি ঘি দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে এটা সম্ভব হল রে?

শিষ্য মৃদু হেসে উত্তর দিল—আপনি সহায় থাকলে অসুবিধে হবার তো কোনও কারণ নেই।

চালাক-চতুর শিষ্যের পিছনে গুরু কেন খাটবেন না? এখানে পক্ষপাতিত্বের কোনও প্রশ্ন নেই। সূর্য বড় ঘরে বেশি এবং ছোট ঘরে কম আলো দেয় কি?

জীবনে যোগ্যতার মূল্যই অধিক, যোগ্য লোকই অধিকারী পুরুষ, সে-ই সর্বোত্তম পুরস্কার পেয়ে থাকে। জীবনের সর্বোত্তম পুরস্কার হল মুক্তিশান্তি ও অমৃতত্বলাভ। তা সম্ভব হয় ঈশ্বরদর্শন ও আত্মজ্ঞান লাভ হলে এবং কেবলমাত্র সর্বোত্তম যোগ্য অধিকারীর পক্ষেই তা সম্ভব।

৪। ৭। ৭২

১৭৫

ভক্ত ও ভগবান উভয়েই যে উভয়ের কাছে কত প্রিয় ও আপন সৎপ্রসঙ্গ করতে করতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সেই প্রসঙ্গে একটি কাহিনি উল্লেখ করলেন।

একদিন নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মা লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু কোথায়?

মা লক্ষ্মী নারদকে বললেন—আমিও সেটা জানি না, প্রভু এলে তুমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।

নারদ নারায়ণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই ভাবে দীর্ঘক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে নারদ ঘুমিয়ে পড়লেন। নয় ঘণ্টা পরে নারায়ণ পূজা সমাপ্ত করে এলেন।

নারদ তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি জগতের প্রভু। আপনাকে জগতের সবাই পূজা করে, কিন্তু আপনি আবার কার পূজা করেন?

নারায়ণ নারদকে বললেন—এই ছোট্ট প্রশ্ন তোমার! পূজার ঘরে গিয়ে তুমি নিজেই দেখে এস।

নারদ তখন নারায়ণের পূজার ঘরে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন—সেখানে তো বিশেষ কিছুই দেখলাম না, শুধু বেদির উপরে একটি বাক্স দেখলাম।

নারায়ণ—ওটাই খুলে দেখ।

নারদ নারায়ণের নির্দেশ মতো পূজার ঘর থেকে বাক্সটি নিয়ে এসে খুললেন। নারদ প্রথম বাক্স খুলে তার মধ্যে আরেকটি বাক্স দেখতে পেলেন। এই ভাবে যতবারই বাক্স খুলতে যান সেই বাক্সের মধ্যে আরেকটি বাক্স দেখতে পান। ভিতরের বাক্সগুলি খুবই সুন্দর এবং সেগুলি কাপড় দিয়ে জড়ানো। সব শেষে নবম বাক্স বের হল। সেই বাক্সটি এত সুন্দর যে তার চাইতে সুন্দর বাক্স বোধহয় আর নেই। নারদ বাক্সটি দেখে অবাক হয়ে নারায়ণের কাছে জানতে চাইলেন—প্রভু, বাক্সটির মধ্যে কী আছে?

নারায়ণ নারদকে বললেন—জানতে গেলে ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা দরকার নইলে জিজ্ঞাসা করো না। তুমি নিজে বাক্সটি খুলে দেখ এর ভিতরে কী আছে।

নারদ অধৈর্য হয়ে বললেন—আমি আর খুলতে পারছি না, আপনি খুলুন। আমি এখন বড় ক্লান্ত।

নারায়ণ বললেন—এই রকম ভাবে শেষ মুহূর্তে অধৈর্য হয়ে ছেড়ে দিলে সাধনার ফল লাভ হয় না। এ রকম অধৈর্যভাব, ক্লান্তিভাব সাধনার পথে আসে।

নারদ বাক্সটি খুলে দেখলেন যে, সেই বাক্সের মধ্যে ব্রজের গোপীদের পদরেণু রয়েছে।

নারায়ণ তখন বললেন—এই হল ব্রজের ধূলি। আমি অণুর সেবা করি আর তোমরা মহানের সেবা কর। আমি ছোট হতে চাই আর তোমরা বড় হতে চাও।

নয়টি বাক্সের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অণু মানে ব্রজের পদরেণু। ভক্তের পদরেণু ভগবানের পূজার বস্তু। নবরস, নববিধা ভক্তি, নবরসায়ন, নবভাব—একটির পর একটি পার হয়ে তবে তো কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবে। সবচেয়ে

বড় সংখ্যা ৯ আর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হল ১। ৯-এর সঙ্গে ১ যুক্ত হলে অর্থাৎ বড়র সঙ্গে ছোট যুক্ত হলেই দশ হয়। ৯ কিন্তু মহান নয়, ১ নয়বার হলে মহান হয়। ১ না-হলে ৯ হবেই না। তাই ভগবান চান অণু হতে। মানুষকেও ভগবান বলেন, নিজে অণু হয়ে সবাইকে মানতে। অণু মানে অক্ষরব্রহ্ম—imperishable, তা অব্যয়। ভগবান যখন আসেন তখন অণু হতে বলেন, তবেই অনুভব হবে। অণু হল অব্যয়বীজ। অণু হলে ভগবানের প্রিয় হবে।

৫।৮।৭।৭২

১৭৬

নিম্নলিখিত ঘটনাটি নিগূঢ় বোধতত্ত্বের উপলব্ধিজ্ঞাপক।

এক রাজা তার রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সব দিকেই সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে একদিন রাতে রাজা দেখতে পেলেন অদূরে গাছতলায় একজন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। পরের দিন ছদ্মবেশে সেখানে সাধুসঙ্গ করতে যাবেন রাজা, এই সংকল্প করলেন। সত্যি সত্যিই ছদ্মবেশে রাজা পরদিন রওয়ানা হলেন। এদিকে রাজার এক শত্রু রাজাকে বহুদিন ধরে হত্যা করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না। ঘটনাচক্রে সেই দুশমন তৈরি হয়ে রাজাপ্রাসাদে ঢুকে তাকে মারবে, এই সংকল্প করে এগোতে লাগল। পথে দু'জনেই দু'জনের সঙ্গে meet করল, কিন্তু কেউ কারওকে চিনতে পারল না ছদ্মবেশ থাকার জন্য। সাধুবাবার কাছে পৌঁছবার আগেই পথে চলতে চলতে হঠাৎ রাজার পায়ে একটি কাঁটা ফুটে গেল। তার পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনেক কষ্টে রাজা সাধুবাবার কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে প্রথমেই রাজা সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ আমি সাধুদর্শন করতে এসেছি অথচ কাঁটা ফুটে কেন দুর্ভোগ হল? এর কারণ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এ রকম হল কেন? সাধুবাবা বললেন—এই সময় তো তোমার জীবনটাই চলে যাবার কথা, এটা তো সামান্য একটু যন্ত্রণা কাঁটা ফোটার জন্য।

রাজা চমকে উঠে বললেন—সেকি, কেন এ রকম হবে? আপনিই বা কী করে তা জানলেন?

সাধুবাবা—বাড়ি গিয়েই তা টের পাবে। তোমার ছিল আজকে মৃত্যুযোগ, কিন্তু সাধুসঙ্গ করতে এসেছ বলেই তা খণ্ডন হয়ে পায়ে শুধু কাঁটা ফুটে গেল।

রাজবাড়িতে এদিকে সেই দুশমন অনেক চেষ্টার পরে রাজার শয়নঘরে প্রবেশ করল। রাজার এক বিলাসী চাকর ছিল। রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে রাজার ব্যবহৃত ভাল পোশাক পরে রাজার পালঙ্কে গিয়ে একটু শুয়ে আরাম করছিল। আরাম করতে গিয়ে চাকরটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েই পড়ল সেখানে। এদিকে রাজা ঘুমিয়ে আছে মনে করে রানি চাকরের পাশেই শুয়ে পড়লেন।

দুশমন তার শয়নঘরে ঢুকে প্রথমে ভাবল, রাজারানি দু'জনকেই শেষ করবে, কিন্তু রানিকে মেরে কোনও লাভ নেই ভেবে সেই চাকরকেই রাজা মনে করে হত্যা করে পালিয়ে গেল। রানি জেগে উঠে দেখেন চার দিকে রক্ত। তিনি চাকরের রক্তাক্ত দেহটা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

রাজা সেই মুহূর্তে তার শয়নঘরে প্রবেশ করে দেখলেন তার অতি পুরাতন চাকরটির এই শোচনীয় অবস্থা, দুশমন এসে খুন করে গিয়েছে। রাজা ভাবলেন, সাধুবাবা তো ঠিকই বলেছিলেন যে, আজ তাঁরই মৃত্যু হবার কথা, কিন্তু সাধুসঙ্গ করার জন্যই তা হল না। অতবড় একটি ঘটনা অর্থাৎ মৃত্যু, সেটাও কেটে গেল সামান্য একটু যন্ত্রণা দিয়ে। রাজা অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, যেই মুহূর্তে রাজার পায়ে কাঁটা বিঁধেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই দুশমন তার পুরাতন চাকরটিকে খুন করেছে।

গল্পটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—লোকপ্রবাদ আছে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস।" জীবনে মানুষ অসৎ-এর সঙ্গই বেশি করে, সৎ-এর সঙ্গ পায় খুব কম। সৎসঙ্গের অভাবে অসৎসঙ্গের প্রভাব বাড়ে এবং জীবনও সেই ভাবে গড়ে ওঠে। তার চিন্তা ও কর্মে অসৎ-এর প্রভাব বাড়ে, সেই মতো ফলভোগও তাকে করতে হয়। সঙ্গদোষে যে দুর্ভোগ তার উদাহরণই চার দিকে বেশি দেখা যায়। সঙ্গের প্রভাবে যে সুখভোগ তার উদাহরণ খুব কমই দৃষ্ট হয়। সৎ ভাব, সাধু ভাব ও বোধের মাত্রা বাড়লে তদনুরূপ মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। সেই জন্য সাধুর নির্দেশ—সদাশ্রয়ী হও, সৎসঙ্গ কর, সৎ ভাবনা ও সৎ কর্মের অনুষ্ঠান কর। সৎ বোধে জীবনযাপন কর এবং দিব্য সুখ, আনন্দ ও অমৃতত্বের অধিকারী হও।

৯। ৭। ৭২

১৭৭

সামান্য ভুল থেকেও বিরাট অশান্তি আসে অজ্ঞানতার জন্য।

এক অজপাড়াগাঁয়ে অল্প কয়েকঘর লোক বাস করত। লেখাপড়া বা ইংরেজি কেউই তেমন জানত না। কারও কোনও প্রয়োজন হলে বা চিঠিপত্র টেলিগ্রাম পড়াতে হলে সেই গ্রামে এক পণ্ডিতমশাই ছিলেন, তাকে দিয়েই কাজ চালানো হত।

ঐ গাঁয়ে এক বাড়ির কর্তা বিদেশে থাকতেন। একবার তার ছেলে টেলিগ্রাম পেল বিদেশ থেকে। কর্তা টেলিগ্রাম করেছেন বিদেশ থেকে ছেলের কাছে—ছেলের চাকরি হয়েছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তাতে লেখা ছিল—Come sharp, service ready। পণ্ডিতমশাইকে টেলিগ্রাম পড়তে ডাকা হল। পণ্ডিতমশাই টেলিগ্রাম পড়ে বললেন—কাম সাড়া, সাপে কেটে ফেলেছে। বাড়ির কর্তাকে সাপে কেটেছে ভেবে বাড়িতে সকলে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। পিওনও বকশিশ পেল না। বিষণ্ণ বদনে সে চলে গেল। কর্তার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পণ্ডিতই সব করে দিলেন। এদিকে ছেলে বিদেশে গেল না, চাকরিও হল না। অন্য লোক সেই চাকরিতে বহাল হয়ে গেল।

এদিকে বিদেশে কর্তা অর্থাৎ ছেলের বাবা ক্ষেপে গেলেন। পূজার সময় তিনি বাড়িতে এলেন। কর্তাকে রাস্তায় দেখে গ্রামের লোকেরা ভূত মনে করে চেঁচামেচি করতে লাগল। তাঁকে পিটিয়ে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলার মতন অবস্থা করে ফেলল। এমন সময় গ্রামের এক বখাটে ছেলে এসে বলল—তোমরা ভূত মনে করছ কেন ? ও ভূত নয়। শুনেছি ভূত শূন্যের উপর দিয়ে হাঁটে। কিন্তু এই লোকটি তো দিব্যি মাটিতেই হাঁটছে। এই ভাবে নানা রকম ভাবে বোঝাবার পরে গ্রামের লোক তাদের ভুল বুঝতে পারল। তখন ঘটনার মূল বুঝে পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তার অজ্ঞতার পরিচয় জেনে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। তারপর সেই বাড়ির কর্তাকে গৃহে আনা হয় এবং তার সংস্কার করা হয়। পুত্রের চাকরিটি হাতছাড়া হওয়াতে বাড়ির সকলে খুব দুঃখিত হয়। ভদ্রলোক স্বপরিবারে গ্রাম ছেড়ে কর্মস্থলে ফিরে যান, গ্রামের অন্য কারও অনুরোধ তিনি আর শুনলেন না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অল্প জ্ঞান যে অজ্ঞানেরই সমান, এর উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। অজ্ঞানের ফলে দুর্ভোগ ভোগ করতেই হয়।

একটি প্রবাদ আছে "অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী" অর্থাৎ যেখানে বিদ্যার অভাব সেখানে অবিদ্যার প্রভাব বেশি। তার ফলে মানুষকে বহুবিধ দুঃখ অশান্তি ভোগ করতে হয়, অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, অন্যের সাহায্য দরকার হয়। সুযোগ বুঝে অজ্ঞানীদের সবাই ঠকায়। সংসারে অবিদ্যা-অজ্ঞানই হল সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল। সেই জন্য বিদ্যাচর্চার একান্ত প্রয়োজন। তবে বিদ্যা বলে যা লোকে জানে তা কিন্তু অবিদ্যারই প্রকারভেদ। অবিদ্যা হল দ্বৈতাশ্রয়ী, তার ফল সংসারদশা ভোগ। সংসারী কখনও অমৃত মুক্তি শান্তির অধিকারী হতে পারে না। বিদ্যার স্বরূপ অদ্বৈত, ফল তার অমৃত মুক্তি শান্তি।

৯। ৭। ৭২

অষ্টম অধ্যায়

১৭৮

সব ছকে বাঁধা আছে, ভোগ ভোক্তার কাছে যাবেই।

এক আশ্রমে সাধুবাবার কাছে এক গৃহস্থ ভদ্রলোক একদিন এলেন। সাধুবাবা তাকে অকালের একটি ফল খেতে দিলেন। লোকটি অকালে এই ফলটি দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ফলটি আপনি কোথায় পেলেন এই অসময়ে?

সাধুবাবা বললেন—তোমার জন্যই তৈরি হয়ে এসেছে। এর ভোক্তা তুমি। তোমার জন্যই কাবুল থেকে এসেছে এটা। এক ভক্ত এটা দিয়েছে। আমি ভোক্তা নই। ছকে বাঁধা রয়েছে এটা তোমার জন্যই।

গল্পটির জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভোগ ভোক্তার জন্য ছুটে আসবেই। সংসারে ভোক্তা তো শুধু ভোগের পিছনেই ছুটে চলেছে। কতদিন কত আয়োজন করে আহার্য বস্তু তৈরি করে কেউ খেতে বসেছে হয়ত, মুখের কাছে গ্রাস এনেও তা খাওয়া হয় না কোনও বিশেষ কারণে। তাই বলা হয় কার কতটা ভোগ হবে তা ছকে বাঁধা আছে।

৯। ৭। ৭২

১৭৯

ভগবান এসে গুরুবরণ করেন অথচ মানুষ নিজেরা গুরু সাজে।

মুরারি পণ্ডিত তাঁর ছেলে মকরধ্বজকে নিয়ে প্রায়ই মহাপ্রভুর সঙ্গ করতে যেতেন। মুরারির সঙ্গে ঘন ঘন যাবার ফলে সকলের সঙ্গেই মকরধ্বজের আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। মহাপ্রভুও তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং গোপাল বলে ডাকতেন। এর ফলে সকলেই তাকে গোপাল বলে ডাকত।

নিয়মিত এখানে যাতায়াতের ফলে অবশেষে মকরধ্বজের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের খুব ভাব হয়। মকরধ্বজ একটু একটু করে গোবিন্দের সেবাও করত সময় বিশেষে। এ রকম ভাবে কয়েকবছর কেটে গেল।

মকরধ্বজের যখন বারো বছর বয়স তখন মহাপ্রভু একদিন বেড়াতে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মহাপ্রভু গোপালকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে শৌচকর্মে গেলেন। গোপাল দেখতে পেল মহাপ্রভু শৌচে বসে জিহ্বাটা হাত দিয়ে টেনে চেপে ধরে আছেন। এর কারণ বুঝতে না-পেরে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। শৌচকর্ম সেরে মহাপ্রভু ফিরে আসতেই গোপাল তাকে জিজ্ঞাসা করল—প্রভু, আপনি জিহ্বাটা টেনে হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন কেন?

মহাপ্রভু—এই রকম অশুচি অবস্থায় জিহ্বা যাতে নাম না-করে সেই জন্য চেপে ধরেছিলাম।

গোপাল—আর তো কেউ করে না।

মহাপ্রভু—আমার জন্যই শুধু এই ব্যবস্থা।

গোপাল—কৃষ্ণ নামে শুচি-অশুচি কেন? কৃষ্ণ নাম তো সব সময়ই করা যায়। কৃষ্ণের মধ্যে তো কৃষ্ণই আছে। যে নাম সে-ই কৃষ্ণ, এ কথা তো আপনার মুখেই শুনেছি।

মহাপ্রভুর এবার চৈতন্যোদয় হল। তিনি ভাবলেন, গোপালের কথা তো খুবই সত্য। বারো বছরের একটি ছোট ছেলে আজ আমাকে এত বড় জ্ঞান দিল! এই কথা ভেবে মহাপ্রভু গোপালকে বললেন—গোপাল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ, আজ থেকে তুমিই আমার গুরু। মহাপ্রভু তাঁকে গুরু হিসাবে মনে করতেন এবং সকলকেই বলে দিলেন 'শ্রী গোপাল গুরু' বলে যেন সবাই তাঁকে উল্লেখ করে। সেই দিন থেকে সকলেই তাঁকে 'শ্রী গোপাল গুরু' বলে ডাকতে শুরু করল। যতই তাকে 'শ্রী গোপাল গুরু' বলে ডাকে সবাই, বালক ততই বিনীত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

মহাপ্রভু বারো বছরের এক ছেলেকে গুরুবরণ করেছেন—এই খবর চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বৃন্দাবনেও এই খবর পৌঁছে গেল এক মহাপণ্ডিতের কাছে। তিনি অতীতে কৃষ্ণের এক খেলার সাথি ছিলেন। ধ্যান ও তপস্যার দ্বারা তার এই বোধ জাগ্রত হওয়াতে বৈষ্ণবসমাজে তিনি বেশ আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর একটি বিশেষত্ব ছিল—তাঁর একটি ছড় ছিল। সেই ছড় দিয়ে কারওকে আঘাত করলেই কাজ হয়ে যেত। শ্রীধরস্বামীকে ছড়ের আঘাত দিয়েই তিনি তাঁর ভাব জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যাকে প্রণাম করতেন তার দেহ থাকত না। বৃদ্ধ সাধকদের কাছে গিয়ে তিনি প্রণাম করতেন আর তাদের দেহ তখন নষ্ট হয়ে যেত। 'শ্রী গোপাল গুরু'-র কথা বৃন্দাবনে সেই সাধকের কানেও পৌঁছাল। মহাপ্রভুর মতো লোক বারো বছরের একটি ছেলেকে গুরুরূপে বরণ করেছেন, এই কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, ছেলেটিকে একবার দেখতেই হবে। তিনি বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে আসবার ব্যবস্থা করলেন।

চৈতন্যদেবের কানে কথাটি যেতে তিনিও চিন্তিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে তিনি কাবু করতে না-পারলেও 'শ্রী গোপাল গুরু'-র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করেই শেষ করে দেবেন। মহাপ্রভু সাধকের সেই মনোভাব অনুমান করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

গোপালকে মহাপ্রভু গম্ভীরায় নিয়ে গেলেন। গম্ভীরায় নিয়ে গিয়ে নিজের আসনে তাঁকে বসিয়ে বললেন—আমি একটু কাজে যাচ্ছি, কিন্তু এই আসন তো শূন্য রাখা যায় না, কাজেই যতক্ষণ আমি ফিরে না-আসি ততক্ষণ তুমি এই আসন ছেড়ে উঠবে না। এই বলে চিন্তনের দ্বারা 'শ্রী গোপাল গুরু'-র কপালে শ্রীকৃষ্ণের চরণের ছাপ দিয়ে দিলেন। তার পরেই মহাপ্রভু চলে গেলেন এবং আড়ালে বসে সব লক্ষ্য করতে

লাগলেন। এই সুযোগে বৃন্দাবনের সেই সাধক 'শ্রী গোপাল গুরু'-র সন্ধান নিয়ে গম্ভীরায় উপস্থিত হলেন।

'শ্রী গোপাল গুরু' স্থির হয়ে আসনে বসে আছে দেখে সাধক তাঁকে চারবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রণাম করার পরেও 'শ্রী গোপাল গুরু'-র কোনও ক্ষতি হল না—জীবিতই আছেন। এই দেখে সাধক অবাক হয়ে গোপালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেলেন তাঁর কপালে শ্রীকৃষ্ণের চরণ। তখন তিনি আবার প্রণাম করলেন। এদিকে ঠিক সেই সময় মহাপ্রভুও গম্ভীরাতে ফিরে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—ক'বার হল? কোথা থেকে এ বিদ্যা শিখেছ? সাধক বললেন—তোমাকে হারিয়ে এ বিদ্যা শিখেছি। মহাপ্রভু বললেন—সখা বলে তাঁকে হারাও কেন? নামকে ছেড়েই তোমাব এই অবস্থা হয়েছে। যে নাম সে-ই কৃষ্ণ। নাম ছাড়লে তুমি কী করে কৃষ্ণকে পাবে? নামটি যদি না-ছেড়ে দিতে তবে এই বকম দুষ্কর্ম তুমি কবতে না। কৃষ্ণ নাম হারিযেই তোমার আজ এ রকম দুরবস্থা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষের বুদ্ধিবিচার দিয়ে যা হয় না, নামে তা হয়। গল্পটি বলার উদ্দেশ্য হল, এগুলি মনে থাকলে বোধ আপনা হতেই আসবে। বোধের রাজ্যে পৌঁছে গেলেই সব দায়িত্ব বোধের।

৯। ৭। ৭২

১৮০

ভক্তিতে ভগবান দেখেন মনের ভাবটি শুধু। যোগে দেখেন তার যোগ্যতা, জ্ঞানে দেখেন পূর্ণতা। ভক্তি পথে চললে ভগবান ভক্তেব sincerity-ই দেখেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

নারদ সর্বক্ষণ ভগবানের নাম করে বেড়ান। মনে মনে একটু অভিমানও এসেছে তাঁর যে, তাঁর মতো ভক্ত আর বুঝি কেউ নেই। কিন্তু ভগবান তো সকলের মনের ভাব বুঝতে পারেন, কাজেই তিনি নারদের এই ভাবটিও উপলব্ধি করতে পারলেন।

এদিকে নারদ ঘুরতে ঘুরতে বৈকুণ্ঠে গিয়ে হরির কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে বিমর্ষ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু, আপনি এত বিষণ্ণ কেন?

ভগবান—নারদ, মর্তলোকে আমার এক ভক্ত-মা আছেন তার জন্য আমার মন উতলা হয়েছে, সেখানে যেতে হবে। চল আমরা যাই সেখানে। নারদ খুশি হলেন। তিনি ভাবলেন, দেখা যাক কী রকম ভক্ত সে! ছদ্মবেশে কৃষ্ণ ও নারদ চললেন মর্তে। তারপর দু'জনে গিয়ে এক গৃহস্থ চাষির বাড়িতে হাজির হলেন। চাষির স্ত্রীকেই ভক্ত বলে কৃষ্ণ উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কোথায় ভক্ত? সারাদিন তো নারদ তাকে নাম করতে দেখলেনই না উপরন্তু সারাদিন সে গাধার মতো চাষবাস করে খেটে মরছে। নারদ কৃষ্ণকে তাঁর মনের এই ভাব জানাতেই তিনি বললেন—অস্থির হয়ো না, দেখ না ধৈর্য ধরে একটু।

তারপর সারাদিনের কাজকর্ম সেরে চাষির স্ত্রী বাড়িতে যখন শুতে গেল তখন বিছানার কাছে গিয়ে—'জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি' এই রকম তিনবার উচ্চারণ করে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। শোওয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্বামীকে প্রণাম করে 'জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি' বলে কাজে চলে গেল।

নারদ প্রশ্ন করলেন প্রভুকে—প্রভু, এ কী রকম ভক্ত, সারাদিনের মধ্যে সকালে তিনবার ও বিকেলে তিনবার, এই ছয়বার মাত্র হরি নাম করল। এটা কী রকম ভক্তির লক্ষণ? আপনি যে কী বলেন প্রভু!

কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—ঠিক আছে, তোমাকে তা পরে বুঝিয়ে দেব।

পরের দিন কৃষ্ণ নারদকে ছোট একটি পাত্র ভর্তি তেল দিয়ে বললেন—নারদ এই তেলের পাত্রটি হাতে করে তুমি স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল, এই ত্রিভুবন ঘুরে এস। কিন্তু সাবধান এর থেকে একফোঁটা তেলও যেন মাটিতে না-পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে গেলে তা দিয়ে আর কাজ হবে না।

প্রভুর আদেশ পাওয়ামাত্র নারদ তেলের পাত্রটি হাতে করে রওয়ানা হলেন। কিন্তু নারদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রিভুবন ঘুরে আসতে পারলেন না, বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

কৃষ্ণ—এই বিশ্বভুবন পরিক্রমা করে আসবার সময় কতবার তুমি আমার নাম স্মরণ করেছিলে?

নারদ—সেকি, সারাক্ষণ আমার দৃষ্টি, মন, প্রাণ সব তেলের উপরে ছিল যাতে একফোঁটা তেলও পড়ে না-যায়। এর মধ্যে নাম করার কথা তো আমার স্মরণই হয়নি।

কৃষ্ণ—যে নারদ আমার নাম ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না সেই নারদ আজ সারাদিন নাম না-করে কী করে আছে?

নারদ—কী করে ডাকব? আপনি যে রকম কাজের ভার আমাকে দিয়েছিলেন যে, সারাক্ষণই আমার সজাগ হয়ে থাকতে হয়েছে, কাজেই নাম করা সম্ভব হয়নি।

কৃষ্ণ—নারদ, তাহলে এবার ভেবে দেখ কী রকম ভক্তের কাছে আমি এসেছি। এ গৃহস্থ হয়ে সর্বকাজের মধ্যে সারাদিন নিযুক্ত থেকেও সকালে শয্যাত্যাগের সময় ও রাতে নিদ্রার পূর্বে আমার নামটি নিতে ভোলে না। আব তুমি তো ঋষি, তুমি সব কাজ ফেলে শুধু আমার নামগান করেই থাক। এ গৃহী হয়ে সব কাজ করেও আমার নাম করে অথচ তুমি একটিমাত্র কাজের ভার নিয়ে আমার নামটি পর্যন্ত নিতে ভুলে গিয়েছ!

প্রভুর কথা শুনে নারদ লজ্জিত হয়ে বুঝতে পারলেন ভক্তের উপরেও ভক্ত আছে। আসল ভক্ত অভিমানশূন্য, নিরহংকার।

১০। ৭। ৭২

১৮১

লোকে ভাবে, নিজের অনেক বেশি হয়েছে এবং অপরের কিছুই হয়নি। এটা রাজসিক অহংকার। আবার অনেকে মনে করে, সকলের সব হয়েছে কিন্তু আমারই কিছু হল না। এটা তামসিক অহংকার।

রাজসিক অহংকারে গর্ব করা হয় আর তামসিক অহংকারে খর্ব করা হয়। সাত্ত্বিক অবস্থা হল নারদের মতো অবস্থা। অবশ্য কোনও কোনও সময় এই সাত্ত্বিক অবস্থা নারদের এসেছে, তবে সব সময় নয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নারদ প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বললেন।

নারদ ত্রিভুবনে অর্থাৎ স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে নামকীর্তন করে বেড়াচ্ছেন। এদিকে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করার জন্য গিয়েছেন। কৃষ্ণকে সিংহাসনে না-দেখে নারদ মা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু কোথায়?

মা লক্ষ্মী—কি জানি। বৃন্দাবন না কোথায় যেন লীলা করতে গিয়েছেন। তোমার প্রভুর তো কোনও কাজ নেই এখানে-সেখানে শুধু ছুটোছুটি করেন।

প্রেমে মা লক্ষ্মীর স্থান নেই। মা লক্ষ্মীর হল ঐশ্বর্যের অবস্থা, রাধারানি হলেন যোগমায়াশক্তি—মাধুর্যের অবস্থা। লক্ষ্মী হলেন মহামায়া।

নারদ প্রভুর লীলা দেখবার জন্য বৃন্দাবনে এলেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন গোপগোপীরা আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। নারদ তো কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার সুযোগই পাচ্ছেন না। কয়েকদিন পর কৃষ্ণ তাঁকে সুযোগ দিলেন দেখা করার জন্য।

নারদ প্রথমেই বললেন—প্রভু এ কী রকম হল? অশিক্ষিত সাধনভজনহীন কতগুলি গোপগোপীর সঙ্গে আপনি খেলা করে বেড়াচ্ছেন, এটা কী রকম কথা! এদের না আছে ভক্তি, না আছে জ্ঞান।

কৃষ্ণ তখন কিছু বললেন না। পরে বৈকুণ্ঠে ফিরে এসে বললেন—নারদ, আমার বড় শরীর খারাপ তবে ভক্তের একটু পদধূলি গায়ে মাখতে পারলে রোগ সেরে যাবে।

নারদ—কোথায় পাব বলে দিন। এটা কী এমন শক্ত ব্যাপার, এক্ষুনি এনে দেব।

নারদ স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কোথাও ভক্তের পদরেণু খুঁজে পেলেন না। ভগবান অঙ্গে মাখবেন ভক্তের পদরেণু, কিন্তু কে দেবে এই পদরেণু? পদরেণু চাইতে গেলে সকলেই চমকে উঠে বলে—নারদ তুমি কি পাগল হয়েছ? ভগবানকে পদধূলি দিতে গিয়ে কি অনন্ত কাল নরকবাস করব? নারদ কোথাও ভক্তের পদধূলি না-পেয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে এসে বললেন—প্রভু, পদধূলি কেউ দিতে রাজি নয়।

কৃষ্ণ—তুমি এক কাজ কর। বৃন্দাবনে একবার যাও, সেখানে হয়ত পাবে। নারদের ইচ্ছা ছিল না বৃন্দাবনে কতগুলি অর্বাচীন নারীর কাছে যেতে। এদিকে প্রভুর আদেশ না-মেনেও পারেন না। তিনি বাধ্য হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন। নারদকে দেখে সব গোপীরা তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করল—নারদ, আমাদের কৃষ্ণ কেমন আছেন?

নারদ বলল—কৃষ্ণ ভয়ানক অসুস্থ। এই অসুখ সারবে যদি সর্বাঙ্গে ভক্তের পদধূলি মাখানো যায়, কিন্তু পদধূলি জোগাড় করতে পারছি না।

গোপীরা—সেকি কথা! কৃষ্ণ ভুগছেন আগে কেন বলনি? নিয়ে যাও, কত পদধূলি তাঁর প্রয়োজন? এই বলে গোপীরা পায়ের তলা থেকে মুঠো মুঠো ধূলি তুলে নারদের সামনে রাখল। কী করে ধূলি নিয়ে যাবে, এই হল এখন নারদের সমস্যা। নারদের নামাবলিটা টেনে নিয়ে সকলেই নিজের নিজের পদধূলি তাতে দিতে লাগল। গোপীরা বলল—এগুলি এক্ষুনি নিয়ে তুমি বৈকুণ্ঠে চলে যাও।

নারদ—তোমরা করছ কী? তোমাদের কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? ভগবানকে এই যে পদধূলি দিচ্ছ তার ফলে তোমাদের অনন্ত কাল নরকবাস করতে হবে।

গোপীরা—নরকে যাব ক্ষতি নেই, প্রভুর অসুখ সারলেই হল। তুমি আর দেরি করো না নারদ।

নারদ ভাবলেন, এরা সত্যিই একেবারে বোকা, কোনও হিতাহিত জ্ঞান নেই এদের। শেষ পর্যন্ত নামাবলি ভর্তি করে পদধূলি নিয়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

নারদ কৃষ্ণকে বললেন—নিয়ে এসেছি ঠিকই, তবে ঐ ছোঁড়াছুঁড়িগুলির কাণ্ড দেখে অবাক হলাম। এতই অর্বাচীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, যে যার পায়ের ধুলো নিয়ে এল স্বয়ং ভগবানের অঙ্গে মাখাবার জন্য এবং সেগুলি আমারই নামাবলির মধ্যে বেঁধে দিল। এরা একবারও ভেবে দেখল না যে, এর পরিণামে কী দুর্গতি হবে তাদের। আপনি বৈকুণ্ঠে মা লক্ষ্মীকে এবং ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী, মুনি, ঋষিদের ফেলে কতগুলি মূর্খ ছেলেমেয়েকে নিয়ে খেলছেন।

কৃষ্ণ—নারদ তুমি কাকে মূর্খ বলছ? চার দিকে ঘুরে অনেক ভক্ত তো দেখলে, কত সাধুসন্ন্যাসী, যোগী, এমনকী মুনি, ঋষি এবং কত দেবদেবীও দেখেছ, তাঁরা নিজেদের ভক্ত বলে ভাবলেও আমার প্রাণরক্ষার জন্য কিছু কি করেছেন? অথচ যাদের তুমি মূর্খ ও অর্বাচীন বলছ তারাই আমার প্রাণরক্ষা ও সুখের জন্য নরকবাস বেছে নিল। যারা আমার সুখের জন্য নিজেদের ভুলে যায় তারাই আমার প্রাণ। তাদের জন্য আমি তোমার মা লক্ষ্মীকেও ছেড়ে দিতে পারি, এমনকী তোমাকেও ছেড়ে দিতে পারি।

নারদ তখন বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন—হ্যাঁ, তা তো ঠিকই, ভক্ত না-হলে কি আর আপনি তাদের ভালবাসেন।

কৃষ্ণ বললেন—যে স্বার্থশূন্য হয়ে আমাকে একটুখানি দেয় তাকে আমি সর্বস্ব দিই।

১০। ৭। ৭২

১৮২

ভগবান গোপীদের বহু 'আমি'-র কাছে ঋণী হয়ে রইলেন যুগ যুগান্তকাল! একটি 'আমি' লক্ষ লক্ষ জনম দিয়েও তা শোধ করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন।

বলরাম ও কৃষ্ণ সন্দীপন ঋষির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুদাম, শ্রীদামের সঙ্গে তাঁদের ভাব হয়েছিল। সুদাম আগে শিক্ষা শেষ করে চলে আসে, তথাপি সে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছিল। একদিন গোষ্ঠে যাবার সময় মা যশোদার সঙ্গে সুদাম দেখা করতে গেলে মা যশোদা সুদামের হাতে বলরাম ও গোপালের জন্য নাড়ু পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাস্তায় লোভের বশবর্তী হয়ে সে নাড়ুগুলি খেয়ে ফেলল। ভগবান কৃষ্ণ তো সবই জানতে পারেন, কাজেই এটাও জেনে ফেললেন। এই লোভের জন্য সুদামের সারাজীবন দারিদ্র আর ঘুচল না।

কৃষ্ণ যখন দ্বারকার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলেন তখন একদিন সুদামকে তার পত্নী কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দিল। সুদাম তার ময়লা কাপড়চোপড় এবং এই রকম দীনহীন অবস্থায় কৃষ্ণের কাছে যেতে প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু পত্নীর পীড়াপীড়িতে যেতে বাধ্য হল।

সুদাম এতদিন পরে খালি হাতে কী ভাবে সখার কাছে যাবে, এই ভেবে সুদামের পত্নী কৃষ্ণের জন্য কয়েকটা চাল ভেজে তার চাদরের খুঁটে বেঁধে দিল। সুদাম পায়ে হেঁটে দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে অবশেষে দ্বারকায় পৌঁছাল। সেই সময় অন্দরমহলে যাবার কোনও নিষেধ ছিল না। কাজেই সুদাম সোজা অন্দরমহলেই চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল কৃষ্ণ স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসে আছেন এবং সত্যভামা ও রুক্মিণী দু'জনে তাঁর পদসেবা করছেন। সুদামকে দেখামাত্রই কৃষ্ণ ছুটে এসে সুদামকে আলিঙ্গন করলেন এবং টেনে নিয়ে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রুক্মিণী ও সত্যভামাকে তার চরণ ধুয়ে সেবা করার নির্দেশ দিলেন। কৃষ্ণের সখা এসেছে কাজেই সত্যভামা ও রুক্মিণী দু'জনেই তার পদসেবায় লেগে গেলেন। সুদাম ভীষণ লজ্জিত হচ্ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই তার কথা শুনলেন না।

এদিকে সুদামের চাদরের খুঁটে যে চাল বাঁধা ছিল সেটাও লজ্জায় বার করতে পারছিল না। সুদামের মনের ভাব তো কৃষ্ণের অজানা নেই। তিনি বললেন—দেখ আমাকে যারা ভালবাসে তারা তো কিছু না কিছু আমাকে দেয়ই, ভগবানকে শুধু শুধু ভালবাসা যায় না।

কৃষ্ণের এই কথা শোনা সত্ত্বেও সুদাম চালভাজা বার করতে লজ্জা পাচ্ছিল। তখন কৃষ্ণই চাদরের খুঁট থেকে চালভাজা বার করে নিজে খেলেন, সুদামকে দিলেন এবং দুই রানিকেও দিলেন। ভগবানের প্রসাদ খেয়ে সকলেরই খুব তৃপ্তি হল।

রুক্মিণী কৃষ্ণকে বললেন—তোমরা সখা, একসময় একসঙ্গে বিদ্যাচর্চা করেছ, এক-সঙ্গে খেলেছ অথচ তার এত দুঃখ, তুমি কোনও ব্যবস্থা করে দাও না কেন?

কৃষ্ণ বললেন—ব্যবস্থা করে দিলেও ওর ভোগে তা লাগবে না। এটাই ওর প্রারব্ধ কর্মের ফল। জান, মা আমাকে ও দাদাকে নাড়ু দিয়েছিলেন। সেই নাড়ু আমাদের না-দিয়ে সুদাম খেয়ে ফেলেছিল, তাই তার এত দুঃখকষ্ট ও অভাব-অনটন। প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতেই

হবে, আমি কী করতে পারি? তা সত্ত্বেও সত্যভামা ও রুক্মিণীর পীড়াপীড়িতে তখন ভগবান বললেন—ভক্ত যদি আমাকে এতটুকু না-দেয় আমি তাকে কী করে দেব?

সেই জন্য যে ভক্ত মনের কোণে তাঁকে একটু স্থান দেয়, ভগবান তার কাছে নিজেকেই দিয়ে দেন। একবার কৃষ্ণের আঙুল কেটে যাওয়াতে দ্রৌপদী একটুখানি শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিলেন, তার ফলে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল তখন যতই কাপড় টানে কাপড় আর ফুরায়নি।

দুই রানিকে কৃষ্ণ আরও বললেন—এই ব্রাহ্মণ কৃপণ ও স্বার্থপর ছিল, আমাকে কিছুই দেয়নি। এবার সে চালভাজা দিল, তার ফলে কিছু পাবে।

কৃষ্ণ সুদামকে বললেন—সুদাম তুমি বল তোমার কী দরকার?

সুদাম—তোমার কাছে কিছু চাইতে আসিনি। যদি কিছু দিতেই হয় তবে তোমার ওই পদযুগল শুধু চাই।

ভগবান গলা থেকে তাঁর বৈজয়ন্তীমালাটি দিলেন। তিনি বললেন—এই মালার কাছে তিনটিমাত্র বর প্রার্থনা করতে পারবে তার পরে আর নয়। তিনটি বর পূরণ হয়ে গেলে তা আমার কাছে আবার ফিরে আসবে।

সুদাম বৈজয়ন্তীমালা পরে ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বেরোল যদি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়! ভগবানের নাম নিতে নিতে সে চলেছে। হঠাৎ পথে যেতে যেতে এক বাড়িতে কান্নার রোল শুনে সে বাড়ির কাছে এসে একজনকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে একজনের কাছে জানতে পারল, গৃহকর্তার একমাত্র পুত্র সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। করুণায় বিগলিত হয়ে সে তার বৈজয়ন্তীমালার কাছে প্রার্থনা জানাল—তোমার প্রভুর আদেশ পালন কর। এই যে ছেলেটি আজ সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে এর জীবনটা ফিরিয়ে দাও। এই কথা বলতে বলতেই ছেলেটি উঠে বসল।

আবার চলতে চলতে সুদাম দেখল এক নদীতীরে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির একমাত্র পুত্রকে কুমিরে ধরে নিয়ে গিয়েছে। নদীর তীরে বসে ব্রাহ্মণ দম্পতি আকুল হয়ে কাঁদছিল। সুদাম তাই দেখে বৈজয়ন্তীমালার কাছে ব্রাহ্মণ দম্পতির পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানাল। বৈজয়ন্তীমালা তাকেও ফিরিয়ে নিয়ে এল। এই ভাবে দ্বিতীয় বরটিও শেষ হয়ে গেল।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সুদাম আরও কিছুদূর যাবার পর দেখল বিবাহের সাত দিন পরেই বরটি মারা গিয়েছে। সেখানে সতীদাহের ব্যবস্থা হয়েছে। খুবই বীভৎস এবং করুণ দৃশ্য। সুদামের মনে করুণা জেগে উঠল। বৈজয়ন্তীমালাকে আবার অনুরোধ জানাল বরকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য। বর বেঁচে উঠতেই বৈজয়ন্তীমালা সুদামের কাছে এসে বলল—আমার তিনটি আদেশ পালন করার কথা ছিল, সে কাজ আমি সম্পন্ন করেছি। তার পরে যথাস্থানে সেই মালা চলে গেল।

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন—বৈজয়ন্তীমালা ফিরে এসেছে। রুক্মিণী বললেন—আবার তাহলে কোনও একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কৃষ্ণ—তার জন্য যে ব্যবস্থাই করা হোক না কেন সে অপরের দুঃখকষ্ট দেখলে ব্রাহ্মণীর কথা একেবারে ভুলে যায়।

রুক্মিণী—এ সব তোমার চাতুরী।

কৃষ্ণ—আমার উপর যদি তোমার বিশ্বাস না-থাকে তবে তুমিই তাকে একটু কৃপা কর।

রুক্মিণী তখন সুদামের জন্য বিশাল এক অট্টালিকা তৈরি করে দিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং সুদামের স্ত্রীর জন্য অলংকার ও মূল্যবান শাড়িরও ব্যবস্থা করলেন। তাদের খাওয়াদাওয়ার যাতে কষ্ট না-হয় সেই জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। সুদাম দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নিজের বাড়িতে এসে স্ত্রীকে দেখতে না-পেয়ে মহামুস্কিলে পড়ল। সে ভাবল, এর মধ্যেই কি স্ত্রী মারা গিয়েছে! এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে লাগল। একটু পরে তার স্ত্রী সুদামের খবর পেয়ে তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল।

এত সব ঐশ্বর্য, অট্টালিকা, স্ত্রীর গায়ে রত্নালংকার ও পরিধানে মূল্যবান শাড়ি দেখে সুদাম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এবং কাঁদতে লাগল এই বলে—যে ঐশ্বর্য তোমার পাদপদ্ম ভুলিয়ে রাখে তা আমি চাইনি।

রুক্মিণী তখন বললেন—তোমাকে তো কিছু দেওয়া হয়নি, যাকে দেওয়া হয়েছে সে তো আমার সখী। তুমি পাদপদ্ম চেয়েছিলে পাদপদ্মই পাবে। তবে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তাঁর পাদপদ্মকে তুমি ভুলবে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবানের মহিমা একমাত্র সেই ভক্তের কাছেই প্রকাশ হয় যে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়।

১০। ৭। ৭২

১৮৩

রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী, ইষ্ট, গুরু এই নিয়ে যে কত বিরোধ সেই সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

ভগবানকে কী নামে ডাকলে তিনি তাড়াতাড়ি সাড়া দেন, এই বিষয়ে একবার একটি প্রশ্ন উঠল সাধুদের মধ্যে। কোন নামটি কার্যকরী হয় বেশি? কেউ বলে হরি, কেউ বলে রাম, কেউ কৃষ্ণ, কেউ গুরু, কেউ মা, কেউ বা ইষ্ট প্রভৃতি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজের নিজের পছন্দের নামটিকেই বড় করতে চেষ্টা করছিল। তখন উপর দিয়ে এক বিদেহী মহাপুরুষ যাচ্ছিলেন। উপর থেকে তিনি শুনতে পেলেন, এক এক দল এক এক নামে অর্থাৎ হরি, কৃষ্ণ, শিব, মা এই রকম ভাবে চিৎকার করছে। বিদেহী মহাপুরুষ এই ধ্বনি শুনে ভাবলেন, এখানে নিশ্চয় খুব নাম হচ্ছে, সাধুদের কোনও মহাসভা হচ্ছে বোধহয়। এই ভেবে তিনি একটু নিচে এসে দেখলেন সাধুদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারি চলছে। তিনি ভাবলেন, সাধুদের মধ্যে কেন এ রকম মতবিরোধ, মতভেদ ও মারামারি হবে? তিনি তখন ছদ্মবেশে সেখানে এলেন এবং এসে খুব কাঁদতে লাগলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?

তিনি বললেন—আমার ইষ্টের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। তখন রামভক্তের দল বলল—রাম নাম কর এবং কৃষ্ণভক্তের দল বলল—কৃষ্ণ নাম কর। এই ভাবে এক একটা দল এক একটা নাম করতে বলল। এই সময় এক বৃদ্ধ সাধু এসে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। তাঁর দেখাদেখি আরেকজন সাধুও ওই রকম মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

এই ভাবে দেখা গেল, সবাই মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে ও কাঁদছে। তখন কঠিন হৃদয়ের এক সাধু ভাবল, সবাই কাঁদছে অথচ আমার কেন কান্না আসছে না!

ভগবানকে পেতে হলে নামটা ভিতরে করতে হবে, বাইরে করতে গেলেই ঝগড়াঝাঁটি ও মাবামারি। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বোঝানো হল যে, ওই জায়গাতে সবারই এসে মিলতে হবে। বেদনার স্থানে যুক্তিতর্ক নেই—সব নাম এক সমান। যেমন ছেলের বয়স দুই বছর বা দু'শো বছর যা-ই হোক তারা তো সর্বদা মায়ের ছেলেই থেকে যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মাবাবাকে সংসারে কত নামেই তো সকলে ডাকে, কেউ ডাকে বাবা, কেউ মামা, কেউ দাদু, কেউ কাকা, কেউ বা পিসেমশাই, কিন্তু ব্যক্তি একজনই।

মহাপুরুষ আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন যে, সব নাম সমান। আসলে দেখতে হবে প্রাণ কাঁদছে কি না তাঁর জন্য। কী নামে কে ডাকে তা দিয়ে কী হবে? আচরণ দিয়ে মহাপুরুষ দেখিয়ে গেলেন ধর্মটা কী। তাঁর দেখাদেখি সবাই যে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল এর অর্থ হল মহৎ যিনি, তাঁর মতন আচরণ করবে সবাই। ইষ্টের জন্য যখন প্রাণ কেঁদে মাটিতে লুটায় তখনই তাঁকে পাওয়া যায়।

হরি কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা মানুষের নাম নয়, আবার যুগবিশেষের নাম তাও নয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে মধুর হয় আপনবোধ দিয়ে। আর তা না-হলে জলতেষ্টা পেলে যেমন মানুষ জল খায়, সেই রকম প্রয়োজনের সময় শুধু সবাই তাঁকে ডাকে।

১১। ৭। ৭২

১৮৪

হাতের লাঠি যেমন কাদায়, জলে, কাঁটাবনে, আগুনে যেখানেই রাখা যায় সে প্রতিবাদ করে না, সেই রকম প্রতিবাদ না-করে যিনি support দেন তাঁর নামই গুরু, ইষ্ট বা ঈশ্বর। তাঁকে ভাল বা খারাপ যা-ই দেওয়া হোক তিনি প্রতিবাদ করেন না। ভক্তের সামান্য ফুল, বেলপাতাও তিনি গ্রহণ করেন। অনেকে বলে—কই তিনি তো গ্রহণ করেন না। আসল কথা দেবারও কৌশল আছে। নিবেদন কী ভাবে করতে হয় তাও জানতে হয়। নিখুঁত পরিবেষণ, সেবা বা কর্ম শিখতে হয়। তাহলে কোনও অপচয় ও ক্ষতি হয় না।

যথার্থ গুরু হতে গেলে যে কত পরিশ্রম করতে হয় সে প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক শহরে এক মহাত্মা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যও ছিল। শিষ্যদের মধ্যে একদিন তর্ক হচ্ছিল। এক শিষ্য বলছিল—'আমারবোধ' কখনও যায় না এবং 'তোমারবোধ' কখনও আসতে পারে না। শিষ্যের এই কথা শুনে গুরুদেব বললেন—ঠিকই বলেছ তুমি। এখন 'আমারবোধ' তো থাকবেই। এখন তোমার গোঁফটি নেই এটা ঠিক, কিন্তু আবার যখন গোঁফ হবে, তখন আর গোঁফটি নেই এটা বলতে পারবে না। সেই রকম যথাসময়ে 'তোমারবোধ' এসে গেলে 'আমারবোধ' আর থাকবে না এবং তা ব্যবহার করতে গেলেও কাজে লাগবে না। Train-এ উঠে কেউ যদি বলে train-টি আমার তাহলে তাকে মেরে সবাই তাড়িয়ে দেবে। প্রকৃতির রাজ্যেও vigilance officer আছে, সেও নিজের বলে কারওকে কোনও কিছু দাবি করতে দেখলে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

মহাত্মার মুখে এ সব কথা শুনে একজন লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইল। মহাত্মা বুঝতে পারলেন যে, কোনও মতলব নিয়ে সে এসেছে। যাই হোক, তিনি তাকে বললেন—বেশ, তুমি দীক্ষা চাইছ যখন দেব নিশ্চয়ই, তবে তার আগে কয়েকদিন অন্য কাজ করতে হবে। এই বলে সেই মহাত্মা তার উপর কতগুলি এমন কাজের ভার দিলেন যে, সে তিন দিন পরেই পালিয়ে গেল।

সেই লোকটি অনেক মহাত্মার কাছেই যায়, কিন্তু গুরুর নির্দেশ মতো কাজ করতে যখন পারে না তখন সেখান থেকে পালিয়ে যায় অন্যত্র।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একবার এক সিদ্ধপুরুষের কাছে সে যায়। তিনি বললেন—তোমাকে জমি চাষ করতে হবে, লকড়ি কাটতে হবে, কলসি ভরে নদী থেকে জল আনতে হবে, তা ছাড়া অন্যান্য আরও কাজ আছে সে সবও দেখতে হবে। শিষ্যটি রাজি হল, কিন্তু এ ভাবে পরিশ্রম করে সে হাঁপিয়ে উঠল, আর যেন পারছিল না।

কয়েকদিন পরে একদিন নদীতে যখন সে কলসি ভরে জল আনতে গেল তখন দেখে একটি নৌকা আসছে। সে কলসিটি নদীর তীরে ফেলে দিয়ে নৌকা করে পালাবার মতলবে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে গুরুমহারাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—নৌকা করে পালাচ্ছিস কোথায়? ফিরে আয়।

শিষ্যটি পিছন ফিরে দেখে—কই গুরু তো নেই সেখানে। কলসির মধ্যে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অবাক হয়ে সে ভাবল, কলসি কী করে কথা বলে! তাহলে তো কলসির মধ্যে গুরুদেব আছেন এবং গুরুদেব মহাশক্তিসম্পন্ন। তাড়াতাড়ি কলসির কাছে এসে সে নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখে কলসির মধ্যে কেউ নেই। কলসির মধ্যে থেকে আবার কথা ভেসে এল—তুমি শিষ্য হতে এসেছ, কিন্তু প্রথম পরীক্ষাতেই যদি ফেল কর তাহলে গুরু হবে কী করে? বড় হতে গেলে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। একজন

বড় ইঞ্জিনিয়ার যে হয়েছে সে ছোটবেলা থেকে কতগুলি পরীক্ষা দিয়ে তবেই বড় হয়েছে। যিনি গুরু হয়েছেন তিনিও পূর্বে অনেকের শিষ্য হয়েছেন এবং বহু পরিশ্রম করে ও পরীক্ষা দিয়ে তবেই এই অবস্থায় এসেছেন। আমার জীবনেই কি কম পরীক্ষা দিতে হয়েছে?

তখন কলসি তার আত্মকাহিনি বলতে শুরু করল—কত বেদনাদায়ক অবস্থা ও দশা অতিক্রম করে যে বর্তমানে আমি সাধুর আশ্রমে এসেছি ও সাধুসেবার যোগ্য অধিকারী হয়েছি, সে কথা শোন। প্রথমে তো কুমোর আমাকে মৃত্তিকামায়ের বুক থেকে কোদাল দিয়ে চাক চাক করে কেটে পৃথক করে নিয়ে এসে রোদে ফেলে দিল। পৃথিবীমায়ের রসে আমি সরস ছিলাম। সেখান থেকে কেটে আনার যন্ত্রণা এবং আলাদা হয়ে থাকার কষ্ট ভোগ করলাম প্রথম।

দ্বিতীয় অবস্থায় রোদে পুড়ে একেবারে শুকনো ও নীরস হয়ে গেলাম। যেমন কয়লা আগুনে পুড়ে সাদা হয়ে যায় সেই রকম রোদে পুড়ে আমার রঙও সাদা হয়ে গেল। জলতেষ্টায় বুক ফেটে যায়, কিন্তু কোথায় আর জল পাব? বেশ কিছুদিন এই ভাবে রোদে পড়ে থাকতে হল এবং জলতেষ্টায় কষ্ট পেতে হল।

তারপর তৃতীয় অবস্থায় কুমোর মুগুর দিয়ে পিটিয়ে আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। সেই পিটুনির ব্যথা ও যন্ত্রণা ভুলবার নয়। তখন চতুর্থ অবস্থায় নিজের আত্মরক্ষার জন্য আশেপাশের যা-কিছু আমি জড়িয়ে ছিলাম সেই সব অবলম্বন, যথা—কাঁকর, পাথর প্রভৃতি আমার থেকে পৃথক করে নিয়ে গেল। তখন একা পড়ে রইলাম। দুঃখবেদনার কথা যাদের কাছে বলতাম ও যাদের নিয়ে এতদিন ছিলাম তাদেরও সরিয়ে নিয়ে গেল, তখন দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলি? সুতরাং নীরবে সব সহ্য করলাম।

পঞ্চম অবস্থায় আমার মধ্যে জল ঢেলে দিল। ফলে আমার সর্দিগর্মি হয়ে গেল। একের পর এক কত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাই যে আমায় ভোগ করতে হল।

তার পরে ষষ্ঠ স্তরে কুমোর পা দিয়ে আমাকে মাড়িয়ে দিতে লাগল। কত লাথি যে খেয়েছি তার হিসেব নেই। এত কষ্টের কথা বলি কাকে? তোমরা তো অল্প একটু অসুবিধা হলেই সরে পড়, হইহই করে সরে যাও। আমার অবস্থা একটু ভেবে দেখ। এই লাথিতেই শুধু শেষ হল না, পরে তার মধ্যে আবার কোদাল চালাল। আমাকে তখন মেরে পিটিয়ে একেবারে তুলতুলে কবে ফেলেছে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। আমার কথা শুনবেই বা কে আর জানবেই বা কে?

সপ্তম স্তরে এসে আমাকে এই অবস্থায় কুমোর চাকে ফেলে দিল। চাকের মধ্যে আমাকে পিষে কলসির আকারে গড়ে তুলল। তখন পেটের মধ্যে কিছুই আর রইল না। খালিপেটে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছি।

অষ্টম স্তরে আবার আমাকে রোদে ফেলে রাখল। ছিল ক্ষুধার জ্বালা, এখন আবার রোদের তাপে গলা শুকিয়ে তেষ্টায় বুক ফেটে যাবার মতো অবস্থা।

নবম স্তরে কুমোর আমাকে নিয়ে আগুনে পোড়াল। যেমন লোকে শবদেহ পোড়ায় সেই রকম আমাকে নিয়েও সে লকড়ির আগুনে পোড়াল। তখন কী ভয়ানক যন্ত্রণা! রোদের তাপে আগেই শরীর শুকিয়েছে সুতরাং তখন আর ফোসকা পড়ল না সত্য, কিন্তু আমি পুড়ে একেবারে লাল হয়ে গেলাম এবং আমার কিছু কিছু অংশ কালোও হয়ে গেল।

তারপর দশম অবস্থায় কুমোর আমাকে বাজারে নিয়ে এল। সেখানে দেখতে পেলাম আমার মতো হতভাগা ভাইবোন অনেকেই পাশে রয়েছে। সকলেরই এক অবস্থা। খদ্দের আসে আর আমাদের হাতে তুলে নিযে চাটি মারতে থাকে। কত চাটিই যে খেতে হয়েছে, সে কী আর বলব? চাটি মেরে তারা তাদের পছন্দ মতো আমাদের বেছে নেয়। এক সাধু মহাত্মার সুনজরে পড়েছিলাম বলেই তিনি চাটি না-মেরে শুধুই পেটে হাত বুলিয়ে আমাকে পছন্দ করেন এবং দোকানিকে পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রমে। তারপর থেকে আমার মধ্যে ঘি, জল, তেল রাখা হয়।

আমার মতো হতভাগা ভাইবোনেদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আবার আমার চেয়েও খারাপ। তাদের মধ্যে এমন সব জিনিস রাখা হয় যে, চাপে তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায়ও নেই এবং করলে তা কেউ মানবেও না। আবার ফেটে ভেঙে গেলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অকেজো হয়ে গিয়েছি বলে। জঙ্গলের মধ্যে পথের ধারে আমাদের আবার লোকে মাড়িয়ে যায়, পিটিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। কেউ আবার জলে ফেলে দেয়, তখন জলেই ডুবে থাকি। কেউ কেউ মাঠের ধারে ফেলে দেয়, তখন মাটির বুকেই পড়ে থাকি, কিন্তু পূর্বের মতো মাটির রসের সঙ্গে আর এক হয়ে যেতে পারি না।

মানুষের খামখেয়ালি ও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমাদের কী রকম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় তা অনুমান করতে পারবে না। গৃহস্থের ঘরে আমাদের দুরবস্থার আর অন্ত নেই। তবে সাধু মহাত্মার আশ্রমে আমাদের কেউ কেউ কিছু সুবিধা পায়। সৌভাগ্যক্রমে আমি সাধু মহাত্মার সুনজরে পড়েছি বলেই আমার মধ্যে যজ্ঞের ঘি রাখা হয়। সেই ঘি খেয়ে আমি তুষ্ট আছি। ঘি শেষ হয়ে গেলে আমার মধ্যে আবার কখনও কখনও জলও রাখা হয়।

আশ্রমের মহান্ত মহারাজ আমার মধ্যে নদী থেকে জল ভরে আনার নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে। তুমি আমাকে মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেলে তোমার অপরাধ হবে। তুমি আমাকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এস। আমি যে-ভাবে সাধুগুরুর কৃপা পেয়েছি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছি তা তোমাকে সবিস্তারে বললাম। সাধুগুরুর কৃপাশীর্বাদ সহজে পাওয়া যায় না। সাধুগুরুর কৃপা ছাড়া জীবন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হতে পারে না। তুমি সাধু হতে এসেছ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়ে গুরু হতে এসেছ, কিন্তু কোনও কষ্ট সহ্যও করতে পারছ না, সাধনাও করতে পারছ না এবং তা চাইছও না। কর্ম ও সাধনে ফাঁকি দিয়ে

জীবন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হতে পারে না। তুমি আমাকে নদীতীরে ফেলে দিয়ে আশ্রম থেকে পালিয়ে যেতে চাইছ কর্ম ও সাধনার ভয়ে। তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি, তুমি জল ভরে আমাকে নিয়ে আশ্রমে রাখ এবং গুরুমহারাজের আদেশ মেনে চল, তবে তাঁর কৃপা পাবে এবং তোমার জীবন ধন্য হবে।

কলসির আত্মকাহিনি শোনার পরে সেই শিষ্যের মনে চৈতন্য হল। সে কলসির নির্দেশ অনুসারে জলভর্তি কলসি নিয়ে আশ্রমে গেল ও অনুগত ভক্তের মতো গুরুর নির্দেশ মেনে চলতে আরম্ভ করল। যথাযথ গুরুর কৃপাশিসে ধন্য হয়ে শেষে সে গুরু কর্তৃক আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হল এবং গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভাবেই সেই শিষ্য যথার্থ গুরুপদ প্রাপ্ত হল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পটির মধ্যে যোগতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি সব আছে। গল্পের মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার উত্তম ব্যবস্থা। প্রথমত কোদাল দিয়ে মারা হল যোগের অবস্থা—বাইরে থেকে মনকে ভিতরে আনা ও সৎসঙ্গে প্রবেশ করা। ভক্তি হয় শ্রবণের মাধ্যমে। প্রথমে হল শ্রবণ। জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল শুভ ইচ্ছা।

দ্বিতীয় অবস্থায় কোদাল দিয়ে মাটি কেটে রোদে রাখা হল সৎসঙ্গে এসে তাপ দেওয়া। আবার জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল বিচারণা। সৎসঙ্গের কথা প্রথম প্রথম খুব অপ্রিয় লাগে। শুভ ইচ্ছার পরে স্থির করে নিতে হবে কোনটা শ্রেয়। এই হল বিচারণা। (বিচারপূর্বক হেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করা, জানা ও মানা। এটা গুরুর নির্দেশ অনুসারেও হতে পারে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও হতে পারে এবং নিজের অন্তরাত্মার নির্দেশ অনুসারেও হতে পারে। বিচার হল বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং সংযত ও মার্জিত অনুভূতির প্রকাশ)।

তৃতীয় অবস্থায় কাঁকর, পাথর বাছাই হল ভক্তির দৃষ্টিতে সৎসঙ্গে এসে শ্রবণ করে নিজের ভুলত্রুটি শোধন করার চেষ্টা, অর্থাৎ তমোরজোগুণের মল বিচারপূর্বক পরিহার করা। জ্ঞানের দৃষ্টিতে এটাই হল তনুমনসা।

চতুর্থ অবস্থা—মাটিতে জল ঢালা ভক্তির দৃষ্টিতে হল পদসেবা ও দিব্য কর্ম। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তা হল সত্তাপত্তি অর্থাৎ সরসতা ও সমতার প্রকাশবিকাশ।

পঞ্চম অবস্থা—জ্ঞানের দৃষ্টিতে পা দিয়ে দলাইমলাই করা হল সত্তাপত্তির শেষের অংশ। ভক্তির দৃষ্টিতে তা হল দিব্য কর্ম এবং যোগের দৃষ্টিতে তা যোগাভ্যাস ও আরাধনা।

ষষ্ঠ অবস্থা—জ্ঞানের দৃষ্টিতে কুমোরের চাকে ফেলে দেওয়া হল অসংসক্তি। ভক্তির দৃষ্টিতে তা-ই হল অর্চনা ও বন্দনা।

সপ্তম অবস্থা—জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহ আধার বা আকার তৈরি হল পদার্থভাবনা। ভক্তির দৃষ্টিতে তা হল ভোগারতি সমর্পণ।

অষ্টম অবস্থা—সাম্যভাব অর্থাৎ পদের অর্থভাবনার সঙ্গে যোজনা (যুক্ত হওয়া)। গাছের সঙ্গে যেমন ডালের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন জীবাত্মার সম্বন্ধ ও গুরুর সঙ্গে যেমন শিষ্যের সম্বন্ধ। এই হল নিত্যযোগের লক্ষণ।

দুশমন তার শয়নঘরে ঢুকে প্রথমে ভাবল, রাজারানি দু'জনকেই শেষ করবে, কিন্তু রানিকে মেরে কোনও লাভ নেই ভেবে সেই চাকরকেই রাজা মনে করে হত্যা করে পালিয়ে গেল। রানি জেগে উঠে দেখেন চার দিকে রক্ত। তিনি চাকরের রক্তাক্ত দেহটা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

রাজা সেই মুহূর্তে তার শয়নঘরে প্রবেশ করে দেখলেন তার অতি পুরাতন চাকরটির এই শোচনীয় অবস্থা, দুশমন এসে খুন করে গিয়েছে। রাজা ভাবলেন, সাধুবাবা তো ঠিকই বলেছিলেন যে, আজ তাঁরই মৃত্যু হবার কথা, কিন্তু সাধুসঙ্গ করার জন্যই তা হল না। অতবড় একটি ঘটনা অর্থাৎ মৃত্যু, সেটাও কেটে গেল সামান্য একটু যন্ত্রণা দিয়ে। রাজা অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, যেই মুহূর্তে রাজার পায়ে কাঁটা বিঁধেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই দুশমন তার পুরাতন চাকরটিকে খুন করেছে।

গল্পটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—লোকপ্রবাদ আছে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস।" জীবনে মানুষ অসৎ-এর সঙ্গই বেশি করে, সৎ-এর সঙ্গ পায় খুব কম। সৎসঙ্গের অভাবে অসৎসঙ্গের প্রভাব বাড়ে এবং জীবনও সেই ভাবে গড়ে ওঠে। তার চিন্তা ও কর্মে অসৎ-এর প্রভাব বাড়ে, সেই মতো ফলভোগও তাকে করতে হয়। সঙ্গদোষে যে দুর্ভোগ তার উদাহরণই চার দিকে বেশি দেখা যায়। সঙ্গের প্রভাবে যে সুখভোগ তার উদাহরণ খুব কমই দৃষ্ট হয়। সৎ ভাব, সাধু ভাব ও বোধের মাত্রা বাড়লে তদনুরূপ মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। সেই জন্য সাধুর নির্দেশ—সদাশ্রয়ী হও, সৎসঙ্গ কর, সৎ ভাবনা ও সৎ কর্মের অনুষ্ঠান কর। সৎ বোধে জীবনযাপন কর এবং দিব্য সুখ, আনন্দ ও অমৃতত্বের অধিকারী হও।

৯। ৭। ৭২

১৭৭

সামান্য ভুল থেকেও বিরাট অশান্তি আসে অজ্ঞানতার জন্য।

এক অজপাড়াগাঁয়ে অল্প কয়েকঘর লোক বাস করত। লেখাপড়া বা ইংরেজি কেউই তেমন জানত না। কারও কোনও প্রয়োজন হলে বা চিঠিপত্র টেলিগ্রাম পড়াতে হলে সেই গ্রামে এক পণ্ডিতমশাই ছিলেন, তাকে দিয়েই কাজ চালানো হত।

ঐ গাঁয়ে এক বাড়ির কর্তা বিদেশে থাকতেন। একবার তার ছেলে টেলিগ্রাম পেল বিদেশ থেকে। কর্তা টেলিগ্রাম করেছেন বিদেশ থেকে ছেলের কাছে—ছেলের চাকরি হয়েছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তাতে লেখা ছিল—Come sharp, service ready। পণ্ডিতমশাইকে টেলিগ্রাম পড়তে ডাকা হল। পণ্ডিতমশাই টেলিগ্রাম পড়ে বললেন—কাম সাড়া, সাপে কেটে ফেলেছে। বাড়ির কর্তাকে সাপে কেটেছে ভেবে বাড়িতে সকলে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। পিওনও বকশিশ পেল না। বিষণ্ণ বদনে সে চলে গেল। কর্তার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পণ্ডিতই সব করে দিলেন। এদিকে ছেলে বিদেশে গেল না, চাকরিও হল না। অন্য লোক সেই চাকরিতে বহাল হয়ে গেল।

এদিকে বিদেশে কর্তা অর্থাৎ ছেলের বাবা ক্ষেপে গেলেন। পূজার সময় তিনি বাড়িতে এলেন। কর্তাকে রাস্তায় দেখে গ্রামের লোকেরা ভূত মনে করে চেঁচামেচি করতে লাগল। তাঁকে পিটিয়ে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলার মতন অবস্থা করে ফেলল। এমন সময় গ্রামের এক বখাটে ছেলে এসে বলল—তোমরা ভূত মনে করছ কেন? ও ভূত নয়। শুনেছি ভূত শূন্যের উপর দিয়ে হাঁটে। কিন্তু এই লোকটি তো দিব্যি মাটিতেই হাঁটছে। এই ভাবে নানা রকম ভাবে বোঝাবার পরে গ্রামের লোক তাদের ভুল বুঝতে পাবল। তখন ঘটনার মূল বুঝে পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তার অজ্ঞতার পরিচয় জেনে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। তারপর সেই বাড়ির কর্তাকে গৃহে আনা হয় এবং তার সংস্কার করা হয়। পুত্রের চাকরিটি হাতছাড়া হওয়াতে বাড়ির সকলে খুব দুঃখিত হয়। ভদ্রলোক স্বপরিবারে গ্রাম ছেড়ে কর্মস্থলে ফিরে যান, গ্রামের অন্য কারও অনুরোধ তিনি আর শুনলেন না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অল্প জ্ঞান যে অজ্ঞানেবই সমান, এর উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। অজ্ঞানের ফলে দুর্ভোগ ভোগ করতেই হয়।

একটি প্রবাদ আছে "অল্পবিদ্যা ভযংকরী" অর্থাৎ যেখানে বিদ্যার অভাব সেখানে অবিদ্যাব প্রভাব বেশি। তার ফলে মানুষকে বহুবিধ দুঃখ অশান্তি ভোগ করতে হয়, অন্যের উপর নির্ভর করতে হয, অন্যেব সাহায্য দরকার হয়। সুযোগ বুঝে অজ্ঞানীদের সবাই ঠকায়। সংসারে অবিদ্যা-অজ্ঞানই হল সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল। সেই জন্য বিদ্যাচর্চার একান্ত প্রয়োজন। তবে বিদ্যা বলে যা লোকে জানে তা কিন্তু অবিদ্যারই প্রকারভেদ। অবিদ্যা হল দ্বৈতাশ্রয়ী, তার ফল সংসাবদশা ভোগ। সংসাবী কখনও অমৃত মুক্তি শান্তির অধিকারী হতে পারে না। বিদ্যার স্বরূপ অদ্বৈত, ফল তার অমৃত মুক্তি শান্তি।

৯। ৭। ৭২

অষ্টম অধ্যায়

১৭৮

সব ছকে বাঁধা আছে, ভোগ ভোক্তার কাছে যাবেই।

এক আশ্রমে সাধুবাবার কাছে এক গৃহস্থ ভদ্রলোক একদিন এলেন। সাধুবাবা তাকে অকালের একটি ফল খেতে দিলেন। লোকটি অকালে এই ফলটি দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ফলটি আপনি কোথায় পেলেন এই অসময়ে?

সাধুবাবা বললেন—তোমার জন্যই তৈরি হয়ে এসেছে। এর ভোক্তা তুমি। তোমার জন্যই কাবুল থেকে এসেছে এটা। এক ভক্ত এটা দিয়েছে। আমি ভোক্তা নই। ছকে বাঁধা রয়েছে এটা তোমার জন্যই।

গল্পটির জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভোগ ভোক্তার জন্য ছুটে আসবেই। সংসারে ভোক্তা তো শুধু ভোগের পিছনেই ছুটে চলেছে। কতদিন কত আযোজন করে আহার্য বস্তু তৈরি করে কেউ খেতে বসেছে হয়ত, মুখের কাছে গ্রাস এনেও তা খাওয়া হয় না কোনও বিশেষ কারণে। তাই বলা হয় কার কতটা ভোগ হবে তা ছকে বাঁধা আছে।

৯। ৭। ৭২

১৭৯

ভগবান এসে গুরুবরণ করেন অথচ মানুষ নিজেরা গুরু সাজে।

মুরারি পণ্ডিত তাঁর ছেলে মকরধ্বজকে নিয়ে প্রায়ই মহাপ্রভুর সঙ্গ করতে যেতেন। মুরারির সঙ্গে ঘন ঘন যাবার ফলে সকলের সঙ্গেই মকরধ্বজের আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। মহাপ্রভুও তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং গোপাল বলে ডাকতেন। এর ফলে সকলেই তাকে গোপাল বলে ডাকত।

নিয়মিত এখানে যাতায়াতের ফলে অবশেষে মকরধ্বজের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের খুব ভাব হয়। মকরধ্বজ একটু একটু করে গোবিন্দের সেবাও করত সময় বিশেষে। এ রকম ভাবে কয়েকবছর কেটে গেল।

মকরধ্বজের যখন বারো বছর বয়স তখন মহাপ্রভু একদিন বেড়াতে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মহাপ্রভু গোপালকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে শৌচকর্মে গেলেন। গোপাল দেখতে পেল মহাপ্রভু শৌচে বসে জিহ্বাটা হাত দিয়ে টেনে চেপে ধরে আছেন। এর কারণ বুঝতে না-পেরে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। শৌচকর্ম সেরে মহাপ্রভু ফিরে আসতেই গোপাল তাকে জিজ্ঞাসা করল—প্রভু, আপনি জিহ্বাটা টেনে হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন কেন?

মহাপ্রভু—এই রকম অশুচি অবস্থায় জিহ্বা যাতে নাম না-করে সেই জন্য চেপে ধরেছিলাম।

গোপাল—আর তো কেউ করে না।

মহাপ্রভু—আমার জন্যই শুধু এই ব্যবস্থা।

গোপাল—কৃষ্ণ নামে শুচি-অশুচি কেন? কৃষ্ণ নাম তো সব সময়ই করা যায়। কৃষ্ণের মধ্যে তো কৃষ্ণই আছে। যে নাম সে-ই কৃষ্ণ, এ কথা তো আপনার মুখেই শুনেছি।

মহাপ্রভুর এবার চৈতন্যোদয় হল। তিনি ভাবলেন, গোপালের কথা তো খুবই সত্য। বারো বছরের একটি ছোট ছেলে আজ আমাকে এত বড় জ্ঞান দিল! এই কথা ভেবে মহাপ্রভু গোপালকে বললেন—গোপাল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ, আজ থেকে তুমিই আমার গুরু। মহাপ্রভু তাঁকে গুরু হিসাবে মনে করতেন এবং সকলকেই বলে দিলেন 'শ্রী গোপাল গুরু' বলে যেন সবাই তাঁকে উল্লেখ করে। সেই দিন থেকে সকলেই তাঁকে 'শ্রী গোপাল গুরু' বলে ডাকতে শুরু করল। যতই তাকে 'শ্রী গোপাল গুরু' বলে ডাকে সবাই, বালক ততই বিনীত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

মহাপ্রভু বারো বছরের এক ছেলেকে গুরুবরণ করেছেন—এই খবর চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বৃন্দাবনেও এই খবর পৌঁছে গেল এক মহাপণ্ডিতের কাছে। তিনি অতীতে কৃষ্ণের এক খেলার সাথি ছিলেন। ধ্যান ও তপস্যার দ্বারা তার এই বোধ জাগ্রত হওয়াতে বৈষ্ণবসমাজে তিনি বেশ আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর একটি বিশেষত্ব ছিল—তাঁর একটি ছড় ছিল। সেই ছড় দিয়ে কারওকে আঘাত করলেই কাজ হয়ে যেত। শ্রীধরস্বামীকে ছড়ের আঘাত দিয়েই তিনি তাঁর ভাব জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যাকে প্রণাম করতেন তার দেহ থাকত না। বৃদ্ধ সাধকদের কাছে গিয়ে তিনি প্রণাম করতেন আর তাদের দেহ তখন নষ্ট হয়ে যেত। 'শ্রী গোপাল গুরু'-র কথা বৃন্দাবনে সেই সাধকের কানেও পৌঁছাল। মহাপ্রভুর মতো লোক বারো বছরের একটি ছেলেকে গুরুরূপে বরণ করেছেন, এই কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, ছেলেটিকে একবার দেখতেই হবে। তিনি বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে আসবার ব্যবস্থা করলেন।

চৈতন্যদেবের কানে কথাটি যেতে তিনিও চিন্তিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে তিনি কাবু করতে না-পারলেও 'শ্রী গোপাল গুরু'-র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করেই শেষ করে দেবেন। মহাপ্রভু সাধকের সেই মনোভাব অনুমান করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

গোপালকে মহাপ্রভু গম্ভীরায় নিয়ে গেলেন। গম্ভীরায় নিয়ে গিয়ে নিজের আসনে তাঁকে বসিয়ে বললেন—আমি একটু কাজে যাচ্ছি, কিন্তু এই আসন তো শূন্য রাখা যায় না, কাজেই যতক্ষণ আমি ফিরে না-আসি ততক্ষণ তুমি এই আসন ছেড়ে উঠবে না। এই বলে চিন্তনের দ্বারা 'শ্রী গোপাল গুরু'-র কপালে শ্রীকৃষ্ণের চরণের ছাপ দিয়ে দিলেন। তার পরেই মহাপ্রভু চলে গেলেন এবং আড়ালে বসে সব লক্ষ্য করতে

লাগলেন। এই সুযোগে বৃন্দাবনের সেই সাধক 'শ্রী গোপাল গুরু'-র সন্ধান নিয়ে গম্ভীরায় উপস্থিত হলেন।

'শ্রী গোপাল গুরু' স্থির হয়ে আসনে বসে আছে দেখে সাধক তাঁকে চারবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রণাম করার পরেও 'শ্রী গোপাল গুরু'-র কোনও ক্ষতি হল না—জীবিতই আছেন। এই দেখে সাধক অবাক হয়ে গোপালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেলেন তাঁর কপালে শ্রীকৃষ্ণের চরণ। তখন তিনি আবার প্রণাম করলেন। এদিকে ঠিক সেই সময় মহাপ্রভুও গম্ভীরাতে ফিবে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন--ক'বার হল? কোথা থেকে এ বিদ্যা শিখেছ? সাধক বললেন—তোমাকে হারিয়ে এ বিদ্যা শিখেছি। মহাপ্রভু বললেন—সখা বলে তাঁকে হারাও কেন? নামকে ছেড়েই তোমাব এই অবস্থা হয়েছে। যে নাম সে-ই কৃষ্ণ। নাম ছাড়লে তুমি কী করে কৃষ্ণকে পাবে? নামটি যদি না-ছেড়ে দিতে তবে এই বকম দুষ্কর্ম তুমি কবতে না। কৃষ্ণ নাম হারিযেই তোমার আজ এ রকম দুরবস্থা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষের বুদ্ধিবিচার দিয়ে যা হয় না, নামে তা হয়। গল্পটি বলার উদ্দেশ্য হল, এগুলি মনে থাকলে বোধ আপনা হতেই আসবে। বোধের রাজ্যে পৌঁছে গেলেই সব দায়িত্ব বোধের।

৯। ৭। ৭২

১৮০

ভক্তিতে ভগবান দেখেন মনের ভাবটি শুধু। যোগে দেখেন তার যোগ্যতা, জ্ঞানে দেখেন পূর্ণতা। ভক্তি পথে চললে ভগবান ভক্তের sincerity-ই দেখেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

নারদ সর্বক্ষণ ভগবানের নাম করে বেড়ান। মনে মনে একটু অভিমানও এসেছে তাঁর যে, তাঁর মতো ভক্ত আর বুঝি কেউ নেই। কিন্তু ভগবান তো সকলের মনের ভাব বুঝতে পারেন, কাজেই তিনি নারদের এই ভাবটিও উপলব্ধি করতে পারলেন।

এদিকে নারদ ঘুরতে ঘুরতে বৈকুণ্ঠে গিয়ে হরির কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে বিমর্ষ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু, আপনি এত বিষণ্ণ কেন?

ভগবান—নারদ, মর্তলোকে আমার এক ভক্ত-মা আছেন তার জন্য আমার মন উতলা হয়েছে, সেখানে যেতে হবে। চল আমরা যাই সেখানে। নারদ খুশি হলেন। তিনি ভাবলেন, দেখা যাক কী রকম ভক্ত সে। ছদ্মবেশে কৃষ্ণ ও নারদ চললেন মর্তে। তারপর দু'জনে গিয়ে এক গৃহস্থ চাষির বাড়িতে হাজির হলেন। চাষির স্ত্রীকেই ভক্ত বলে কৃষ্ণ উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কোথায় ভক্ত? সারাদিন তো নারদ তাকে নাম করতে দেখলেনই না উপরন্তু সারাদিন সে গাধার মতো চাষবাস করে খেটে মরছে। নারদ কৃষ্ণকে তাঁর মনের এই ভাব জানাতেই তিনি বললেন—অস্থির হয়ো না, দেখ না ধৈর্য ধরে একটু।

তারপর সারাদিনের কাজকর্ম সেরে চাষির স্ত্রী বাড়িতে যখন শুতে গেল তখন বিছানার কাছে গিয়ে—'জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি' এই রকম তিনবার উচ্চারণ করে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। শোওয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্বামীকে প্রণাম করে 'জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি' বলে কাজে চলে গেল।

নারদ প্রশ্ন করলেন প্রভুকে—প্রভু, এ কী রকম ভক্ত, সারাদিনের মধ্যে সকালে তিনবার ও বিকেলে তিনবার, এই ছয়বার মাত্র হরি নাম করল। এটা কী রকম ভক্তির লক্ষণ? আপনি যে কী বলেন প্রভু!

কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—ঠিক আছে, তোমাকে তা পরে বুঝিয়ে দেব।

পরের দিন কৃষ্ণ নারদকে ছোট একটি পাত্র ভর্তি তেল দিয়ে বললেন—নারদ এই তেলের পাত্রটি হাতে করে তুমি স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল, এই ত্রিভুবন ঘুরে এস। কিন্তু সাবধান এর থেকে একফোঁটা তেলও যেন মাটিতে না-পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে গেলে তা দিয়ে আর কাজ হবে না।

প্রভুর আদেশ পাওয়ামাত্র নারদ তেলের পাত্রটি হাতে করে রওয়ানা হলেন। কিন্তু নারদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রিভুবন ঘুরে আসতে পারলেন না, বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

কৃষ্ণ—এই বিশ্বভুবন পরিক্রমা করে আসবার সময় কতবার তুমি আমার নাম স্মরণ করেছিলে?

নারদ—সেকি, সারাক্ষণ আমার দৃষ্টি, মন, প্রাণ সব তেলের উপরে ছিল যাতে একফোঁটা তেলও পড়ে না-যায়। এর মধ্যে নাম করার কথা তো আমার স্মরণই হয়নি।

কৃষ্ণ—যে নারদ আমার নাম ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না সেই নারদ আজ সারাদিন নাম না-করে কী করে আছে?

নারদ—কী করে ডাকব? আপনি যে রকম কাজের ভার আমাকে দিয়েছিলেন যে, সারাক্ষণই আমার সজাগ হয়ে থাকতে হয়েছে, কাজেই নাম করা সম্ভব হয়নি।

কৃষ্ণ—নারদ, তাহলে এবার ভেবে দেখ কী রকম ভক্তের কাছে আমি এসেছি। এ গৃহস্থ হয়ে সর্বকাজের মধ্যে সারাদিন নিযুক্ত থেকেও সকালে শয্যাত্যাগের সময় ও রাতে নিদ্রার পূর্বে আমার নামটি নিতে ভোলে না। আর তুমি তো ঋষি, তুমি সব কাজ ফেলে শুধু আমার নামগান করেই থাক। এ গৃহী হয়ে সব কাজ করেও আমার নাম করে অথচ তুমি একটিমাত্র কাজের ভার নিয়ে আমার নামটি পর্যন্ত নিতে ভুলে গিয়েছ!

প্রভুর কথা শুনে নারদ লজ্জিত হয়ে বুঝতে পারলেন ভক্তের উপরেও ভক্ত আছে। আসল ভক্ত অভিমানশূন্য, নিরহংকার।

১০। ৭। ৭২

১৮১

লোকে ভাবে, নিজের অনেক বেশি হয়েছে এবং অপরের কিছুই হয়নি। এটা রাজসিক অহংকার। আবার অনেকে মনে করে, সকলের সব হয়েছে কিন্তু আমারই কিছু হল না। এটা তামসিক অহংকার।

রাজসিক অহংকারে গর্ব করা হয় আর তামসিক অহংকারে খর্ব করা হয়। সাত্ত্বিক অবস্থা হল নারদের মতো অবস্থা। অবশ্য কোনও কোনও সময় এই সাত্ত্বিক অবস্থা নারদের এসেছে, তবে সব সময় নয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নারদ প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বললেন।

নারদ ত্রিভুবনে অর্থাৎ স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে নামকীর্তন করে বেড়াচ্ছেন। এদিকে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করার জন্য গিয়েছেন। কৃষ্ণকে সিংহাসনে না-দেখে নারদ মা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু কোথায়?

মা লক্ষ্মী—কি জানি! বৃন্দাবন না কোথায় যেন লীলা করতে গিয়েছেন। তোমার প্রভুর তো কোনও কাজ নেই এখানে-সেখানে শুধু ছুটোছুটি করেন।

প্রেমে মা লক্ষ্মীর স্থান নেই। মা লক্ষ্মীর হল ঐশ্বর্যের অবস্থা, রাধারানি হলেন যোগমায়াশক্তি—মাধুর্যের অবস্থা। লক্ষ্মী হলেন মহামায়া।

নারদ প্রভুর লীলা দেখবার জন্য বৃন্দাবনে এলেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন গোপগোপীরা আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। নারদ তো কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার সুযোগই পাচ্ছেন না। কয়েকদিন পর কৃষ্ণ তাঁকে সুযোগ দিলেন দেখা করার জন্য।

নারদ প্রথমেই বললেন—প্রভু এ কী রকম হল? অশিক্ষিত সাধনভজনহীন কতগুলি গোপগোপীর সঙ্গে আপনি খেলা করে বেড়াচ্ছেন, এটা কী রকম কথা! এদের না আছে ভক্তি, না আছে জ্ঞান।

কৃষ্ণ তখন কিছু বললেন না। পরে বৈকুণ্ঠে ফিরে এসে বললেন—নারদ, আমার বড় শরীর খারাপ তবে ভক্তের একটু পদধূলি গায়ে মাখতে পারলে রোগ সেরে যাবে।

নারদ—কোথায় পাব বলে দিন। এটা কী এমন শক্ত ব্যাপার, এক্ষুনি এনে দেব।

নারদ স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কোথাও ভক্তের পদরেণু খুঁজে পেলেন না। ভগবান অঙ্গে মাখবেন ভক্তের পদরেণু, কিন্তু কে দেবে এই পদরেণু? পদরেণু চাইতে গেলে সকলেই চমকে উঠে বলে—নারদ তুমি কি পাগল হয়েছ? ভগবানকে পদধূলি দিতে গিয়ে কি অনন্ত কাল নরকবাস করব? নারদ কোথাও ভক্তের পদধূলি না-পেয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে এসে বললেন—প্রভু, পদধূলি কেউ দিতে রাজি নয়।

কৃষ্ণ—তুমি এক কাজ কর। বৃন্দাবনে একবার যাও, সেখানে হয়ত পাবে। নারদের ইচ্ছা ছিল না বৃন্দাবনে কতগুলি অর্বাচীন নারীর কাছে যেতে। এদিকে প্রভুর আদেশ না-মেনেও পারেন না। তিনি বাধ্য হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন। নারদকে দেখে সব গোপীরা তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করল—নারদ, আমাদের কৃষ্ণ কেমন আছেন?

নারদ বলল—কৃষ্ণ ভয়ানক অসুস্থ। এই অসুখ সারবে যদি সর্বাঙ্গে ভক্তের পদধূলি মাখানো যায়, কিন্তু পদধূলি জোগাড় করতে পারছি না।

গোপীরা—সেকি কথা! কৃষ্ণ ভুগছেন আগে কেন বলনি? নিয়ে যাও, কত পদধূলি তাঁর প্রয়োজন? এই বলে গোপীবা পায়ের তলা থেকে মুঠো মুঠো ধূলি তুলে নারদেব সামনে রাখল। কী করে ধূলি নিয়ে যাবে, এই হল এখন নাবদের সমস্যা। নারদের নামাবলিটা টেনে নিয়ে সকলেই নিজেব নিজের পদধূলি তাতে দিতে লাগল। গোপীরা বলল—এগুলি এক্ষুনি নিয়ে তুমি বৈকুণ্ঠে চলে যাও।

নাবদ—তোমরা করছ কী? তোমাদের কি বুদ্ধি লোপ পেযেছে? ভগবানকে এই যে পদধূলি দিচ্ছ তার ফলে তোমাদের অনন্ত কাল নরকবাস করতে হবে।

গোপীরা—নরকে যাব ক্ষতি নেই, প্রভুর অসুখ সারলেই হল। তুমি আর দেরি করো না নারদ।

নারদ ভাবলেন, এরা সত্যিই একেবারে বোকা, কোনও হিতাহিত জ্ঞান নেই এদের। শেষ পর্যন্ত নামাবলি ভর্তি করে পদধূলি নিয়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

নারদ কৃষ্ণকে বললেন—নিয়ে এসেছি ঠিকই, তবে ঐ ছোঁড়াছুঁড়িগুলির কাণ্ড দেখে অবাক হলাম। এতই অর্বাচীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, যে যার পায়ের ধুলো নিয়ে এল স্বয়ং ভগবানের অঙ্গে মাখাবার জন্য এবং সেগুলি আমারই নামাবলিব মধ্যে বেঁধে দিল। এরা একবারও ভেবে দেখল না যে, এর পরিণামে কী দুর্গতি হবে তাদের। আপনি বৈকুণ্ঠে মা লক্ষ্মীকে এবং ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী, মুনি, ঋষিদের ফেলে কতগুলি মূর্খ ছেলেমেয়েকে নিয়ে খেলছেন।

কৃষ্ণ—নারদ তুমি কাকে মূর্খ বলছ? চার দিকে ঘুরে অনেক ভক্ত তো দেখলে, কত সাধুসন্ন্যাসী, যোগী, এমনকী মুনি, ঋষি এবং কত দেবদেবীও দেখেছ, তাঁরা নিজেদের ভক্ত বলে ভাবলেও আমার প্রাণরক্ষার জন্য কিছু কি করেছেন? অথচ যাদের তুমি মূর্খ ও অর্বাচীন বলছ তারাই আমার প্রাণরক্ষা ও সুখের জন্য নরকবাস বেছে নিল। যারা আমার সুখের জন্য নিজেদের ভুলে যায় তারাই আমার প্রাণ। তাদের জন্য আমি তোমার মা লক্ষ্মীকেও ছেড়ে দিতে পারি, এমনকী তোমাকেও ছেড়ে দিতে পারি।

নারদ তখন বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন—হ্যাঁ, তা তো ঠিকই, ভক্ত না-হলে কি আর আপনি তাদের ভালবাসেন।

কৃষ্ণ বললেন—যে স্বার্থশূন্য হয়ে আমাকে একটুখানি দেয় তাকে আমি সর্বস্ব দিই।

১০। ৭। ৭২

১৮২

ভগবান গোপীদের বহু 'আমি'-র কাছে ঋণী হয়ে রইলেন যুগ যুগান্তকাল! একটি 'আমি' লক্ষ লক্ষ জনম দিয়েও তা শোধ করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন।

বলরাম ও কৃষ্ণ সন্দীপন ঋষির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুদাম, শ্রীদামের সঙ্গে তাঁদের ভাব হয়েছিল। সুদাম আগে শিক্ষা শেষ করে চলে আসে, তথাপি সে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছিল। একদিন গোষ্ঠে যাবার সময় মা যশোদার সঙ্গে সুদাম দেখা করতে গেলে মা যশোদা সুদামের হাতে বলরাম ও গোপালের জন্য নাড়ু পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাস্তায় লোভের বশবর্তী হয়ে সে নাড়ুগুলি খেয়ে ফেলল। ভগবান কৃষ্ণ তো সবই জানতে পারেন, কাজেই এটাও জেনে ফেললেন। এই লোভের জন্য সুদামের সারাজীবন দারিদ্র আর ঘুচল না।

কৃষ্ণ যখন দ্বারকার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলেন তখন একদিন সুদামকে তার পত্নী কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দিল। সুদাম তার ময়লা কাপড়চোপড় এবং এই রকম দীনহীন অবস্থায় কৃষ্ণের কাছে যেতে প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু পত্নীর পীড়াপীড়িতে যেতে বাধ্য হল।

সুদাম এতদিন পরে খালি হাতে কী ভাবে সখার কাছে যাবে, এই ভেবে সুদামের পত্নী কৃষ্ণের জন্য কয়েকটা চাল ভেজে তার চাদরের খুঁটে বেঁধে দিল। সুদাম পায়ে হেঁটে দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে অবশেষে দ্বারকায় পৌঁছাল। সেই সময় অন্দরমহলে যাবার কোনও নিষেধ ছিল না। কাজেই সুদাম সোজা অন্দরমহলেই চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল কৃষ্ণ স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসে আছেন এবং সত্যভামা ও রুক্মিণী দু'জনে তাঁর পদসেবা করছেন। সুদামকে দেখামাত্রই কৃষ্ণ ছুটে এসে সুদামকে আলিঙ্গন করলেন এবং টেনে নিয়ে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রুক্মিণী ও সত্যভামাকে তার চরণ ধুয়ে সেবা করার নির্দেশ দিলেন। কৃষ্ণের সখা এসেছে কাজেই সত্যভামা ও রুক্মিণী দু'জনেই তার পদসেবায় লেগে গেলেন। সুদাম ভীষণ লজ্জিত হচ্ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই তার কথা শুনলেন না।

এদিকে সুদামের চাদরের খুঁটে যে চাল বাঁধা ছিল সেটাও লজ্জায় বার করতে পারছিল না। সুদামের মনের ভাব তো কৃষ্ণের অজানা নেই। তিনি বললেন—দেখ আমাকে যারা ভালবাসে তারা তো কিছু না কিছু আমাকে দেয়ই, ভগবানকে শুধু শুধু ভালবাসা যায় না।

কৃষ্ণের এই কথা শোনা সত্ত্বেও সুদাম চালভাজা বার করতে লজ্জা পাচ্ছিল। তখন কৃষ্ণই চাদরের খুঁট থেকে চালভাজা বার করে নিজে খেলেন, সুদামকে দিলেন এবং দুই রানিকেও দিলেন। ভগবানের প্রসাদ খেয়ে সকলেরই খুব তৃপ্তি হল।

রুক্মিণী কৃষ্ণকে বললেন—তোমরা সখা, একসময় একসঙ্গে বিদ্যাচর্চা করেছ, একসঙ্গে খেলেছ অথচ তার এত দুঃখ, তুমি কোনও ব্যবস্থা করে দাও না কেন?

কৃষ্ণ বললেন—ব্যবস্থা করে দিলেও ওর ভোগে তা লাগবে না। এটাই ওর প্রারব্ধ কর্মের ফল। জান, মা আমাকে ও দাদাকে নাড়ু দিয়েছিলেন। সেই নাড়ু আমাদের না-দিয়ে সুদাম খেয়ে ফেলেছিল, তাই তার এত দুঃখকষ্ট ও অভাব-অনটন। প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতেই

হবে, আমি কী করতে পারি? তা সত্ত্বেও সত্যভামা ও রুক্মিণীর পীড়াপীড়িতে তখন ভগবান বললেন—ভক্ত যদি আমাকে এতটুকু না-দেয় আমি তাকে কী করে দেব?

সেই জন্য যে ভক্ত মনের কোণে তাঁকে একটু স্থান দেয়, ভগবান তার কাছে নিজেকেই দিয়ে দেন। একবার কৃষ্ণের আঙুল কেটে যাওয়াতে দ্রৌপদী একটুখানি শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিলেন, তার ফলে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল তখন যতই কাপড় টানে কাপড় আর ফুরায়নি।

দুই রানিকে কৃষ্ণ আরও বললেন—এই ব্রাহ্মণ কৃপণ ও স্বার্থপর ছিল, আমাকে কিছুই দেয়নি। এবার সে চালভাজা দিল, তার ফলে কিছু পাবে।

কৃষ্ণ সুদামকে বললেন—সুদাম তুমি বল তোমার কী দরকার?

সুদাম—তোমার কাছে কিছু চাইতে আসিনি। যদি কিছু দিতেই হয় তবে তোমার ওই পদযুগল শুধু চাই।

ভগবান গলা থেকে তাঁর বৈজয়ন্তীমালাটি দিলেন। তিনি বললেন—এই মালার কাছে তিনটিমাত্র বর প্রার্থনা করতে পারবে তার পরে আর নয়। তিনটি বর পূরণ হয়ে গেলে তা আমার কাছে আবার ফিরে আসবে।

সুদাম বৈজয়ন্তীমালা পরে ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বেরোল যদি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়! ভগবানের নাম নিতে নিতে সে চলেছে। হঠাৎ পথে যেতে যেতে এক বাড়িতে কান্নার রোল শুনে সে বাড়ির কাছে এসে একজনকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে একজনের কাছে জানতে পারল, গৃহকর্তার একমাত্র পুত্র সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। করুণায় বিগলিত হয়ে সে তার বৈজয়ন্তীমালার কাছে প্রার্থনা জানাল—তোমার প্রভুর আদেশ পালন কর। এই যে ছেলেটি আজ সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে এর জীবনটা ফিরিয়ে দাও। এই কথা বলতে বলতেই ছেলেটি উঠে বসল।

আবার চলতে চলতে সুদাম দেখল এক নদীতীরে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির একমাত্র পুত্রকে কুমিরে ধরে নিয়ে গিয়েছে। নদীর তীরে বসে ব্রাহ্মণ দম্পতি আকুল হয়ে কাঁদছিল। সুদাম তাই দেখে বৈজয়ন্তীমালার কাছে ব্রাহ্মণ দম্পতির পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানাল। বৈজয়ন্তীমালা তাকেও ফিরিয়ে নিয়ে এল। এই ভাবে দ্বিতীয় বরটিও শেষ হয়ে গেল।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সুদাম আরও কিছুদূর যাবার পর দেখল বিবাহের সাত দিন পরেই বরটি মারা গিয়েছে। সেখানে সতীদাহের ব্যবস্থা হয়েছে। খুবই বীভৎস এবং করুণ দৃশ্য। সুদামের মনে করুণা জেগে উঠল। বৈজয়ন্তীমালাকে আবার অনুরোধ জানাল বরকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য। বর বেঁচে উঠতেই বৈজয়ন্তীমালা সুদামের কাছে এসে বলল—আমার তিনটি আদেশ পালন করার কথা ছিল, সে কাজ আমি সম্পন্ন করেছি। তার পরে যথাস্থানে সেই মালা চলে গেল।

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন—বৈজয়ন্তীমালা ফিরে এসেছে। রুক্মিণী বললেন—আবার তাহলে কোনও একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কৃষ্ণ—তার জন্য যে ব্যবস্থাই করা হোক না কেন সে অপরের দুঃখকষ্ট দেখলে ব্রাহ্মণীর কথা একেবারে ভুলে যায়।

রুক্মিণী—এ সব তোমার চাতুরী।

কৃষ্ণ—আমার উপর যদি তোমার বিশ্বাস না-থাকে তবে তুমিই তাকে একটু কৃপা কর।

রুক্মিণী তখন সুদামের জন্য বিশাল এক অট্টালিকা তৈরি করে দিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং সুদামের স্ত্রীর জন্য অলংকার ও মূল্যবান শাড়িরও ব্যবস্থা করলেন। তাদের খাওয়াদাওয়ার যাতে কষ্ট না-হয় সেই জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। সুদাম দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নিজের বাড়িতে এসে স্ত্রীকে দেখতে না-পেয়ে মহামুস্কিলে পড়ল। সে ভাবল, এর মধ্যেই কি স্ত্রী মারা গিয়েছে! এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে লাগল। একটু পরে তার স্ত্রী সুদামের খবর পেয়ে তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল।

এত সব ঐশ্বর্য, অট্টালিকা, স্ত্রীর গায়ে রত্নালংকার ও পরিধানে মূল্যবান শাড়ি দেখে সুদাম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এবং কাঁদতে লাগল এই বলে—যে ঐশ্বর্য তোমার পাদপদ্ম ভুলিয়ে রাখে তা আমি চাইনি।

রুক্মিণী তখন বললেন—তোমাকে তো কিছু দেওয়া হয়নি, যাকে দেওয়া হয়েছে সে তো আমাব সখী। তুমি পাদপদ্ম চেয়েছিলে পাদপদ্মই পাবে। তবে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তাঁর পাদপদ্মকে তুমি ভুলবে না।

গল্পটি শেষ কবে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবানের মহিমা একমাত্র সেই ভক্তের কাছেই প্রকাশ হয় যে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়।

১০। ৭। ৭২

১৮৩

রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী, ইষ্ট, গুরু এই নিয়ে যে কত বিরোধ সেই সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

ভগবানকে কী নামে ডাকলে তিনি তাড়াতাড়ি সাড়া দেন, এই বিষয়ে একবার একটি প্রশ্ন উঠল সাধুদের মধ্যে। কোন নামটি কার্যকরী হয় বেশি? কেউ বলে হরি, কেউ বলে রাম, কেউ কৃষ্ণ, কেউ গুরু, কেউ মা, কেউ বা ইষ্ট প্রভৃতি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজের নিজের পছন্দের নামটিকেই বড় করতে চেষ্টা করছিল। তখন উপর দিয়ে এক বিদেহী মহাপুরুষ যাচ্ছিলেন। উপর থেকে তিনি শুনতে পেলেন, এক এক দল এক এক নামে অর্থাৎ হরি, কৃষ্ণ, শিব, মা এই রকম ভাবে চিৎকার করছে। বিদেহী মহাপুরুষ এই ধ্বনি শুনে ভাবলেন, এখানে নিশ্চয় খুব নাম হচ্ছে, সাধুদের কোনও মহাসভা হচ্ছে বোধহয়। এই ভেবে তিনি একটু নিচে এসে দেখলেন "সাধুদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারি চলছে। তিনি ভাবলেন, সাধুদের মধ্যে কেন এ রকম মতবিরোধ, মতভেদ ও মারামারি হবে? তিনি তখন ছদ্মবেশে সেখানে এলেন এবং এসে খুব কাঁদতে লাগলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?

তিনি বললেন—আমার ইষ্টের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। তখন রামভক্তের দল বলল—রাম নাম কর এবং কৃষ্ণভক্তের দল বলল—কৃষ্ণ নাম কর। এই ভাবে এক একটা দল এক একটা নাম করতে বলল। এই সময় এক বৃদ্ধ সাধু এসে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। তাঁর দেখাদেখি আরেকজন সাধুও ওই রকম মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

এই ভাবে দেখা গেল, সবাই মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে ও কাঁদছে। তখন কঠিন হৃদয়ের এক সাধু ভাবল, সবাই কাঁদছে অথচ আমার কেন কান্না আসছে না।

ভগবানকে পেতে হলে নামটা ভিতরে করতে হবে, বাইরে করতে গেলেই ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বোঝানো হল যে, ওই জায়গাতে সবারই এসে মিলতে হবে। বেদনার স্থানে যুক্তিতর্ক নেই—সব নাম এক সমান। যেমন ছেলের বয়স দুই বছর বা দু'শো বছর যা-ই হোক তারা তো সর্বদা মায়ের ছেলেই থেকে যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মাবাবাকে সংসারে কত নামেই তো সকলে ডাকে, কেউ ডাকে বাবা, কেউ মামা, কেউ দাদু, কেউ কাকা, কেউ বা পিসেমশাই, কিন্তু ব্যক্তি একজনই।

মহাপুরুষ আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন যে, সব নাম সমান। আসলে দেখতে হবে প্রাণ কাঁদছে কি না তাঁর জন্য। কী নামে কে ডাকে তা দিয়ে কী হবে? আচরণ দিয়ে মহাপুরুষ দেখিয়ে গেলেন ধর্মটা কী। তাঁর দেখাদেখি সবাই যে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল এর অর্থ হল মহৎ যিনি, তাঁর মতন আচরণ করবে সবাই। ইষ্টের জন্য যখন প্রাণ কেঁদে মাটিতে লুটায় তখনই তাঁকে পাওয়া যায়।

হরি কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা মানুষের নাম নয়, আবার যুগবিশেষের নাম তাও নয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে মধুর হয় আপনবোধ দিয়ে। আর তা না-হলে জলতেষ্টা পেলে যেমন মানুষ জল খায়, সেই রকম প্রয়োজনের সময় শুধু সবাই তাঁকে ডাকে।

১১। ৭। ৭২

১৮৪

হাতের লাঠি যেমন কাদায়, জলে, কাঁটাবনে, আগুনে যেখানেই রাখা যায় সে প্রতিবাদ করে না, সেই রকম প্রতিবাদ না-করে যিনি support দেন তাঁর নামই গুরু, ইষ্ট বা ঈশ্বর। তাঁকে ভাল বা খারাপ যা-ই দেওয়া হোক তিনি প্রতিবাদ করেন না। ভক্তের সামান্য ফুল, বেলপাতাও তিনি গ্রহণ করেন। অনেকে বলে—কই তিনি তো গ্রহণ করেন না। আসল কথা দেবারও কৌশল আছে। নিবেদন কী ভাবে করতে হয় তাও জানতে হয়। নিখুঁত পরিবেষণ, সেবা বা কর্ম শিখতে হয়। তাহলে কোনও অপচয় ও ক্ষতি হয় না।

যথার্থ গুরু হতে গেলে যে কত পরিশ্রম করতে হয় সে প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক শহরে এক মহাত্মা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যও ছিল। শিষ্যদের মধ্যে একদিন তর্ক হচ্ছিল। এক শিষ্য বলছিল—'আমারবোধ' কখনও যায় না এবং 'তোমারবোধ' কখনও আসতে পারে না। শিষ্যের এই কথা শুনে গুরুদেব বললেন—ঠিকই বলেছ তুমি। এখন 'আমারবোধ' তো থাকবেই। এখন তোমার গোঁফটি নেই এটা ঠিক, কিন্তু আবার যখন গোঁফ হবে, তখন আর গোঁফটি নেই এটা বলতে পারবে না। সেই রকম যথাসময়ে 'তোমারবোধ' এসে গেলে 'আমারবোধ' আর থাকবে না এবং তা ব্যবহার করতে গেলেও কাজে লাগবে না। Train-এ উঠে কেউ যদি বলে train-টি আমার তাহলে তাকে মেরে সবাই তাড়িয়ে দেবে। প্রকৃতির রাজ্যেও vigilance officer আছে, সেও নিজের বলে কারওকে কোনও কিছু দাবি করতে দেখলে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

মহাত্মার মুখে এ সব কথা শুনে একজন লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইল। মহাত্মা বুঝতে পারলেন যে, কোনও মতলব নিয়ে সে এসেছে। যাই হোক, তিনি তাকে বললেন—বেশ, তুমি দীক্ষা চাইছ যখন দেব নিশ্চয়ই, তবে তার আগে কয়েকদিন অন্য কাজ করতে হবে। এই বলে সেই মহাত্মা তার উপর কতগুলি এমন কাজের ভার দিলেন যে, সে তিন দিন পরেই পালিয়ে গেল।

সেই লোকটি অনেক মহাত্মার কাছেই যায়, কিন্তু গুরুর নির্দেশ মতো কাজ করতে যখন পারে না তখন সেখান থেকে পালিয়ে যায় অন্যত্র।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একবার এক সিদ্ধপুরুষের কাছে সে যায়। তিনি বললেন—তোমাকে জমি চাষ করতে হবে, লকড়ি কাটতে হবে, কলসি ভরে নদী থেকে জল আনতে হবে, তা ছাড়া অন্যান্য আরও কাজ আছে সে সবও দেখতে হবে। শিষ্যটি রাজি হল, কিন্তু এ ভাবে পরিশ্রম করে সে হাঁপিয়ে উঠল, আর যেন পারছিল না।

কয়েকদিন পরে একদিন নদীতে যখন সে কলসি ভরে জল আনতে গেল তখন দেখে একটি নৌকা আসছে। সে কলসিটি নদীর তীরে ফেলে দিয়ে নৌকা করে পালাবার মতলবে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে গুরুমহারাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—নৌকা করে পালাচ্ছিস কোথায়? ফিরে আয়।

শিষ্যটি পিছন ফিরে দেখে—কই গুরু তো নেই সেখানে। কলসির মধ্যে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অবাক হয়ে সে ভাবল, কলসি কী করে কথা বলে। তাহলে তো কলসির মধ্যে গুরুদেব আছেন এবং গুরুদেব মহাশক্তিসম্পন্ন। তাড়াতাড়ি কলসির কাছে এসে সে নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখে কলসির মধ্যে কেউ নেই। কলসির মধ্যে থেকে আবার কথা ভেসে এল—তুমি শিষ্য হতে এসেছ, কিন্তু প্রথম পরীক্ষাতেই যদি ফেল কর তাহলে গুরু হবে কী করে? বড় হতে গেলে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। একজন

বড় ইঞ্জিনিয়ার যে হয়েছে সে ছোটবেলা থেকে কতগুলি পরীক্ষা দিয়ে তবেই বড় হয়েছে। যিনি গুরু হয়েছেন তিনিও পূর্বে অনেকের শিষ্য হয়েছেন এবং বহু পরিশ্রম করে ও পরীক্ষা দিয়ে তবেই এই অবস্থায় এসেছেন। আমার জীবনেই কি কম পরীক্ষা দিতে হয়েছে?

তখন কলসি তার আত্মকাহিনি বলতে শুরু করল—কত বেদনাদায়ক অবস্থা ও দশা অতিক্রম করে যে বর্তমানে আমি সাধুর আশ্রমে এসেছি ও সাধুসেবার যোগ্য অধিকারী হয়েছি, সে কথা শোন। প্রথমে তো কুমোর আমাকে মৃত্তিকামায়ের বুক থেকে কোদাল দিয়ে চাক চাক করে কেটে পৃথক করে নিয়ে এসে রোদে ফেলে দিল। পৃথিবীমায়ের রসে আমি সরস ছিলাম। সেখান থেকে কেটে আনার যন্ত্রণা এবং আলাদা হয়ে থাকার কষ্ট ভোগ করলাম প্রথম।

দ্বিতীয় অবস্থায় রোদে পুড়ে একেবারে শুকনো ও নীরস হয়ে গেলাম। যেমন কয়লা আগুনে পুড়ে সাদা হয়ে যায় সেই রকম রোদে পুড়ে আমার রঙও সাদা হয়ে গেল। জলতেষ্টায় বুক ফেটে যায়, কিন্তু কোথায় আর জল পাব? বেশ কিছুদিন এই ভাবে রোদে পড়ে থাকতে হল এবং জলতেষ্টায় কষ্ট পেতে হল।

তারপর তৃতীয় অবস্থায় কুমোর মুগুর দিয়ে পিটিয়ে আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। সেই পিটুনির ব্যথা ও যন্ত্রণা ভুলবার নয়। তখন চতুর্থ অবস্থায় নিজের আত্মরক্ষার জন্য আশেপাশের যা-কিছু আমি জড়িয়ে ছিলাম সেই সব অবলম্বন, যথা—কাঁকর, পাথর প্রভৃতি আমার থেকে পৃথক করে নিয়ে গেল। তখন একা পড়ে রইলাম। দুঃখবেদনার কথা যাদের কাছে বলতাম ও যাদের নিয়ে এতদিন ছিলাম তাদেরও সরিয়ে নিয়ে গেল, তখন দুঃখের কথা আব কাকেই বা বলি? সুতরাং নীরবে সব সহ্য করলাম।

পঞ্চম অবস্থায় আমার মধ্যে জল ঢেলে দিল। ফলে আমার সর্দিগর্মি হয়ে গেল। একের পর এক কত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাই যে আমায় ভোগ করতে হল।

তার পরে ষষ্ঠ স্তরে কুমোর পা দিয়ে আমাকে মাড়িয়ে দিতে লাগল। কত লাথি যে খেয়েছি তার হিসেব নেই। এত কষ্টের কথা বলি কাকে? তোমরা তো অল্প একটু অসুবিধা হলেই সরে পড়, হইহই করে সরে যাও। আমার অবস্থা একটু ভেবে দেখ। এই লাথিতেই শুধু শেষ হল না, পরে তার মধ্যে আবার কোদাল চালাল। আমাকে তখন মেরে পিটিয়ে একেবারে তুলতুলে করে ফেলেছে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। আমার কথা শুনবেই বা কে আর জানবেই বা কে?

সপ্তম স্তরে এসে আমাকে এই অবস্থায় কুমোর চাকে ফেলে দিল। চাকের মধ্যে আমাকে পিষে কলসির আকারে গড়ে তুলল। তখন পেটের মধ্যে কিছুই আর রইল না। খালিপেটে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছি।

অষ্টম স্তরে আবার আমাকে রোদে ফেলে রাখল। ছিল ক্ষুধার জ্বালা, এখন আবার রোদের তাপে গলা শুকিয়ে তেষ্টায় বুক ফেটে যাবার মতো অবস্থা।

নবম স্তরে কুমোর আমাকে নিয়ে আগুনে পোড়াল। যেমন লোকে শবদেহ পোড়ায় সেই রকম আমাকে নিয়েও সে লকড়ির আগুনে পোড়াল। তখন কী ভয়ানক যন্ত্রণা! রোদের তাপে আগেই শরীর শুকিয়েছে সুতরাং তখন আর ফোসকা পড়ল না সত্য, কিন্তু আমি পুড়ে একেবারে লাল হয়ে গেলাম এবং আমার কিছু কিছু অংশ কালোও হয়ে গেল।

তারপর দশম অবস্থায় কুমোর আমাকে বাজারে নিয়ে এল। সেখানে দেখতে পেলাম আমার মতো হতভাগা ভাইবোন অনেকেই পাশে রয়েছে। সকলেরই এক অবস্থা। খদ্দের আসে আর আমাদের হাতে তুলে নিয়ে চাটি মারতে থাকে। কত চাটিই যে খেতে হয়েছে, সে কী আর বলব? চাটি মেরে তারা তাদের পছন্দ মতো আমাদের বেছে নেয়। এক সাধু মহাত্মার সুনজরে পড়েছিলাম বলেই তিনি চাটি না-মেরে শুধুই পেটে হাত বুলিয়ে আমাকে পছন্দ করেন এবং দোকানিকে পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রমে। তারপর থেকে আমার মধ্যে ঘি, জল, তেল রাখা হয়।

আমার মতো হতভাগা ভাইবোনেদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আবার আমার চেয়েও খারাপ। তাদের মধ্যে এমন সব জিনিস রাখা হয় যে, চাপে তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায়ও নেই এবং করলে তা কেউ মানবেও না। আবার ফেটে ভেঙে গেলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অকেজো হয়ে গিয়েছি বলে। জঙ্গলের মধ্যে পথের ধারে আমাদের আবার লোকে মাড়িয়ে যায়, পিটিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। কেউ আবার জলে ফেলে দেয়, তখন জলেই ডুবে থাকি। কেউ কেউ মাঠের ধারে ফেলে দেয়, তখন মাটির বুকেই পড়ে থাকি, কিন্তু পূর্বের মতো মাটির রসের সঙ্গে আর এক হয়ে যেতে পারি না।

মানুষের খামখেয়ালি ও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমাদের কী রকম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় তা অনুমান করতে পারবে না। গৃহস্থের ঘরে আমাদের দুরবস্থার আর অন্ত নেই। তবে সাধু মহাত্মার আশ্রমে আমাদের কেউ কেউ কিছু সুবিধা পায়। সৌভাগ্যক্রমে আমি সাধু মহাত্মার সুনজরে পড়েছি বলেই আমার মধ্যে যজ্ঞের ঘি রাখা হয়। সেই ঘি খেয়ে আমি তুষ্ট আছি। ঘি শেষ হয়ে গেলে আমার মধ্যে আবার কখনও কখনও জলও রাখা হয়।

আশ্রমের মহান্ত মহারাজ আমার মধ্যে নদী থেকে জল ভরে আনার নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে। তুমি আমাকে মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেলে তোমার অপরাধ হবে। তুমি আমাকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এস। আমি যে-ভাবে সাধুগুরুর কৃপা পেয়েছি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছি তা তোমাকে সবিস্তারে বললাম। সাধুগুরুর কৃপাশীর্বাদ সহজে পাওয়া যায় না। সাধুগুরুর কৃপা ছাড়া জীবন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হতে পারে না। তুমি সাধু হতে এসেছ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়ে গুরু হতে এসেছ, কিন্তু কোনও কষ্ট সহ্যও করতে পারছ না, সাধনাও করতে পারছ না এবং তা চাইছও না। কর্ম ও সাধনে ফাঁকি দিয়ে

জীবন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হতে পারে না। তুমি আমাকে নদীতীরে ফেলে দিয়ে আশ্রম থেকে পালিয়ে যেতে চাইছ কর্ম ও সাধনার ভয়ে। তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি, তুমি জল ভরে আমাকে নিয়ে আশ্রমে রাখ এবং গুরুমহারাজের আদেশ মেনে চল, তবে তাঁর কৃপা পাবে এবং তোমার জীবন ধন্য হবে।

কলসির আত্মকাহিনি শোনার পরে সেই শিষ্যের মনে চৈতন্য হল। সে কলসির নির্দেশ অনুসারে জলভর্তি কলসি নিয়ে আশ্রমে গেল ও অনুগত ভক্তের মতো গুরুর নির্দেশ মেনে চলতে আরম্ভ করল। যথাযথ গুরুর কৃপাশিসে ধন্য হয়ে শেষে সে গুরু কর্তৃক আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হল এবং গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভাবেই সেই শিষ্য যথার্থ গুরুপদ প্রাপ্ত হল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পটির মধ্যে যোগতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি সব আছে। গল্পের মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার উত্তম ব্যবস্থা। প্রথমত কোদাল দিয়ে মারা হল যোগের অবস্থা—বাইরে থেকে মনকে ভিতবে আনা ও সৎসঙ্গে প্রবেশ করা। ভক্তি হয় শ্রবণের মাধ্যমে। প্রথমে হল শ্রবণ। জ্ঞানেব দৃষ্টিতে এই হল শুভ ইচ্ছা।

দ্বিতীয় অবস্থায় কোদাল দিয়ে মাটি কেটে রোদে রাখা হল সৎসঙ্গে এসে তাপ দেওয়া। আবার জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল বিচারণা। সৎসঙ্গের কথা প্রথম প্রথম খুব অপ্রিয় লাগে। শুভ ইচ্ছার পরে স্থির করে নিতে হবে কোনটা শ্রেয়। এই হল বিচারণা। (বিচারপূর্বক হেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করা, জানা ও মানা। এটা গুরুর নির্দেশ অনুসারেও হতে পারে, শাস্ত্র অধ্যযন করেও হতে পারে এবং নিজের অন্তরাত্মার নির্দেশ অনুসারেও হতে পারে। বিচার হল বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং সংযত ও মার্জিত অনুভূতির প্রকাশ)।

তৃতীয় অবস্থায় কাঁকর, পাথর বাছাই হল ভক্তির দৃষ্টিতে সৎসঙ্গে এসে শ্রবণ কবে নিজের ভুলত্রুটি শোধন করার চেষ্টা, অর্থাৎ তমোরজোগুণের মল বিচারপূর্বক পরিহার করা। জ্ঞানেব দৃষ্টিতে এটাই হল তনুমনসা।

চতুর্থ অবস্থা—মাটিতে জল ঢালা ভক্তির দৃষ্টিতে হল পদসেবা ও দিব্য কর্ম। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তা হল সত্তাপত্তি অর্থাৎ সরসতা ও সমতার প্রকাশবিকাশ।

পঞ্চম অবস্থা—জ্ঞানের দৃষ্টিতে পা দিয়ে দলাইমলাই করা হল সত্তাপত্তির শেষের অংশ। ভক্তির দৃষ্টিতে তা হল দিব্য কর্ম এবং যোগের দৃষ্টিতে তা যোগাভ্যাস ও আরাধনা।

ষষ্ঠ অবস্থা—জ্ঞানেব দৃষ্টিতে কুমোরের চাকে ফেলে দেওয়া হল অসংসক্তি। ভক্তির দৃষ্টিতে তা-ই হল অর্চনা ও বন্দনা।

সপ্তম অবস্থা—জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহ আধার বা আকার তৈরি হল পদার্থভাবনা। ভক্তির দৃষ্টিতে তা হল ভোগারতি সমর্পণ।

অষ্টম অবস্থা—সাম্যভাব অর্থাৎ পদের অর্থভাবনার সঙ্গে যোজনা (যুক্ত হওয়া)। গাছের সঙ্গে যেমন ডালের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন জীবাত্মার সম্বন্ধ ও গুরুর সঙ্গে যেমন শিষ্যের সম্বন্ধ। এই হল নিত্যযোগের লক্ষণ।

শিষ্য—আচ্ছা, এবার থেকে তোমাকে আরও বেশি করে ডাকব। কিন্তু বাড়ি গিয়ে সে গুরুকে স্মরণ করতে আবার ভুলে যায়। যখন হঠাৎ কোনও বিপদে পড়ে তখন তার গুরুর কথা স্মরণ হয়। এই রকম ভাবে দিন যায়। হঠাৎ এমন বিপদে একদিন সে পড়ল যে, মরতে মরতে কোনও রকমে প্রাণ বাঁচল। সেই বিপদের সময়েও সে বারবার গুরুকেই ডাকছিল। যাই হোক, গুরুকৃপায় সেই বার সে রক্ষা পেল।

শিষ্য তার বন্ধুর কাছে সব বলল। বন্ধু তাকে বলল—তুমি গুরুকে আরও বেশি করে ডাক না কেন? দু-চারবার ডাকার ফলেও তুমি যেখানে উপকার পাচ্ছ, সেখানে ডাকার মাত্রা বাড়িয়ে দিলে তো উপকার বেশিই পাবে।

বন্ধু তাকে আরও বলল—তুমি যা খাবে তা-ই তাঁকে নিবেদন করে খাবে। চলতে-ফিরতে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করবে এবং যখন যা কর্ম করবে, তাঁর কথা স্মরণ করেই করবে। এই ভাবেই তো স্মরণের মাত্রা বেড়ে যাবে।

লোকটি বন্ধুর কথা শুনে সেই ভাবে চলতে লাগল। চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে সে সর্বদাই গুরুর কথাই স্মরণ করে। ক্রমশ এমন অবস্থা হল যে, আর সে কুকাজ করতে পারে না। এই ভাবে তার সদাচার শুরু হয়ে গেল। সদাচার থাকলে কুকর্ম করার ইচ্ছা দূর হয়ে যায়। ক্রমশ এমন হল যে, যখন যেখানে সে যায় সেখানেই গুরু উপস্থিত হন। গুরু তখন শিষ্যের অন্তরে স্থান পেয়ে গিয়েছেন। সেই সময় একদিন শিষ্য গুরুর কাছে গিয়ে বলল—তুমি আমাকে না-দেখে কি থাকতে পার না? যখন যেখানে যাই, যা-কিছু করতে যাই, তুমি কেন সেখানে উপস্থিত হও?

গুরু—তুই ডাকিস বলেই যাই।

শিষ্য—আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তোমাকে ডাকব না ভাবলেও তোমার কথাই মনে পড়ে যায়।

গুরু—আমি গেলে তো তোর অসুবিধে নেই। তোকে কোনও কাজ করতে তো বারণ করা হয়নি। যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবেই তুই চলবি।

শিষ্য—আমার যে লজ্জা করে।

গুরু—লজ্জা হল দৈবীগুণ। লজ্জা এলে কুকাজের বৃত্তি আপনিই চলে যায়। লজ্জারূপে মাতাই তার মধ্যে থাকে। লজ্জারূপে তিনি না-থাকলে তো কুকাজ বন্ধ হয় না। এখানে লজ্জারূপে প্রকাশিতা মাতা। শাস্ত্রে তাই বলা আছে "যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।" মাতা লজ্জারূপে যার মধ্যে প্রবেশ করেন সে আর কুকাজ করতে পারে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে, মহতের প্রভাবে চিত্তের মলাবরণ ও বিক্ষেপ শোধন হয়ে যায় এবং অন্তরে সৎ বৃত্তি, মহৎ বৃত্তি জেগে ওঠে। পরিণামে ঈশ্বরানুভূতি, আত্মানুভূতি আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৩। ১০। ৭২

১৯৭

ধর্মতত্ত্ব খুবই জটিল, খুবই দুর্বোধ্য, কারণ তার বহুবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে পরস্পর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথাও বলা হয়েছে সত্যই পরমধর্ম, আবার কোথাও বলা হয়েছে অহিংসাই পরমধর্ম। কোথাও বলা হয়েছে প্রাণরক্ষাই পরমধর্ম, আবার কোথাও বলা হয়েছে প্রাণদানই পরমধর্ম। কোথাও বলা হয়েছে সেবাই পরমধর্ম, আবার কোথাও বলা হয়েছে ক্ষুধার্তকে অন্নদানই ধর্ম। কোথাও বলা হয়েছে দুঃস্থকে সাহায্য করাই ধর্ম, কোথাও বা বলা হয়েছে প্রার্থীর প্রার্থনাপূরণ করাই ধর্ম। কোথাও বলা হয়েছে জ্ঞানদানই সত্যধর্ম, আবার কোথাও বলা হয়েছে আত্মজ্ঞানই 'সুধর্ম' এবং 'সুধর্ম'-ই সব কিছুকে ধারণ করে রেখেছে। অন্য সমস্ত ধর্ম এই আত্মজ্ঞানেরই বিভূতি বা প্রকাশ মাত্র। আত্মজ্ঞান দানের দ্বারাই আত্মজ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহার সুসিদ্ধ হয়। ধর্মের পদ্ধতি যুগে যুগে পাল্টে যায়। পূর্বে ধর্মের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ শুধু নয়, নরমেধ যজ্ঞও করা হত। বর্তমানে এ সব করে কী ফল হবে?

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার ধর্মরাজ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে কর্ণের আতিথ্যধর্ম পরীক্ষা করতে এলেন। কর্ণের কাছে এসে ব্রাহ্মণ বললেন—আমি খুব ক্ষুধার্ত, আমাকে কিছু খাবার দাও।

কর্ণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কী খাবেন?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি মাংস খাব।

কর্ণ তখন মৃগয়া করতে অর্থাৎ হরিণ শিকার করতে বেরোলেন। তিনি মৃগয়াতে যাবার আগে জানালেন যে, তিনি হরিণের মাংস আনতে যাচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ তখন বললেন—আমি অন্য কোনও মাংস খাব না, আমি নরমাংস খাব।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে কর্ণ নিজের মাংস দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ তখন কর্ণকে জানালেন, কর্ণের মাংস তিনি খাবেন না, কর্ণের পুত্র শ্বেতকেতুর মাংসই খাবেন।

ব্রাহ্মণ আরও বললেন যে, কর্ণ ও তাঁর স্ত্রী পদ্মা উভয়ে মিলে তাঁদের পুত্রকে বধ (বলি) করে সেই মাংস পুত্রের মাতাকে স্বহস্তে রান্না করে দিতে হবে।

কর্ণ ব্রাহ্মণের কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না-হয়ে তাঁর পত্নীকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। কর্ণ ও তাঁর পত্নী পদ্মা উভয়ে মিলে পুত্র শ্বেতকেতুকে অবিচলিত চিত্তে বধ করলেন। কর্ণপত্নী পদ্মা অবিচলিত হয়ে সেই মাংস রান্না করে অতিথি ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করলেন। ব্রাহ্মণ সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। কর্ণ ও পদ্মা বিচলিত হয় কি না তা দেখাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য ছিল।

ব্রাহ্মণ দু'জনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না-হয়ে আনন্দের সঙ্গে অতিথি নারায়ণের সেবা করতে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। ব্রাহ্মণ আহারান্তে তৃপ্ত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ করে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। তারপর তিনি তাঁদের পুত্রকে বাঁচিয়ে দিলেন, যদিও পুত্রকে বাঁচিয়ে দেবেন—এই আশা নিয়ে কর্ণ ও তাঁর পত্নী তাঁদের একমাত্র

পুত্রকে বলি দেননি। তাঁরা এই ভাবে অতিথি সৎকার করেছিলেন কারণ কর্ণের কাছে কেউ কোনও কিছুর জন্য প্রার্থী হয়ে আসলে তিনি তা পূরণ করতেন। এই জন্য তাঁর সুনাম ছিল। ধর্মরাজ কর্ণের সত্যধর্ম পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন —তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে।

তখনকারদিনে অতিথি সৎকার ছিল পরমধর্ম।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বর্তমান যুগেব মানুষ কোনও কিছু করতে গেলেই ভবিষ্যতের আশা নিযেই কাজ করতে যায়। কর্ণের মতো এখনকার দিনে ধর্মাচরণ করলে জেল ও ফাঁসি হয়ে যাবে। কোনও কিছু করার আগেই মানুষ লাভ-লোকসানের হিসাব করে তবে কাজ করতে আরম্ভ করে।

৪। ১০। ৭২

১৯৮

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিম্নোক্ত গল্পটির মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন যে, বাইরের থেকে যত সাবধানতাই অবলম্বন করা হোক, জীবনে দুঃখ-বিপদ-মৃত্যুকে কখনও ঠেকানো যায় না। দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল অবিরাম ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা।

এক রাজা শত্রুর ভয়ে এত ভীত যে, রাতে ঘুমের সময়ও প্রহরী রাখেন চার দিকে। যদি হঠাৎ শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে, এই ভয়ে অস্ত্র তৈরি রাখেন ও সৈন্যসামন্তদের সতর্ক থাকতে বলেন।

একদিন রাজা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন যে, বাঘ তাকে তাড়া করেছে। রাজা ছুটতে ছুটতে লাফ দিয়ে এক গাছে উঠছেন এবং বাঘটিও তখন গাছের উপরে উঠতে চাইছে লাফ দিয়ে। এই দেখে ভয় পেয়ে রাজা আরও উঁচুতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ দেখেন তার মাথার উপরেই একটি বিরাট সাপ। সাপের দৃষ্টি রয়েছে গাছের নিচের দিকে। নিচের দিকে তাকিয়ে রাজা দেখতে পেলেন একটি সাদা ইঁদুর ও একটি কালো ইঁদুর গাছের গোড়ায় অনবরত মাটি খুঁড়ছে। তার পরেই রাজা অদূরে একটি গভীর কুয়ো দেখতে পেলেন। রাজা দেখলেন ভারী বিপদ। নিচে বাঘ, উপরে কালসাপ, আর এদিকে দু'টি ইঁদুর এমনভাবে মাটি খুঁড়ছে যে শিগগিরই গাছটি পড়ে যাবে। গাছ থেকে পড়লে আবার গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে প্রাণ যাবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে বাঘ হল অহংকার-অভিমানের প্রতীক। বৃক্ষ হল সংসারবৃক্ষ। কালসর্প হল মৃত্যু। কুয়ো হল নরক এবং সাদা ও কালো ইঁদুর হল রাত ও দিন—একটির পর একটি এসে ক্রমশ আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারই নিদর্শন। এ অবস্থায় কী কর্তব্য? মৃত্যুর কালসাপ তো সবার মাথার উপরেই বসে আছে। কেউ তো তার হিসাব রাখে না।

এ সবের থেকে বাঁচবার উপায় আছে। অবিরাম যদি অন্তরে নাম হতে থাকে তবে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বাঘ এসেও থমকে দাঁড়াবে। ভিতরে নাম চললে কেউ মারতে পারে না, কেউ কাটতে পারে না। 'আমারবোধে' চললেই ভয়, শোক,

দুঃখকষ্ট, মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। যে যত 'আমারবোধ' কমাতে পারবে সে Beggar king হয়ে যাবে।

৫। ১০। ৭২

১৯৯

গল্পের মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুব আত্মজ্ঞানের বা আত্মবিদ্যার অনুশাসন ও শিক্ষা অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন হল, সংসারে শান্তি কী বস্তু এবং এই শান্তি কী ভাবে আসে? শান্তি আসে ত্যাগে। 'আমারবোধ' যার ত্যাগ হয়েছে সে-ই হল ত্যাগী। যার 'আমার' বলে কিছুই নেই, এমনকী 'আমার' বলে দেহের প্রতি দাবিও থাকে না সে-ই সদাতুষ্ট এবং যথার্থ শান্তি লাভ করেছে।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প বললেন।

একজন অবধূত পাহাড়পর্বতে ঘুরে বেড়ান আবার নগরেও আসেন। তাঁর স্বভাব এমন যে, তিনি কারওর বাড়িতে যান না, কিছু চান না, তৃষ্ণায় নদীর জল পান করেন এবং গাছের ফল খেয়ে থাকেন। সারাদিনে তাও না-জুটলে dustbin থেকে কুড়িয়ে খান। এই ভাবে চলতে চলতে এক রাজবাড়িব সামনে তিনি উপস্থিত হলেন। সেই সময ‌বিশেষ এক উৎসব উপলক্ষ্যে রাজবাড়িতে যজ্ঞ প্রভৃতি হচ্ছিল। বহু লোক আমন্ত্রিত হযেছে। চার দিকে আলোর মালায় উৎসববাড়ি সুসজ্জিত এবং লোক সমাগমে মুখবিত। সর্বত্রই জাঁকজমকপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ। রাজবাড়ির পাশেই আস্তাকুঁড়। সেখানে অতিথি অভ্যাগতরা খেয়ে যাবার পরে এঁটোপাতা ও ভুক্তাবশেষগুলি ফেলা হচ্ছে। সেই অবধূত ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে সেগুলি কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ কবলেন। তাঁর কোনও আচার-বিচার নেই, বিকারও নেই। প্রসন্ন চিত্তে অবধূত কোনও কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে আপনমনে তা খাচ্ছিলেন। এ রকম দৃশ্য দেখলে লোকে পাগলই বলবে। কারণ তাঁর তখন কোনও বিচার নেই। সংসারী লোক এঁদের পাগল বলেই ভাবে এবং ঠেকলে পরে তাঁদের পায়ে এসে মাথা ঠোকে। এ রকম ভাবে খেতে দেখে রাজার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। উৎসবের দিনে অভুক্ত একজন তার রাজ্যে dustbin থেকে কুড়িয়ে খাচ্ছে দেখে তার খুব কষ্ট হল। তাঁকে ডেকে আনবার জন্য হুকুম দিলেন রাজা। ভৃত্য অবধূতকে বলল— তুমি এখানে খাচ্ছ কেন? রাজার আদেশ তোমাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।

অবধূত বললেন—আমি কখনও কারওর বাড়িতে যাই না। ভৃত্য এসে রাজাকে সেই সংবাদ দিল। রাজা তাঁকে খাবার পাঠাতে আদেশ করলেন। ভৃত্য ভাল ভাল খাবার নিয়ে অবধূতের কাছে গেল। অবধূতের সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। রাস্তা থেকে কুড়িয়েই খেতে লাগলেন। ভৃত্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—রাজা তোমার জন্য এ সব খাবার পাঠিয়েছেন, তুমি এগুলি খাও।

অবধূত বললেন—এ সব অন্য কারওকে দাও, আমার প্রয়োজন নেই।

ভৃত্য এসে রাজাকে সংবাদ দিল এবং অবধূতের কথা জানাল। রাজা তখন দু'টি টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তাও অবধূত ফিরিয়ে দিলেন। রাজা ভাবলেন,

দু'টি টাকা অতি যৎসামান্য, এত কম টাকা দেওয়া ঠিক হয়নি, সেই জন্যই বোধহয় অবধূত টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন। তারপর রাজা দশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। তাও ফেরত আসল। এরপর রাজা একশো, হাজার টাকা যথাক্রমে ভৃত্যকে দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু প্রতিবারই অবধূত সেই টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভাবলেন, ইনি তো সাধারণ সাধু নন। তখন রাজা খাজাঞ্চির কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে নিজেই গেলেন সেখানে। অবধূতের কাছে গিয়ে রাজা বললেন—সাধুজি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার জন্য দশ হাজার টাকা উপঢৌকন এনেছি, আপনি গ্রহণ করুন। অবধূতের সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, নির্লিপ্ত ভাবে বসে আছেন। তখন রাজা বললেন—আপনার যদি আরও দরকার থাকে বলুন, আরও দেব। দশ-বিশ লাখ যত প্রয়োজন হবে সব দেব।

অবধূত রাজাকে বললেন—আপনি অন্য কারওকে দান করুন।

রাজা বললেন—আপনি আমার রাজ্যে থেকে এ রকম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে খাবেন, তা হতে পারে না। আমার রাজ্যে কাঙাল কেউ থাকতে পারবে না।

অবধূত রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাঙাল কে?

রাজা—কেন, আপনি?

অবধূত—কেন?

রাজা—আপনি কুড়িয়ে খাচ্ছেন তাই।

অবধূত—আমি কাঙাল আর আপনি রাজা? আচ্ছা মহারাজ, আপনাকে যদি কেউ এক লাখ টাকা দেয়, আপনি গ্রহণ করবেন কি?

রাজা—কেন গ্রহণ করব না? নিশ্চয় করব।

অবধূত—লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং আপনার কোষাগারে যত ধনসম্পত্তি আছে ততোধিক ঐশ্বর্য যদি আপনাকে দেওয়া হয় তবে আপনি তা নেবেন কি?

রাজা—হ্যাঁ নিশ্চয়ই নেব। তারপর হাত জোড় করে রাজা অবধূতকে বললেন—আপনি যদি কৃপা করে দেন তবে আমি ধন্য হয়ে যাব।

অবধূত—আপনার এত থাকা সত্ত্বেও আপনার অভাব পূরণ হয়নি এবং লোভও দূর হয়নি। কাঙাল তো আপনি নিজেই, অথচ আপনি আমাকে কাঙাল বলছেন। কিন্তু আমার তো অর্থের কোনও প্রয়োজন নেই, কোনও অভাবও নেই। আমি কী করে কাঙাল হব?

যার মনে অভাববোধ সে-ই কাঙাল। যার অভাব নেই সে কাঙাল নয়। যতক্ষণ মানুষের অভাব আছে সে কিছুতেই রাজা নয়, যাঁর অভাব নেই তিনিই রাজার রাজা, জীবন্ত ভগবান। তাঁর মন সদাতুষ্ট, সদাতৃপ্ত।

অবধূত বললেন—অভাববোধ নিয়ে কোনও দিন কেউ রাজা হতে পারে না।

১৮। ১০। ৭২

২০০

স্নেহ মমতা থেকে জীবনে যে আঘাত আসে তারই উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক ব্রাহ্মণ দম্পতি সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটায়। তাদের সন্তান নেই বলে মনে খুব দুঃখ। তারা সাধনভজন করে। কারওকে মনের কথা কিছু বুঝতে দেয় না। সন্তানের জন্য ঈশ্বরের কাছেও প্রার্থনা করতে লজ্জা বোধ করে। এ ভাবেই দিন চলছে।

তাদের এক প্রতিবেশী ছেলেপুলে, নাতিনাতনি নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছিল। তাই দেখে তাদের আরও মন খারাপ হত। সন্তানের অভাব বোধ করত অথচ ভগবানের কাছে চাইতেও সংকোচ ও লজ্জা বোধ করত।

তাদের প্রতিবেশী ছিল বৈশ্য, ব্যবসাবাণিজ্য করে সুখে সংসার করছিল। হঠাৎ একদিন প্রতিবেশী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—পুত্রকন্যা, নাতিনাতনির জন্য সারাজীবন এত করলাম অথচ ওরাই এখন আমাদের মেরে তাড়িয়ে দিল। কেন এ রকম হল? আমি তো সে বাড়িতে আর বাস করতে পারব না। ওরা মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। তোমরা বেশ আছ—সন্তানসন্ততি নেই। তাদের কাছ থেকে দুঃখকষ্ট ও আঘাত তোমাদের পেতে হবে না। ব্রাহ্মণ তাকে নানা রকম ভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল।

একটু পরেই সেই বাড়িতে বৈশ্যের স্ত্রীও কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল—আমাকেও মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের নিজের হাতে মানুষ করেছি, যে নাতিনাতনির জন্য ঈশ্বরের কাছে কত প্রার্থনা করেছি তারাই শেষ পর্যন্ত আমাকে এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিল—এটা কিছুতেই আমি সইতে পারছি না।

ব্রাহ্মণীর দিকে তাকিয়ে বৈশ্যপত্নী আরও বলল—তুমি বেশ ভাল আছ, দুঃখ দেবার কেউ নেই তোমাদের। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভেবে দেখল সত্যিই তো সন্তানসন্ততি না-থাকলে দুঃখকষ্ট সাময়িক ভাবে হলেও পরিণামে অনেক কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বুঝতে পারল যে, ভালই হয়েছে তাদের সন্তান না-হয়ে। তবুও মাঝে মাঝে সন্তানহীন হবার দুঃখটা থেকে থেকে জেগে উঠত।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পের মাধ্যমে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, কেউ আপন নয়। কোনও জন্মে পাওনা ছিল কাজেই সন্তানরূপে এসে আদায় করে নিয়ে গেল এই ভাবে। পিতামাতারা এই ভাবে ঋণমুক্ত হবার সুযোগ পায়। কোনও রকম আশা না-রেখে পুত্রকন্যাদের প্রতি duty পালন করে যেতে হয় তারা মানুষ না-হওয়া পর্যন্ত।

১৮। ১০। ৭২

২০১

জ্ঞানের আলো ছাড়া অভী হওয়া যায় না। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করতে হয় বিচার দ্বারা, জ্ঞানের সাহায্যে। এই শিক্ষাই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিম্নোক্ত গল্পটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন।

এক গুরুদেবের আশ্রমে তার এক শিষ্যের উপর গোশালা তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। শিষ্য গোসেবা করে, গোশালার তত্ত্ববধান করে—এই ভাবেই চলছিল কিছুদিন। একদিন রাতে গরুকে বাঁধবার জন্য যে দড়ি ছিল তারই একটি ছিন্ন অংশ গোশালার মাঝখানে পড়েছিল। সেই দিন রাতে গোশালা পরিষ্কার করতে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শিষ্য তা দেখতে পেয়ে সাপ মনে করে ভয়ে চিৎকার করে উচ্চৈঃস্বরে গুরুদেবকে সে কথা জানাল।

গুরুদেব পাশেই একটি কুটিরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি শিষ্যকে বললেন—বদ্রীনারায়ণের নাম কর তাহলেই সাপ চলে যাবে। শিষ্য বদ্রীনারায়ণের নাম করল, কিন্তু কিছুই হল না। সাপ যথাস্থানেই রইল। গুরুদেবকে সে কথা জানাতে গুরুদেব বললেন—শিবশঙ্করের নাম জপ কর তাহলে। শিষ্য শিবশঙ্করের নাম জপ করল, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। সে কথা শুনে গুরুদেব নির্দেশ দিলেন—সব দেবদেবীর নাম কর। শিষ্য আবার সব দেবদেবীর নাম করতে লাগল, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। সাপ (দড়ি) যেমন ভাবে ছিল ঠিক তেমন ভাবেই পড়ে রইল।

শিষ্যের কাছে সব শুনে গুরু চিন্তিত হয়ে এবার একটি লণ্ঠন হাতে করে নিজেই এলেন গোশালায়। তিনি লণ্ঠন নিয়ে কাছে আসতেই দড়িটি দেখতে পেয়ে শিষ্যকে বললেন—কোথায় সাপ ? সাপের মতন আঁকাবাঁকা হয়ে গরুর গলার একটি দড়ি পড়ে আছে মাটিতে। গুরুদেব তখন বললেন—তোমার ভ্রম হয়েছিল, এটা সাপ নয়, দড়ি। তখন শিষ্য আশ্বস্ত হল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পটি থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া গেল যে, জ্ঞানের আলো ছাড়া অভী হওয়া যায় না। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করতে হয় বিচার দ্বারা, জ্ঞানের সাহায্যে। রজ্জুতে সর্পভ্রম যেটা হয়েছিল সেই ভ্রম দূর হয়েছিল আলোর দ্বারাই। তবে এটাও স্থায়ী হয় না, বোধের দ্বারা পূর্ণ ভ্রান্তি অবলুপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত। বুদ্ধির ক্ষমতা সসীম বলে তার বিচার অভ্রান্ত হয় না। আবার রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন কচুরিপানা সরিয়ে জল ব্যবহার করার পরে পুনরায় কচুরির দল এসে জলটা আবৃত করে ফেলে, সেই রকম বুদ্ধির অধিষ্ঠানচৈতন্য সাময়িক ভাবে ভ্রান্তি অপসারণ করলেও পুনরায় সেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। সেই রকম বুদ্ধিবিজ্ঞানের সাহায্যে "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এটাও স্থায়ী হয় না। রজ্জু ও সর্প দু'টিই মিথ্যা বলে যখন জ্ঞানসিদ্ধ হবে তখন ঠিক ঠিক অভী হওয়া যাবে। সেই রকম পূর্ণতার জন্য বুদ্ধি এবং জগৎ কোনওটির উপরেই importance দিতে নেই আর নয়ত দু'টির প্রতি সমান importance দিতে হবে। তাহলেই সর্ব অবস্থায় অনাসক্ত ও উদাসীন হয়ে নিরবলম্ব অবস্থায় থাকা সম্ভব হয়।

১৮। ১০। ৭২

২০২

কুকীর্তি করে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। প্রসঙ্গকে সুবোধ্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক রাজা ভোগী ও বিলাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, আমিই সম্রাট, আমার উপরে আর কে আছে—অতএব আমার যা ইচ্ছা তা-ই করব।

কিন্তু জীবনধন তো একদিন ফুরিয়ে যায়। শক্তি, প্রতাপ সসীম বস্তু—যখন তা কমে যায় তখন দেহরক্ষা, রাজ্যরক্ষা করার ক্ষমতা থাকে না। একবার সেই রাজার রাজ্যে বাইরের শত্রু আক্রমণ করল। অত্যাচারী হয়ে যাওয়ার ফলে রাজা শত্রুকে প্রতিহত করতে পারলেন না, কারণ তখন তার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পরাজিত হয়ে রাজা ও মন্ত্রী দু'জনেই শত্রুর হাতে বন্দি হন। রাজা তখনও মন্ত্রীকে বলছেন—মন্ত্রী আমার যে এ রকম দুরবস্থা হবে আমি ভাবতেই পারিনি। মন্ত্রী বললেন—কেন মহারাজ, এ অবস্থা যে হবে আমি তো আগেই বলেছিলাম। রাজা বললেন—বলেছিলে তো কী হয়েছে। মন্ত্রী বললেন—কেন, সেটাই তো হয়ে গেল। মহারাজ, দেখছি এখনও আপনার অহংকার-অভিমান আছে, অতএব আরও কত যে দুঃখ আসছে।

শত্রুপক্ষরা মন্ত্রীকে ছেড়ে দিল, কিন্তু রাজাকে ছাড়ল না। একটি cell-এ রাজাকে বন্দি করে রাখল। সেই cell-এ মস্ত বড় এক খুনিকে এনে রাখা হল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কী করেছ? সে বলল—আমি কয়েকশো মানুষ খুন করেছি। কিন্তু তোমাকে কেন এনেছে? তুমি কী করেছ? রাজা উত্তরে বললেন—আমি রাজা, এখন শক্তিসামর্থ্য নেই। শত্রুরা পরাজিত করে এই অবস্থায় এনেছে। সে অবাক হয়ে রাজাকে বলল—তুমি রাজা? তুমি তো আমার চেয়েও বড় খুনি। আমি মাত্র কয়েকশো খুন করেছি আর তুমি কয়েকলাখ লোক মেরেছ।

রাজার দুরবস্থা দেখে খুনি তার বিচার করে দিল। কাদের দুরবস্থা হয়? এখানে বক্তব্য কী? সৎ মার্গের লোকেদের দুরবস্থা হতে পারে না। রাজার দুরবস্থা হল তার স্বকৃত কর্মফলের জন্য। তার জন্যই তাকে রাজ্য হারিয়ে অন্য রাজার কারাগারে বন্দি হয়ে বাস করতে হল। যারা অসৎ কর্ম করে তাদের দুর্ভোগ ভোগ করতেই হয়।

গল্পটির মূল বক্তব্য হল—"সৎ কর্মে স্বর্গবাস, অসৎ কর্মে নরকবাস।" সৎ কর্ম হল ঈশ্বরাত্মবোধে দিব্য কর্ম, বিষ্ণুযজ্ঞ। তার ফল অমৃত মুক্তিশান্তি। অসৎ কর্ম হল ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ, হীন, জঘন্য, লজ্জাকর ও দুষ্ট কর্ম, অন্যের সর্বস্ব অপহরণ, নিষ্ঠুর ভাবে অপরের প্রাণনাশ প্রভৃতি। তার ফলে যন্ত্রণাদায়ক, দুঃখপ্রদ জীবন এবং পুনঃপুনঃ নরকবাস। শুধু তাই নয়, নিম্ন বা হীন যোনিতে জন্ম ও অপরের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত জীবন ভোগ।

আসলে জীবনে বুদ্ধির বাহাদুরি নিয়ে চলাটাই অসুরবৃত্তি। বুদ্ধি যদি ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন না-করে চলে তবে কাজকর্মে কুফল আসবেই। কর্মফল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েও যদি মানুষ সৎ কর্মের বদলে অসৎ কর্মের আশ্রয়ে জীবনযাপন করে তাহলে তার সদ্গতির আর কোনও উপায় থাকে না। মনুষ্যজীবন লাভের মূল উদ্দেশ্য হল অবিদ্যা-অজ্ঞান মুক্ত হয়ে দিব্য আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

২০। ১০। ৭২